প্রথম প্রকাশ,
১৯৫৮

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রাকর
মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

উৎসর্গ

শৈশবে শিশুব প্রথম শিক্ষা

অ যে। অজগব আসচে তেড়ে

আ তে। আমটি আমি খাবো পেড়ে

যোগীন্দ্রনাথ সবকাবেব এই অনবদ্য অক্ষব পবিচয়েব মাধ্যমে যিনি আমায় বাল্যে কলাপাতায় প্রথম অক্ষব- জ্ঞান দিয়েছিলেন, বিস্মৃতিব অন্ধকাবে হাবিয়ে গিয়েও তিনি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল ; আমাদেব পাঠশালাব সেই অবিস্মবণীয় শিক্ষক **পরেশ মাস্টারের** পুণ্যস্মৃতিব উদ্দেশে

নিবেদন

সাহিত্যের সব সমঝদার ও কৌতূহলী পাঠক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রস-আহরণে কতখানি আগ্রহী, তার পরিমাণ নির্ণয় করা না গেলেও একথা বলা যায় যে ভাষা ও রচনাগত কারণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে পার্থক্য, সাহিত্যের অনেক পাঠক সেই পার্থক্যের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা উপলব্ধি করতে পারেন বলেই সম্ভবত অপেক্ষাকৃত দুরূহ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠে তেমন উৎসাহ পান না। আসলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য দূর অতীতের বিধায় তার সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তার সম্পর্ক নিকট নয়; প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাষা, বিষয়, কবিদের রচনাবৈশিষ্ট্য সবই পাঠককে প্রায়শ অপরিচয়ের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করে। অন্যদিকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পাঠকের খুব কাছের হওয়ায় পাঠক তাকে সহজেই আপন করে নিতে পারেন। তবে একথা ঠিক যে সাধারণ পাঠকের না হোক; অন্তত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ইতিহাস-পাঠ একান্ত আবশ্যক হয়। তার কারণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের উচ্চতর পাঠ্যতালিকার একটি অবশ্য-পঠনীয় বিষয়।

সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়ের সেতুবন্ধন যোজনা করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। এই ইতিহাসের পাঠ দুরূহ ও কিছুটা দুরধিগম্য বটে, কিন্তু জ্ঞানার্জনের আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হলে সব বাধা খুব সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব। তথাপি দেখা যায় তুলনামূলক দুরূহতার কারণে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি সাধারণ পাঠকের কিছু ঔদাসীন্য থাকে। হয়তো কোনো অজানা ভয় ও ভাবনার জন্য অনেক পাঠক সচরাচর ঐ দুর্গম পথে পা বাড়াতে চান না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণার ফলে এখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা ও এ বিষয়ে বই লেখা যে অনেক সহজ হয়ে এসেছে একথা অনেকেই স্বীকার করেন। তবু প্রাচীন সাহিত্যের অনেক বিষয় যেহেতু এখনো একেবারে বিতর্কশূন্য নয়, সেকারণে সেসব বিষয়ে গবেষণারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আসলে দূর অতীতের সব বিষয় অনেক জোরালো মত-প্রতিষ্ঠার পরেও যে একেবারে সংশয়শূন্য হবে এমন মনে করা ঠিক নয়। তাই দেখা যায় আজ যেখানে শেষ করা হলো বলে ধারণা করা হয়, কালই হয়তো সেখান থেকেই নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। কাজেই অতীতের পথ-পরিক্রমায় শেষ বলে কিছু নেই।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এককথায় বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস। তাতে যেমন হিন্দুপুরাণ ও মিথের উপস্থিতি আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের আচার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, উপচার ইত্যাদির সমন্বিত পরিচয়; প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়সহ বাংলার শিল্পকলা ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ইতিহাস-চর্চায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণত পুথি-নির্ভর সাহিত্য। এই ইতিহাস রচনার একটা অসুবিধা এই যে, সব কবির পুথি সব সময় সুলভ হয় না। নিজেব চেষ্টায় কিংবা হ্যাতের কাছে যা পাওয়া যায় এবকম কিছু মূলপুথির অবলম্বন তো থাকেই, উপরন্তু বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহ করতে পারলেই কেবল এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ লেখার প্রেরণা পাওয়া যায়। যেহেতু অনেক বিশিষ্ট গবেষক ও পণ্ডিত বহু আগেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে গেছেন, সুতরাং এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নতুন করে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা কি? তার কোনো সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে নতুন যে-কোনো বিষয়ের মধ্যে এক ধরনের স্বাদ থাকে যা মৌলিকতা দাবি না করলেও তার উপস্থাপনা কারো কারো কাছে উপাদেয় কিংবা প্রয়োজন-সিদ্ধ মনে হয়। এ বইটি সেরকমভাবে নতুন কোনো তাৎপর্য বহন করবে কিনা বলতে পারি নে, তবে তত্ত্বঘটিত বিতর্কে অংশগ্রহণ করার অভিলাষ পরিহাব করে এ বইযেব বিষয়কে যথাসম্ভব সহজভাবে উপস্থাপন করাব চেষ্টা করা হয়েছে বিধায় এটি পাঠকেব বুদ্ধি বিবেচনায় সাড়া দেবে বলে বিশ্বাস করি। এছাড়া বইটি লেখা হয়েছে পুরোপুরিভাবেই সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়। তবে এতে বিষযের ঐতিহাসিক ধাবাবাহিকতা রক্ষা করার প্রয়াস আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক জটিলতা বাড়ানোব প্রয়াস নেই ; পাণ্ডিত্যেব পথে অগ্রসর হওয়াব চেষ্টা আছে, কিন্তু যতদূব সম্ভব পথটিব সরল রেখা ধরে চলার প্রয়াস কবা হয়েছে। এবং সম্পূর্ণ বইটিতেই বাংলা সাহিত্যেব স্বনামধন্য পণ্ডিতদের ছায়ার মতো অনুসবণ করা হয়েছে ; তাতে লেখকের নিজস্বতা কতটুকু ম্লান হয়েছে, এটি পাঠকেব বিবেচনাব বিষয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুরোটাই বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'লেখা' পত্রিকায় প্রথম ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'লেখা'র নির্বাহী সম্পাদক আমাব অত্যন্ত প্রিয়বন্ধু, সহপাঠী ও বাংলা একাডেমীর দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং বাংলাদেশেব স্বনামধন্য কবি ও সংস্কৃতি-ব্যক্তিত্ব জনাব আসাদ চৌধুরী। এই সর্বজননন্দিত ব্যক্তিটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'লেখা'র জন্মলগ্নে একাডেমীর এই মাসিক পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে রচনার জন্য আমাকে প্রস্তাব দেন। আমি তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করি। তবে পুস্তক আকাবে প্রকাশিত প্রাচীন ও মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস 'লেখা'য প্রকাশিত ইতিহাসেব তুলনায় যথেষ্ট পরিণত, বিন্যস্ত ও পরিমার্জিত। 'লেখা'য় ছাপানোর জন্য আমার লেখাটি ঘনঘন তাগাদা দিয়ে যিনি আদায করতেন তিনি বাংলা একাডেমীব নিবেদিত কর্মকর্তা জনাব জালাল ফিরোজ।

এ গ্রন্থ রচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্যেব, অনেক জটিল বিষয়ের গ্রন্থিমোচনে আমাকে অনেক গুবত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসব ডক্টব আহমদ শরীফ। তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই, অত্যান্ত বেদনাভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁকে আজ স্মবণ করি।

আর একজন কৃতি গবেষক প্রফেসব ডক্টব মোহাম্মদ আবদুল কাইউম প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

বাংলা একাডেমীর নিয়ম অনুযায়ী দু'জন পরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন পাণ্ডুলিপিখানি একাডেমী থেকে প্রকাশের জন্য অনুমতি দেন। তদনুসারে বইটি প্রকাশ করেন একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন। আমি তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী। তাঁদের সহৃদয় অনুমোদন ছাড়া এ বইয়ের প্রকাশ সম্ভব হতো না।

বাংলা একাডেমীর প্রেস-ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত একাডেমীর উপপরিচালক জনাব মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ্ এ বইয়ের শোভন প্রকাশে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যে সহায়তা দিয়েছেন, আমি তা ভুলবো না। একাডেমী- প্রেসের নিরলস কর্মী মোঃ আনোয়ারুল হক ও মোঃ মনিরউদ্দিন আহমেদ বইটির প্রকাশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে সহযোগিতা করেছেন, আমাকে তা মুগ্ধ করেছে। এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ।

এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সময় বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক জনাব আমিরুল মোমেনীন কিছু দুর্লভ গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাংলা একাডেমীর কম্পিউটার পুলের মাহবুব হাসান, নজরুল ইসলাম, মাহফুজ, জিয়া, লুনা, মিলন, শাহীন ও পলি এবং এরূপ একটি জটিল বইয়ের কম্পোজ থেকে শুরু করে অন্যান্য পর্যায়ের কাজগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পাদন করেছে। তারা প্রত্যেকেই আমার স্নেহভাজন।

বইটির নির্ঘণ্ট বা শব্দসূচি আমাকেই করতে হয়েছে, তবে যাঁর অক্লান্ত সহায়তা আমার কাজটি সহজ করে দিয়েছে তিনি ভাষা সাহিত্য উপবিভাগের অফিসার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। ভাসাসপ বিভাগের প্রকাশন শাখার সহপরিচালক মোহাম্মদ আবদুল হাই বইটির ইনার ও বিষয়সূচি বেশ সুষ্ঠুভাবে তৈরি করেছেন। জনাব মামুন কায়সার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আমার প্রায় সব বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন। এ বইয়ের প্রচ্ছদটিও তিনিই করেছেন। মামুনকে ধন্যবাদ।

সবশেষে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

আজহার ইসলাম

বিষয়-সূচি

বিষয়-প্রসঙ্গ

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বাঙালির জাতীয় জীবনের নানা দিক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। বাঙালির জীবন ও জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো তার ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিমিশ্র হয়ে অবলীলায় ছড়িয়ে পড়েছে এই ইতিহাসের পাতায়। তাই সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসের যুগ থেকে গঙ্গা-যমুনার পলল্ মাটির ভূখণ্ডে লালিত বাঙালি জাতিকে জানতে হলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ একান্ত আবশ্যক।

প্রাকৃত, অপভ্রংশ তথা অবহট্টের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে বাঙালি কবিগণ প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায়ই নিবেদিত ছিলেন। সেই সঙ্গে অবহট্টে লেখা কবিতা রচনাও তখন হয়েছিলো। তাই প্রাচীন বাঙালির মনন-চর্চার ইতিহাসও ধরা পড়ে সংস্কৃত ও অবহট্টে রচিত সাহিত্যে। সূচনায় তারই মধ্যে প্রতিফলিত হয় বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস ; পরবর্তী পর্যায়ে তা কোন্ দিকে মোড় নেবে তাও বোঝা যায়।

সংস্কৃতের সঙ্গে নবোদ্ভূত প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটা বিরোধ একসময় ছিলো, তবে সেন আমলের উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য, জয়দেব, শরণ, ধোয়ী প্রমুখ বাঙালি কবি সংস্কৃতে সাহিত্য-চর্চা করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা বাঙালির ঐতিহ্য হিসেবে যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অবদান রেখে গেছেন, তাকে কোনোক্রমেই বিরোধের বিষয়রূপে মনে করা যায় না। বিশেষ করে প্রাচীন বাঙালির মানসলোকের চমৎকার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে এই সব সংস্কৃত সাহিত্যের বাঙালি কবির রচনায়।

অনেক চড়াই উতরাই পার হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরিশেষে একটি সুস্থ সাহিত্যের পথে অগ্রসর হয়। বাংলা সাহিত্যের পথ-নির্মাণে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের অবদান যেমন অপরিমেয়, তেমনি শতাব্দী থেকে শতাব্দীকালের বাঙালির মনন-চর্চার এই ক্রমবিকাশ মধ্যযুগের কবিদের নিবেদনে ও মিলিত প্রয়াসে এক গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্যের ইতিহাসরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দুটি ভাগে বিভক্ত,—আদিযুগের বাংলা সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। তবে তার মাঝে এক শতকের অধিকাল ধরে রাজনৈতিক গোলযোগে বাংলার শিষ্ট সাহিত্যের ধারাটি প্রায় স্তব্ধ থাকে। ভবিষ্যৎ-গবেষণায় হয়তো সেসময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যের কোনো চমকপ্রদ নিদর্শন বেরিয়ে আসতেও পারে। আশার কথা এই যে এ বিষয়ে গবেষকদের চেষ্টার কোনো অন্ত নেই।

চর্যাপদকে ঘিরে যে সাহিত্যবলয়, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলতে তাকেই বোঝায়, তার আগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে যে সাহিত্য-প্রয়াস, কতকগুলো কারণে সেই প্রয়াসকেও বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যায়। কেননা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অপভ্রংশ যুগের যে সাহিত্য-সাধনা, প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে তার অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। একই কারণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'

সংস্কৃতে রচিত হলেও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় তার প্রসঙ্গ অনিবার্য হয়। তথাপি সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত অপভ্রংশ নয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের বৈপ্লবিক প্রয়াসে সৃষ্ট বাংলা ভাষাই এক সময় সাহিত্য-চর্চার বাহন হয়, যার ফলপ্রসূ নিদর্শন 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'।

আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের নাম সুবিদিত। পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের বিষয়ভাবনার যে কাব্যরূপায়ণ, তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখের পদাবলী ও চৈতন্যপর্বের সাহিত্য-সাধনায়।

প্রাচীন বঙ্গে তুর্কিদের বিজয়াভিযান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তুর্ক আক্রমণে দেশের যে রাজনৈতিক পরিবর্তন, তাতে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রথমে একটা অনিশ্চয়তার ছায়াপাত ঘটে, তবে দূর-ভবিষ্যতে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর অভিযান বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্যের জন্য যে শুভপ্রদ হয়েছিলো তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই অভিযান দুটি কারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম শাসকগণের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদায়গত ভেদরেখা অনেকটা বিলুপ্ত হয়, ফলে এক অখণ্ড বাঙালি জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, হিন্দু মুসলমানের দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ফলে এক অভিন্ন বঙ্গসংস্কৃতিরূপে গড়ে উঠবার অবকাশ পায়।

বঙ্গে এক সময় সংস্কৃত চর্চার যে দাপট ছিলো তাতে দেশীয় ভাষাগুলো বিপর্যস্ত হয়; সংস্কৃতবহুল শিষ্ট সাহিত্যের ধারায় এসব ভাষার কোনো স্থান ছিলো না। পরে বাংলা চর্চার প্রসার ঘটে, মুসলিম আমলে মৈথিল ও হিন্দির সঙ্গে অল্পাধিক ফারসি ভাষার চর্চা হয়। মুঘল আমলে উর্দু ও ফারসি চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই চর্চার একটা সুফল হয়েছিলো এরূপ যে বাংলায় তখন অনুবাদমূলক সাহিত্য-সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবার সুযোগ হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ। এসময়ের উল্লেখযোগ্য কবি কৃত্তিবাস (খ্রিস্টীয় ১৫ শতক) তাঁর রামায়ণের মাধ্যমে তুর্ক আমলের বিশৃঙ্খল সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শোনার প্রবণতা ছিলো মধ্যযুগের মুসলিম শাসকগণের। হয়তো এসব কাহিনীতে যুদ্ধবিগ্রহের যে চিত্র, মুসলিম নৃপতিদের তা আকর্ষিত করে থাকবে।

চৈতন্যদেবের (১৪৮৬ ১৫৩৩) আবির্ভাব সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯)। এসময় নবদ্বীপ ছিলো সংস্কৃত ও অন্যান্য শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র। চৈতন্যদেব ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল প্রবর্তক। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলা কাব্যের জগতে যে নবপ্রেরণা আনে এবং মানবজীবনের ব্যাখ্যায় যে দার্শনিক মতবাদ দেয়, বাঙালির মনীষায় তা অভিনব প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রেমধর্ম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা, সামন্ত সমাজব্যবস্থার মূলে তা কুঠারাঘাত করে। তবে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষত

কোনো আঘাত হানেন নি, কিন্তু তাঁর নাম সংকীর্তনে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে 'জীবের দয়া এবং স্রষ্টায় ভক্তি', সামন্তযুগের অনুদার মত-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তা একটি প্রতিবাদ। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে একথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে প্রেমের মহোৎসবে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। উচ্চ নিচের ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে মহৎ সংস্কারের এই যে আদর্শ চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব-সাধনায় প্রকাশ পেয়েছে, নিঃসন্দেহে তা গণতন্ত্রের মূল ধারাগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বাঙালির চৈতন্য বিকাশ লাভ করে সংগীতে, দর্শনে ও সাহিত্যে।

প্রেম ও ভক্তির আনন্দময় সত্তার আর এক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে। বাঙালির জাতীয় জীবনকে অনুরাগের বিকাশপথে মহিমান্বিত করেছে বৈষ্ণব-পদাবলী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার লীলাতত্ত্ব তাতে ভাবময় ও সুরময় হওয়ার অবকাশ পায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমে যে অবৈধ জৈবধর্মের প্রকাশ, চৈতন্যদেব তাতে দেবত্বের মহিমা আরোপ করে তাকে সমাজ-অনুমোদিত করেন, ফলে তা মানবপ্রেমের স্বাভাবিক বিকাশকে অন্তরায়-মুক্ত করে। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমকেই শাশ্বত সত্যের ভিত্তিতে বিচার করেন। বাংলার বৈষ্ণব-সাধনায় যে অতীন্দ্রিয় দৈবশক্তির বন্দনা, সুফী সাধকের মরমিয়া চিন্তায়ও তারই প্রকাশ প্রায় অভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব কবির হলাদিনী শক্তি যে তত্ত্ব ও সত্যের সন্ধান দেয়, বাংলার মুসলিম কবিরা সেই তত্ত্ব ও সত্যকে ভিত্তি করেই তাঁদের পদাবলীতে পারস্যের সুফীবাদের বিকাশসাধন করেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় নাথসাহিত্য ও বাংলা মঙ্গলকাব্য। বাঙালির জাতীয় জীবনের সঙ্গে এ দুটি সাহিত্যধারার সংশ্লেষ যথেষ্ট গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

নাথপন্থী সাধকেরা যোগতন্ত্রের যে ধর্মমত প্রচার করেন, চর্যাপদের সহজপন্থী ধর্মমতের সঙ্গে তার মিল ও অমিল দুটোই লক্ষ্য করা যায়। মূলত একই উৎস থেকে এই দুই ধারার ধর্মমতের উদ্ভব। গুরুবাদ উভয় ধর্মেরই প্রেরণা, তবে চর্যাপদে যেমন গুরুর উপদেশে পরমার্থজ্ঞান লাভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, নাথধর্ম মতে সাধক তার বিপরীত ধারা অনুসরণ করে কোনো পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান ছাড়াই যোগমার্গে পৌঁছবার শক্তি ধারণ করেন। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত নাথগীতিকায় প্রাকৃত জীবনের উদ্ভট কল্পনার মিশ্রণ থাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এক সময় এক শ্রেণীর অবধূত নাথশাস্ত্র-সম্মত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রংপুর কোচবিহার অঞ্চলে তাদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রভাব সঞ্চার করতো ; তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা উল্লসিত হতো। নাথসাহিত্যের এই জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে যোগী সিদ্ধাচার্যগণের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কাহিনী বাংলাদেশের জনগণের মুখে মুখে এক যুগ থেকে আর এক যুগে প্রবহমান হয়ে আসে।

নাথগীতিকাগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। পালবংশীয় রাজন্যবৃন্দের ইতিবৃত্ত নাথগীতিকার যোগীপাল, মহীপাল, ভোগীপাল ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়। অনুমান করা হয় গোপীচন্দ্রের গানের প্রধান ব্যক্তি গোপীচন্দ্র পালবংশের এক রাজা ছিলেন।

তেরো থেকে আঠারো শতকের মধ্যে রচিত ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যগুলোর মধ্যে বাংলা মঙ্গলকাব্য বাঙালির সংস্কার, আচার, বিশ্বাস, ভয়-ভীতি ও সামাজিক জীবনচেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। মঙ্গলকাব্যে দৈব ও দেবসমাজের যে আধিপত্য, পরোক্ষত তা স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব সঞ্চার করে, তবে বাঙালির সমাজ-জীবনে তাতে দেবতার অধিকার বাড়ে না, বরং মানুষই তার অধিকারবোধের অহঙ্কার নিয়ে দেবসমাজকে নিজের সমাজ ও পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করে। সেজন্য মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই জয়গান। সার্বজনীন মানবতার বিকাশ-সাধনের ক্ষেত্রেও বাংলা মঙ্গলকাব্যের মূল্য অপরিসীম। বাংলাদেশ ও বাঙালির সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস চর্চায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের স্তরগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলার সামাজিক জীবনে লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় ঘটে, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে তার ছাপ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা অসঙ্গত নয় যে বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালির মানসিক আয়োজনের মূলকথা হলো প্রবল মুসলিম রাজশক্তির দ্বারা শাসিত তৎকালীন দুর্বল হিন্দুসমাজ আত্মশক্তিতে আস্থা হারিয়ে অবশেষে নিঃসহায়ভাবে দৈবনির্ভর হয়ে পড়ে।

তবে মুসলিম রাজশক্তি সম্পর্কে জনমনে এই যে ভীতি, কখনো কখনো যে আতঙ্ক ও আশঙ্কা, তার সম্বন্ধ ছিলো সম্পূর্ণত বাইরের দিক থেকে ; কিন্তু ভিতরের যে অভিঘাত, তার প্রকাশ ঘটে আধিব্যাধি ও মহামারী সম্পর্কে জনসাধারণের ভয় ভাবনা ও হিংস্র জীবজন্তুর অনভিপ্রেত আক্রমণের সঙ্গে সম্বন্ধ যোজনায়। এই সব বিপদ-আপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ওলাদেবী ও শীতলা দেবীর প্রতিষ্ঠাও সেই দিক থেকেই এসেছে। তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় সংঘাতের বাইরে জনসাধারণের এই দৈবনির্ভরতা থেকে এ ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় যে বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে যে দেববন্দনা, তার মূলে কাজ করেছে বাঙালির মনোজগতে আন্দোলিত প্রেম আর ভক্তি নয়, বরং তার বিপরীতে ভয় আর ভীতি। সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাও সেই কারণে।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক বিবেচনায় মনসামঙ্গলের স্থান আগে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে হিন্দুপুরাণ যথা রামায়ণ মহাভারতে মনসার কোনো উল্লেখ নেই ; কেবল অর্বাচীন পুরাণ দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার প্রসঙ্গ আছে। তবে মনসার নাম তাতে ভিন্নভাবে পাওয়া যায়। দেবী ভাগবতে মনসাকে বলা হয়েছে জগৎগৌরী, নাগেশ্বরী, বিষহরি ও সিদ্ধযোগিনী। এসব হচ্ছে উপপুরাণের মনসা, কিন্তু মনসামঙ্গলের কাহিনীগত যে আড়ম্বর, হিন্দুপুরাণের ধারায়ই তার প্রকাশ ঘটেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী প্রথমে অনার্যদের পূজ্যা ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ্যসমাজের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আদায় করতে সমর্থ হন তিনি। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গদেশে চণ্ডীমাহাত্ম্য, দুর্গামাহাত্ম্য, গাথাসপ্তশতী ইত্যাদি পুরাণ-সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিলো। পঞ্চদশ শতকের বায়ুপুরাণ ও বামনপুরাণে চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। এসব পুরাণে বর্ণিত চণ্ডীর সঙ্গে কালী বা দুর্গার কোনো পার্থক্য নেই। চণ্ডী অনার্যপূজিত দেবী হওয়ায় চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-

উপাখ্যানে অনার্য প্রভাব বেশি। চণ্ডীর দ্বিতীয় উপাখ্যান 'ধনপতি-শ্রীমন্তে'র কাহিনীতে বর্ণিত আরাধ্য দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' শীর্ষক কাব্যরূপায়ণ থেকে অনুমান করা যায় যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের লৌকিক কাহিনী পরে জনসমাজে ব্রতকথা রূপে প্রচলিত হয়।

ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুরও অনার্যদের পূজ্য এক দেবতা। আনুমানিক খ্রিস্টীয় নবম শতকে তাঁর পূজার প্রচলন হয়। অনার্যপূজিত এই দেবতা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্পর্শে আসেন। তবে ধর্মের পূজা প্রধানত ডোমজাতীয় লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেজন্য দেখা যায় বৈদিক দেবতা বরুণ, ডোম, চণ্ডাল এঁদের প্রভাব ও সংশ্লেষ ধর্মঠাকুরের ক্রমবিকাশে সহায়ক হয়। আদি অনার্যপূজিত সূর্যদেবতা ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে ধর্মঠাকুর রূপে প্রতিষ্ঠা পান। এই ধর্মঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে শিবের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, ধর্মের গান এসব অঞ্চলে শিবের গাজনে রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় ভূমিতে ধর্মঠাকুর কালু রায়, বাঁকুড়া রায় ও বুড়া রায় নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যের দিক থেকে ধর্মমঙ্গলের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। হিন্দুসমাজে ধর্মঠাকুরের অবস্থান ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাসের উপর তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাঁর কৃপায় অন্ধ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পায়, শ্বেতকুষ্ঠে আক্রান্ত ব্যক্তি এই ভয়ানক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে, বন্ধ্যা অনায়াসে সন্তানলাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। এমন কি ধর্মের কল্যাণে কখনো কখনো মৃতের পুনর্জীবন লাভও সম্ভব হয়। এজন্য তুলনামূলকভাবে উচ্চবর্ণের কোনো দেবতাও ধর্মের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। তার আসল কারণ ধর্ম সাধারণ মানুষের দেবতা ; এবং সাধারণের বিশ্বাসের উপরই তাঁর প্রতিষ্ঠা।

হিন্দুপুরাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেবচরিত্র শিব। হরপার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়ে শিবের জীবনাচরণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শিবমঙ্গল কাব্যে। যদিও মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ডের দেবতা হিসেবে শিবকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষকরূপী দেবতারূপে শিবের গুরুত্ব সাধারণ বাঙালির জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। বিশেষ করে হরপার্বতীর অভাবের সংসারের শিবঠাকুর অনায়াসে অনশনক্লিষ্ট বাঙালির হৃদয় জুড়ে অবস্থান করেন। সুতরাং বলা যায় শিবমঙ্গল কাব্যের এই শিব পুরাণের মহেশ্বর নন, পার্বতীও মহিষমর্দিনী দেবী নন, তাঁরা নিতান্তই বাঙালির অভাবের সংসারের কুশীলব।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবী অন্নদাও অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতির অন্তরে অনায়াসে বিচরণ করেন। চণ্ডীর কৃপাময়ী উপস্থাপনা যদিও তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু তিনি চণ্ডী নন, বরং চণ্ডীর করুণাভরা আচরণের আদলে তিনি গড়ে উঠেছেন দেবী অন্নপূর্ণা রূপে। ভারতচন্দ্রের হাতে এই দেবী সাধারণ মানুষের পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণময়ী অধিষ্ঠাত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

সতেরো আঠারো শতকে হিন্দু মুসলমানের মিলিত ধর্মমত থেকে যে দেবতার আবির্ভাব, তাঁর নাম সত্যপীর। হিন্দুর ঘরে তিনি নারায়ণ বা সত্যনারায়ণ নামে প্রতিষ্ঠা পান, মুসলমানের কাছে পীরের মর্যাদায় ভূষিত। হিন্দুধর্মের বিবেচনায় সত্যপীর লৌকিক ও অর্বাচীনকালের দেবতা। তবে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে তাঁর

উল্লেখ আছে। অবশ্য রামেশ্বরের সত্যপীর অর্বাচীন পুরাণের কাহিনী অবলম্বনেই পরিকল্পিত।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বিশাল অংশ মুসলিম কবিদের অবদানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়। হিন্দু রচয়িতাদের পাশাপাশি গড়ে-ওঠা মুসলিম কবিদের সাহিত্য-নিবেদনের প্রয়াসকে কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিতে বিচার করা চলে না। তবে মুসলিম জাতীয় সাহিত্যের ধারায় তাঁদের সাহিত্যাদর্শকে বিবেচনা করা যায়। ইরান তুরানের গাল্পাগল্প ও ইসলামের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীগুলো মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের অনুবাদমূলক সাহিত্যের বাহন হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ভারতের লোকগাথাও তাঁদের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে স্থান করে নেয়।

মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সমগ্র বাংলায় চট্টগ্রাম বিভাগই ছিলো মুসলিম কবিদের প্রধান অবস্থানকেন্দ্র। চট্টগ্রামের একটি অংশ তখন আরাকান ত্রিপুরার রাজাদের অধীন ছিলো। মগ সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতি থেকে মুসলিম সভ্যতা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ধারাগুলো অনেক উন্নত হওয়ায় আরাকানের রাজনীতি ও সংস্কৃতি মুসলিম প্রভাবকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আত্মগত করে। সেই সূত্রে মুসলমানদের মধ্যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী ও অমাত্য হিসেবে আরাকানের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। এসব মুসলিম মন্ত্রী অমাত্যরা প্রধানত চট্টগ্রামের এবং কিছু সিলেটের অধিবাসী ছিলেন। আরাকানের উপদেষ্টা হিসেবেও তাঁরা যোগ্যতার প্রমাণ দেন। তাঁদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য মগ নৃপতিগণের পোষকতা লাভ করে উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করে।

প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের দিকনির্দেশনা হয়, - রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও ধর্মীয় কাহিনী। উত্তর ভারতীয় রোমান্সের সঙ্গে আরবি ফারসি গালগল্পের যে সমান্তরাল অবস্থান, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশকেই তা চিহ্নিত করে। এই সব রোমান্টিক গল্পগাথার মধ্যে কল্পনার যে প্রসার, তাতে লৌকিক ভাবের বিকাশ কিছুটা উপেক্ষিত হলেও সেই অবাস্তব কাহিনীগুলোই প্রধানত বাংলার জনগণের আনন্দরস পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে ; বলা যায় জনচিত্ত আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিলো এসব কাহিনীর বিপুল। তৎকালীন হিন্দু পুরাণাশ্রিত সাহিত্যের বিকাশের ধারায় আরবি ফারসি কথাবস্তুর সঙ্গে উত্তর ভারতীয় বিষয় ভাবনার আত্মীয়তার-বন্ধনে সৃষ্ট মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই যে পরিচয়, তাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়রূপেই চিহ্নিত করা যায়। কবি আলাওল এই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব। এমন কি তৎকালীন কোনো উল্লেখযোগ্য হিন্দুকবিও একই সঙ্গে পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে তাঁর সমকক্ষতার দাবি করতে পারেন না। এই গেলো সতেরো শতকের মুসলিম সাহিত্যের ধারা। তবে আঠারো শতকে এসে এই ধারাটিই উপযুক্ত কবি প্রতিভার অভাবে যথেষ্ট ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। আলাওল দৌলত কাজীর মতো প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব তখন আর ঘটে নি। যে ঐতিহ্য ষোল সতেরো শতকের মুসলিম কবিরা সৃষ্টি করে গেছেন, আঠারো শতকের মুসলিম কবিরা সেই ঐতিহ্যের ধারায় নিজেদের কাব্যে রোমান্টিক ভাবের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করলেও কোনো স্মরণীয় কবির আবির্ভাব না হওয়ায় এসময়ের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য কবিকৃতির স্বাক্ষর নেই। ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের সূচনাপর্ব

তখন ; বিদেশী রাজশক্তির আবির্ভাবে দেশে যখন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন কোনো স্মরণীয় সাহিত্য-সৃষ্টি যে বিঘ্নিত হবে, এমন মনে করা যায় ; ইতিহাসেও এরূপ প্রমাণ আছে। তবু দেশের সেই অরাজক পরিবেশেও মুসলিম সাহিত্যচর্চা একেবারে থেমে থাকে নি। মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও কলকাতা ছিলো সেসময় মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। এসব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি মুসলিম সাহিত্য-সমাজও তখন গড়ে ওঠে। এই সমাজের রচিত সাহিত্যের ধারাটি দোভাষী বা মিশ্রভাষা-রীতির সাহিত্যে রূপ পরিগ্রহ করে। এসময় বিকৃত নাগরিক রুচির গীত ও কবিগানেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীকালে দোভাষী-রীতির সাহিত্য-ধারাটি নানারকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখে। সেজন্য এ ধারার সাহিত্যের একটি জাতীয় মূল্যও আছে। গ্রামবাংলায় এগুলোর জনপ্রিয়তাও যে বিপুল, তার তাৎপর্য অনুভব করা যায় যখন দেখি সময়ের পরিবর্তিত ধারায়ও সাধারণ মানুষের মন থেকে মুসলিম পুথি-সাহিত্যের আনন্দ-বিনোদনের রেশটুকু মিলিয়ে যায় নি। মুসলিম ঐতিহ্যকে ধারণ করে এসব পুথির সৃষ্টি, তাই শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এমন কি অশিক্ষিত মুসলিম বাঙালি মাত্রই দোভাষী পুথির বিষয়ভাবনাকে আত্মগত করে নিয়ে জাতীয় ঐতিহ্যে উদ্দীপিত হয়। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা।

উনিশ শতক এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা পুথিসাহিত্যের ধারাটি অব্যাহত ভাবেই চলে। তবে একথা ঠিক যে এ ধারার কবিকৃতির সাহিত্য মূল্য খুবই সামান্য। সেজন্য দোভাষী পুথির জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হলেও একটা বিশেষ শ্রেণীর কাছেই তা আদৃত ; শিষ্ট সাহিত্যের ধারায় তার বিচার চলে না। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে বিশ শতকের নতুন সূর্যোদয়ে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির জীবনে-সাহিত্যে যখন নতুন ভাবোন্মাদনার জোয়ার আসে, তখন শরীয়তি শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম কবিরা পাশ্চাত্য ভাবের প্লাবনকে উপেক্ষা করে পুথির জগতেই আত্মবিভোর থাকেন। অথচ পুথিসাহিত্য যে কোনো উচ্চাঙ্গ সাহিত্যাদর্শের নিদর্শন নয়, কিংবা এ ধারার সাহিত্য-ধারায় আবর্তিত হয়ে যে কোনো উচ্চ মর্যাদার সাহিত্য রচনা করাও সম্ভব নয় -- এরূপ আধুনিক শিল্পবোধ থেকে তৎকাল-অধ্যুষিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ ছিলো সম্পূর্ণত উদাসীন। ফলে পূর্বসুরিদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য রক্ষায় সেসমাজ পুরোপুরিভাবেই বিফল হয়। এই পর্বের মুসলিম পুথিকারগণ তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্বল সাহিত্যধারার কবি হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছেন।

মধ্যযুগের শেষপর্বের বাংলা সাহিত্য হিসেবে শাক্ত-পদাবলীকে ধরা যায়। এ ধারার সাহিত্যকর্মে মধ্যযুগের আদর্শ রক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এগুলো আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাবব্যঞ্জনাকেই উপস্থাপন করে। শাক্ত পদাবলীর অবস্থান আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। কবিরা সম্পূর্ণত গৃহী, শিশু হয়ে তাঁরা শ্যামা মায়ের অঞ্চল আশ্রয় করে মান-অভিমানে, আবদার-আবেদনে দেবীর কাছে নিজেদের মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা জানান। সেই সূত্রে শাক্ত-পদাবলী শ্যামা-সংগীতের মূল প্রেরণাও বটে। ইংরেজ আমলের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির কারণে সাধারণ মানুষের যে দুঃখদুর্দশা, তার প্রতিকার প্রার্থনা শাক্ত-পদাবলীর কবিদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রামপ্রসাদ সেন এই ধারার একজন বিশিষ্ট কবি। ব্যক্তিমানসের যে ধারাটি পদাবলী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে, রামপ্রসাদের গানে তারই

ভাবছায়া লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু হিন্দুপুরাণের শিব-পার্বতীর সংসার-জীবনের ধারায় বাঙালির চিরকালের ধূলিধূসরিত গার্হস্থ্য-জীবনের চাহিদাগুলো রামপ্রসাদী গানে এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে তার স্পর্শকাতরতা আবহমান বাঙালি-চিত্তে জীবন-বাস্তবতার মর্মান্তিক ছায়াপাত ঘটায়।

বাংলা লোকসাহিত্য, খনার বচন, ব্রতকথা ও ডাকের বচনকে আবহমানকালের বাংলা সাহিত্য হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। বাংলার লোকসমাজের কাছে এগুলোর যে সার্বজনীন আবেদন তাতে এসব সাহিত্য কখনো পুরোনো হবে এমন মনে করা যায় না। কেননা বাঙালির ভাষা ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে লোকসমাজের সাহিত্যের এই ধারাটি শাশ্বতকালের সর্বজনপ্রিয় সাহিত্য হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়ে যায়, প্রতি যুগেই শতাব্দী কালের এসব সাহিত্য বাঙালির হৃদয় জুড়ে অবস্থান করে।

এক সময় লোকের মুখে মুখেই লোকসাহিত্যের প্রচলন ছিলো, পরে আধুনিক শিল্পচৈতন্যের স্পর্শে তা লিখিত রূপ পায়। লোকসাহিত্য, খনা ও ডাকের বচনের মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় ভাবের যে স্ফুরণ ঘটে তাতে এগুলোর মৌলিকতা-গুণ কখনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় নি। লোকসাহিত্য পুরোপুরিভাবেই সমাজের সৃষ্টি, তবে তার উৎসে ব্যষ্টির অবদান থাকতে পারে। আবহমান বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজ ও বাংলার পারিবারিক জীবনের চাওয়া পাওয়ার বিষয়গুলো উজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে ডাকের বচন, ব্রতকথা ও খনার বচনে। বাংলা ও বাঙালির জীবন ও জীবনাচরণে চিরন্তন সত্যের ছায়াপাত ঘটায় খনা, ডাক ও ব্রতকথা। গভীর তত্ত্ব ও সত্যকথার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে এগুলোতে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থেকে বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের এই যুগ কত বিশাল, বিচিত্রতার কত স্বাদ তাতে রয়েছে এবং কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এযুগের সাহিত্যের ধারা। চিরায়ত সাহিত্যের ধারায়ই কেবল তার পরিমাপ করা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্রমশ আধুনিক যুগে মোড় পরিবর্তন করে। আধুনিক যুগের সূচনা হয় উনিশ শতকের প্রারম্ভে। বাঙালি-জীবনে প্রভাব-সঞ্চারী আধুনিকতার নানা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অতঃপর বাঙালির নবজাগরণের পথে তার যাত্রা শুরু করে।

প্রথম অধ্যায়

বাঙালি ও বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির কথা

বিচিত্র এই বাঙালি জাতি। তার জীবন, তার জীবনাচরণ, তার ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি, তার অবস্থান সবই বিচিত্রতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নদীর মতো বয়ে এসেছে এক যুগ থেকে আর এক যুগে। এভাবে যুগে যুগে তাকে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। তাই পৃথিবীর নানা জাতির রক্তধারার মিশ্রণ থেকে সে মুক্ত নয়, হয়তো তাদের স্বভাব চরিত্রও তার মধ্যে অন্তর্লীন। কিন্তু সব কিছু আত্মস্থ করেই সে সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসের যুগ থেকে গঙ্গা-যমুনার পলল্ মাটির ভূখণ্ডে বসবাস করে প্রমাণ করেছে জাতি হিসেবে সে এক ও অভিন্ন এবং বিশ্বময় স্বীকৃত তো বটেই।

বাঙালির জাতিসত্তার বিষয়ে জানতে হলে আদি ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয়। একসময় যে-ভূখণ্ডে এই জাতির আবির্ভাব ঘটেছিলো, সেই কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো এদেশ অখণ্ড বঙ্গ হিসেবে রূপ পায় নি; জাতিগত দিক থেকে বাঙালির পরিচয়ও তখন সুস্পষ্ট হয় নি। তবে এদেশের আধিবাসীদের মধ্যে পৃথিবীর নানা জাতির রক্তধারার সংমিশ্রণ তখন থেকেই শুরু হয়েছে। বিশ্বের নানাস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতির আবির্ভাব যে তখন ঘটতে থাকে এদেশে, তার কারণটি অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয়। বঙ্গভূমি চিরকালই ছিলো শ্যামলে কোমলে, শস্যসম্ভারে অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বহুদেশের মানুষের লিপ্সা ছিলো এদেশের প্রতি, ফলে দেশটি বিদেশী আক্রমণের শিকার হয় বারবার। আক্রমণের উদ্দেশ্যে যারা তখন এখানে এসেছিলো, তাদের অনেকেই এই পলল্ মাটির ভূমিতে বংশানুক্রমে বসবাস করার অনুপ্রেরণা পায়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর রক্তগত মিশ্রণ তাই অবাধে ঘটতে থাকে এদেশের মূল অধিবাসীদের রক্তধারায়।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীদের আদি উৎসের ইতিহাসও দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাকে সহায়তা করছে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার নানা দিক, নানা প্রসঙ্গ। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বঙ্গ ও বাঙালির উৎস ও সভ্যতার নানা বিষয় বেশ চমকপ্রদভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন, অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ধরা পড়ে বাঙালির দেহগঠন, তার রক্তধারার বিষয়- এমন কি তার ভাষাগত নানাপ্রসঙ্গ, যদিও ভাষাতাত্ত্বিকগণ বাংলা ভাষার যাথার্থ্য নিরূপণে বেশি তৎপর ও বেশি নিবেদিত। এভাবে বঙ্গদেশ, বাঙালি ও তার উৎসের নানা দিকে বেরিয়ে এসেছে পূর্বের ও সাম্প্রতিক নানা গবেষণায় ও আবিষ্কারে।

সুদূর অতীতে উত্তর ভারতে যে জাতির বাস ছিলো তারা ছিলো আর্য। এই আর্যজাতিই হচ্ছে 'ঋগবেদে'র স্রষ্টা। ইতিহাস এদের নর্ডিক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু আর্যদের একটি ধারা পরে নর্ডিক জাতিগোষ্ঠীর বাইরে 'আলপীয়' নামে গোত্রভুক্ত হয়। একসময় তারা বহিরাগত হিসেবে বঙ্গদেশে আগমন করে এবং আদি বাঙালির রক্তধারায় নিজেদের রক্তধারার অবাধ মিশ্রণ ঘটায়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগে আদি ভারতে একটি জাতির বাস ছিলো যারা সুদূর অস্ট্রেলিয়া

থেকে এদেশে আগমন করে। এদেরকে 'অস্ট্রিক' নামে অভিহিত করা হয়। আবার নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মঙ্গোলীয় ও ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতির একটি অংশের উদ্ভব হতে পারে। তবে রক্তসম্বন্ধে মঙ্গোলীযরা ছিলো ইন্দোচীনের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত। মঙ্গোলীয়দের চওড়া মাথা ও থ্যাবড়া নাক দেখে অনুমান করা হয় যে এরা বাংলার কোনো মৌলিক জনগণের কেউ ছিলো না, বরং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের শারীর-গঠন সম্পর্কের সাদৃশ্য বেশি। বাংলার এই আদিগোত্রীয় জনদের পূর্বসূরি হিসেবে অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইতিহাস থেকে মানবসভ্যতার উপাত্ত সংগ্রহ করে ধারণা করা হয় যে দীর্ঘকালের সংমিশ্রণ-প্রক্রিয়ায় বাঙালির জাতিসত্তায় যে তিনটি আদি জনগোষ্ঠীর রক্তধারার সমন্বয় ঘটেছিলো, সে তিনটি জনগোষ্ঠী হচ্ছে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আলপীয়।

আর্যদের আগে 'অসুর' নামে একটি জাতির উদ্ভব হযেছিলো ; বৈদিক, সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে 'অসুর' জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন প্রাক-আর্য যুগে বাংলায় এরা নিরুপদ্রবভাবেই বসবাস করে। এই জাতি এদেশে একটি কৃষি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। বলা বাহুল্য ভারতের আদি সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে এই কৃষি সমাজব্যবস্থার নামোল্লেখ করা হয়। দূর অতীত বলেই এভাবে বলা সমীচীন মনে করি যে যদি এই 'অসুর' গোত্র কখনো বাংলায় বসবাস করে থাকে, তবে বাঙালির রক্তধারায় যে এদের রক্তধারার মিশ্রণ ঘটেছে তা বলা যায়। তবে এটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। এ ধারণা একারণেও হতে পারে যে, 'কতিপয় পণ্ডিতের মতে অসুর বলিতে ভারতবর্ষের আর্যপূর্ব যুগের দেশজ অধিবাসীবৃন্দকে বুঝিতে হইবে।'[১]

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬/৩২৭ অব্দে মেসিডনিয়ার গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দার পঞ্চনদ জয় করে বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। আলেকজাণ্ডার তখন আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে 'গঙ্গারিডই' নামক একটি রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হন। এই রাজ্য আর্যপূর্ব যুগের জনবসতি রূপে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীকালে রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভার যবন রাজদূত মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে প্রাচ্যের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, গ্রীক লেখকগণ নিজেদের গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেন। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই গঙ্গারিডই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এই রাজ্যের সঙ্গে কলিঙ্গ রাজ্য যুক্ত ছিলো। গঙ্গানদী গঙ্গারিডই রাজ্যের পূর্বসীমা দিয়ে প্রবহমান ছিলো।[২] এই গঙ্গারিডই সম্ভবত আজকের বাংলাদেশ। গঙ্গারিডই বা গঙ্গাঋদ্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে গ্রীক লেখক কার্তিয়াস, দিওদোদোরাস, প্লুতার্ক প্রমুখ রচিত ইতিবৃত্তে। স্ট্রাবো এবং টলেমির ভূগোলবৃত্তান্তেও এ সংবাদ আছে। এমন কি ভার্জিলের মহাকাব্যেও গঙ্গারিডইয়ের উল্লেখ আছে।[৩]

প্রাচীন বঙ্গদেশ হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট, বঙ্গাল, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়া, সুহ্ম, বজ্রভূমি, তাম্রলিপ্তি, গৌড় ইত্যাদি বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলো। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অবিষ্কার থেকে একথা এখন প্রমাণিত হয়েছে যে বহুজাতির রক্তধারাব মিশ্রণে গড়ে ওঠা বাঙালির যে বসতভূমি রূপে চিহ্নিত এককালেব অবিভক্ত বৃহত্তর বঙ্গদেশ, তার অস্তিত্ব বিস্মৃতপ্রায় অতীত ইতিহাসেব সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। তাই 'বিভিন্ন জনগোষ্ঠীব প্রবাহ তাদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বঙ্গ-জনসমুদ্রে এসে মিশেছে। তবে বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও নিজস্ব আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে বাঙালি জন, ভাষা আর সংস্কৃতি।'[৪]

দুই।। বাংলা ভাষার ইতিকথা

পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভাষীর লোক আছে। প্রত্যেক জাতিব ভাষায় রয়েছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য এতই স্বতন্ত্র যে জানা না থাকলে মানুষের কাছে তা একই সঙ্গে দুর্বোধ্যতা ও বিস্ময়েব ঢেউ আনে। অথচ নিজের দেশের তথা নিজের এলাকার ভাষা মানুষের কাছে কতনা সুবোধ্য ও প্রীতিকর, সেজন্য ভাষা মায়ের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়।

বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলোব মধ্যে অন্যতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষাব ইতিহাস জানতে হলে কিভাবে তার উৎপত্তি সে বিষয়ে খানিকটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

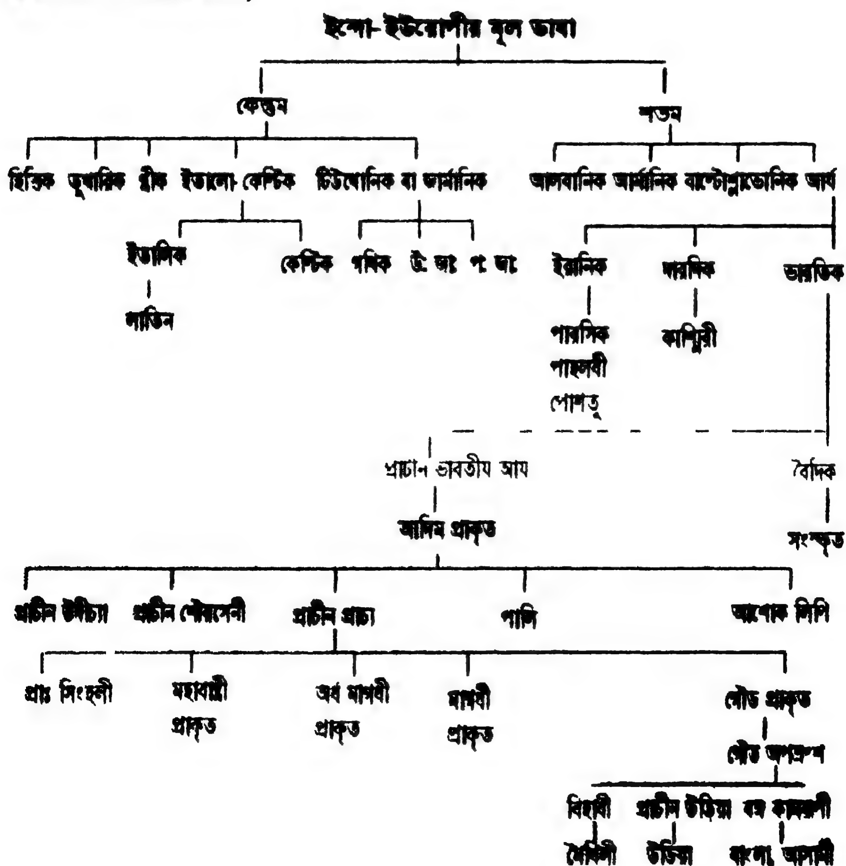
প্রায় পাঁচ হাজাব বছর আগে ইউরোপেব মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ পূর্বাংশ অবধি যে ভাষার প্রচলন ছিলো তাকে 'ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা' (Indo European Parent Speech) রূপে অভিহিত করা হযেছে। এই মূল ভাষাব দু'টি ভাগ-- ক. 'কেন্তুম' (Centum) এবং খ. 'শতম' (Satam)। আলবানী এবং বাল্টোশ্লাভোনিক ভাষা ব্যতীত ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাব অন্যান্য ভাষাগুলো 'কেন্তুম' বিভাগ থেকে উৎপন্ন হযেছে। এশিযায 'কেন্তুম' বিভাগেব দু'টি শাখা বর্তমান ছিলো- ক. প্রায দেড় হাজার খ্রিস্টপূর্বে প্রচলিত 'হিত্তি' (Hitti), এবং খ. এশিয়াব মধ্যভাগে প্রচলিত 'তুখারী' (Tokharian) ভাষা। 'কেন্তুম' বিভাগের সঙ্গে বাংলা ভাষাব কোনো সম্বন্ধ নেই, 'শতম' বিভাগেব সঙ্গে রযেছে। 'শতম' বিভাগ থেকে উৎপন্ন আর্য শাখার নিজস্ব তিনটি শাখা 'আলবানিক', 'আর্মানিক' এবং 'বাল্টো-শ্লাভোনিক'। আর্য শাখার দু'টি প্রশাখা --'ইরানিক' ও 'ভারতিক'। এই দুই প্রশাখাব মধ্যবর্তী একটি প্রশাখা 'দারদিক'। ইরানীয় প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ভাষা আবেস্তার, প্রাচীন ও আধুনিক পারস্য, পহলবী, কুর্দ্দিস্থানী, বলোচী, আফগানী, ওসেটিক, পামিরী ইত্যাদি। ভারতীয় আর্য প্রশাখা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হযেছে বাংলা ভাষা। ভারতীয় আর্য প্রশাখাব তিনটি স্তর,—

১. প্রাচীন স্তর।। এই স্তর ১২০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা এবং আদিম প্রাকৃত এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

২. মধ্য স্তর॥ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এর তিনটি উপস্তর,— ক. প্রথম উপস্তর : ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপস্তর। পালি ভাষা এই উপস্তরের একটি সাহিত্যিক রূপ। সন্ধি উপস্তর : ১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সন্ধি উপস্তর। খ দ্বিতীয় উপস্তর : ২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় উপস্তর। নাটকীয় প্রাকৃত এই উপস্তরের নিদর্শন। গ. তৃতীয় উপস্তর : ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপস্তর। অপভ্রংশ এই উপস্তরের নিদর্শন।

৩. আধুনিক স্তর॥ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্তর। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সংকট যুগ ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ অবধি। মধ্যযুগ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং নব্যযুগ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা ভাষার বর্তমান কাল অবধি। নব্যযুগের দু'টি ভাগ, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

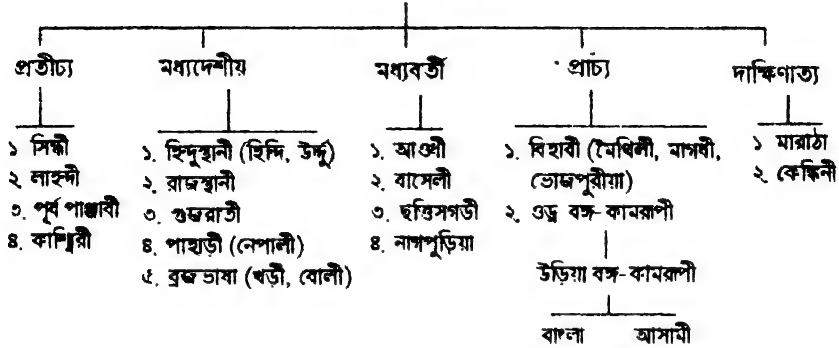
নিম্নে প্রদত্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে 'ইন্দো ইউরোপীয় মূল ভাষা' থেকে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ দেখানো হলো,



বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জর্জ গ্রিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে এ ভাষার পূর্ববর্তী উৎস-স্থল গৌড় অপভ্রংশ। সাধারণ অর্থে তাকে অপভ্রংশ বলেই মনে করা হয়।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রদত্ত নব্য ভারতীয় আর্যভাষাব মানচিত্র,—

নব্য ভারতীয় আর্যভাষা



তিন॥ বাঙালি কবির অপভ্রংশ রচনা

বাংলা ভাষাব পূর্বে আমরা গৌড় অপভ্রংশের নাম পাই। গৌড় অপভ্রংশেব পূর্ববর্তী যুগের ভাষা ছিলো গৌড় প্রাকৃত। ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহব মতে অপভ্রংশ যুগেব আরম্ভ ৫০০ খ্রিস্টাব্দেরও আগে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় তিনি প্রমাণ করেছেন অপভ্রংশ থেকে প্রথম উৎপন্ন হয় বিহারী। এ ভাষা পৃথক হয়ে যায়, পরে উড়িয়া ও বঙ্গ-কামরূপী ভাষা উৎপন্ন হয়। বঙ্গ-কামরূপী ভাষার বিচ্ছিন্ন রূপ হচ্ছে বাংলা ও আসামী। গৌড় অপভ্রংশের নিদর্শন মেলে কাহ্ন এবং সরহেব দোহাকাষে। এঁরা ছিলেন দুজন সহজপন্থী সিদ্ধাচার্য। এঁরা ঠিক কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এঁদের অপভ্রংশ রচনায় প্রকাশ পেয়েছে ধর্মসাধনার জটিল তত্ত্ব। এসব রচনা থেকে আমরা বাংলার তৎকালীন ধর্মসাধন তত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের পরিচয় পাই।

বাঙালি কবিব রচিত অপভ্রংশেব নিদর্শন হিসেবে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো। সরহ রচিত দোহাগুলোতে বৈদিক, শৈব, বৌদ্ধ, লোকায়ত ও সাংখ্য মতবাদের বিরূপ সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদাচার সম্বন্ধে তাঁর উক্তি, -

ব্রহ্মণেহি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পঢ়ি অউ এ চ্চউবেউ॥
মট্টী পাণী কুস লই পঢন্ত।
ঘরহি বইসী অগ্গি হুণন্ত॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্খি ডহাবিঅ কডুএঁ ধূমেঁ॥

বঙ্গানুবাদ ॥ ব্রাহ্মণগণ রহস্য জানেন না ; এইভাবে চতুর্বেদ পড়া হয়। মাটি, জল এবং কুশ নিয়ে তাঁরা পড়েন। ঘরে বসে অগ্নিতে হোম দেন। অন্য কাজ না থাকায় অগ্নিতে হোম করে কটু ধূমে চোখ দগ্ধ করেন।

বাহ্যিক আচার ও কৃচ্ছ্র সাধনাদির প্রতি সরহের মনের বিরাগ অতি স্পষ্ট। এসবের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন সহজ পথে চললে সংসারের যাত্রা নির্বাধ হয়। এই সহজ পথ লাভের পন্থা হলো সংসারাসক্তি ও সংসার-বিরাগ উভয়কে বর্জন করে চলা। সুতরাং কবি বলেছেন,—

ঘরহি ম থক্কু ম জাহি বণে জহি তহি মণ পরিআণ।
সঅলু নিরন্তর বোহি- ঠিঅ কহি ভব নিব্বাণ॥

বঙ্গানুবাদ॥ ঘরে থেকো না, বনেও যেও না। যেখানেই থেকো, মনকে ভালো করে জেনো। সকল (মন) নিরন্তর জ্ঞানে থাকলে কোথায় সংসার, কিংবা কোথায় তা থেকে মুক্তির ভাবনা?

কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য ছিলেন সহজিয়া তত্ত্বের সাধক। তিনি তাঁর অপভ্রংশ রচনায় সহজিয়া তত্ত্বের মহিমা বর্ণনা করেছেন। কবি বলেন,-

সহজ্ঞ একু পর অখি তহি কাণহ ফুড পরিজ্জাণই।
সত্থাগম বহু পঢ়ই সুণই বঢ় কিম্পিণ জাণই॥

বঙ্গানুবাদ॥ সহজ আছে একের উপরে ; তথায় কাহ্ন স্পষ্ট অবগত আছেন। মূর্খ বহু শাস্ত্র পাঠ করে ও শ্রবণ করে, অথচ কিছুই জানে না।

সরহ ও কাহ্নপাদের দোহাগুলোতে তত্ত্ব ও সাধন- পদ্ধতির কথাই ব্যক্ত হয়েছে ; কিন্তু এসবের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষ পর্বের একটি অকৃত্রিম আবহ-মণ্ডল তৈরি হয়েছে। বাংলা কবিতার শেষে মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি এসেছে এই অপভ্রংশ থেকে।

'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামক ছন্দ আলোচনার একখানি গ্রন্থ আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থে কয়েকটি কবিতা আছে। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং স্বভাবের অতি চমৎকার বর্ণনা থেকে একথা অনুমিত হয় যে এ সব কবিতামঞ্জরী কোনো বাঙালি কবির রচনা। যেমন, একটি কবিতা,--

নব মঞ্জরি সজ্জিঅ চূঅঅ গাছে, পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণে আছে।
জই এথি দিগন্তর জাহিই কন্তা, কিঅ বম্মহ ণথি কি ণথি বসন্তা॥

বঙ্গানুবাদ॥ আম্রবৃক্ষে নবমঞ্জরী সজ্জিত হয়েছে, বনে নতুন কিংশুক প্রস্ফুটিত আছে। এখান থেকে যদি কান্ত দিগন্তে (প্রবাসে) যায়, তবে কি মন্মথ নেই, বসন্তও নেই।

প্রাকৃত-পৈঙ্গলের অপর একটি কবিতায় মৌরলা মাছ ও নালিচা বা পাট শাকের উল্লেখ আছে। যেমন,-

ওগগর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা ণালিচা গচ্ছা, দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা॥

বঙ্গানুবাদ॥ প্রিয় পত্নী কর্তৃক কলার পাতে ওগরা (ডাল চালমিশ্রিত রান্না করা খিচুড়ি), ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি, নালিচার শাক, মৌরলা মাছ ও দুগ্ধ পরিবেশিত হচ্ছে ; পুণ্যব্যক্তি তা খান।

কাহ্নপাদ ও সরহপাদ তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন বাংলায়ও পদ রচনা করেছেন। তাঁরা মূলত বাঙালি কবি, সুতরাং তাঁদের অপভ্রংশ রচনায়ও যে বাংলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে তাঁতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চার॥ বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিকথা

এক সময় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান সংস্কৃতি ছিলো স্মৃতি, শ্রুতি, কাব্য, দর্শন এবং শিল্পের আরো কিছু নিদর্শন। ক্রমশ বিবর্তনের ধারায় ভারত কৃষিব্যবস্থা ও পশুপালনকে সামাজিক বিন্যাসের প্রধান বিষয়রূপে বিবেচনা করে। পল্লীর কৃষিসমাজ এক সময় নগরপত্তনেও উৎসাহ সৃষ্টি করে। নাগরিক জীবন তখন গৃহশিল্পে মনোযোগী হতে শুরু করে। ক্রমে ভারতে নতুন নতুন জাতির আবির্ভাব শুরু হয়, এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তার চিরাযত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করেই বিকাশের নবতর পথে অগ্রসর হয়। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, নৃত্য, গীত ছাড়াও ধর্মীয় চিন্তার প্রসার ঘটে, নানারকম লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালনে লোকসমাজ উৎসাহ বোধ করতে থাকে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের ও বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির যে প্রভাব, তার মূলে আছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, চাকমা প্রভৃতি উপজাতীয় সংস্কৃতির অবদান। পরবর্তীকালেও উপজাতীয় সংস্কৃতি সভ্যতার নানা স্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

মুসলিম বিজয়ের আগ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিরূপেই চিহ্নিত ছিলো। মুসলমানদের এদেশে আগমনে এদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইরান তুরান থেকে আগত সেদেশের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটায় ভারতীয় সংস্কৃতির যে কিছু রূপান্তর ঘটে, তার ফলে এখানকার সংস্কৃতিতে আসে নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। এই অবস্থায় সংস্কৃতির চেহারা কিছুটা পাল্টে গেলেও তাতে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যবহারিক জীবনের নানাক্ষেত্রে মুসলিম সংস্কৃতি অবাধে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। কালক্রমে দুই সংস্কৃতির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দেয়, কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া তার অধিকাংশই লোকসমাজ প্রায় ভুলেই যায়।

যুগের বিবর্তনে একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির বহমান ধারা যেমন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে তার সঙ্গে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির জাগরণও ঘটে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রায় হাজার বছর আগের আমাদের এই সংস্কৃতির মূলে যে আদর্শ, যে ভাব ও ভাবনা কাজ করে, কাল-বিবর্তনের ধারায় তার রূপ ও রূপায়ণের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির হৃদয়ে ভালোবাসার ফল্গু হয়ে সেই সংস্কৃতিই আজো সগৌরবেই বিরাজ করছে।

বাঙালি সংস্কৃতির ধারাটি পল্লীকে কেন্দ্র করেই যে গড়ে উঠেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক সময় গৌড় ও নবদ্বীপ শিষ্ট শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হলেও বাংলার সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিলো গ্রাম। আসলে গ্রামসভ্যতার সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির যে

একটা সুহৃদ সম্পর্ক বিদ্যমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহু আচার, আচরণ, সংস্কার, লোকবিশ্বাস, ধর্মভীরুতা ইত্যাদি নিয়ে যে গ্রামসভ্যতা,—তার মূলে আছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাব। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাঙালির এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, শূদ্র, পোদ, তিলি, নাপিত, বাগদি, বৈদ্য, মুচি, কৈবর্ত, ধোপা, মাহিষ্য, শুঁড়ি প্রভৃতি বহু বিচিত্র জাতপাতের সম্মিলিত আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম ও পেশা-বৃত্তির বহমান ধারার সংমিশ্রণে।

যদিও বলা হয়ে থাকে বাংলার সংস্কৃতির বয়স হাজার বছরেরও উপর, কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিলো কয়েক হাজার বছর আগে। তবে হাজার বছর পূর্বে বাংলা ভাষার নিদর্শন আবিষ্কারের আগে বাঙালির জাতপাতের ধারণাটি তেমন সুস্পষ্ট হয় নি, হয়তো তখন বাঙালির জাতিসত্তা বৃহত্তর দৃষ্টিতে ভারতীয় বলেই বিবেচিত হয়ে থাকবে। তবে বঙ্গের অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই অনুমান করা যায়। তখন সময়টা ছিলো প্রাক-গুপ্ত যুগ। এসময় বাংলাদেশ জৈন আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক মখলিপুত্র গোসালও মহাবীরের সমসাময়িককালে বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, কর্বাট ইত্যাদি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া রাঢ়দেশে তখন বহু আজীবিক সন্ন্যাসী ছিলো। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় দশকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

গুপ্তযুগে অনেক ব্রাহ্মণ বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বঙ্গদেশীয় জীবনের উপর পড়ে। এ সময় বাঙালির লোকায়ত জীবনের ধারায় কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কথার প্রভাবও দেখা যায়। পাহাড়পুরের ফলকগুলোতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের বহুবিচিত্র লীলাখেলার নানা চিত্র খোদাই করা আছে। ষষ্ঠ শতকে রাজা বৈন্যগুপ্তের সময় বঙ্গে শৈবধর্মের প্রসার ঘটে। সপ্তম শতকের গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা শৈবভক্ত ছিলেন। এসময় পাহাড়পুরের নানা মন্দিরে শিবের খোদাই করা মূর্তিগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে বিচিত্র অঙ্কন-বৈশিষ্ট্য।

সপ্তম শতকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। চৈনিক বৌদ্ধশ্রমণ ফা হিয়েন (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) ও যুয়ান চোয়াং (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক), এঁদের তথ্যবিবরণী থেকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে নানা বিষয় জানা যায়। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের কারুখচিত মূর্তির নানা বৈশিষ্ট্য তৎকালে বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়।

প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন যুগে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের ধর্মমতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনেক মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলোও তৎকালীন বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনার পরিচয় বহন করে। খননকার্যে অনেক সময় বিভিন্ন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। তার মধ্যে আসীন, শয়ান ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিযুক্ত কোনো বিষ্ণুমূর্তি হয়তো পাল, চন্দ্র বা কম্বোজ আমলের বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

পাল, চন্দ্র ও সেনযুগের আবিষ্কৃত বিভিন্ন শিবমূর্তিতে প্রতিফলিত চিত্রাভাস থেকে শৈবধর্ম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। ধর্মের ভিত্তিতে তখন যেসব মূর্তি নির্মাণ করা

হয়েছে, তার মধ্যে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্টভাবে দীপ্য হয়ে ওঠে। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে খোদাই করে অঙ্কিত শিব ও শিবের বাহন নন্দী, ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডলু ইত্যাদি চিত্র পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিবমূর্তি নির্মাণের উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এসব মূর্তির গঠন-সৌকর্য পুরাকালের বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। বঙ্গের রাঢ়, বরেন্দ্রী, দিনাজপুর, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যে-সব বিহার গড়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে বাস করে বহু বাঙালি আচার্য নীরবে জ্ঞানসাধনা ও সংস্কৃতিচর্চা করে গেছেন।

শিকার ছিলো এক সময় বাঙালির জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায়। বিশেষ করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ে তখন জীবন-জীবিকার বাহন হিসেবে শিকার-প্রথা প্রচলিত ছিলো। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তার চমৎকার পরিচয় আছে। যদিও চণ্ডীমঙ্গলে বিবৃত কালকেতুর ব্যাধ-সংস্কারের মাধ্যমে কবি প্রধানত এই চরিত্রের বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের প্রয়াস পান, তবু একথা বলা যায় যে প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত শিকার ব্যবস্থার নিদর্শন তার মধ্যে প্রভাব সঞ্চার করেছে। কালকেতুর শিকার-যাত্রায় বনের পশুদের মধ্যে আতঙ্ক জাগে। এতে ব্যাধবীর কালকেতুর নির্ভীক শিকার-নৈপুণ্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আমরা কৌমসমাজের শিকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাই। যেমন,—

বীরের অস্ত্রের বেগে বত্রিশ দশন ভাঙ্গে
পশুগণে মহামারী করে।
তুমি হস্তী মহাশয় তোমার কিসের ভয়
বজ্রসম তোমার দশন
তব কোপে জেই পড়ে যমপথে সেই নড়ে
কেবা ইচ্ছে তব দরশন।
দুই চারি ক্রোশ জায় তব মোর লাগ পায়
উলটিয়া শুণ্ড মোর খেচে
মোর পিঠে মারে বাড়ী লয়ে জায় তাড়াতাড়ি
ছাগলের মূল্যে লযে বেচে।
শুন হে মহিষ বাণী মানুষ তোমার পানি
তুমি হও যমের বাহন
তুমি যদি মনে কর পর্বত চিরিতে পার
নর ভয় কর কি কারণ।
বিকট দশন ভাঙ্গিল বদন
রকত পড়িল তুণ্ডে।
অতিবেগে বীর মারিল খর তির
রণেতে উঠিল ধূলা
রবির কিরণ হরিল তখন
অবসান হৈল বেলা।

এই চিরাচরিত ব্যাধ-সংস্কৃতির মূলে কাজ করেছে প্রাচীন বঙ্গে বাঙ্গালির জীবিকার উপায় হিসেবে নির্ধারিত পশুনিধন কর্ম। এই ধারাটি এখনো বনাকীর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

প্রাচীন বঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি ছিলো কৃষিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা। শুধু বাঙালি কেন, একদা ভারতবর্ষের সকল জাতিরই কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ধারার মূলে কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার গুরুত্ব ছিলো বেশি।

আবার কৃষিনির্ভর সমাজটি ছিলো আদিতে অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রকৃতির নিকট মানুষের বশ্যতা ও আত্মসমর্পণ ছিলো অনিবার্য। হিন্দুধর্মে গিরি-কন্দর ও নদ নদীকে দেব-দেবীরূপে পূজা করা হয়। কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও এখানকার নদ-নদীর প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ নদীবহুল। এখানকার কৃষিনির্ভর জনজীবনে নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সর্বকালের সর্ব মুহূর্তের। কৃষিজীবী বাঙালির সমাজ-জীবনে নদীমাতৃক বঙ্গভূমির প্রকৃতি নিয়ত আশীর্বাদ বর্ষণ করে, এদেশের কৃষককে ফসল-ফলনে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে বাংলাদেশের নদী ও বাতাসের সংমিশ্রণে তৈরি ঘন আর্দ্রতা ও স্যাঁতসেতে জলবায়ু।

আনুমানিক খ্রিস্টের জন্মের দুই থেকে তিনশ' বছর আগে বগুড়ার মহাস্থানে পাওয়া একটি শিলালিপিতে ধানের উল্লেখ আছে।[৫] এ থেকে প্রাচীন বঙ্গে কৃষিকাজের প্রাধান্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে' বঙ্গের ধানমাড়াইয়ের বর্ণনা আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে পৌণ্ড্রবর্ধনের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'রামচরিত' কাব্যখানি যদিও সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু তাতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন বঙ্গে কৃষকের যথেষ্ট কদর ও খাঁতির ছিলো। গ্রামের শেষ প্রান্তে ক্ষেত জুড়ে ধান আর যবের শিষগুলো যখন বাতাসের মৃদু ব্যজনীতে স্নিগ্ধ সবুজ রেখায় আন্দোলিত হতো, তখন কৃষকের বুক ভরে হয়তো আশা ভরসার আশিস্-বারি বর্ষিত হতো। তারপর চাষীর ঘরে জমা হতো নতুন কাটা শালিধানের স্তূপ। এই যে ছবি, এ ছবি শুধু আবহমান বাংলার কৃষিপ্রাধান্যেরই ইঙ্গিত দেয় না, তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় বাংলার আদি ও অকৃত্রিম লোকায়ত সমাজের সমষ্টিগত জীবন চচা এবং এই চর্চা থেকেই বাঙালি-সংস্কৃতির এই বিশেষ ধারাটি যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবহমান হয়।

বাংলার ডাক ও খনার বচনে এই কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার কথা মৌখিকভাবে কালের বিরামহীন ধারাস্রোতে প্রবহমান হয়ে এযুগে এসে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ব্রত উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রাক বৈদিক যুগে আদিবাসী কোমদের মধ্যে এই উৎসব পালিত হতো। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রথমে ব্রত অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি না দিলেও পরে শিবপূজা, পুণ্যপুকুর, মধু সংক্রান্তি. সন্ধ্যামণি, জয়মঙ্গল, ভাদুলি, সেজুতি, লাউল, মাঘমঙ্গল, শিবরাত্রি, পূর্ণিমা, ঋতু ইত্যাদি ব্রত পালনকে মেনে নেয়। ব্রতকথা বাংলার হিন্দু নারীর মাঙ্গলিক আচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন মানত, দেব-দেবীর পূজা,

গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের কল্যাণ কামনায় হিন্দুনারী ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। নবান্ন বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম আদি উৎসব।

আদিকাল থেকেই বাঙালি হিন্দুসমাজে বিভিন্ন দেবতা-উপদেবতার পূজা পদ্ধতি চালু হয়ে আসছে। আদিবাসী কৌমসমাজের দেবতা ধর্মঠাকুর প্রধানত অন্ত্যজ হিন্দুসমাজে পূজিত হয়। এছাড়া মনসার পূজা, শীতলা পূজা, চৈত্রমাসে চড়কপূজা, অম্বুবাচি অনুষ্ঠান, দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শারদোৎসব, ষষ্ঠীপূজা, হোলি অনুষ্ঠান ইত্যাদি বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত চাষাবাদ, শিকার ও গৃহশিল্প ছাড়াও তখন সমাজ উৎকর্ষের অন্যতম উপায় ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পের বিকাশ ও প্রসার ঘটে।

বাংলার বস্ত্রশিল্প এক সময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। পূর্ববঙ্গে তাঁতী এবং জোলারা সুতির বস্ত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

পনেরো শতকের বাঙালি কবি বিজয়গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে পেশাজীবী জোলাদের সম্পর্কে বর্ণনা আছে। যেমন,

আরে আরে আরে জোলা উঠি দেখ মাউগ-পোলা
আচম্বিতে তোমারে হইল কি।
এইখানে বিছানায় ছিলা নানা সুখ আরও পাইলা
কোছর কাড়িয়া খাইলা পান।
জোলা ছিল বড় ধনী বুনাইয়া দিত লাল ভুনি
পরিয়া বেরাইতাম বাড়ী বাড়ী।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও জোলা ও সরাক তাঁতীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে।[৬]

বাংলার মসলিন সেকালেই দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করে। মসলিন এবং জামদানী তন্তুবায় সম্প্রদায়ের শিল্পনৈপুণ্যের চমৎকার পরিচয় নির্দেশ করে। রেশম পোকা থেকে তৈরি তসর ও মুগা বস্ত্রাদি মসলিন এবং জামদানীর মতোই প্রশংসিত হয়। এইসব বয়নশিল্পে সূক্ষ্ম কারুকাজের যে ব্যবহার—বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সংস্কৃতিকে তা উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশের পাটের কাপড়ের মিহি, চকচকে ও দ্যুতিময় চাঞ্চল্যের ভাবটি সবাইকে মুগ্ধ করে। পূজা-পার্বণ, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক মেলামেশায় পাট থেকে তৈরি কাপড় বা পট্টবস্ত্রের ব্যবহার এক সময় বাঙালির প্রায় রুচি-রেওয়াজে পরিণত হয়।

বাঙালি যে শিল্পনিপুণ জাতি, প্রাচীন বঙ্গের আবিষ্কৃত বিভিন্ন পদ্ধতির শিল্পের নমুনা থেকে তা প্রমাণিত হয়। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃৎশিল্পের যেসব নিদর্শন

আবিষ্কৃত হয়েছে, আজকের দিনের পোড়ামাটির শিল্পনমুনাগুলো যে তারই উত্তরাধিকার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেনযুগে ও পাল-আমলে সমাজে যে শিল্প এবং শিল্পীদেব যথেষ্ট কদর ছিলো, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখন আবিষ্কৃত তখনকার তৈরি অনেক মন্দির মূর্তি বিহারে শিল্পের মনোরম কারুকাজ দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার শিল্পী বা কারিগরদের কুলিক বলা হতো। এই প্রসঙ্গে সূত্রধব বা ছুতোরদের কথা ওঠে। ছুতোর এক অর্থে কাঠমিস্ত্রিকে বোঝায়। তাদের কাজ শুধু কাঠখোদাই করা নয়, তারা স্থপতিও বটে। প্রাচীন বঙ্গের ঘরগেরস্থালির কাজ থেকে শুরু করে মন্দিব, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নদীতে চলমান জাহাজ, পিনিস এমন কি সমুদ্রপোতও ছুতোরগণ কাঠ দিয়ে তৈবি করতো। ষোড়শ শতকের কবি শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে তৎকালে ছুতোব কর্তৃক নৌকা গঠনেব বর্ণনা আছে। যেমন,—

পাতিল নায়ের দাঁড়া আগাপাছা দিয়া গুড়া
দুই গলুই লাগাইল তখন।
প্রমাণ কবি হাতে হাতে জোখা লৈল সুতে সুতে
ডিঙ্গাখান করিল বিচক্ষণ॥
দাঁড়া কৈল পরিপাটি নায়ের কৈল তেয়াটি
পাঁচট হইল তরাতরি।
শতে শতে লোক ঘাটে সাতট ভবিল পাটে
নওটে হইল ভ্রে পুখরি॥

সাম্প্রতিক কালে বাঙালির স্থাপত্য-কীর্তিব বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হযেছে। প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, মন্দিব, মঠ আব মসজিদগুলো ভগ্নাবস্থায় বাংলাদেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো কালেব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িযে আছে। কুমিল্লার ময়নামতী ও নওগাঁর পাহাড়পুবে আবিষ্কৃত সোমপুরী বিহার, উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহার, দেবীকোট বিহার, বিক্রমপুরী বিহার, চট্টগ্রামেব পণ্ডিতবিহার ইত্যাদি বিহাব প্রাচীন বঙ্গেব ধর্মকর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানেব উৎস-কেন্দ্র ছিলো। বিক্রমণীপুবের (বাংলাদেশেব বিক্রমপুর) বাজা কল্যাণশ্রীর পুত্র অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান (জন্ম আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, বিদ্যায় ও সংগঠনে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন। বরেন্দ্রভূমের বৌদ্ধ আচার্য জেতারির শিষ্য ছিলেন তিনি। অতীশ ছিলেন বিক্রমশীল বিহারেব (সম্ভবত ভাগলপুবে অবস্থিত ছিলো) মহাচার্য।

অতীশ দীপংকরেব সঙ্গে তাঁব আগে পরের আবো কয়েকজন স্বনামধন্য বাঙালি পণ্ডিতের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ কবা যায। এঁরা হলেন বিক্রমশীল বিহারের আচার্য গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র, বজ্রযানী গ্রন্থের বচযিতা অভযাকব গুপ্ত, হেরুক-সাধনেব লেখক দিবাকর চন্দ্র, আচার্য রত্নাকব শান্তি, উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহাবেব আচার্য বিভূতিচন্দ্র, কাপট্য-বিহারের পণ্ডিত প্রজ্ঞাবর্মা প্রমুখ।

তাই বোঝা যায় প্রাচীন বঙ্গে বৌদ্ধবিহার সংঘারামগুলোই ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-ব্যাকরণ-দর্শন-ইতিহাস চর্চাব উৎস কেন্দ্র। বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে বৌদ্ধধর্মেব ইতিহাস শেখা ছিলো বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ব্যাকবণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকাযবাদ যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এসব

বিষয়ের চর্চা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ হিসেবে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে। বাঙালি সংস্কৃতির ধারাটি এভাবে তার উৎসমুখেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়।

নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার দাপটই বেশি ছিলো। জ্যোতিষ, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, বেদান্ত, তর্ক, মীমাংসা ইত্যাদি শাস্ত্র পড়ানো হতো বিপুল উৎসাহে। সাহিত্যের ভাষাও ছিলো সংস্কৃত। তবে প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশও ভাষা হিসেবে মান্যতা পায়। প্রাকৃত সরাসরি সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি, তাকে পরিশুদ্ধরূপেই কেবল সংস্কৃত-প্রধান সাহিত্যে স্থান দেওয়া হতো। তখন বাংলা প্রাকৃত ভাষা হিসেবেই গণ্য হতো। মাগধীপ্রাকৃত থেকে (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড় অপভ্রংশ থেকে) বাংলা ভাষার উৎপত্তি। এই প্রাচীন বাংলায় সাহিত্য-রচনায় উৎসাহ দেখান প্রথমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। প্রাচীন চর্যাগীতিগুলো বাংলা ভাষার সেই আদিযুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংস্কৃতে রচিত কাব্য, শ্লোক, টীকা, দর্শন সাধারণ লোকের মানস-দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি বলে নবজাত বাংলা ভাষার সাহিত্য তখন তাদের রসবোধের অধিগম্য হয়, ফলে খুব সহজেই তারা বাংলাকে বরণ করে নেয়। তথাপি এই পর্বে বাঙালির সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসও যে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরম্পরায় বিবেচ্য, এই কথাটি কোনোক্রমেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। এই সময় সংস্কৃতে বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান ও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও অক্লান্তভাবে চলে। সংস্কৃতে বেদান্ত-শাস্ত্রের চর্চা করেছেন উত্তর রাঢ়ের উমাপতি পণ্ডিত, দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীধর ভট্ট, ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত অভিনন্দ, বৌদ্ধ ব্যাকরণ ও চরকের টীকাভাষ্য অবলম্বনে রচিত 'আয়ুর্বেদ দীপিকা'র লেখক আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্ চক্রপাণি দত্ত, 'সারাবলী' শীর্ষক জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা কল্যাণবর্মা, লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভার তিন সংস্কৃত পণ্ডিত ধোয়ী, শরণ ও মীমাংসা-রচয়িতা হলায়ুধ প্রমুখ। প্রখ্যাত বাঙালি স্মৃতিকার ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ জীমূতবাহনের (খ্রিস্টীয় ১১-১২ শতক) নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

সংস্কৃতে সাহিত্য রচনা করেছেন তৎকালে অনেক বাঙালি কবি। গৌড়-অভিনন্দ নামক একজন বাঙালি কবি পদ্যে 'কাদম্বরী-কথাসার' নামক গ্রন্থ লেখেন। অন্য এক অভিনন্দের লেখা 'রামচরিত' কাব্যের নাম পাওয়া যায়। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্য বিশেষ যশ অর্জন করে। দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিতে' বাঙালি জীবনাচরণের চমৎকার ছবি অঙ্কিত হয়েছে। লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের দিক-নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া তৎকালীন বঙ্গের অনেক বাঙালি কবির অপভ্রংশে লেখা কাব্যে বাঙালির জীবনাচরণের নানাদিকের বাস্তবসমৃদ্ধ প্রকাশ দেখা যায়।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিভিন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের পদের সংকলন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। চর্যাপদ হচ্ছে দেশজ ভাষার প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন। মগধ ও বাংলার ঐশ্বর্যে ভরা বৌদ্ধমঠ, মন্দির ও বিহারগুলোই ছিলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গবলয় আক্রমণ করে

লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করলে বৌদ্ধমঠ ও বিহারগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা না পাওয়ায় তৎকালীন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনের একটা বড়ো অংশ যবনিকার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে এবং বাংলা সাহিত্য ক্রমে মধ্যযুগের পথ তৈরি শুরু করে। বহু বাঙালি কবির সাধনায় সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অবশেষে যুগ থেকে যুগান্তরে এসে আধুনিক কালের সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এতকাল যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে বাঙালির অধিবাস ছিলো, ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয়। বাঙালির এতদিনের লালিত সংস্কৃতিতে তখন মুসলিম কালচার প্রায় সগৌরবে প্রবেশ শুরু করে। মুসলিম আইন-কানুন, ইরান-তুরানের ঐতিহ্য এদেশীয় সংস্কৃতির উপর নানাভাবে ছায়াপাত ঘটাতে থাকে। মুসলিম শাসকবর্গের প্রতিপোষণেই যে তা সম্ভব হয় তা বলা যায়। রাজকার্য পরিচালনায় মুসলিম সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সরাসরি হলেও সম্পূর্ণ নতুন এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে এদেশবাসী প্রথমে মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। তার কারণ মুসলিম সংস্কৃতিতে ইসলামি ঐতিহ্যের সম্পর্কটি যেমন গভীরভাবে সম্পৃক্ত, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবপুষ্ট এতকালের বঙ্গসংস্কৃতির মধ্যে তার মিশেল রাতারাতি সম্ভব হয় নি। কাজেই এদেশবাসীর কাছে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ছিলো সম্পূর্ণ বিদেশী, অন্যদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে বিজাতীয়ও বটে। কারণ ভারত তখন প্রায় সবটাই ছিলো হিন্দু অধ্যুষিত রাজ্য। মুসলিম কিংবা ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতবাসীর কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিলো না। তথাপি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম শাসকশ্রেণী ইরান তুরান থেকে আনিত সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেন।

মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পর জীবনের নানাক্ষেত্রে বিদেশী চাপ বাড়ে, কিন্তু শত চাপেও বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন তার নিজস্ব সত্তা হারায় নি। তবে ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় নির্ধারিত শ্রেণীবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কয়েক যুগ পরে ইসলাম পরোক্ষভাবে হলেও কিছু প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ইসলাম যে সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী -এই জ্ঞান থেকে সাধারণ মানুষ পারস্পরিক শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে কাটানোর অভিপ্রায়ে ধর্মান্তরিত হওয়াও শুরু করে।

তবু একথা বলা যায় যে, ইসলাম সাম্যবাদ ও একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও হিন্দু-সংস্কৃতিতে যে মূর্তিপূজা, গাছ, পাথর, পশু কিংবা রোগ-ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পিত দেবদেবীগণের বন্দনা, তার বিরুদ্ধে ইসলামের সাম্যবাদ ও একেশ্বরবাদ এদেশবাসীর মনে তখন কোনো প্রভাবই রাখতে পারে নি। অর্থাৎ মূর্তিপূজার ব্যাপারে এদেশীয় সংস্কার কোনোক্রমেই ইসলামের অনুশাসনকে স্বীকার করে নেয় নি।

কিন্তু কালের ব্যবধানে উভয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে আপোস করা সম্ভব হয়। ফলে এদেশে ইসলামি শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর কালক্রমে দেশীয় জনসংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশীয় সংস্কৃতির সংযোগ বাড়তে থাকে। তার আর একটি কারণ এই যে মুসলমানগণও তখন আর বিদেশী ছিলো না। কালচক্রে তারাও তখন বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়।

রাজকার্যে ও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে ফারসি জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য তথা আমলা ও মুনশীদের কদর বাড়ে। ইরানের সুফীবাদও এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে এক নতুন অধ্যায় যোজনা করে। ক্রমে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি জনমনে আবেদন সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়।

অতঃপর সমাজে আউল-বাউল, ফকির-দরবেশদের আগমন ঘটে। বাংলার লোক-সংস্কৃতির ধারাটিও সুফী ভাববাদের সংস্পর্শে নবরূপ লাভ করে। এছাড়া মুসলিম সংস্কৃতি থেকে বাংলার শাসনকার্যে উজির, নাজির, কাজী, মুনশি ইত্যাদি শব্দগুলো জুতসইভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। অনুরূপভাবে আদব কায়দা, খেতাব-খেলাত, উর্দি কুর্তা ইত্যাদি মুসলমানি শব্দগুলোও অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও ইসলামি সংস্কৃতির দান উপেক্ষণীয় নয়। শাল, মসলিন, কিংখাব, কার্পেট ইত্যাদির ব্যবহার এবং সোনার গহনা কিংবা রৌপ্য বা তামার থালা ঘটি বাটিতে মিনার কাজ—এসব প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সংস্কৃতিরই দান। বিভিন্ন সৌধ বা মসজিদগাত্রে খোদিত কিংবা চিত্রকলায় প্রতিফলিত শিল্পকর্ম দেখলে ইসলামি সংস্কৃতির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া সংগীতের একটি বিশেষ ধারায়,—খেয়ালে, ঠুমরিতে, গজলে ইসলামি সংস্কৃতিকেই অবলম্বন করা হয়।

ধর্ম যাই থাক, পারস্পরিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় হিন্দু মুসলমানের শিক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও এক নতুন বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। একসময়, সাহিত্য রচনায় দেবভাষা সংস্কৃতেরই প্রাধান্য ছিলো। মুসলমানদের আগমনে বিদেশী প্রভাব ছায়া ফেলায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই অভিনব সংযোজনায় দেশীয় সাহিত্য নতুনভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে।

ভাষা-ব্যবহারে ও সাহিত্যচর্চায়ও অতঃপর মুসলিম ঐতিহ্য অবাধে প্রবেশ শুরু করে। পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণু মুসলিম শাসকগণও হিন্দু ঐতিহ্য প্রভাবিত দেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে বঙ্গে সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার সাফল্য প্রায় তুঙ্গে ওঠে। এই মহান সম্রাটকে হিন্দু সম্প্রদায় কৃষ্ণের অবতার রূপে মনে করতেন। বৈষ্ণবদের কাছে তিনি ছিলেন 'নৃপতিতিলক' ও 'জগৎ-ভূষণ'। মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ও বিজয়গুপ্ত তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহও (১৫১৯-১৫৩২) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহ ও নসরত শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের ও পরাগল ও ছুটিখাঁর অনুপ্রেরণায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন।

শুধু বঙ্গ নয়, সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমান শাসকগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। পাঠানযুগে মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' রচিত হয়; সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত মুসলিম কবি আলাওল বাংলায় 'পদ্মাবতী' নামে কাব্যের অনুবাদ করেন। তাছাড়া কবীরের দোহা ও তুলসীদাসের 'রামচরিত'ও পাঠানযুগেরই অবদান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ শাহ্ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজীর বাহরাম খান, সৈয়দ

সুলতান, মুহম্মদ খান, আবদুল হাকিম, দৌলত কাজী, আলাওল, ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ মুসলিম কবির অবদানে সমৃদ্ধ হয়।

মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শুরুতে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হয়। এ সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মসূত্রে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও হাওড়া হুগলী এলাকায় বহু হিন্দুস্তানি ও অবাঙালির আগমন ঘটে। এদের আগমনের ফলে বাঙালির কথার বুলিতে হিন্দি উর্দু অর্থাৎ হিন্দুস্তানি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে শিক্ষিত ও অভিজাত বংশের পারিবারিক জীবনে বাংলার সঙ্গে উর্দু হিন্দি মিশ্রিত জবানের রেওয়াজ হয়। উর্দুর মিলনে গড়ে ওঠা এই অভিনব বাংলা ভাষা ও কাব্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় তুর্কিদের বঙ্গবিজয়ের পর মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাবে বঙ্গে ফারসি দরবারী ভাষার মর্যাদা পায়। রাজকার্যে এবং ব্যবহারিক জীবনে সঞ্চারিত ফারসি ক্রমে সাহিত্যেও অনুপ্রবেশ করে। ফলে হিন্দু-মুসলমান অনেক কবির কাব্যে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রে ভারতচন্দ্রের কাব্যেও ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উর্দুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষায় যেসব মুসলমানি পুথি রচিত হয়, যেমন ফকির গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা', সৈয়দ হামজার 'জৈগুনের পুথি' ইত্যাদি কাব্য দোভাষী পুথি হিসেবে পরিচিত।

দোভাষী রীতির কাব্যে যেসব বিষয় পল্লবিত হয়েছে, তাতে বাংলার আদিসংস্কৃতির কোনো ছাপ নেই ; ফলে ঐসব রোমান্টিক কাব্যে ভাষার যে ব্যবহার এবং বিষয়ের যে পরিবেশনা তাতে এ ধারার সাহিত্যে যে সংস্কৃতিচর্চা, তাকে মুসলমানি সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। তবে বঙ্গসংস্কৃতির পাশাপাশি তা বিরাজ করে।

এভাবেই বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন যুগে যুগে সাহিত্যে, শিল্পে, ধ্যানে-জ্ঞানে, সংস্কারে উপচারে নানাভাবে বিকাশ লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ
(খ্রিস্টীয় ৭-১১ শতক)

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বলতে আমরা চর্যাপদকে ঘিরে যে সাহিত্য-প্রয়াস এবং সেই সাহিত্য-প্রয়াসকে নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের যে-যুগের অবস্থান ছিলো তাকেই বুঝবো। তার আগে প্রাকৃত তথা অপভ্রংশের মাধ্যমে যে-সাহিত্য-প্রয়াস চলছিলো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারও একটা গুরুত্ব আছে। কেননা ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপভ্রংশ যুগের যে সাধনা, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বভাব-চরিত্রের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। হয়তো তখন অপভ্রংশ যুগেব সান্ধ্য সাহিত্যাকাশ এক নতুন ভাষা ও সাহিত্যের জন্ম-সম্ভাবনায় রাগরক্তিম আভাস সঞ্চার কবে আরো উজ্জ্বল হয়েছিলো।

বঙ্গদেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের পটভূমিকায আসে খ্রিস্ট্রীয় পঞ্চম শতকে গুপ্তদের শাসনামলে। হুন আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হলে রাজা শশাঙ্ক (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক) বঙ্গদেশেব ইতিহাসকে যথাযোগ্য মর্যাদায প্রতিষ্ঠিত কবেন। আনুমানিক ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পব বঙ্গদেশ আভ্যন্তবীণভাবে রাজনৈতিক গোলযোগের শিকাব হয়। এই গোলযোগের ফলে বাংলায প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহেব আক্রমণ প্রবল হয়। আভ্যন্তবীণ বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা প্রথম এদেশ আক্রমণ করেন। পবে কাশ্মীর বাজ্যের জয়পীড় এবং নেপালরাজ দ্বিতীয় জয়দেব এদেশে অধিকার বিস্তাবের চেষ্টা করেন। এই আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দেশের জনগণ গোপালদেব নামে একজন সেনাপতিকে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের আমলে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থাব যথেষ্ট উন্নতি হয়। পাল নৃপতিগণ উদার ও সুশাসক ছিলেন। এসময় বাংলাব ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয। অনুকূল পরিবেশে দেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধিও ঘটে। কেননা পাল রাজগণ ছিলেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। বাঙালি তার পূর্বপুরুষ দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পেয়েছিলো ভক্তিধর্ম, আর্যদেব কাছ থেকে হযেছিলো আধ্যাত্মিক ভাবগৌববের উত্তরাধিকাবী। পাল রাজবংশেব শাসনামলে বাঙালিব এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো স্ফুরিত হওয়ার অবকাশ পায়।

কালক্রমে পাল রাজবংশেও পারিবারিক কলহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পাল রাজগণের উত্তরাধিকারদের দ্বন্দ্বসংঘাত ও দুর্বলতার সুযোগে সামন্তশক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র ও সমাজের বিশৃঙ্খলা যখন চরমে ওঠে, তখন কর্ণাটক থেকে এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এদেশে এসে সেনরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনবংশের আদিপুরুষ ছিলেন সামন্ত সেন। সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন। তিনি গৌড়েব বাজারূপে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন উত্তরাধিকার-সূত্রে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা লক্ষ্মণ

সেনের রাজসভায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধিপত্য বেশি ছিলো বলে সাধারণ জনসাধারণের প্রবেশাধিকাব তাতে প্রায় ছিলো না বললেই চলে। রাজসভায় সংস্কৃত, বেদ ও স্মৃতিসংহিতা চর্চাব দাপটে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকার প্রবলভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের আগে ও পরে ব্রাহ্মণ্য-গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গ সমাজ-ব্যবস্থার শীর্ষদেশেই শুধু অবস্থান কবতো না, নিজেরাই দেবত্বের মহিমা ধারণ করে অন্যান্য বর্ণের পালনীয় বিধিব্যবস্থা ও আচার-ব্যবস্থাকে পৃথক করে দিয়েছিলো। ব্রাহ্মণের স্থান নির্ধারিত হয়েছিলো সমাজের চূড়ায়, মধ্যে ক্ষুদ্র এবং সর্বনিম্নে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শে গঠিত সমকালীন এই সমাজ-ব্যবস্থা এক কথায় একনায়কত্বের রূপ লাভ কবে এবং এই একনাযকত্বের মূলে ছিলো এক বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বর্ণ, এক ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, এক সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্য-শাসিত এই সমাজ-জীবনে সমতার আদর্শকে যেমন অস্বীকার কবা হযেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য-শ্রেণীর স্বার্থে সামাজিক দুর্নীতি ও ব্যভিচাবকে স্বীকৃতি দেওয়া হযেছে। ব্রাহ্মণদেব স্বেচ্ছাচাবমূলক যৌন-ব্যভিচারে সমাজের মৌন সম্মতি ছিলো। বিখ্যাত বাঙালি স্মৃতিকার ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ জীমূতবাহন (১১-১২ শতক) বলেছেন বিবাহিত নয় এমন শূদ্রনারীব সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের ফলে সন্তান জন্মালে ব্রাহ্মণের কোনো অপরাধ বা পাপ হতো না। এমন কি এই যৌন অনাচার ধর্মমন্দিরকেও সংক্রমিত করে। উচ্চবর্ণেব ব্রাহ্মণগণ দেবালয়ের দেবদাসীদের দ্বাবা নিজেদেব যৌন-লালসা চরিতার্থ কবতো অবাধে।

এই বিচিত্র সমাজ জীবনে একদিকে ছিলো উচ্চবর্ণের বিলাস-কলুষিত জীবন-যাপন প্রণালী, অন্যদিকে সাধাবণ লোকেব দাবিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের স্থবির গতিধারা ; একদিকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি, অন্যদিকে ধর্মেব নামে ব্যভিচার ও অনাচার ; একদিকে সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিল্পেব প্রতি অনুবাগ, অন্যদিকে দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি অবহেলা। এই দেবগর্বী সমাজ জীবনই ছিলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাগীতির সামাজিক পটভূমি।

তবে এই অবস্থা যে সব সময বিরাজমান থাকতে পারে না, কালক্রমে তা প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সফলতার আগেই তুর্কি থেকে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর পরিবাব-পবিজন নিয়ে পলাযন করেন। লক্ষ্মণ সেনের বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মূলে কুঠাবাঘাত করা হয়। তার আগে উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে বৌদ্ধবিপ্লবও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থাই সেই বিপ্লবেব মূলে প্রেরণা যোগিয়েছিলো। তার ফলে সংস্কৃতের উপর দিয়ে দেশজ ও প্রাকৃত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিজয়ের পথে এগিয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃতকে জিইয়ে রাখার নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য তার পূর্বগৌরব আব কখনো ফিরে পায নি। সেজন্যই সম্ভবত বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধের বাঙালি কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ভাবে-বৈভবে-ভাষায় সংস্কৃতের চমৎকার আভিজাত্য ছড়ালেও, হুমায়ুন কবিরের মন্তব্যের

অনুসরণে, বলতে পারি আসলে তা 'স্ফুলিঙ্গই রয়ে গেল, দাবানল হয়ে জ্বলে উঠবার অবকাশ পেল না।'[৭]

দুই।। আদি নিদর্শন চর্যাপদ

বঙ্গে দেশজ ভাষার প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন বৌদ্ধ গান ও দোহা বা 'চর্যাপদ'। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে চর্যাপদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বাংলাব সারস্বত-সমাজ অবহিত ছিলেন না। এই সালেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল রাজ-দরবারের গ্রন্থশালা থেকে কিছু সংখ্যক অপভ্রংশ দোহার সঙ্গে চর্যাপদের একটি প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হয। তাঁরই সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে এ পুথি 'হাজার বছরেব পুরান বাঙ্গালা ভাষায বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

তিব্বতী ভাষার নানা গ্রন্থ অবলম্বনে ভাষা ও অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ কবে ডক্টর হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাহুল সাংকৃত্যায়ন, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, সুখময় মুখোপাধ্যায প্রমুখ পণ্ডিত চর্যার কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এই সব পণ্ডিতেব বিচার-বিশ্লেষণে যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি আছে, তা খানিকটা পবস্পববিবোধী,সর্বত্র স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ নয। তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া অন্য সবাই প্রায মনে কবেন চর্যাব কবিগণ মোটামুটিভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। ডক্টর শহীদুল্লাহর অভিমত সপ্তম থেকে অষ্টম শতক।

চর্যার কবিগণ ছিলেন বৌদ্ধ; সেজন্য চর্যাপদে মূলত বৌদ্ধ সম্প্রদাযেব সহজযান তান্ত্রিক যোগসাধনার কথাই ব্যক্ত হযেছে। তবে তার অবলম্বন বাঙালির অন্তরলব্ধ ভাবেব সঙ্গে বিমিশ্র বাংলাদেশের জীবন, প্রকৃতি ও জীবনাচবণের নানা বিষয়; প্রধানত বাংলা ভাষা তাব বাহন।

শববীপা, লুইপা, কাহ্নপা প্রমুখ তেইশ জন পদকর্তার সাতচল্লিশটি পদ চর্যাপদে অন্তর্ভুক্ত। এই সব পদকর্তাকে সিদ্ধাচার্য বলা হয়। কেননা তাঁরা গুরুপ্রদত্ত তন্ত্রমতে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক সাধনায স্বসিদ্ধ। তাঁদের রচনায় এই তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে সোজাসুজি আধ্যাত্মিক উপায়ে, কতকটা হেঁয়ালির ধরনে; ফলে দেশীয় ভাষার সববকম বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও চর্যাপদেব ভাষার সাধারণ নাম 'সান্ধ্যভাষা' অর্থাৎ যে ভাষাব আলো-আঁধারি রূপ অভীষ্ট বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটনে পাঠককে কখনো কখনো দ্বিধায ফেলে। তবে একথা খুবই সত্য যে সান্ধ্যভাষার আড়ালে উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষার নিগড়ে বাঁধা পদগুলোকে সাহিত্যিক আদর্শে গড়ে তুলে জনচিত্তে তাকে আকর্ষণীয় ও আবেদনশীল কবাই ছিলো চর্যাকারগণের প্রধান উদ্দেশ্য।

নানাকারণে চর্যাপদের ভাষা যে অবিমিশ্র বাংলা নয় একথা পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করেছেন।[৮] এর একটি যুক্তিসঙ্গত ধারণা এই যে চর্যার কবিগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে

---

৭. হুমায়ুন কবির, 'বাংলার কাব্য' (কলিকাতা : চতুরঙ্গ, ২য় সং.১৩৬৫), পৃ. ১৬
৮. মণীন্দ্রমোহন বসু, ['চর্য্যাপদ' প্রবন্ধ], 'বাঙ্গালা সাহিত্য', ১ম খণ্ড (কলিকাতা : কমলা বুক ডিপো, ১৯৪৬), পৃ. ১১১

আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে সকলের ভাষা নিশ্চিত ঐক্যসূত্রে গাঁথা নয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান তখন দেশসীমা অতিক্রম করে নানাদিকে বিস্তৃত ছিলো। সেজন্য উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার অঞ্চলের ভাষাদর্শ, এমন কি শব্দ প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যও তাতে লক্ষ্য করা যায়। আসলে উড়িয়া, বাংলা ও অসমীয়া পূর্বভারতের একই মূল কথ্যভাষা থেকে উদ্ভূত। সেই সূত্রে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন, তেরো শতক পর্যন্ত উড়িয়া বাংলার এবং ষোল শতক পর্যন্ত বাংলা অসমীয়ার অভিন্ন রূপ ছিলো। এইসব ভাষা ক্রমান্বয়ে পৃথক স্বরূপ লাভ করে। সুতরাং চর্যাপদকে নিয়ে বাঙালি, আসামি ও উড়িয়াদের দাবি একেবারে অযৌক্তিক নয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এ সম্পর্কের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হলো,- 'আমার বিশ্বাস, যাঁরা এই ভাষা লিখিয়াছেন, তাঁরা বাঙ্গালা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের লোক।'৯ তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গের নিশ্চিত উল্লেখ থেকে বাঙালির দাবি প্রধান বলে বিবেচিত হতে পারে। 'বাঙ্গালী', 'বঙ্গালদেশ', 'পঁউয়া খাল' (পদ্মানদী) ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখে একপ মনে হয়। এছাড়া প্রত্যক্ষত বাংলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়।১০

চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। চর্যার কবিগণ বিচার-বোধে ছিলেন যুক্তিসিদ্ধ, মনন মানসে তীক্ষ্ণ এবং উপমা রূপকের ব্যবহারে সুদক্ষ। শিল্পকলার নানাবিধ কৌশল তাঁদের অধিগত ছিলো, সেজন্য তাঁদের রচনারীতি ও বাক্যপ্রয়োগ সংক্ষিপ্ত হয়েও অর্থগূঢ়। 'উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী', 'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা' ইত্যাদি বাক্য কেবল সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন মাত্র নয়, সংগীতের সুরমাধুর্যেও ভরপুর।

চর্যাপদে প্রতিফলিত বাঙালির তৎকালীন জীবন ও সমাজের বাস্তব ছবি জীবনরসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। মেয়েরা তখন ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করতো, গলায় পরতো গুঞ্জার মালা, কর্ণে কুণ্ডল। বৃত্তি হিসেবে অনেকেই শুঁড়ীর কাজ করতো। উল্লেখযোগ্য অলঙ্কার ছিলো বাহুখণ্ড বা বাউটি, তাবঙ্ক বা তাড়। লোকজন কাড়া-নাকাড়া ও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বিবাহ উৎসবে যেতো। সমাজে যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিলো। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু ও হাতির উল্লেখ আছে ; অস্ত্রের মধ্যে টাঙ্গী, কুঠার, নখলি বা খন্তা। হরিণ-শিকার খুব জনপ্রিয় ছিলো।

মুসলমানদের বঙ্গবিজয়কালে রাজনৈতিক অরাজকতায় চর্যাপদের রচয়িতাগণ তৎকালীন বৃহত্তম বঙ্গবলয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম থেকে পালিয়ে যান ভারতের উত্তরাঞ্চলে। চর্যাপদকারদের অবস্থান ছিলো প্রধানত নালন্দা ও বিক্রমশীল নামক অঞ্চলে ; ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী এই দুটি অঞ্চল দখল করার পর তাঁরা নেপাল ও তিব্বতে আত্মগোপন করেন। নেপাল থেকে চর্যাপদের আবিষ্কার সেই কারণেই সম্ভব হয়েছে।

---

৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৬), ভূমিকা, পৃ. ৬

১০. মণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্যাপদ' (কলিকাতা : কমলা বুক ডিপো, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৫৯), ভূমিকা, পৃ. ৬৮-৬৯

তিন॥ চর্যাপদের কবি

সরহপা ॥ চর্যাপদের আদি-রচিয়তা হিসেবে অনুমিত। তিনি সরোজ বজ্র, পদ্মবজ্র, রাহুল ভদ্র ইত্যাদি নামেও পরিচিত। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত সবহেব জন্মস্থান কেউ বলেন পূর্বভারতের রাজ্ঞীগ্রাম, তিব্বতী ঐতিহ্য মতে উড়িষ্যা। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদ লাভ করেন। এঁব কালগত অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিমত অভিন্ন নয়। বলা হয়েছে সরহ কামরূপেব বাজা বত্নপালকে (১০০০-১০৩০) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। তাহলে তিনি রত্নপালের সময় আবির্ভূত হয়েছেন। 'তবে তিনি সম্ভবত অষ্টম থেকে নবম শতকের মধ্যেও আবির্ভূত হযে থাকতে পারেন। 'বজ্রগীতি', 'চিত্তকোষ', 'দোহাকোষ' ইত্যাদি প্রায় একুশটি গ্রন্থের বচয়িতা তিনি। তার মধ্যে তাঁর সংস্কৃত রচনাও আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধগানের অন্তর্ভুক্ত ২২ নং, ৩২ নং, ৩৮ নং ও ৩৯ নং চর্যাগীতি তাঁর রচিত। তাঁর রচিত পদ,—

রাগ গুঞ্জরী

অপনে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ণ জাণহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥
জা এথু জাম মবণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেবে কঙ্খা॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম

আধুনিক বাংলা॥ ভবনির্বাণ আপনি রচে রচে লোকে মিছা আপনাকে বন্ধনযুক্ত করে। অচিন্ত্য যোগী আমরা জানি না। জন্মমবণভব কেমনে হয়। যেমন জন্ম তেমন মরণ। জীবন্ত ও মৃত অবস্থায় বিশেষ নেই। এখানে যাব জনমে ও মবণে শঙ্কা আছে, সে রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা কবে। যে সচবাচর দেবলোকে ভ্রমণ কবে সে অজর ও অমর, (তার) কিছুই হয় না। জন্ম থেকে কর্ম কি কর্ম থেকে জন্ম। সবহ বলেন, সেই ধাম অচিন্ত্য।

রাগ দেশাখ

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল॥
উজু বে উজু ছাড়ি মা লেহু রে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক॥
হাথেরে কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ।
অপণে অপা বুঝ তু নিঅমন॥
পার উআরে সোই গজিই।

দুজ্জণ সঙ্গে অবসরি জাই॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বাপা লজুবাট ভাইলা॥

আধুনিক বাংলা॥ নাদ নেই, বিন্দু নেই : রবি ও শশিমণ্ডল নেই। চিত্তরাজ স্বভাবতঃই মুক্ত। সরল রে সরল ছাড়ি বঙ্ক লইও না। নিকটেই বোধি, লঙ্কায় যেও না রে। যে হাতে কঙ্কণ, দর্পণ লইও না। তোমার নিজের মনে আপনাকে আপনি বুঝ। উপকারে সে পারে গতিশীল হবে। দুর্জনের সঙ্গে অপসরণ হয়ে যাবে। বাম দক্ষিণে খাল ও ডোবা আছে, সরহ বলেন বাপ সবল পথ (সেই)।

সান্ধ্যভাষার ছায়াতলে নিবেদিত সরহের এই রূপকধর্মী পদটিতে এরূপ একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে আধ্যাত্মিক সাধনা লাভের জন্য কঠিন কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন নেই। সাধক তাঁর নিজশক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ীই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন।

রাগ ভৈরবী

কাঅ ণাবডি খাণ্টি মণ কেডুয়াল।
সদ্ গুরুবঅণে ধর পতবাল।
চীঅ থিব করি ধরহু রে নাই।
আন উপায়ে পার ণ জাই॥
নৌ বাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজে জাউ ণ আণে॥
বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ।
ভব উলোলেঁ সব বোলিআ॥
কূল লই খব সোন্তে উজাআ।
সরহ ভণই গঅণে সমাঅ॥

আধুনিক বাংলা॥ কায়া নৌকা, খাঁটি মন বৈঠা। সদগুরুর বচনকে হাল রূপে ধর। ওরে! চিত্ত স্থির করে নৌকাকে ধর। অন্য উপায়ে পার হওয়া যায় না। নৌকা বায়, গুণের দ্বারা নৌকা টানে। মিলিত হয়ে সহজানন্দে মিলিত হও, অন্য উপায়ে যাওয়া যায় না। পথ অভয় পথ, (পথভ্রষ্টে) খড়গধারী বলবান হয়। ভব বিষয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে খণ্ডিত হয়। কূল লয়ে খরস্রোতে উজান বয়। সরহ বলেন, গগনে প্রবেশ করো।

রাগ মালশী

সুইণা হ অবিদাব অরে নিঅমন তোহোর দোসে।
গুরুবঅণবিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে॥
অকট হুঁ ভব ই গঅণা।
বঙ্গে জায়া নিলেসি পবে ভাগেল তোহোর বিণাণা॥
অদভুঅ ভবমোহ রে দিসই পর অপ্পণা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুণ অপণা॥
অমিআ অচ্ছন্তে বিস গিলেসি রে চিঅ পরবস অপা।

ঘরে পরেক বুঝ্‌ঝিলে রে খাইব মই দুঠ কুণ্ডবা
সরহ ভণন্তি বর সুণ গোহালী কি মো দুঠ বলন্দেঁ।
একেলে জগ নাশিঅ রে বিহরুউ সুচ্ছন্দে॥

আধুনিক বাংলা॥ স্বপ্ন তোমার অবিদ্যার তরে, ওরে নিজমন তোমার দোষে। গুরুবচন বিহারে থাকবে, কেমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত হুঙ্কার ভব এই গগনে, বঙ্গে জায়া গ্রহণ করলে পরে তোমার বিজ্ঞান ভেঙ্গে গেলো। ওরে! অদ্ভুত ভবমোহ, পর আপন দৃষ্ট হয়। এই জগৎ জল বিম্বাকারে সহজ শূন্যে আপন হয়। অমৃত থাকাতে বিষ গলধঃকরণ করো, ওরে! চিত্ত পরবশ আপনি। ঘরে পরকে বুদ্ধিস্থ করলে, ওরে! আমি দুষ্টকুণ্ড খাবো। সরহ বলেন, শূন্য গোহাল ; দুষ্ট বলদের দ্বারা আমি কি করবো। একলা জগৎ নাশ করলো, স্বচ্ছন্দে বিহার করে।

শবরী বা শবরপা॥ ডক্টর ধর্মবীর ভারতী চর্যাপদের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে বিবেচনা করেন শবরপা ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। শবরপা বৌদ্ধপণ্ডিত কমলশীলকে 'ডাকিনী-বজ্র গুহ্যরীতি' ও 'মর্মোপদেশ' নামক দুখানি পুস্তক প্রণয়নে সহায়তা করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কমলশীল অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিব্বত-রাজ খ্রি-স্রোঙ-ল্‌দেউ-বচ্‌নের নিমন্ত্রণে তিব্বত আসেন। সেই সূত্রে শবরপা অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে লোক।[১১] রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন, শবরপা বিক্রমশীল-নিবাসী, ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি মন্ত্রবিক্রম পর্বতে শিকারী ছিলেন। এমনও বলা হয় যে আর্য অবলোকিতেশ্বরের কাছে অথবা পণ্ডিত নাগার্জুনের বাংলায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট শবরপা দুই মহিলাসহ নাথমতে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মহিলা দুজন, এক মতে তাঁর ভগ্নী, অন্যমতে পত্নীরূপে কথিত। পরে এদের নিয়ে তিনি শ্রীপর্বতে বসবাস করেন। তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা ও সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত সিদ্ধা রূপেও বিবেচিত। এছাড়া তিনি বজ্রযোগিনী সাধনার প্রবর্তক ছিলেন বলেও মনে করা হয়। শবরীপা 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি', 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি' ও 'শূন্যতাদৃষ্টি' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৮ নং ও ৫০ নং চর্যাপদ তাঁর রচিত। পদ দুটি,—

রাগ বলাড্ডি

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গিপীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী॥

চিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই।
গুরুবাক্ পুঞ্চিআ বিন্ধ নিঅমণ বানেঁ
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ পরমণিবাণেঁ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবরসিহরসন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে॥

আধুনিক বাংলা॥ উঁচু উঁচু পর্বত, তথায় শবরী বালিকা বাস করে। শবরীব পরিধান ময়ূবপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জাব মালা। উন্মত্ত শবব, পাগল শবর, গুহামাঝে বিলীন করো না। নিজ গৃহিণী নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর, মুকুলিত হলো, গগণে লাগলো ডাল। কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারিণী শবরী একাকিনী এ বনে ক্রীড়া করে। তিন ধাতুর খাট পাতলো, শবর মহাসুখে শয্যা বিছালো। ভুজঙ্গধারী শবর নৈরামণি নাগরীর সহিত প্রেমরসে রাত পোহালো। হিয়াকে তাম্বুল কবে মহাসুখে কর্পূর খায়। শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে নিযে মহাসুখে রাত্রি পোহায়। গুরুবাক্‌কে ধনু করে নিজ মনকে বাণে বিদ্ধ কবো। এক শবসন্ধানে বিদ্ধ করে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কবো। গুরুতর রোষে উন্মত্ত শবব গিরিবরশিখরের সন্ধিদেশে প্রবেশ কবলেন, শবর কেমন করে লডবেন?

শবব এবং শবরীব প্রেমের রূপকে গাওযা এই গানেব মর্মার্থে আভাসিত হযেছে অধ্যাত্ম সাধনমার্গে পৌছবাব উপদেশ।

রাগ রামক্রী

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুবাড়ী।
কণ্ঠে নৈবামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাড়ু ছাড মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণমেহেলী॥
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা॥
সুকড়এ সে বে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাডিব পাসের জোহ্ন বাডী উএলা।
ফিটেলি অন্ধাবি রে আকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা বে শবব শবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা॥
চারিবাসে গড়িলা বেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণশিআলী।
মারিল ভবমত্তাবে দহদিহে দিধলীবলী।
হের সে সবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিল যবরালী॥

আধুনিক বাংলা॥ গগনে গগনে তৃতীয় শূন্যে বাডি। হৃদয়কে কুঠার করে কণ্ঠে নৈরামণি বালিকাকে নিয়ে জেগে থাকেন। ছাড়ো ছাডো মাযামোহ বিষম দ্বন্দ্বময়ী। শূন্য মেহেলীকে নিযে শবর মহাসুখে বিলাস কবে। দেখি আমার সেই তৃতীয় বাড়ি খসম সমতুল্য। সুকড় এ সেই কপাসু ফুটলো। তৃতীয় বাড়িব পাশে জ্যোৎস্না বাড়ি উদিত হলো। ওরে! আকাশফুল

অন্ধকারে টুটুলো। ওরে! কঙ্গুচিনাফল পাকলো, শবর শবরী মেতে উঠলো। অনুদিন শবর কোনোক্রমেই জাগে না, মহাসুখে বিভোর হয়। ওরে! চণ্ডালীকে দিয়ে চার বাসস্থান গড়লো। তা তুলে শবর দাহ করলো, সগুণ শৃগালী কাঁদতে লাগলো। ভবমত্তাকে মারলো ; ওরে, বলবানকে দাহ করে ফেললো। দেখো সেই শবর নির্বাণপ্রাপ্ত হলো, শবরালী টুটুলো।

লুইপা॥ লুইপা মৎস্যান্দ্রাদ নামেও পরিচিত। মাছের আঁতড়ি বা অন্ত্র ভক্ষণ করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিলো মৎস্যান্দ্রাদ। তঞ্জুরের পুঁথিতে লুই 'ভাঙ্গালী' বলে কথিত ; তদনুযায়ী ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁকে বাঙালি বলে মনে করেন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও স্থির করেছেন লুই রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'ভাঙ্গালী' অর্থে ভাগলপুর মনে করেন এবং সে কারণে তাঁর মতে লুই রাজা ধর্মপালের আমলে (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রিঃ) মগধের অধিবাসী ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর জীবনকাল, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৭৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।[১২] তিব্বতি পণ্ডিত লামা তারনাথ বলেন, লুইপা বঙ্গদেশে গঙ্গার ধারে বাস করতেন। অবশ্য প্রথম জীবনে তিনি সামশুভ নামে উদ্যানের, বর্তমানে পাকিস্তানের সোয়াতের, রাজার কায়স্থ লেখক ছিলেন বলে মনে করা হয়। লুইপা উড়িষ্যার রাজা ও মন্ত্রীকে যোগতন্ত্রে দীক্ষা দেন। তিনি 'বজ্রসত্ত্বসাধন', 'বুদ্ধোদয়', 'শ্রীভগবদভিসময়' ও 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামক চারখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং 'লুহিপাদ গীতিকা' নামক একখানি বাংলা সংকীর্তন পদাবলীর রচয়িতা ছিলেন। ১নং ও ২৯ নং চর্যাগীতি তাঁর রচিত। পদ দুটি হচ্ছে,—

রাগ পটমঞ্জরী

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহু রে পাস॥
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥

আধুনিক বাংলা॥ শরীর শ্রেষ্ঠ তরু, তার পাঁচটিই ডাল। চঞ্চলচিত্তে কাল প্রবেশ করে। দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাপ করো। লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জানো। সকল সমাধি কেন করা হয়। সুখ-দুঃখে নিশ্চিত মৃত্যু হয়। ছন্দোবন্ধ কপট ইন্দ্রিয়ের আশা ত্যাগ করো। শূন্যতাপক্ষ ভিত্তি করে নৈকট্য গ্রহণ করো। লুই বলেন, আমি ধ্যানে দেখেছি। ধমন চমনের যুক্ততাকে পিঁড়ি করে তাতে বসেছি।

---

১২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪

পদটিতে সহজ সাধনার ইঙ্গিত আছে ; অর্থাৎ দেহের সহজাত ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির ভোগসুখকে অস্বীকার না করে এতে মহাসুখতন্ময় সাধনার শীর্ষে আরোহণের উপদেশ রয়েছে।

রাগ পটমঞ্জরী

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতিআই॥
লুই ভণই বট দুলক্‌খ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা॥
জাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥
লুই ভণই মই ভাইব কিস।
জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস॥

আধুনিক বাংলা॥ ভাব হয় না, অভাবও যায় না। এইরূপ সংবোধে কে প্রত্যয় করতে পারে? লুই বলেন, বিজ্ঞান দুর্লক্ষ্য বটে। তিন ধাতুতে বিলাস করে, (অথচ) তাতে সংলগ্ন হয় না। যার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না, সে কেমন করে আগম ও বেদ ব্যাখ্যান করে? কাকে কেমন করে বলবো, প্রশ্ন করলে আমি দিব। উদিত চন্দ্র যেমন সত্যও নয়, মিথ্যেও নয়। লুই বলেন, আমি কিসে ভাববো। যাকে নিয়ে আছি, তার উদ্দেশ্যও দেখি না।

দারিকপা॥ কামরূপ রাজ বত্নপালের পরবর্তী উড়িষ্যার শালীপুত্রের এক রাজার নাম ইন্দ্রপাল। তিনি ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন এবং রাজা বিজয় সেন কর্তৃক পরাভূত হয়েছিলেন। অনুমান করা হয় ইন্দ্রপালই ছিলেন চর্যাপদকার দারিকপা। লুইপার প্রতি দারিকের শ্রদ্ধা নিবেদন থেকে তারনাথ মনে করেন, দারিকপা লুইয়ের শিষ্য ছিলেন। লুই রাজা ধর্মপালের আমলে (৭৭০ ৮১০ খ্রিঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সেই সূত্রে দারিকপাও সেই সময়ের হতে পারেন। সুতরাং সাক্ষ্য-প্রমাণাদি যা আছে তাতে দারিকের জীবনকাল বিভিন্ন পণ্ডিতের বিবেচনায় অভিন্ন সূত্রে গাঁথা নয়। দারিক তিনটি অপভ্রংশসহ মোট দশটি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি কালচক্র, চক্রশম্বর, বজ্রযোগিনী, কঙ্কলিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন। ৩৪ সংখ্যক চর্যাপদটি তাঁর রচিত। তাঁর নামে আরো একটি পদ ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৯ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

তাঁর চর্যাটি হচ্ছে,--

রাগ বরাড়ী

সুণকরুণরি অভিনচারেঁ কাঅবাক্‌চিএ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ॥
অলক্‌খলক্‌খণচিত্তা মহাসুহেঁ।
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলেঁ॥

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠানমহাসুহলীলেঁ দুলকখ পরমনিবাণে॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দীজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরে বাধা।
লুইপাঅপসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা॥

আধুনিক বাংলা॥ শূন্যই করুণার অভিন্ন আচারে, কায়বাকচিত্তে দারিক গগনে পরমকূলে বিহার করছে। অলক্ষ্যলক্ষণচিত্তে মহাসুখে দারিক গগনে পরমকূলে বিহার কবছে। রে, তোর মন্ত্রেই কি, তন্ত্রেই কি, ধ্যান ব্যাখ্যানেই বা কি! মহাসুখলীলায় অপ্রবিষ্ট, (তোমার) পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য। দুঃখ সুখকে একত্র কবে (দারিক) ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। স্ব, পর, অপর জাগ্রত হয় না, দারিক সমস্তই অনুত্তব মানে। বাজা রাজা বাজা বে, অপর রাজা রে, অপর রাজা মোহে আবদ্ধ। লুইপাদপ্রসাদে দাবিক দ্বাদশ ভুবন লাভ করেছে।

পদটির ভাবার্থ॥ সুখ দুঃখকে মেনে নিযে মহাজ্ঞানী মহাসুখ-লীলায প্রতিষ্ঠিত হন ও পবম নির্বাণ লাভ করেন।

ডোম্বীপা॥ তিনি নামান্তরে ডোম্বীপাদ ও ডোম্বী। ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনুমান কবেন ডোম্বীপা দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁব সময় মোটামুটি ৭৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ডোম্বীপা ত্রিপুবা রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি বিরূপার শিষ্যও ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকরূপে তিনি দীক্ষা গ্রহণ কবেন। সাধনার সঙ্গিনী হিসেবে তিনি ডোম জাতীয় একজন স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে এই মেয়েটি পরমা সুন্দবী কিশোরী ও গাযিকা হিসেবে নাম কবেছিলো। বাজা এই মেয়ের শবীরের ওজনের সোনা দিয়ে তাকে তার পিতাব কাছ থেকে কিনে নেন। ডোমনীকে বিয়ে করায় প্রজাসাধাবণ ও মন্ত্রীবর্গ বাজার উপব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে বাজ্য ছেড়ে তাঁকে ডোমনীসহ বনে জঙ্গলে ঘুবে বেড়াতে হয়। বাজার অবর্তমানে রাজ্যে দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। গণকেরা বলেন ধার্মিক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করায দেশের এই দুরবস্থা হযেছে। বাজা ফিরে এলে বাজ্য দুর্ভিক্ষ ও মহামারী মুক্ত হয়। দেশের প্রজাসাধারণ তখন তাঁব ভক্ত হযে তাঁব কাছে তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নেয়। এছাড়া ডোম্বীপা রাঢ়, কর্ণাট ও লিঙ্গাইত রাজাব দেশের প্রজাসাধারণকে নাথপন্থায় দীক্ষাদান কবেন। ডোম্বীপা বজ্রযান ও সহজযান সম্পর্কে বই লিখেছেন। এছাড়া 'ডোম্বীগীতিকা' নামে তাঁর একটি সংকীর্তন পদাবলী আছে। ডোম্বীপার নামে একটিমাত্র গান ১৪ নং চর্যা পাওয়া গিয়েছে। গানটি হচ্ছে,—

ধনসী রাগ

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ॥
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী পোইআ লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপসাএ জাইব পুণু জিণউরা॥
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।

গঅ্রণদুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥
চন্দ সূজ্জ দুই চকা সঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহতু ছন্দা॥
কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছড়ে পার করই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কূলেঁ কূলেঁ বুড়ই॥

আধুনিক বাংলা॥ গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে নিমজ্জমান থেকে মাতঙ্গী পুত্রসকলকে অবলীলায় পার করে। ডোম্বি! তুমি বেয়ে চলো। বেয়ে যাও ডোম্বি, পথে বেলা অধিক হলো। সদগুরুপাদ প্রসাদে পুনরায় জিনপুর যাবো। পঞ্চ বৈঠা নৌমার্গে পড়ছে, পীঠে কাছি বেঁধে বাখা আছে। শূন্যতারূপ সেচনীতে পানি সিঞ্চন করো, যেন তা শরীরে প্রবেশ না করে। চন্দ্র সূর্য দুই চক্র (হস্তে) পুলিন্দ সৃষ্টি ও সংহার (করছে)। বাম দক্ষিণ দুই পথে সংযমপূর্বক উঠো না, তুমি স্বচ্ছন্দে বেয়ে যাও। (নৈরাত্মা দেবী ডোম্বী) কড়িও নেন না, পয়সাও নেন না, (কিন্তু সাধককে তিনি) স্বচ্ছন্দে পার করেন। যে রথে চড়েছে, (অথচ তা) বাইতে জানে না, তার কূলে কূলে নিমজ্জিত হয়।

পদটির ভাবার্থ॥ ডোমনী নদী পারাপার করছে; আর তারই মাধ্যমে সহজ সাধনার তীর্থধামে পৌঁছানোর আভাস সূচিত হচ্ছে।

বিরূপা॥ বিরূপা নামে দুইজন লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। নালন্দের জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্যরূপে একজন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বর্তমান ছিলেন। অন্যজন জালন্ধরীপার শিষ্য যিনি বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যোগী এবং ভিক্ষুরূপে সোমপুরী, উড়িষ্যা, সৌরাষ্ট্র, জুনাগড়, দেবীকোট ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেন। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে চিন্তা করে কেউ কেউ তিনজন বিরূপার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। একজন রাজা দেবপালের সময়ে, অপরজন রাজা রামপালের সময় এবং আর একজন গৌড়ের মুসলমান রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। আমাদের আলোচ্য বিরূপার সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। তিনি ছিলেন ডোম্বীপার গুরু। ৩ নং চর্যাগীতি বিরূপার রচিত। চর্যাটি হচ্ছে, -

রাগ গবড়া

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণী সান্ধ।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥

আধুনিক বাংলা॥ এক স্বরূপিণী শুণ্ডিনী দুইকে (চন্দ্র-সূর্যকে) ঘরে প্রবিষ্ট করলো। চিকন বাকলে বারুণী বাঁধলেন। সহজে স্থির করে বারুণীতে প্রবেশ করো। যার দ্বারা অজর ও অমর হয়ে দৃঢ় স্কন্ধ পাবে। দশম দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক আপনি বয়ে এলো। দিবারাত্র (সেই দ্বারে) প্রসারিত করলো। গ্রাহক প্রবেশ করলো, (কিন্তু) বাইরে এলো না। সেই এক ঘটি যার নাল সরু। বিরূপা বলছেন, স্থির করে চালিত করো।

পদটির ভাবার্থ ॥ চোলাই করা মদ ও শুঁড়ির দোকানে মদ বিক্রির যে বর্ণনা এতে আছে তার দ্বারাই জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং চিত্তে সহজাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।

ভুসুকু/শান্তিদেব॥ তিনি আসলে চর্যাপদের অন্যতম কবি শান্তিদেব;[১৩] তাঁর ডাক নাম 'ভুসুকু'। 'বোধিচর্যাবতার', 'শিক্ষা সমুচ্চয়' ও 'সূত্র সমুচ্চয়' নামক তিনখানা মহাযান গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন শান্তিদেব। তারনাথ বলেন, শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্র দেশের রাজকুমার। রাজসিংহাসন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি। সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে তিনি নালন্দে যান, সেখানে বৌদ্ধাচার্য জয়দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বলা হয়েছে, ভুসুকু সেখানে নিজে কুটিরে বসে লেখাপড়া করে কাটাতেন। তাই অপরাপর ভিক্ষু শ্রমণেরা মনে করতেন ভুসুকু কেবল ভোজন, শয়ন এবং কুটিরে কাটিয়ে সময় যাপন করেন। ভুক্তি থেকে ভু, সুপ্তি থেকে সু এবং কুটির থেকে কু অর্থাৎ ভুসুকু ; শান্তিদেব তখন এইরূপে ভুসুকু নামে অভিহিত হন। আসলে ভুসুকু তাঁর অভীষ্ট লেখাপড়া শিখে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিব্বতি পণ্ডিত লামা তারনাথ ভুসুকুকে শ্রীহর্ষের পুত্র শীলের সমসাময়িক মনে করেন। এতে তাঁর সময় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হয়।[১৪]

একমতে তিনি সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ), অন্যমতে ৭৭০-৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপালের রাজত্বকালে (রাহুল সাংকৃত্যায়ন), আর এক মতে দেবপালের সমসাময়িককালে খ্রিস্টীয় নবম শতকে (সুখময় মুখোপাধ্যায়) বর্তমান ছিলেন। তারনাথ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্যরূপে দ্বিতীয় ভুসুকুর নামোল্লেখ করেছেন ; দীপঙ্কর এগারো শতকের মধ্যভাগের লোক। দ্বিতীয় ভুসুকুর অস্তিত্ব যথার্থ হলে তিনিও বাঙালি ছিলেন (সুখময় মুখোপাধ্যায়)। তবে বিখ্যাত পণ্ডিতদের উক্তি অনুসারে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্যাপদের ভুসুকু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ভুসুকুর নামে মোট ৮টি চর্যাপদ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে,-- চর্যা নং ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩ এবং ৪৯। আধুনিক বাংলা রূপান্তরসহ ভুসুকুর চর্যাপদগুলো উদ্ধৃত হলো।

রাগ পটমঞ্জরী



কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥

---

১৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ় হি অহি ন পইসই॥

আধুনিক বাংলো॥ কাকে গণে ও কাকে ছেড়ে আমি কিসে আছি? বেষ্টিত হয়ে চারদিকে হাকডাক পড়লো। নিজের মাংসের জন্যই হরিণ (নিজের) শত্রু। ভুসুকু ব্যাধ তাকে ক্ষণমাত্রও ছাড়ে না। চিত্তহরিণ পানাহার করে না। হরিণীর নিবাসও হরিণ জানে না। হরিণী বলে, ওগো হরিণ শুন। এই বন ছেড়ে তুমি ভ্রমণ কবো। ত্বরিত গতিহেতু হরিণের ক্ষুর দেখা গেলো না। ভুসুকু বলেন, মূঢ় ব্যক্তি চিত্তে (তত্ত্ব) প্রবেশ কবে না।

পদটির ভাবার্থ ॥ ভুসুকু নিজেকে ব্যাধ কল্পনা কবে হরিণ শিকারের বর্ণনা দিয়েছেন। চিত্তরূপী হরিণ আর পবনরূপী হরিণীর লীলায় তিনি অনুভব করেন সাধনার গভীর অর্থদ্যোতনা।

রাগ বড়াড়ী

নিসি অন্ধারী মুসা আচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা॥
মার রে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণাগবণা॥
ভব বিন্দারঅ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশক থাতী॥
কাল মুসা উহ ণ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ॥
তাব সে মুসা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদগুরু বোহে করহ সো নিচ্চল॥
জবেঁ মুসা এর আচার তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ॥

আধুনিক বাংলো॥ রাত্রি অন্ধকার, মূষিক চড়ে বেড়ায়। অমৃত-ভক্ষক মূষিক আহার করে। রে যোগি! মূষিক পবনকে মেরে ফেলো। যার দ্বারা আসা-যাওয়া টুটে যাবে। মূষিক ভব বিদারণ করে, গর্ত খনন করে। চঞ্চল মূষিকের গণনা দ্বারা নাশক স্থিতি করো। কালমূষিক, ওর বর্ণ নেই। গগনে উঠে আমন ধান (ক্ষেতে) বিচরণ করে। তাবৎকাল সেই মূষিক উটলপাচল। সদগুরুর কাছে নিশ্চল করো। যখন মূষিকের বিচরণ টুটবে, ভুসুকু বলেন, তখন (সংসার) বন্ধন কেটে যাবে।

রাগ বড়াড়ী

জই তুম্হে ভুসুকু অহেরি জাইবে মারিহসি পঞ্চজনা।
নলিণীবন পইসন্তে হোহিসি একুমনা॥
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল রঅণি।

হণবিণুমাসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহি ণি॥
সদ্‌গুরুবোহেঁ বুঝিরে কাসু কহিনি॥

আধুনিক বাংলা॥ যখন তুমি ভুসুকু মৃগয়ায় যাবে, পঞ্চজনাকে মেরো। নলিনীবনে প্রবেশ করে একমনা হয়ো। জীবন্তে ভোর হলো, রজনী মরলো। হতদের মাংস বিনা ভুসুকু পদ্মবনে প্রবেশ করো না, মায়াজাল প্রসারিত করে মায়াহরিণীকে বধ করলো। সদগুরুর নিকট বুঝলাম কাহার কি ব্যাপার।

রাগ কামোদ

অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোইণী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥
চালিঅ ষষহর মাগে অবধূই।
রঅণহু সহজে কহেই॥
চালিঅ যষহর গউ নিবাণে।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ॥

আধুনিক বাংলা॥ অধ রাত্রিভর কমল বিকশিত হলো। বত্রিশ যোগিনী তাদের অঙ্গ উৎফুল্লতাযুক্ত করলো। শশধর অবধূতিমার্গে চালিত হয়ে সহজানন্দের কথা কইতে লাগলো। চালিত শশধর নির্বাণ পেয়ে গেলো। কমলিনী কমল নালিকায় প্রবাহিত হয়। বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ (হয়)। যে এখানে বুঝে সে এখানে বোধি হয়। ভুসুকু বলেন আমি মিলনের দ্বারা বুঝলাম, অবলীলায় সহজানন্দ মহাসুখ লাভ হয়।

রাগ মল্লারী

করুণা মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বন্দল দলিআ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভূআ।
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ।
জাসু সুনন্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুরে ণিঅ মন দে উলাস॥
বিসঅ বিশুদ্ধে মই বুজ্‌ঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে॥
এ তৈলো এ এত বিসারা।
জোই ভুসুকু ফেড়ই অন্ধকারা॥

আধুনিক বাংলা॥ ভাব ও অভাবদ্বয় দলিত হয়ে করুণা মেঘ নিরন্তর স্ফুরিত হচ্ছে। গগনের মাঝে অদ্ভুত (ভাসে) উদিত হয়েছে। রে ভুসুকু, সহজস্বরূপ দেখ। যাহা শ্রবণান্তে ইন্দ্রিয়জাল বিদূরিত হয়। নিজের মন নিভৃতে উল্লসিত হয়। বিষয়ের বিশুদ্ধিতে আমি আনন্দকে বুঝে, গগনকে যেমন চন্দ্র উজ্জ্বল করে। এ ত্রৈলোক্যে এত বিস্তারিত। যোগী ভুসুকু অন্ধকার বিনাশ করেছেন।

রাগ কহ্নুগুঞ্জরী

আইএ অনুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই সাঁচে কি তা কে বোড়ো খাই॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহ্ন।
অইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি তুটই বাষণা তোরা॥
মরুমরীচি গন্ধনইরী দাপণপড়িবিম্বু জইসা।
বাতাবর্ত্তে সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা॥
বান্ধিসুআ জিম কেলি করই খেলও বহুবিহ খেলা।
বালুআতেলেঁ সসর সিংগে আকাশ ফুলিলা॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী পচ্ছতু সদগুরুপাব॥

আধুনিক বাংলা॥ আদৌ অনুৎপন্ন এ জগৎ ভ্রান্তিবশে প্রতিফলিত হচ্ছে। রজ্জুতে সাপ দেখে যে চমকিত হয় তাকে কি সত্যি বোড়ো সাপে খায়? আশ্চর্য, যোগি রে! তুমি হাত লোনা করো না। এতরূপ স্বভাবে যদি জগৎকে বুঝ, তোমার বাসনা টুটে যাবে, মরু মরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণপ্রতিবিম্ব যেমন, বায়ুর আবর্তে যেমন দৃঢ় হয়ে জল পাথরসদৃশ দৃষ্ট হয়। বন্ধ্যাপুত্র যেমন কেলি করে, বহুবিধ খেলা খেলে। বালুকার তেল, শশধর শৃঙ্গ, আকাশ ফুল। রাউত বলেন আশ্চর্য, ভুসুকু বলেন আশ্চর্য, সকল এইরূপ স্বভাব। যদি তুমি মূঢ় ও ভ্রান্ত থাক, সদ্গুরুচরণে জিজ্ঞেস করো।

রাগ বঙ্গাল

সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলো এ।
খসমসভাবে রে বাণত মুকা কোএ॥
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেড ন জাঅ।
তিন মণ- রঅণা রে সমরসে গঅণ সমাঅ॥
জাসু নাহি অপ্পা তাসু পরেলা কহি।
আই অনুঅণা রে জামমরণ ভাব নাহি॥
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব।
জাই ণ আবই রে ণ তংহি ভাবাভাব॥

আধুনিক বাংলা॥ সহজ মহাতরুতে স্ফুরিত হচ্ছে এই ত্রৈলোক্য। রে গগনোপম স্বভাব। কোন না মুক্ত হয়? যেমন জলে জল টললে ভেদ হয় না তেমনি মনোরত্ন সমরসে গগনে প্রবেশ করে। যার আত্মা নেই তার পরবোধ কেমন করে হবে। আদৌ অনুৎপন্ন রে জন্মমরণভাব নেই। ভুসুকু বলেন আশ্চর্য, রাউত বলেন আশ্চর্য, সকল এই স্বভাব। যায় না, আসে না, রে তাতে ভাব অভাব নেই।

রাগ মল্লারী

বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।

নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥
দহিঅ পঞ্চ ধাটণী ইংদিবিসআ ণঠা।
ণ জানমি চিঅ মোব কহিঁ গই পইঠা॥
সোনত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ॥
চউ কোড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥

আধুনিক বাংলা॥ পদ্মাখালে বজ্রা নৌকা ফেলে বাইতে লাগলাম। অজয় বঙ্গালে ক্লেশ লুটালাম। আজ ভুসুকু বাঙ্গালি হলো। নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী নিলে। পঞ্চ বিঢবণ দগ্ধ করে ইন্দ্রিযবিষয় নষ্ট করলাম। জানি না চিত্ত আমার কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট হলো। শূন্যতা রূপ কিছুই আমার থাকলো না। নিজ পরিবাবে মহাসুখে থাকি। চতুষ্কোটি ভাণ্ডার আমাব নিয়ে শেষ কবেছে। জীবনে মবণে বিশেষ নেই।

কাহ্নপাদ/কানুপা/কৃষ্ণাচার্য॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয থেকে প্রকাশিত 'বাংলাব ইতিহাস' ১ম খণ্ডে বলা হযেছে মেহেবকুলের বাজা গোপীচন্দ্রের বাজত্বকাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষ পর্যায়। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে চৈনিক পবিব্রাজক I-tsing তাঁর 'ভারত ভ্রমণেব বিবরণে' লিখেছেন ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ভর্তৃহবিব মৃত্যু ঘটে। হিন্দি ও তিব্বতি ঐতিহ্যে এক ভর্তৃহরিকে রাজা গোপীচন্দ্রেব মাতুল বলা হযেছে। ইনিই সম্ভবত I-tsing বর্ণিত ভর্তৃহরি। কাহ্নপাদ ছিলেন নাথপন্থী যোগী জালন্ধরীপা বা হাড়িপাব শিষ্য। তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তাবনাথ বলেছেন জালন্ধবী রাজা ভর্তৃহবিব দীক্ষাগুরু। তিনি রাজা গোপীচন্দ্রেবও দীক্ষাগুরু ছিলেন। এইসব দিক বিচাব করে বাজা গোপীচন্দ্রের সময় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের চতুর্থপাদ হলে গোপীচন্দ্র ও ভর্তৃহরিব দীক্ষাগুরু জালন্ধরীপা সপ্তম শতকের দ্বিতীযার্ধে হবেন।[১৫] অতএব জালন্ধরী- শিষ্য কাহ্নপাদের সময়ও আমরা ৬৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধরতে পাবি। তিব্বতি ঐতিহ্যমতে কাহ্নপাদ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন, পবিণত বয়সে তাঁর নিবাস হয় সোমপুবী বিহাব। বাহুল সাংকৃত্যায়নেব মতে কাহ্নব জন্মস্থান কর্ণাট। বর্ণে তিনি ব্রাহ্মণ তবে তিনি ভিক্ষু ও সিদ্ধাচার্য হিসেবে বেশি পবিচিত। কাহ্নপার বংশধরদেব মধ্যে অনেকে যেমন সরহ, ধর্মপাদ, ধেতন, মহীপাদ প্রমুখ চর্যাব পদকার হিসেবে খ্যাত।[১৬] কাহ্নপার নামে প্রণীত গ্রন্থ,—'গীতিকা', 'মহাঢুণ্ঢন', 'বসন্ততিলক', 'বজ্রগীতি' ও 'দোহাকোষ'। তিনি সর্বাধিক চর্যাগীতির রচযিতা; মোট ১৩টি, যথা—৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২ ও ৪৫ সংখ্যায় চিহ্নিত চর্যাপদ তাঁব বচিত। প্রায় প্রতিটি পদেই বিভিন্ন উপমা ও রূপকের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সত্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। নিম্নে তাঁর পদগুলো অনুবাদসহ উদ্ধৃত হলো।

---

১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৮২), পৃ. ৩৭

১৬. পূর্বোক্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বৌদ্ধগান ও দোহা', পৃ. ২৫

রাগ পটমঞ্জরী

আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমণা ভইলা॥
কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মণ গোঅর সো উআস॥
তে তীনি তে তীনি তীনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ন ভব পরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা॥
অবণাগবণে কাহ্ন বিমণা ভইলা॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিণউর বট্টই।
ভণই কাহ্ন মোহিঅহি ণ পইসই॥

আধুনিক বাংলা॥ লোকজ্ঞান ও লোকাভাসের দ্বারা পথ অবরুদ্ধ হইলো। তা দেখে কাহ্ন বিমর্ষ হলেন। কানু, তুই কোথায় গিয়ে বাস করবি? যা মনগোচর তাই উদাসীন। তারা তিন, তারা তিন (স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, কাহ্নপাদের মতে কায় বাক চিত্ত), এই তিন ভিন্ন। কাহ্ন বলছেন আমি ভবকল্পজ্ঞান বঞ্চিত। যারা যারা এসেছিলেন, তারা তারা চলে গেলেন। সংসারচক্রের গমনাগমনে কাহ্ন বিমনা হলেন। তার নিকটে জিনপুর বা মহাসুখপুর উপস্থিত দেখে কাহ্ন বলছেন, মোহের জন্য প্রবেশ করতে পারছি না অথবা হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারছি না।

রাগ পটমঞ্জরী

এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবীতা॥
জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিসঅ॥
ছড়গই সঅল সহাবে সুধ॥
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ॥
দশবল রঅণ হরিঅ দশ দিসেঁ।
বিদ্যা করি দমকু অকিলেসেঁ॥

আধুনিক বাংলা ॥ চন্দ্র, সূর্য অথবা দিবারাত্রিরূপ দৃঢ় স্তম্ভদ্বয় ভগ্ন করে নানাবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করে আসব (মদমত্ত) মত্ত কৃষ্ণাচার্য সহজ নলিনীবনে প্রবেশ করে বিলাস করছেন। যেরূপে হস্তী হস্তিনীর প্রতি আকর্ষিত হয়, সেরূপে তথতা (শূন্যতা) মদগল বর্ষণ করছে। ষড়্গতিকা অথবা ষড়গতিকা (সমগ্র প্রাণীজগৎ) সকল স্বভাবতঃই শুদ্ধ। ভাব এবং অভাব কেশাগ্র পরিমাণও অশুদ্ধ নয়। দশবলরত্ন দশদিকে বিস্তৃত। অবিদ্যারূপ করীকে অনায়াসে দমন কর।

রাগ দেশাখ

নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাম্‌হণ নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ॥
এক সো পদুমা চউসট্‌ঠী পাখুড়ি।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বি বাপুড়ি।
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহেরি নাবেঁ।
তান্তি বিকণহ ডোম্বি অবর ণা চাঙ্গিড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া॥
তুলো ডোম্বি হাউ কাপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বি খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

আধুনিক বাংলা॥ ডোম্বি, নগরের বাইরে তোমার কুটির। তুমি মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে করে যাও। ওলো ডোম্বিনী, আমি তোমার সাথে মিলিত হবো অথবা তোমার সঙ্গসুখ অনুভব করবো। কাপালিক কৃষ্ণাচার্য নিঘৃণ উলঙ্গ যোগী। একটি পদ্ম, তাতে চৌষট্টি পাপড়ি। ডোম্বি ও বাহুড়ি তাতে চড়ে নৃত্য করে। ওগো ডোম্বি, তোমাকে আমি স্বরূপে জিজ্ঞেস করি, তুমি কার নৌকায় আসা-যাওযা কর? ডোম্বি, তুমি তন্ত্রীয় আবৃত চাঙ্গাড়ি ত্যাগ কর। আমি তোমাব জন্য নটের পেটিকা পরিত্যাগ করি। তুমি ডোম্বি, আমি কাপালিক ; তোমার জন্য আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করেছি। ডোম্বি (অবিদ্যারূপিণী) তুমি সরোবর ভেঙে মৃণাল ভক্ষণ কর। আমি তোমাকে (অবিদ্যারূপিণী ডোম্বিকে) মারবো ; তোমার প্রাণ সংহার করবো।

রাগ পটমঞ্জরী

নাড়ি শক্তি দিঢ় ধরিঅ খাটে।
অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে॥
কাহ্ন কাপালী জোই পইঠ আচারে।
দেহ নঅরী বিহরই একাকারেঁ॥
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে॥
রাগ দেস মোহ লইআ ছার।
পরম মোহ লভএ মুত্তিহার॥
মারিঅ সাসু ননন্দ ঘরে সালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইল কবালী॥

আধুনিক বাংলা॥ নাড়িশক্তি দৃঢ়রূপে শূন্যে ধারণ করি। অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজছে। কাপালিক যোগী কৃষ্ণাচার্য দেহরূপ নগরীতে একাকারে বিহার করে যোগাচারে প্রবিষ্ট হয়েছেন। লোকজ্ঞান ও লোকাভাস চরণের ঘণ্টা এবং নূপুর রবিশশীকে কর্ণে কুণ্ডল করা

হয়েছে। রাগ, দ্বেষ, মোহকে ভস্মীভূত করে মুক্তাহার রূপ মহামূল্য পরম মোক্ষ লাভ করে। শ্বাসরোধ করে, জ্ঞান-ইন্দ্রিয় সকলকে অবরুদ্ধ করে, অবিদ্যারূপ মায়াকে হত্যা করে কৃষ্ণাচার্য কাপালিক হয়েছেন।

রাগ ভৈরবী

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥
ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআবি উএসেঁ কাহ্ন ণিঅড জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরে তোড়িআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ করিআ ভববল জিআ॥
ভণই কাহ্ন আম্‌হে ভাল দান দেহুঁ।
চউসটঠী কোঠা গুণিয়া লেহুঁ॥

আধুনিক বাংলা॥ করুণাময় চিত্তকে পীঠরূপে (বা ছককাপে) পরিণত করে নববল (চতুর্থানন্দ বল) খেলছে। সদগুরু উপদেশে ভববল জয় করা হয়েছে। ঠাকুরকে চালনা করে আভাসদ্বয় দূর করলাম। উপকারীর উপদেশে কৃষ্ণাচার্য জিনপুরের নিকটবর্তী হয়েছেন। প্রথমেই বড়িয়াগুলোকে সবলে প্রহার করেছি। গজবরের দ্বারা পাঁচজনকে (পঞ্চবিষয়গত অহঙ্কার) নির্মদ (ঘায়েল) করেছি। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে নিবৃত্ত ও অবশ করে (অচিন্ত্যতায় লীন করে) ভববল জয় করা হয়েছে। কৃষ্ণাচার্য বলেন,--আমি ভাল দান দেই। চৌষট্টি ঘর গুণিয়া লই।

রাগ কামোদ

তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী।
নিঅ দেহ করুণা শূণমে হেরি॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইণা।
মাঝ বেণী তরঙ্গম মুনিআ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥
গন্ধপরসরস জইসো তইসো।
নিংদ বিহূনে সুইণা জইসো॥
চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিনা কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥

আধুনিক বাংলা॥ ত্রিশরণকে (বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ) নৌকা করে অষ্টসিধ্‌কে (আট রকম) ধ্বংস করি। নিজের দেহে করুণা ও শূন্যতাকে (শূন্যতাকে নারীরূপে তুলনা দেওয়া হয়েছে) দেখি। মায়া স্বপ্নরূপ করে ভব জলধি পার হই। মধ্যমায় মনোরম সুখের তরঙ্গ আমি (অনুভব করি)। পঞ্চ তথাগতকে দাঁড় করিয়ে কৃষ্ণাচার্য কায়ানৌকা বেয়ে মায়াজাল হতে

উত্তীর্ণ হচ্ছেন। নিদ্রাবিহীনে স্বপ্নবৎ অলীক গন্ধ স্পর্শ রস যেমন আছে তেমনই থাকুক। চিত্তকে কর্ণধার করে কৃষ্ণচার্য শূন্যতামার্গে মহাসুখ সঙ্গমে চললেন।

রাগ গউড়া

তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহলীলেঁ॥
কইসণি হালো ডোম্বি তোহোরি ভাভরি আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝেঁ কাবালী॥
তঁইলো ডোম্বি সঅল বিটালিউ।
কাজ্জণ কারণ সসহর টালিউ॥
কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজণ লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলই॥
কাহ্নে গাই তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বি তো আগলি নাহি ছিণালী॥

আধুনিক বাংলা॥ তিন ভুবন (কায় বাক চিত্ত) আমার দ্বারা অবহেলায় বাহিত হলো। আমি মহাসুখলীলায় শয্যা গ্রহণ করলাম। ওগো ডোম্বিনী, তোমার চতুবালী কেমন, (তোমার) বাহিবে কুলীন জনেবা (যাবা বস্তুজগতে বা রূপাদি বিযযে লীন থাকেন) আর মধ্যখানে কাপালী (যাদেব চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে)। ডোম্বিনী, তুমি সকল অশুচি কবেছো। কার্যকারণের হেতুস্বরূপ শশধবকে বিনষ্ট কবেছো। কেউ কেউ তোমাকে বিরূপ বলেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ তোমাকে কণ্ঠ হতে পবিত্যাগ করেন না। কৃষ্ণাচার্য গান, তুই কর্মচতুরা চণ্ডালিনী, ডোম্বিনী হতে অধিক ছিনালী নেই।

রাগ ভৈরবী

ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি করণ্ডকশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।
ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥
অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাই।
জোইণি জালে রঅণি পোহাই॥
ডোম্বি-এর সঙ্গে জো জোই রত্ত।
খণহ ন ছাড়অ সহজ উন্মত্ত॥

আধুনিক বাংলা॥ ভব নির্বাণকে পটহ মাদল এবং মন পবন দুটিকে করণ্ড ও কশাল করে, জয় জয় দুন্দুভী শব্দ উত্থিত করে কৃষ্ণাচার্য ডোম্বি বিযে করতে যান। ডোম্বিকে বিয়ে করে জন্ম নাশ করলেন; এবং যৌতুক স্বরূপ অনুত্তর ধাম (সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়) লাভ করলেন। দিবা ও রাত্রি সুরত প্রসঙ্গে যায় এবং যোগিনীসমূহ পরিবৃত হযে (জোনাকি দল পরিবৃত হয়ে) রজনী প্রভাত হয়। যে যোগী ডোম্বিনীব প্রতি অনুরক্ত সে সহজানন্দ উন্মত্ত, তাকে ক্ষণকালের জন্য ছাড়ে না।

জইসে চান্দ উইআ হোই।
চিঅরাঅ অইসে সোহিঅই॥
মোহমল গুরু উএসে জাই।
আঅত্তণ ইন্দী গঅণ সমাই॥
খসম বীঅ জা খসমে জাই।
নিঅ রাখহু তিহুঅন ছাঅ বিছাই॥
সূজ উএলা জিম রাতি পোহাই।
ভব সমুদা মোহ তিম অবসরি জাই॥
হংস বাঅ জিম পাণী লেই।
ভব অহারি এহু কাহ্নে গাই॥

আধুনিক বাংলা॥ যেরূপে চন্দ্র (শূন্য গগনে) উদিত হয়, সেরূপ চিত্তরাজ (শূন্যতা বা তথতায়) শোভা পায়। গুরুর উপদেশে ভববিকল্প জ্ঞান দূরীভূত হয়। আয়তন ইন্দ্রিয় গগনে প্রবেশ করে। শূন্যতার বীজ শূন্যতায় লীন হয়। নিজবৃক্ষ থেকে ত্রিভুবনে ছায়া বিস্তার করে। সূর্য উদিত হলে যেমন রাত্রি প্রভাত হয়, তেমনি ভবসমুদ্রের মোহ অপসৃত হয়ে যায়। রাজহংস যেরূপ জলত্যাগ করে, সেইরূপে ভববিকল্প জ্ঞান বিনষ্ট করে, কৃষ্ণাচার্য এখানে গাইছেন।

রাগ পটমঞ্জরী

সূণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅল অহারী।
ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা।
সহজ নিন্দালু কাহ্নিলা লাঙ্গা॥
চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা॥
স্বপণে মই দেখিল তিহুবণ সূণ।
ঘোরিঅ অবণা গমণ বিহুণ॥
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ।
পাসি ণ চাহই মোরে পাণ্ডি আচাএ॥

আধুনিক বাংলা॥ তথতা শূন্যতার আঘাতে আমার বাসস্থান অথবা বাসনাগার শূন্য। মোহ ভাণ্ডার সকল নাশ করেছি। আত্মপর ভেদশূন্য হয়ে ঘুমে অচেতন হয়েছি। কৃষ্ণাচার্যের মোহমুক্ত মন সহজ নিদ্রায় নিদ্রিত। চেতনা ও বেদনাশূন্য চিত্তে তিনি ঘুমে বিভোর হলেন। সকল মুক্ত করে অথবা নিঃশেষে দান করে কৃষ্ণাচার্য সুখে নিদ্রা গেলেন। আমি স্বপ্নবৎ ত্রিভুবন শূন্য দেখলাম। ঘৃণাচক্র গমনাগমন বিহিন হলো। আমি জালন্ধরীপাকে সাক্ষী করবো। আমার পার্শ্বমুক্ত অবস্থা পণ্ডিতাচার্যেরা দেখেন না।

রাগ মালসী গবুড়া

জো মণ গোঅর আলা জালা।
আগম পোথী ইষ্টমালা॥

ভণ কইসেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমাঅ॥
আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্ পথাতীত কহিব কীস॥
জে তেঁই বোলী তে তবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥
ভণই কাহ্নু জিণ রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

আধুনিক বাংলা॥ যা কিছু মনের গোচর, যা কিছু আগম পুথিমধ্যে বিবৃত (হইয়াছে) সে সবই মিথ্যা মায়া। বল, কায় বাক চিত্ত যাতে প্রবেশ করে না, তার স্বরূপ কি প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়? গুরু শিষ্যকে বৃথা উপদেশ দেন, যা বাক্যাতীত তা কি প্রকারে বলবেন? যিনি তা বলবেন, সকলই অসত্য প্রতিপন্ন হবে। গুরু বোবা, শিষ্য কালা (বধির) এই উপলব্ধিই সত্য। কৃষ্ণাচার্য বলেন জিনরত্ন বিকশিত হয়ে আছে। বধিরকে যেমন বোবা সম্বোধিত করেন (অর্থাৎ সদগুরু যেমন শিষ্যকে স্বীয় শক্তিবলে সহজানন্দের দিকে পরিচালিত করেন)।

রাগ কামোদ

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিন তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগ তরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তে ন দেখই॥
ভব জাই ণ আবই এথু কোই।
অইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই।

আধুনিক বাংলা॥ সহজ শূন্যতায় (আমার) চিত্ত (স্বভাবতই) পূর্ণ। (আমার) স্কন্ধ বিয়োগে বিষণ্ণ হইও না। কৃষ্ণাচার্য নেই, তুমি কিরূপে তা বল। সে ত্রৈলোক ব্যাপ্ত হয়ে অনুদিন বিহার করছে। মূর্খেরা দৃষ্ট বস্তুকে নষ্ট দেখে কাতর হয়। ভগ্ন তরঙ্গ কি সাগর শোষণ করে? মূর্খেরা লোকসকল প্রত্যক্ষ করে না। (যেমন) দুধের মাঝে সর আছে তা চোখে পড়ে না। ভব থেকে কেউ চলে যায় না, এখানে কেউ আসেও না, এভাবে কাহ্নিল যোগী বিলাস করছেন।

রাগ মল্লারী

মণ তরু পাঞ্চ ইন্দ্রি তসু সাহা।
আসা বহল পাত ফলবাহা॥
বরগুরু বঅণ কুঠারেঁ ছিজ্জঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজ্জঅ॥

বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।
জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই॥
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥

আধুনিক বাংলা॥ মন রূপ তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা। আশাবহুল পত্রফলবাহক। বস্তুগুরুবচন রূপ কুঠার দ্বারা ছেদন কর। কৃষ্ণাচার্য বলেন, তরু পুনরায় জন্মাবে না। শুভাশুভ জলে সেই তরু বৃদ্ধি হয়। বিদ্বান জন গুরুকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করে ছেদন করবেন। যে তরুকে ছেদন-ভেদন করতে জানে না, সে (মোক্ষমার্গ হতে) সবে পড়ে ভবকে মেনে নেয়। শূন্য তরুবর গগন কুঠার, সেই তরু ছেদন, যার মূলও থাকে না, ডালও থাকে না।

কুক্কুরীপা॥ রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে কুক্কুরীপা রাজা দেবপালের সময় (আনুমানিক ৭৭০ ৭১০ খ্রিঃ) বর্তমান ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান কপিলাবস্তু এবং বর্ণে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত অনুসারে তিনি বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন। লামা তারনাথ বলেন, লুম্বিনী বনে এক রমণীর কাছে কুক্কুরীপা মহামুদা সিদ্ধিলাভ করেন ; সেই রমণী পূর্বজন্মে কুক্কুরী ছিলেন বলে কথিত। 'যোগ-ভাবানুপদেশ' ও 'স্বর-পরিচ্ছেদন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। কুক্কুরীপার নামে যদিও দুটি গান পাওয়ার কথা বলা হয়েছে[১৭] পরে আর একটি পদ উদ্ধার করা হয়। সেই সুবাদে ২, ২০ এবং ৪৮ সংখ্যক পদ কুক্কুরীর রচনা।[১৮] যেমন,—

রাগ গবড়া

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইড়।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহি সমাইড়॥

---

১৭. গোপাল হালদার, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড (কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি., ২য় সং. ১৩৬৩), পৃ. ২৫

১৮. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (কলিকাতা : ৫ম সং. ইস্টার্ন পাবলিসার্স, ১৯৭০), পৃ. ৬৯

আধুনিক বাংলা॥ দুলি (মহাসুখকমল) দোহন করে পিটা (পীঠে) ধরা যায় না। বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খায়। ওগো বিআতী (বাদ্যধরী), শ্রবণ করো, ঘরের মধ্যে অঙ্গন। অর্ধরাতে কানেট (সহজানন্দরূপ) চোরে নিল। শ্বশুর নিদ্রা গেলো, বধূ জেগে আছে। কর্ণাভরণ চোরে নিল, কোথায় গিয়ে খোঁজ করবো। দিবাভাগে বউ কাকের ভয়ে ভীত হয়, রাত্রিবেলা কাম সেবায় (মহাসুখচক্রে) যায়। এরূপ চর্যা কুক্কুরীপাদে গায়, কোটি জনের মধ্যে কেবল একজনের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

রাগ পটমঞ্জরী

হাঁউ নিরাসী খমণভতারি।
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই॥
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউরি চাহি।
জা এথু চাহাম সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপুড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া॥
জাণ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা।
মূল নখলি বাপ সংঘারা॥
ভণথি কুক্কুরীপা এ ভব থিরা।
জো এথু বুঝই সো এথু বীরা॥

আধুনিক বাংলা॥ আমি আসঙ্গরহিতা (দেবী নৈরাত্মা)। আমার মন শূন্য ভর্তা। আমার সুখের অনুভব বলা যায় না। ওগো মা, অন্তঃপুরের দিকে তাকিয়ে (বিষয়াদি) দূরীভূত করলাম। যা এখানে (বাহ্যরূপে) দেখা যায় তা এখানে (অন্তঃপুরে) নেই। প্রথম বিয়ান (প্রসূত হয়েছে) আমার বাসনাপুট। নাড়ি বিচার করলে সেই বাপুড়া। আমার জ্ঞান ও যৌবন পূর্ণ হলে মূল দেখলাম ; জনক সংহার করলাম। কুক্কুরীপাদ বলেন এই ভব স্থির। যিনি (তত্ত্ব) এ বোঝেন, তিনি তাতে বীর হয়েছেন।

উদ্ধারকৃত পদটি,—

কুলিশ—ভর-নিদ বিআপিল।
সমতা জোএ মগুল সঅল॥
বিষয় ইন্দিপুর সব জিতেল।
শুনবাঅ মহাসুহে ভইল॥
তূর শাঙ্খ ধনি অনহা গাজই।
মোহ ভববল দূরে ভাজই॥
সুই-নঅরী এ লই, আগ থাতি।
আঙ্গুলি উভ তোলি কুক্কুরীপা ভণথি॥
এ তৈলোএ মহাসুহেঁ লইঅ।
অথ নিনাদেঁ কুক্কুরীপাএ কহিঅ॥

ভাবার্থ॥ পররাজ্য আক্রমণ ও জয়ের উৎপ্রেক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সহজ সাধনার সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এখানে।

মীনপা॥ মীনপাথ অন্য যেসব নামে চিহ্নিত, সেগুলো হলো মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মচেন্দ্রপাদ ও মোচ্ছন্দর। ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভী মনে করেন, মীননাথ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরেন্দ্রদেবের রাজত্বকালে নেপালে আগমন করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও মনে করেন মীননাথ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। 'কৌলজ্ঞান' গ্রন্থ অনুসারে মীননাথ চন্দ্রদ্বীপবাসী ছিলেন ; বরিশালকে এক সময় চন্দ্রদ্বীপ বলা হতো। তিব্বতি ঐতিহ্যে নাথপন্থার আদিগুরু মীননাথ সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্প প্রচলিত আছে। একটি বৃত্তান্তে বলা হয়েছে, মীননাথ পূর্বভারতের কামরূপবাসী একজন ধীবর ছিলেন। ব্রহ্মনদে একদা তিনি একটি মৎস্যের উদরস্থ হন। মৎস্যের উদরে থাকাকালীন একদিন তিনি কামরূপ কামাখ্যার উমাগিরি পর্বতে শিব কর্তৃক উমাকে প্রদত্ত গভীর তত্ত্বকথা শ্রবণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধাচার্য অবস্থায় পরে তিনি নেপাল ভ্রমণ করেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন মীননাথই বাংলা ভাষার আদি কবি, সুতরাং তাঁর ভাষাই প্রাচীন বাংলার প্রথম নিদর্শন। তাঁর রচিত 'বাহ্যান্তর বোধিচিত্ত বন্ধোপদেশ' নামীয় গ্রন্থের সন্ধান মেলে। চর্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের টীকায় মীননাথের নামে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে তা হলো,—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ॥
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা॥

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আধুনিক বাংলায় পদটি রূপান্তরিত করেছেন,—

কহেন গুরু পরমার্থের বাট।
কর্মের রঙ্গ সমাধির পাট॥
কমল বিকশিত, কহিও না জোংড়াকে (শামুককে)।
কমলমধু পান করিতে ক্লান্ত হয় না ভোমরা॥

পদটিতে গুরু কর্তৃক কমলমধু সদৃশ পরমার্থ শিক্ষাদানের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

বীণাপা॥ বীণা তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিলো, সেজন্য তিনি বীণাপা। তিব্বতি ঐতিহ্যমতে তিনি বিরূপার বংশধর। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, বীণাপা খ্রিস্টীয় নবম শতকের লোক, বর্ণে তিনি ক্ষত্রিয় এবং তাঁর গুরুর নাম বুদ্ধবাদ। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে বীণা দশম শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি ভদ্রপা বা ভাদেপার শিষ্য। ১৭ নং চর্যা তাঁর রচিত। পদটি নিম্নরূপ,—

রাগ পটমঞ্জরী

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা।
সুনতান্তিধনি বিলসই রুণা।
আলি কালি বেণি সারি সুণিআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥

জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিশ তান্তিধনি সঅল বিআপিউ॥
নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই॥

আধুনিক বাংলা॥ সূর্য হলো লাউ এবং শশী তন্ত্রীসংলগ্ন হলো। অনাহত দণ্ডে অবধূতিকে একীভূত করা হলো। ওলো সখি ! হেরুকবীণা বাজছে। শূন্যতা তন্ত্রীধ্বনি রুনু রুনু শব্দে বিলসিত হচ্ছে। আলি ও কালির বেণির স্বর শুনে গজবর সমরসকে সন্ধি গণ্য করলাম। যখন করহকলে (সকলকে) চেনে ধরে, তখন বত্রিশ তন্ত্রধ্বনি সকলকে ব্যাপ্ত করলো। বজ্রধর নাচেন, দেবী গান করেন। বুদ্ধ নাটক বিশ্রাম (নির্বাণ) হন।

লক্ষণীয় যে চর্যাপদটিতে বীণাপার কোনো ভণিতা নেই, তবে তৃতীয় ছত্রে 'হেরুঅবীণা' কবির নাম নয়, এর দ্বারা বীণাপাদক হেরুককে বোঝানো হয়েছে। ভাবার্থে অধ্যাত্ম অনুভবের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মহীধরপা॥ নামান্তরে মহিল, মহিলা, মহিত্ত, মহিন্তা। কাহ্নপার শিষ্যরূপে তিনি চট্টগ্রাম যান। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে মহীধর নারায়ণ পালের রাজত্বকালে (৮৫৯-৯০৮) আবির্ভূত হন। বর্ণে তিনি শূদ্র, জন্মস্থান মগধ। তাঁর গ্রন্থ 'বায়ুতত্ত্বগীতিকা' ও 'দোহাকোষ গীতিকা'। ১৬ নং চর্যা তাঁর রচিত।

তিনিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহকসণ ঘণ গাজই।
তা সুনিমার ভয়ঙ্কর রে বিসঅ মণ্ডল সঅল ভাজই॥
মাতেল চীঅগএন্দা ধাবই।
নিরন্তর গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই॥
পাপপুন্নবেণি তোড়িঅ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণ॥
গঅণটাকলি লগিরে চিত্ত পইঠ নিবাণ॥
মহারসপানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিসঅ নায়ক রে বিপখ কোবি ন দেখি॥
খররবিকিরণ সন্তাপেঁ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্ত ; মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা॥

আধুনিক বাংলা॥ তিন পাটে লগ্ন হলো, অনাহত ধ্বনি ঘন ঘন গর্জন করে। তা শুনে ভয়ঙ্কর মার, ওরে, বিষয়মণ্ডলসকল ভগ্ন হলো। মত্ত চিত্তগজেন্দ্র ধাবিত হয়, নিরন্তর গগনপ্রান্তে তৃষ্ণায় ঘূর্ণিত হয়। পাপপুণ্য দুই শিকল ছিন্ন করে, স্তম্ভস্থান মর্দিত করে, গগনে সংলগ্ন হয়ে চিত্ত নির্বাণে প্রবেশ করলো। ওরে, মহারসপানে মাতাল হলো, ত্রিভুবন সকল উপেক্ষা করলো। ওরে, পঞ্চবিষয়ের নায়ক কোনো বিপক্ষদল দেখলো না। প্রখর রবিকিরণ সন্তাপে সে গগনাঙ্গনে গিয়ে প্রবেশ করলো। মহিত্ত বলেন, আমি এখানে ডুবে কিছুই দেখি না।

ঢেণ্ঢণপাদ॥ রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তাঁর জীবৎকালের উর্ধ্বসীমা ৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ। ঢেণ্ঢণ বা ধেতনের জন্মস্থান উজ্জয়িনীর অবন্তিপুর, বর্ণে তিনি তাঁতী ছিলেন। 'চতুর্যোগ ভাবনা' গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। ৩৩ সংখ্যক পদটি তাঁর রচিত।

রাগ পটমঞ্জরী

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামাঅ।
বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে
পিঠা দুহিঅ এ তিনা সাঝে॥
জো সো বুধী সোধ নিবুধী।
জো সো চৌব সোই সাধী॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝঅ।
ঢেন্ঢণপাএব গীত বিচবিলে বুঝঅ॥

আধুনিক বাংলা॥ টালেতে (মহাসুখচক্রে) আমাব ঘর, প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই, নিত্য (নৈরাত্মরূপে) আসে। অঙ্গহীন সংসাব বেড়ে যায়। দোহান দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে। বলদ বিয়ালো, গাই বন্ধ্যা হলো। পিটা (আধাবরূপ মহাসুখচক্র) এ ত্রিসন্ধ্যা দোহন করি। যে সেই বুদ্ধিবান, সেই নির্বোধ। যে সেই চোব, সেই সাধু। নিত্য নিত্য শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ঢেন্ঢণপাদের গীত বিচরণশীল হলে বোঝা যায়।

তাড়কপাদ॥ তাড়কের আভিধানিক অর্থ 'খুনী, ফাঁসুড়ে'।[১৯] এটি সম্ভবত তাড়কের ছদ্মনাম। তিব্বতী ঐতিহ্যে তাড়ক সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। ৩৭ নং পদ তাঁর রচিত। তাঁর পদ,

রাগ কামোদ

অপণে নাহি সো কাহেবি শঙ্কা।
তা মহামুদেবী টুটি গেলি কংখা॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই।
চৌকোটিবিমুকা জইসো তইসো হোই॥
জইসনে অছিলে স তইসন অচ্ছ।
সহজ পিথক জোই ভান্তি মা হো বাস॥
বাণ্ডকুরুণ্ড সন্তারে জাণী।
বাকপথাতীত কাঁহি বখাণী॥
ভণই তাড়ক এথু নাহি অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস॥

আধুনিক বাংলা॥ আপনি, সে নেই, (সুতরাং) কিসের শঙ্কা। মহামুদ্রা আকাঙ্ক্ষা, তাও টুটে গেলো। রে যোগি, সহজ অনুভবকে ভুলো না। চতুষ্কোটিভাববিমুক্ত, (আমি) যেমন তেমনই হই। যেমন ছিলে, তেমনই আছ। সহজ বস্তু পৃথক, ভ্রান্তিতে বাস করো না। (নদী

পারাপারের সময়) বাঁটুয়া ও কবণ্ড জেনে নেয়। বাকপথের অতীত, কেমন করে ব্যাখ্যা করবে। তাড়ক বলে, এতে অবকাশ নেই। যে বোঝে তার গলায় গলপাশ (বাঁধা)।

গুণ্ডরীপা।। দেবপালের রাজত্বকালে (৮৪০ খ্রিঃ) আবির্ভূত হন, জন্মস্থান তিশুনগর, বর্ণে লোহার বা কর্মকার। তবে তিব্বতি ঐতিহ্যে তাঁর নাম নেই। ৪ নং চর্যার রচয়িতা তিনি।

রাগ অরু

তিঅড্ডা চাপী জোনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টি করহঁ বিআলী।।
জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।।
খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ।।
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ্জ বেণি পখা ফাল।।
ভণই গুণ্ডরী অহ্মে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ নারী মাঝেঁ উভিল চীরা।।

আধুনিক বাংলা।। নাড়ীত্রয়ে চেপে যোগিনী অঙ্কবালী (আলিঙ্গন) দান করে। কমল ও কুলিশ ঘেটে বিকল কর। যোগিনী, তোমাকে ছেড়ে আমি ক্ষণমাত্রও বাঁচবো না। তোমার মুখ চুম্বন করে আমি কমলরস পান করবো। ক্ষিপ্ত যোগিনী অবলিপ্তা হয় না। মণিকুল বেয়ে উড্ডীয়ানে প্রবেশ করে। শাশুড়ীকে ঘরে বদ্ধ করে তালাচাবি দাও। চন্দ্র সূর্য দুই প্রবাহ ছিঁড়ে ফেলো। গুণ্ডরী বলে, আমি সুরত ক্রিয়ার বীর হয়েছি। নরনারীর মধ্যে ঊর্ধ্বলোকবাসী যোগীদের বল্কলখণ্ড ধারণ করেছি।

চাটিলপা।। চাটিল সম্পর্কে সব পণ্ডিতই অনুমানে মন্তব্য দিয়েছেন ; কেননা তাঁর জীবনেতিহাস অজ্ঞাত। চর্তুদশ শতকে জ্যোতিরেশ্বর ঠাকুর রচিত 'বর্ণরত্নাকরে' চাটিলের নামটি পাওয়া যায়।[২০] ৫ নং চর্যা তাঁর রচিত।

রাগ গুর্জরী

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝে ন থাহী।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই।।
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
অদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোরিঅ।।
সাঙ্গমতে চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।

২০. আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪

নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামি।
পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তরসামী॥

আধুনিক বাংলা॥ ভবনদী গহন, অত্যন্ত বেগে প্রবহমান। এর দুই তীর পিচ্ছিল, মধ্যদেশে থই পাওয়া যায় না। ধর্ম সাধনার জন্য চাটিল সাঁকো নির্মাণ করলেন। পারগমনে ইচ্ছুক লোক নির্ভয়ে উত্তীর্ণ হয়। মোহতরু চিরে ফেলে পাটের (বোধিচিত্তের নিবাসস্থল) সঙ্গে জোড় দাও। অদ্বয়রূপ দৃঢ় কুঠারে নির্বাণ খনন কর। সাঁকোতে চড়লে ডান কিংবা বামমুখি হয়ো না। নিকটেই বোধি রয়েছে, দূরে যেও না। যদি, ওগো লোকসকল, তোমরা পারগামী হবে, তবে অনুত্তরস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা করো।

জয়নন্দী॥ তিনি জঅনন্দি ও জয়ানন্দ নামেও পরিচিত। জয়নন্দীর কাল অজ্ঞাত। তাঁর সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে তিনি বাংলাদেশের কোনো এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। ৪৬ সংখ্যক চর্যা তাঁর রচিত। পদটি হচ্ছে,--

রাগ শবরী

পেখু সুঅণে অদশে জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা॥
মোহবিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা॥
নউ দাঢ়ই নউ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ লোঅ মোহে বলি বলি বাঝই॥
ছাআ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা॥
চিঅ তথতা স্বভাবে যোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড়অ ণ হোই॥

আধুনিক বাংলা॥ দর্পণে দেখা ছায়া যেন অন্তরে ভাবমোহের প্রতিফলন। যখন মন মোহমুক্ত হবে তখন গমনগমন তিরোধান করবে। (মোহে বদ্ধ চিত্তকে) দগ্ধ করতে পারা যায় না। কিংবা জলসিক্ত করা যায় না ; তবু (মূর্খরা) ছায়ার মায়ায় আবদ্ধ থাকে। পক্ষাপক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে বিজ্ঞান। তথতাস্বভাবে (অর্থাৎ সর্বাংশে শুদ্ধতা দ্বারা) চিত্ত শোধিত হয়, জয়নন্দী বলে, অন্য কিছুতে চিত্ত বিচলিত হয় না।

ভদ্রপাদ/ভাদেপা॥ কাহ্নপার অন্যতম শিষ্য। রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিমত, ভদ্রপার আবির্ভাব-কালের নিম্নতম সীমা ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ, তাঁর জন্মস্থান শ্রাবস্তী এবং পেশায় তিনি চিত্রশিল্পী ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তাঁর জন্মস্থান মণিভদ্র এবং জীবনকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। ডক্টর ধর্মবীর ভারতীও মনে করেন, তিনি মণিধর দেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর রচিত 'সহজানন্দ দৃষ্টি-গীতিকা' তিব্বতি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। ৩৫ নং চর্যা তাঁর রচিত। চর্যাটি হচ্ছে,—

রাগ মল্লারী

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলোঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরুবোহেঁ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মোকু ণঠা।
গঅণসমুদে টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহ দিহ সব্বই শুন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন॥
বাজুলে দিল মো লক্খ ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পসিআ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ মই অহাব কএলা॥

আধুনিক বাংলা॥ এতকাল আমি স্বগতমোহে ছিলাম। এখন আমি সদগুরুবোধে বুঝলাম। এখন (আমার) চিত্তরাজ নষ্ট হয়েছে। গগনসমুদ্রে ঘুরে প্রবিষ্ট হয়। দশদিক সবই শূন্য দেখি। চিত্তবিহনে পাপপুণ্য নেই। বাজুল (বজ্রকুল) আমাকে লক্ষ্য বলে দিল। আমি গগনে পানি আহার করলাম। ভাদে বলেন, অভাগে নিয়ে চিত্তরাজকে আমি আহার করলাম।

পদটির ভাবার্থ ॥ স্বগতমোহে বদ্ধ মন সদগুরুর সান্নিধ্যে গগনসমুদ্রের ওপারে মহাসুখ নীড়ের সন্ধান পায়।

কঙ্কণপা ॥ কম্বলাম্বরের বংশজাত বলে জানা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, কঙ্কণ প্রথম জীবনে বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন।[২১] রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তাঁর জন্মকাল নবম শতকের শেষ ভাগ। ৪৪ সংখ্যক পদ তাঁর রচিত।

রাগমল্লারী

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅল ধাম উইআ তবেঁ॥
আছহুঁ চউখণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী॥
বিন্দু ণাদ ণ হিঁএ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা॥
জথাঁ আইলেসি তথা জান।
মাসং থাকী সঅল বিহাণ॥
ভণই কঙ্কণ কলঅল সাদেঁ।
সব্ব বিচুরিল তথতা নাদেঁ॥

আধুনিক বাংলা॥ যখন শূন্যে শূন্য মিলে যায়, সকল ধর্ম উদিত হয় তখন। ক্ষণ দ্বারা চতুর্থানন্দকে সম্বোধিত করে রয়েছি। মধ্যমার নিরোধ দ্বারা অনুত্তর বোধি (লাভ করলাম)।

---

২১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮

বিন্দুনাথ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নি। এক চাইতে অন্য বিনষ্ট হলো। যেখান থেকে এসেছো তথায় (গিয়ে) স্নান। মাংসে (নিজ বোধিচিত্তে প্রতিষ্ঠিত থেকে) সকল ছাড়। কলকল শব্দে কঙ্কণ বলেন, তথতানাদে সকল বিচূর্ণ হলো।

কম্বলাম্বর পা।। কম্বলাম্বরের সময় অষ্টম শতকের প্রথমপাদ বলে অনুমান করা হয়।[২২] তিনি নামান্তরে কম্বল ও কামলি। কম্বলাম্বরের জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। একমতে তিনি উড়িষ্যা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, অন্যমতে তিনি ছিলেন কঙ্করের রাজপুত্র ইন্দ্রভূতি এবং জালন্ধরীপার গুরু। ফরাসি পণ্ডিত কর্দিয়ে (Cordier) তাঁকে পূর্ব-ভারতের অধিবাসী বলে মনে করেন। কুক্কুরীপা ও আর্যদেব তাঁর সমসাময়িক চর্যাগীতিকার ছিলেন। তিনি লুইপার একটি পুস্তকের টীকা লিখে দেন। এছাড়া 'প্রজ্ঞাব মিতা উপদেশ' নামে তিনি একখানি মহাযান গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর বাংলা পুস্তকের নাম 'কম্বলগীতিকা'। ৮ নং চর্যা তাঁর রচিত। চর্যাটি হচ্ছে,

রাগ দেবক্রী

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুউই কইসেঁ।।
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছি।।
মাঙ্গত চড়্হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা।।

আধুনিক বাংলা।। করুণারূপ নৌকা সোনায় ভর্তি রয়েছে, রূপা রাখবো (এমন) স্থান নেই। ওহে কামলি, গগন উদ্দেশে বেয়ে চলো। বহু গত জন্ম কেমন করে উদিত হয়। খুঁটি উৎপাটিত করে কাছি খুলে দিয়েছো, সদগুরুকে জিজ্ঞেস করে বেয়ে চলো। (নৌকার) পথে চড়ে চতুর্দিকে চাও। বৈঠা নেই, কে কি করে বাইতে পারে? বাম ও দক্ষিণ চেপে, পথের সঙ্গে মিলে, পথেই মহাসুখসঙ্গ লাভ হলো।

ধামপা/ধর্মপাদ।। কাহ্নপার শিষ্য। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, তাঁর জীবনকালের নিম্নতম সীমা ৮৭৫ খ্রিঃ। জন্মস্থান বিক্রমশীলা বা ভাগলপুর, বর্ণে ব্রাহ্মণ ও ব্যবহারিক জীবনে ভিক্ষু। ডক্টর শহীদুল্লাহর মতেও ধামপাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন, জন্মস্থান বিক্রমপুর।[২৩] ৪৭ সংখ্যক চর্যাপদ তাঁর রচিত।

---

২২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮
২৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯

রাগ গুঞ্জরী

কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ মিঅলী।
সমতাজোএঁ জলিঅ চণ্ডালী॥
ডাহ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহুঁ পাণী॥
ন উ খরজালা ধূম ন দিশই।
মেরু শিখর লই গঅণ পইসই॥
দাঢ়ই হরি হর বাহ্ম ভডা।
ফীটি হই নবগুণ শাসন পড়া॥
ভণই ধাম ফুড় লেহু রে জাণী।
পঞ্চ নালেঁ উঠে গেল পাণী॥

আধুনিক বাংলা॥ কমল কুলিশ মাঝে মিলিত হলো। সমতা যোগ দ্বারা চণ্ডালী প্রজ্জ্বলিত হলো। ডোম্বীর ঘরে দাহ, আগুন লেগে গেলো। শশধরকে নিয়ে পানি সিঞ্চন করি। প্রখর জ্বালা নেই, ধূমও দেখা যায় না। মেরুশিখরে নিয়ে গিয়ে গগনে প্রবেশ করে। হরি হর ব্রহ্ম দগ্ধ করলো। নবগুণ শাসন পাট্টা দগ্ধ হলো। ধামপাদ বলেন, স্পষ্ট করে জেনে লও। পঞ্চ নালে পানি উঠে গেলো।

আর্যদেব॥ তাঁর নামের পাঠান্তর আজদেব। তিনি ছিলেন কম্বলাম্বরের সমসাময়িক। কম্বলাম্বরের সময়কাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। এই হিসেবে তাঁকেও আমরা উক্ত শতকের লোক বলে অনুমান করতে পারি। অবশ্য খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে অপর একজন আর্যদেব অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক প্রণয়ন করে মহাযান ধর্মমতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের আর্যদেব তাঁর থেকে পৃথক। ৩১ নং চর্যা তাঁর রচিত। তিনি 'কর্ণেরী গীতিকা' ও 'চর্যামেলায়ন' নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। উড়িয়া ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক তাঁর একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়েছে। পদটি হলো,–

রাগ পটমঞ্জরী

জহি মন ইন্দিঅ পবণ হোই ণঠা।
ণ জানমি অপা কহি গই পইঠা॥
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ।
আজদেব নিরাসে রাজই॥
চান্দরে চান্দকান্তি জিম পডিভাসঅ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই॥
ছাড়িঅ ভঅ ঘিণ লোআচার।
চাহন্তে, চাহন্তে সুণ বিআর॥
আজদেবে সঅল বিহরিউ।
ভঅ ঘিণ দূর নিবারিউ॥

আধুনিক বাংলা॥ যেখানে মন ইন্দ্রিয় পবন নষ্ট হয়, না জানি আত্মা (তথায়) কোথায় প্রবিষ্ট হয়। আশ্চর্যভাবে করুণা ডমরু বাজে, আর্যদেব নিরাশায় বিরাজ করেন। চন্দ্রে যেরূপ চন্দ্রকান্তি প্রতিভাসিত হয়, চিত্তও তদ্রূপ বিচলিত হয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। ভয় ঘৃণা

লোকাচার ছাড়লাম, চাইতে চাইতে শূন্যতাকে বিচার করলাম। আর্যদেব দ্বারা সকল বিফল হলো। ভয় ঘৃণা দূরীভূত হলো।

শান্তিপাদ।। খ্রিস্টীয় দশম শতকের বিক্রমশীল বিহারের দ্বাররক্ষক রত্নাকর শান্তি নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপরও তিনি লিখেছেন। উপরন্তু সহজযানের উপর তাঁর লেখা 'সহজরতিসংযোগ' ও 'সহজযোগক্রম' দুখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। তিনিই আলোচ্য শান্তিপাদ কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও তেঙ্গুরে উল্লিখিত 'সুখদুঃখদ্বয় পরিত্যাগ দৃষ্টি' নামক সহজযান-গ্রন্থে রত্নাকর শান্তিকে সিদ্ধাচার্য শান্তি বলা হয়েছে। তাঁর পরিচয় কিছুটা আলো আঁধারী হওয়ায় পণ্ডিতদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। সুকুমার সেন বলেন--'যদি ইনি চর্যাগীতিকার শান্তি হন তবে তিনি ভুসুকুর শিষ্য।'[২৪] ১৫ নং এবং ২৬ নং চর্যাদ্বয় তাঁর রচিত।

রাগ রামক্রী

সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁ অলক্‌খ লক্‌খণ ণ জাই।
জে জে উজুবাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোই।।
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাটে সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধারা।।
মাআমোহসমুদা রে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি নাহা।।
সুনা পান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজুবাট জাঅন্তে।।
বাম দাহিণ দোবাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড় তড়ি ণ হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ।।

আধুনিক বাংলা।। সংবেদন স্বরূপবিচারে অলক্ষকে লক্ষে দেখা যায় না। যিনি সহজ পথে গেলেন তিনি অনাবর্তনশীল হলেন। কূলে কূলে ওরে মূঢ়, সহজপথে সংসারাভিমুখি হয়ো না। ওহে বাল! একটি ভিন্ন বাক্যেও ভুলো না। রাজা কনকধারা পথে (প্রবিষ্ট হন)। পরে মায়া মোহসমুদ্র। তোর অন্তও বুঝি না, গভীরতাও না। অগ্রে নৌকা কিংবা ভেলা দৃষ্ট হয় না। সেই পথে যেতে ভ্রান্ত হয়ো না। সহজ পথে গেলে এইরূপে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হবে; বাম দক্ষিণ দুই পথ ছেড়ে শান্তি সংকেলিতে নিরত। এপথে ঘাট গুল্ম খড় তৃণ নেই, আঁখি বুজে পথ চলো।

রাগ শবরী

তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু।।

---

২৪. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (কলিকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৫ম সং. ১৯৭০), পৃ. ৬৯

তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
শান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই॥
তুলা ধুণি ধুণি সুণে অহারিউ।
পুন লইআঁ অপণা চটারিউ॥
বহল বট দুই মার ন দিশঅ।
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ॥
কাজ ন কারণ জ এহু জুগতি।
সঅ সঁবেঅণ বোলথি শান্তি॥

আধুনিক বাংলা॥ তুলা ধুনে ধুনে আঁশে পরিণত কবা হলো। আঁশ ধুনে ধুনে নিববযব হলো। এইরূপ হওয়ায় দেখতে পাওয়া গেলো না। শান্তি বলেন, কেন তাকে ভাববো। তুলা ধুনে ধুনে শূন্য আহার করেছে। পুনরায় নিয়ে আপনাকে বাধিত করেছে। বর্ত্ম দুইকে মারা হয়েছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না। শান্তি বলেন, বালক ও অজ্ঞ প্রবেশ করতে পারে না। শান্তি বলেন, স্বসংবোধন হলো যুক্তি।

১৯৫৬ সালে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল এবং তিব্বতের কোনো গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তালপাতাব পুথিতে লিপিবদ্ধ বিশটি চর্যাপদ উদ্ধাব ক'রে তাঁর 'দোহাকোশে' প্রকাশ করেন। পরে ডক্টব শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরনলড্ বাকেব সংগৃহীত আরো কয়েকটি গানকে বাংলা বলে বিবেচনা করেন। তাঁব 'নব চর্যাপদে' ৯৮টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'দোহাকোশে' যে-তিনজন নব চর্যাপদকারেব নাম জানা যায় তাঁরা হচ্ছেন বিনয়শ্রী, সরুঅ ও অবধু। বিনয়শ্রীব পদ ১৩টি, সরুঅর ২টি এবং অবধুর ১টি পদ মোট ১৬টি পদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২৫]

নিচে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এঁবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেব সঙ্গে যেমন জড়িত, তেমনি কেউ কেউ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব নানা কাহিনীর সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

চৌরঙ্গীনাথ॥ গোরক্ষবিজয কাব্যে চৌরঙ্গীনাথের উল্লেখ আছে। তিব্বতি ভাষায় লিখিত চুরাশী মহাসিদ্ধার ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় চৌরঙ্গীনাথের পিতা ছিলেন পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল। এই ইতিবৃত্তকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করলে চৌবঙ্গীনাথ খ্রিস্টীয় নবম শতকেব প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন।

হলায়ুধ মিশ্র॥ হলাযুদেব জীবনকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না, তিনি সম্ভবত দ্বাদশ শতকের শেষপাদে অথবা ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন। অনুমান করা হয় হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মূলত তিনি সংস্কৃতের লেখক ছিলেন, তবে 'শেক শুভোদয়া' নামক গদ্যগ্রন্থে তাঁর রচিত একটি বাংলা গান আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাষার দিক থেকে গানটি প্রাচীন বটে, তবে অনেকাংশে সুবোধ্য হওয়ায়

---

২৫. আনিসুজ্জামান, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যান্য নিদর্শন'। পূর্বোক্ত, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০-৪৫৭

পরবর্তীকালে তাতে কারো হাতের স্পর্শ পড়েছে বলে অনুমান করা যায়। গানখানি উদ্ধৃত হলো।

ভাটিয়ালী রাগেন গীয়তে

জঙ্গ জুবনী পতিএ হীন।
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন॥
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ।
বাযু ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ॥
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাও ঘর।
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড়॥
হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান॥
বড় সে বিপাক আছে উপাএ।
সাজিয়া গেইলে বাঘে ন খাএ॥
পুন পুন পাএ পড়িআ মাঙ্গো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ॥
শ্রীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহএ অনল॥
পীন পয়োধর বাঢ়ে ত্যাগ।
প্রাণ ন জায় গেল বহিঞা ভাব॥
নয়ান বহিঞা পড়ে নীর নিতি।
জীএ ন প্রাণী পলাএ ন ভীতি॥
আশে পাশে শ্বাস করে উপহাস।
বিনা বাযুতে ভাঙ্গে তালের গাছ॥
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা।
চলি জাহ সখি পলাইল শঙ্ক॥

চর্যাপদের বাইরে উদ্ধৃত কবিতাখানি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। হলায়ুধ মিশ্র এবং তাঁর 'শেখ শুভোদয়া' এই দিক থেকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হতে পারে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান/অতীশ॥ ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজা কল্যাণশ্রীর পুত্র দীপঙ্করের (জন্ম আনুমানিক ৯৮০ খ্রিঃ) বাড়ি বাংলাদেশ বলে মনে করেছেন। দীপঙ্করের রচিত 'একবীর সাধন ও বলবিধি' নামক গ্রন্থে তাঁকে বাঙালি বলা হয়েছে। তিনি বিক্রমশীল বিহারের (সম্ভবত ভাগলপুরে অবস্থিত ছিলো) অধ্যক্ষ ছিলেন। বৌদ্ধ আচার্য জেতারি তাঁর গুরু ছিলেন। ১০৩৮ সালে তিব্বত-রাজ তাঁকে তিব্বত নিয়ে আসেন। তিব্বতে তাঁর নাম হয় অতীশ। তাঁর রচিত পুস্তক,—'বজ্রাসন বজ্রগীতি', 'চর্যাগীতি' ও 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা'। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলের অধিবাসী মনে করেন।

জয়দেব/জয়দেব গোস্বামী।। জয়দেব সম্ভবত খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলার সেন রাজবংশের সময়ে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। জয়দেবের জীবন সম্পর্কে এইটুকু জানা যায় যে বীরভূম জেলাব অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ভোজদেব এবং মাতা বামাদেবী। জয়দেবেব স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনি সারাক্ষণ উদাসীন স্বামীর পাশে থাকতেন। জয়দেবেব 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃতে রচিত হলেও বাংলায় রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বৈষ্ণবসাহিত্য ভাবে, ছন্দে এবং অলঙ্কার-প্রকবণে উক্ত কাব্য ও জয়দেবের রচনারীতি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ও লাভবান হয়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় জয়দেবের প্রসঙ্গ আসে।

জালন্ধরীপা/হাড়িপা।। নাথগীতিকার ঐতিহ্য অনুসারে জালন্ধরীপা বা হাড়িপা ছিলেন মেহেরকুলেব রাজা গোপীচন্দ্রের দীক্ষাগুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বাংলার ইতিহাস' ১ম খণ্ডে বলা হয়েছে রাজা গোপীচন্দ্রের রাজত্বকাল সপ্তম শতকের শেষ পর্যায়।[২৬] সেই সূত্রে ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন জালন্ধরীর সময় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। জালন্ধবীপা ছিলেন নাথযোগী। চর্যাপদের কাহ্নপাদ ছিলেন তাঁর শিষ্য। নাথযোগীদের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত,--একটি হচ্ছে সিদ্ধাচার্য মীননাথ ও তাব শিষ্য গোর্খনাথের কাহিনী। একাহিনীব নাম তাই গোবক্ষবিজয বা মীনচেতন। দ্বিতীয় কাহিনীটি হচ্ছে বাজা গোপীচন্দ্রেব সন্ন্যাস, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজমাতা ময়নামতী ও তাঁর গুরু জালন্ধবীপা বা হাড়িপাব যোগসাধনাব কথা।

২৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনে বাংলা সাহিত্যের সংকট

(খ্রিস্টীয় ১২-১৩৫০ শতক)

যুগসন্ধিক্ষণের ইতিকথা

যুগে যুগে বাংলাদেশ নানাদিক থেকে রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর তখন সাময়িকভাবে বিপর্যয় নেমে আসে। সেনযুগে (খ্রিস্টীয় ১১-১২ শতক) বঙ্গে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য বংশোদ্ভূত রাজাদের অবহেলা ও নিষেধাজ্ঞায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশলাভের সুযোগ পায় নি। তখন দেবভাষা সংস্কৃতের যেমন মর্যাদা ছিলো, তেমনি দাপট ছিলো প্রবল। কালক্রমে উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বিরোধিতা করে বৌদ্ধবিপ্লব যখন মাথা চাড়া দেয় তখন সংস্কৃতের স্বেচ্ছাচারিতা অনেকটা খর্ব হয়। সেই সুযোগে প্রাকৃত ও দেশজ ভাষাগুলোও জেগে উঠতে থাকে।

হিন্দু অভ্যুত্থানের যুগে সংস্কৃতের পুনর্জাগরণ ঘটলেও বাংলায় মুসলিম আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দর্প চূর্ণ হয়। তবে বাঙালির ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও জনপদের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ যে বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, মুসলমানদের আগমনে আকস্মিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তার গতি স্থবির হয়ে পড়ে, এবং বাংলা সাহিত্যও তখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই রাজনৈতিক অস্থিরতায় বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণগণ তাঁদের লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন পুথিপত্রাদিসহ নেপাল, কাশ্মীর, আসাম, উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে পালিয়ে যান। প্রবাস গমনে বাধা না থাকায় এঁরা সহজেই সে যুগে নিজেদের দেশ ছেড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে অন্যদেশে চলে যেতে সক্ষম হন। সুতরাং প্রায় দেড়শ বছর (১২০০--১৩৫০) পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের যুগ।

এই রাজনৈতিক অরাজকতার যুগে যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস বিঘ্নিত হবে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে মুসলিম আধিপত্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সংস্কৃত শাস্ত্র-সাধিত শিষ্ট সাহিত্যের ধারাটি। এই ধারার সাহিত্যের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজপতি ও রাজসভাসদ্‌। এইসব পরপুষ্ট ব্যক্তি তখন বহিরাগত আঘাতে বিপন্ন হয়ে কোথাও পালিয়ে গিয়ে কিংবা আত্মগোপন করে বেঁচে থাকেন।[২৭]

তবে মুসলিম আধিপত্য তাৎক্ষণিকভাবে দেশের পরম্পরাগত রাজনীতি ও মঠ-মন্দির লালিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য বিঘ্নসঙ্কুল হলেও শহরগুলোর বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের জীবনধারায় ইতিহাসের এই পরিবর্তন যে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে নি, এমন মনে করা যায়। সাধারণ জনজীবনের ধারা নিরুপদ্রব ছিলো বলেই সম্ভবত পরবর্তীকালে তৎকালীন কিছু সাংস্কৃতিক ও লোকায়ত সাহিত্যনিদর্শন পাওয়া যায়, যা তখনকার স্মৃতি

২৭. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৮৩

বহন করে। অধ্যাত্মভাবনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, যা সম্পূর্ণত লোকায়ত, এমন কিছু ছড়া ও গান সেসময় রচিত হয়ে থাকবে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে রচিত বলে অনুমিত মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী[২৮] এবং যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গান এবং চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বিষয় গ্রামীণ উৎসব ও দেবপূজা উপলক্ষে বাদ্যে ও নৃত্যে পাঁচালীরূপে পরিবেশন করা হতো। এসব কাহিনী প্রাকৃত, অপভ্রংশে, অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাংলার মধ্য দিয়ে বয়ে আসে। এই লোকায়ত-নির্ভর সাহিত্য-নিদর্শন থেকে মনে হয় তুর্ক অভিযান বাংলায় এই ধারার সাহিত্য-সৃষ্টির উপর তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তবে শিষ্ট সাহিত্যের ধারাটি যে পুরোপুরি স্তব্ধ হয়েছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারও কারণ নির্ণয় করা যায়। দেশে যখন রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তখন দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর একটা প্রতিকূল আবহাওয়া বিরাজ করে। যতদিন পর্যন্ত এই দুষ্ট আবহাওয়া মিলিয়ে না যায় ততদিন পর্যন্ত দেশে প্রচলিত জীবনের গতি খুব ক্ষীণ ধারায় বয়ে যায়। বঙ্গে তুর্কি অভিযানেও প্রথম দিকে এরূপ একটা অশুভ ছায়া বিস্তার করে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সংঘাত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দেও সংঘটিত হয় যখন পলাশীর প্রান্তরে বঙ্গদেশ তার স্বাধীনতা হারায়। এই সংঘাতের জের চলে এদেশে ইংরেজের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় একশ' বছর। তার ফলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকালের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে কোনো রসোত্তীর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ হয় নি। তবে এরকম অবসাদ ও নৈরাশ্যের যুগেও সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্যম একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। লোকজীবনের সাহিত্য রস পিপাসা মেটানোর জন্য ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যস্তর পর্যন্ত যেমন লোকায়ত সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে পাঁচালী, টপ্পা, কবিগান, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই এসব জনগণমন-রঞ্জনকারী এক শ্রেণীর গীতিসাহিত্য অবাধে রচিত হয়েছিলো।

তুর্কি অভিযানের ফল কালক্রমে বঙ্গ সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্যের জন্য যে শুভপ্রদ হয়েছিলো তা মনে করার কারণ আছে। অন্তত দুটি কারণে এই অভিযান বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম শাসকদের ঔদার্যপূর্ণ মনোভাবের ফলে পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদায়গত ভেদরেখা বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়ে বঙ্গে এক বৃহত্তর বাঙালি জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়। অন্যদিকে হিন্দু মুসলমানের দুই সংস্কৃতির ভাবধারার মিলনে এদেশে এক অখণ্ড বঙ্গসংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য গড়ে উঠবার অবকাশ পায়।

---

২৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৮৬

চতুর্থ অধ্যায়

মধ্যযুগের আদিপর্বের বাংলা সাহিত্য

(খ্রিস্টীয় ১৪-১৫ শতক)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশদেব ভাবতবিজযেব পূর্বকাল অবধি কালপবিধিকে বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে মনে করা হয়। এই গোটা সময়টায় ভাবতে মুসলিম আধিপত্য বর্তমান থাকায় সাধারণভাবে একে **'মুসলিম যুগ'** বলেও অভিহিত কবা হয়।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের শুরুতে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চাব পবিবর্তে বাংলায় সাহিত্যচর্চার একটা অনুকূল পবিবেশ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাব পেছনে কাজ করে জযদেবের বাংলা-ঘেঁষা সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাব। বিষযগত দিক থেকে জয়দেবেব কাব্যের প্রভাব আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাস বচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পড়া অসম্ভব কিছু নয়। পরবর্তীকালে বিপুল পদাবলী সাহিত্যে এই প্রভাব আবো ব্যাপক হয়। তথাপি সংস্কৃত নয়, বাংলা ভাষাই তখন থেকে বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চাব একমাত্র মাধ্যম হয়।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকেব মধ্যভাগ থেকে বঙ্গে স্বাধীন ইলিযাসশাহী পাঠান সুলতানগণের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায বাংলা সাহিত্য নতুন প্রেবণায তাব দিকনির্দেশনা কবে অগ্রসব হয। প্রথমে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২ ১৩৫৮) কথাই ধরা যাক। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও একজন দূবদর্শী শাসক। তাঁব সময থেকেই এদেশে সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চাব সুবর্ণ সুযোগ আসে।

১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের পব থেকে হিন্দু সামন্ত বাজা গণেশেব আবির্ভাব কাল পর্যন্ত ছোট বড়ো প্রায নয়জন মুসলিম শাসক গৌড় শাসন কবেন। গিযাসউদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা কবেছেন। তাঁব সঙ্গে পাবস্য কবি হাফিজেব পত্র বিনিময হয় বলে জানা যায। হাফিজ বাংলাব সুলতানকে একটি গজলও উপহার দেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এবং মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর সম্রাট গিযাসউদ্দীন আযম শাহের প্রশস্তিগাথা রচনা কবেন।

এরপব বঙ্গদেশ কিছুকাল হিন্দু বাজশক্তির অধীনে আসে। ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গেব ভাতুরিযাব জমিদার গণেশ 'দনুজমর্দন দেব' উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র যদু সিংহাসনে বসেন। যদু 'জালালউদ্দীন' নাম গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। অনুমান করা হয় কবি কৃত্তিবাস যদুর সময়ে আবির্ভূত হন। জালালউদ্দীনেব পুত্র শামসুদ্দীন আহমদের (১৪৩১-১৪৪২) আমলে পদাবলীর কবি চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল অনুমান করা হয়। বাংলার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বিদ্যোৎসাহী সম্রাট রুকনউদ্দীন বাববাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধর বসুকে 'গুণরাজ'

উপাধি দেন। পঞ্চদশ শতকের মুসলিম কবি জৈনুদ্দীনও তাঁর আমলে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সম্রাট সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮২)। কবি জৈনুদ্দীন এই কাব্যরসিক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন বলে জানা যায়।

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিবেদিতচিত্ত পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দীন হুসেন শাহের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আমলে বঙ্গসংস্কৃতি সাহিত্যে ভাস্কর্যে ও স্থাপত্য শিল্পে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। হুসেন শাহ যে অসাধারণ একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন, ঔদার্যে ও গুণীর কদরে তাঁর তুল্য নৃপতি সেযুগে যে বিরল ছিলো, তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য অনেক কবি সেকথা বলেছেন। যেমন, বিজয়গুপ্ত বলেছেন, -

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রতাপেতে রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥

বিপ্রদাস পিপিলাই বলেছেন,

সিন্ধু ইন্দু বেদশশী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান॥

মহাভারতের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের উক্তি,

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার॥

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব কবি যশোরাজ খান বলেছেন, --

শ্রীযুক্ত হুসায়ন জগৎ ভূষণ সেহ ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥

সম্রাট হুসেন শাহের আমলে রূপ গোস্বামী বাংলা ভাষায় 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলার পরবর্তী শাসনকাল হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২)। পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন নসরত শাহ। মধ্যযুগের অনেক কবি তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাকথা ব্যক্ত করেন। যেমন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে বলেছেন, --

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

কবি শেখর তাঁর একটি পদে বলেছেন,—

কবি শেখর ভণে অপরূপ রূপ দেখি।
রায় নসরত শাহ ভজিল কমলমুখী॥

নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২-১৫৩৩) উত্তরাধিকার সূত্রেই পিতা-পিতামহের গুণগুলো পেয়েছিলেন। কবি দ্বিজ শ্রীধর এই বিদ্যোৎসাহী সম্রাট সম্পর্কে বলেছেন,—

নৃপতি নসিরা সাহা-তনয় সুন্দর।
সব-কলা নলিনী ভোগিত মধুকর॥
রাজা সিরি পেরোজ (শ্রী ফিরোজ) সাহা বিধিত সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি বাজা পরিমাণ॥

বাংলাদেশের ইতিহাস অতঃপর সুরবংশীয় আফগান শাসনের দিকে মোড় পরিবর্তন করে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পর্বে আফগান মুঘলের সংঘর্ষ ও পরবর্তী পর্যায়ে মুঘল সম্রাট শাজাহানের পুত্রদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব এবং শায়েস্তা খানের সময় তাঁর অনুচরদের শোষণনীতির ফলে বঙ্গে যে রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতা দেখা দেয় তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড়ের সীমানা ছেড়ে আরাকানের রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অন্ত্য- মধ্যযুগে আরাকান রাজপারিষদদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ধারায় প্রবহমান হয়। দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ প্রতিভাবান কবি আরাকানে বসেই কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলাদেশ ইংরেজদের হাতে স্বাধীনতা হারায়। উর্দুভাষী নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি ও উর্দুর অনুপ্রবেশ ঘটে ; সেই সূত্রে বাংলা সাহিত্যে মিশ্র ভাষারীতির পুথিসাহিত্যের উদ্ভব হয়। বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটি দোভাষী পুথিসাহিত্য হিসেবে পরিচিত।

দুই॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাপদ যেমন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তেমনি তার দ্বিতীয় নিদর্শন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত একাব্যের যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্বৎ সমাজকে মুগ্ধ করে তার মধ্যে রয়েছে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের অবিকৃত রূপ, রচনার আঙ্গিক পারিপাট্য, ছন্দ প্রকরণ ও অলঙ্কার-প্রয়োগে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব, সেই সঙ্গে পাণ্ডিত্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং মনস্তত্ত্বের চমৎকার অভিব্যঞ্জনা। পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেই অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

চর্যার পরে বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটির আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা। এ পুথির আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) পুথিটি আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ পুথি প্রকাশের পর পণ্ডিতমহলে বড়ু চণ্ডীদাস ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন, মতবাদ ও সপক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়। সেই সূত্রে চণ্ডীদাস সমস্যাও প্রকট হয়।

অধিকাংশ পণ্ডিত অভিমত দিয়েছেন বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। তিনি দেবী বাসলীর ভক্ত ছিলেন। বাসলীর বিগ্রহ ও মন্দির অধ্যুষিত বীরভূমের নান্নুর গ্রামটি সেই সূত্রে বড়ুর নিবাসভূমি রূপে অভিহিত হয়। বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বাসলী

দেবীর বিগ্রহধন্য ছাতনা গ্রামের নুনুর হাট বা মাঠ নামক একটি জায়গাও অনুরূপ বিবেচনায় বড়ু চণ্ডীদাসের বাস্তুভূমি রূপে চিহ্নিত। তবে বড়ু ছাড়াও 'দীন' ও 'দ্বিজ' এই নামের আরো দুজন চণ্ডীদাসের সন্ধান মেলে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত, চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা অভিন্ন ব্যক্তি।[২৯] তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চণ্ডীদাসের অল্প বয়সের রচনা। পরিণত বয়সে তিনি রজকিনী রামীর সংস্পর্শে পদাবলীর মতো অমৃতনির্ঝর কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা পান। ডক্টর সেনের এই অভিমত যে সংশয়শূন্য নয়, তার কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একজন অপরিণত বয়স্ক যুবকের রচনা হতে পারে না ; এ পুথিতে যে কবিত্ব আছে, শাস্ত্রপুরাণাদি সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য রয়েছে এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার ছাপ আছে, তা নিঃসন্দেহে পরিণত ও অভিজ্ঞ চিন্তাচেতনার ফসল।

মণীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।[৩০] একজন 'বড়ু' যিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস। অন্যজন 'দীন' যিনি চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চণ্ডীদাস তিনজন- -বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। ডক্টর শহীদুল্লাহর এই মত গ্রহণযোগ্য এই কারণে যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় প্রাচীনত্বের নানাবিধ ছাপ বর্তমান, যেমন, -

আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন।
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।

বাসলীভক্ত এই বড়ু চণ্ডীদাসের কথা পরবর্তীকালের অনেক বৈষ্ণব সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন, ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি জয়ানন্দ মিশ্র তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন,

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত তারা করিল প্রকাশ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত হয়েছে,-

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।

বিদ্যাপতির উল্লেখ থেকে এরূপ ধারণা করা হয় যে সম্ভবত বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'তে'ও এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং সম্পাদক মনে করেন, বড়ুর সমসাময়িক বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও মনে করেন 'বিদ্যাপতি ১৩৫৪ হইতে ১৪৭৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।'[৩১] দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে

---

২৯. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ১৩২

৩০. মণীন্দ্রমোহন বসু, 'বাঙ্গালা সাহিত্য' (কলিকাতা : কমলা বুক ডিপো, ১৯৫৬), 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৮৪-২৮৮

৩১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১ম সং. ১৩৭১), পৃ. ৫৫

বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তীকালের কবি, একথা প্রমাণিত হয় তাঁদের রচনার ভাব, ভাষা ও আদর্শগত দিক বিচারে। বড়ু চণ্ডীদাস প্রাকচৈতন্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির রচয়িতা ; দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য সমসাময়িক, পদাবলী সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট অংশ তাঁর রচিত। তৃতীয় কবি দীন চণ্ডীদাস, সংখ্যায় তাঁর পদ বেশি, কিন্তু কাব্যভাবনায় উৎকৃষ্ট নয়। এ সম্পর্কে চতুর্থ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কালনির্ণয়॥ এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও লিপিভঙ্গি বিচার করে প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণ অনুমান করেন এর লিপিকাল ষোড়শ শতকের প্রথমপাদ। পুথির নানা জায়গায় পাঠবিক্ষেপ দৃষ্টে মনে হয় মূল পুথিটি পুথি-লিপির পঞ্চাশ পঁচাত্তর বছর পূর্বে লেখা হয়ে থাকবে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যগঠনরীতি ও শব্দার্থতত্ত্ব আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চর্যাপদের ভাষাই কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে কৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে। স্থূল ও নিরঙ্কুশ জীবনরসের অভিব্যক্তি থাকায় পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে এর আদর্শগত বিরোধ ঘটে, ফলে লোকসমাজে পুথিটির প্রচলন তখন ব্যাহত হয়, সেজন্য এ পুথির আধুনিক রূপান্তরও সম্ভব হয় নি এবং তা না হওয়ার কারণেই চর্যার পরবর্তী স্তরের আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ভাষাবিচারে লক্ষ্য করি।

আখ্যান-বস্তু॥ স্বর্গের দেবগণ কংস নামক অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদা ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে নারায়ণের স্তব করেন। নারায়ণ দেবগণকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তিনি যথাসময়ে কংসকে ধ্বংস করবেন। নারদ মুনি মারফত এ কথা জানতে পেরে কংস দেবকীর বহু সন্তানকে নিধন করে। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণ। বসুদেব পুত্রহত্যার আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের ঘরে রেখে আসেন। কংস কৃষ্ণকে হত্যার জন্য অসুর পাঠায়, কিন্তু কৃষ্ণের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। কৃষ্ণ তাঁর শ্যামল দেহে পীতবস্ত্র ধারণ করে ও বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে গোকুলে বাড়তে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদানের জন্য গোপ-নন্দনের ঔরসে ও পদুমা গোয়ালিনীর গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম হয়, এই লক্ষ্মীই পরবর্তীকালে শ্রীরাধিকা নামে পরিচিত হয়। যথাসময়ে আইহন বা অভিমন্যুর সঙ্গে শ্রীরাধার বিয়ে হয়।

সখি-পরিবৃত শ্রীরাধা একদিন দুধ বিক্রির জন্য মথুরা যায়। সবাইর অভিভাবিকা হিসেবে বড়ায়িও তাদের সঙ্গে যায়। মথুরা অঞ্চলে কৃষ্ণের বাস। বড়ায়ি মারফত কৃষ্ণ শ্রীরাধার রূপগুণের বার্তা শোনে। কৃষ্ণ তখন বড়ায়িকে দূত করে শ্রীরাধার কাছে পাঠায়। রাধিকা ক্রুদ্ধ হয়ে বড়ায়িকে গালাগালি করে। রাধিকার জন্য কৃষ্ণ বড়ায়ির দ্বারা যে মাল্য ও তাম্বুল পাঠিয়েছিলো, রাধা পদাঘাত করে তা দূরে নিক্ষেপ করে। এদিকে রাধিকাকে পাওয়ার আশায় কৃষ্ণ মথুরায় 'দানী' বা 'শুল্ক আদায়কারী' হিসেবে কাজ করতে থাকে। মথুরার পথে কৃষ্ণ একদিন শ্রীরাধার পথ আটকায়। প্রেমজর্জর শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছে প্রেম নিবেদন করে। পথে অসহায়ভাবে একাকিনী রাধা কাঁদতে থাকে, কৃষ্ণ রাধার কপোল-সিক্ত মুখমণ্ডল মুছে দেয়। এই পর্যন্ত রাধা ও কৃষ্ণের পূর্বরাগের প্রসঙ্গ। কৃষ্ণ ইতিমধ্যে খেয়া পারাপারের কাজ

গ্রহণ করে। রাধা বড়ায়ির ছলনায় ভুলে একদিন যমুনার ঘাটে আসে। রাধিকা খেয়ার মাঝিরূপী কৃষ্ণের ছল বুঝতে পারে। দুজনে কলহ শুরু করে, বাতাসে নৌকা ডুবু ডুবু হয়, ভীত রাধিকা কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু তবু নৌকা ডুবে যায়। রাধা-কৃষ্ণ তখন যমুনার জলে ভেসে ওঠে। অতঃপর রাধা আর সখীদের সঙ্গে মথুরা যেতে চায় না। কেননা সেখানে কৃষ্ণ আছে, এবং কৃষ্ণ নিশ্চয় তার সঙ্গে যথাবিহিত অশোভন ব্যবহার করবে। কিন্তু কৃষ্ণের কূটকৌশলে ও বড়ায়ির সড়যন্ত্রে রাধা যমুনা পার হয়ে মথুরার পথ ধরে। শরতের রোদে শ্রান্তক্লান্ত রাধার পাশে অতঃপর মজুরিয়া বেশে কৃষ্ণ এসে উপস্থিত হয়। রাধার দুধের ভাণ্ডটি সে কাঁধে তুলে নেয়, পথ চলতে গিয়ে কিছু দুধ পড়ে যায়, রাধা তাকে তিরস্কার করে এবং ভারবহনের মজুরী দিতে অস্বীকার করে। কৃষ্ণ পুনরায় ভার বহন করে। মথুরায় পৌঁছে কৃষ্ণ রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। এসময় দেবগণ স্বর্গে কৌতুকবোধ করেন। রাধা কৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করবে বলে আশ্বাস দেয়। ফেরার পথে কৃষ্ণ রাধার মাথার উপরে ছাতা ধরে এবং রাধা হয়তো বা তখন কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে ; ব্যাপারটি অস্পষ্ট। কেননা পুথির কিছু অংশ এখানে খণ্ডিত।

রাধা কৃষ্ণের পারস্পারিক ভাব বিনিময়ের বার্তা আইনের মায়ের কানে পৌঁছলে তিনি রাধাকে সতর্ক দৃষ্টিতে রাখেন। শাশুড়ী ঘরের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য পুত্রবধূ রাধার মথুরা যাওয়া বন্ধ করে দেন। বড়ায়ি আইহনের মাকে একঘরে হওয়ার ভয় দেখালে রাধা মথুরা যাওয়ার অনুমতি পায়। পরের ঘটনাগুলো যথাক্রমে বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের অভিসার, গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার, রাসলীলা, কালীয় দমন, জলকেলি, বস্ত্রহরণ লীলা ইত্যাদি ; এসব দৃশ্যচিত্র অঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাসের শিল্পীমানস বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছে।

পুথির শেষাংশে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে রয়েছে জলকেলির সময় কৌতুক করার জন্য কৃষ্ণ রাধার হার লুকিয়ে রাখে। শাশুড়ির ভয়ে ভীত রাধা যশোদার কাছে কৃষ্ণের নামে নালিশ করে। কৃষ্ণ রাধার প্রতি তার মোক্ষম অস্ত্র মদন বাণ নিক্ষেপ করে। এইবার রাধার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের মিলন কামনায় বড়ায়িকে সে অনুরোধ করে। বড়ায়ির দৌত্যকর্মে তখন রাধা কৃষ্ণের মিলন ঘটে। এর পর থেকে কৃষ্ণের মোহন-বাঁশীর সুরে রাধা অস্থির হয়ে ওঠে, তার কোমল নারী হৃদয় প্রেমের প্লাবনে উচ্ছ্বসিত হয়। যখন-তখন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর ভেসে আসে, ব্যাকুল রাধা সেই সুরের মোহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবশেষে কৃষ্ণের বাঁশীটি হস্তগত করে। বাঁশী না পেয়ে কৃষ্ণ অস্থির হয়। কাহ্নাঞির অনুনয়ে রাধা বাঁশী ফিরিয়ে দেয়। কৃষ্ণ অতঃপর রাধার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেয়। রাধা এই বিরহ সহ্য করতে পারে না। কৃষ্ণের সংস্পর্শ পাওয়ার জন্যে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

> বুঝিতেঁ না পারোঁ কাহ্নাঞি তোহ্মার চরিত।
> যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আনৃত॥

এরপর পুথি খণ্ডিত।

কাহিনী-সমালোচনা। কাহিনী-রচনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস কিছুটা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বারা প্রভাবিত। বড়ুর রাধা-কৃষ্ণলীলার কাহিনীটি পৌরাণিক

আদর্শের হুবহু রূপায়ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা এবং কৃষ্ণ যথাক্রমে লক্ষ্মী এবং নারায়ণের অবতাররূপে পরিকল্পিত হয়েছেন, একথা সত্য হলেও তাতে কোনো উন্নত ভাবাদর্শের ছায়াপাত ঘটে নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কাহিনীটি স্থূল ভোগলালসার চিত্ররূপে অঙ্কিত হয়েছে। কৃষ্ণ এখানে এগারো বছরের পরস্ত্রী রাধার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে ছলে-বলে-কৌশলে যে সম্পর্কটি পাতিয়েছে, রুচির দিক থেকে তা মোটেই উন্নত নয়। বড়ায়ির সহযোগিতায় সাধিত রাধার সঙ্গে কৃষ্ণ তার প্রেমলীলায় যে ঐশী শক্তির বাহাদুরি দেখিয়েছে, সেটিও বালকসুলভ চপলতার ছাপমারা। রাধা নিজে কৃষ্ণের প্রেমে সম্মোহিত হওয়ার পরই কেবল নায়ক-নায়িকার চরিত্রের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদিকে কৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান, অন্যদিকে রাধার আকুলতা---এই দ্বিমুখী প্রতিভাস চিত্রণে বড়ু চণ্ডীদাস ট্র্যাজেডির এক অনবদ্য রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এখানে বড়ুর অধ্যাত্ম ভাবমহিমারও প্রকাশ ঘটেছে। তবে তিনি ভাগবত এবং পুরাণ-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনী অবলম্বন না করে বাস্তব চিন্তায় পরিকল্পিত প্রাকৃতজনের একটি কাহিনীকে রূপদান করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায় যে বড়ুর এই কাব্য জীবনরসের অভিজ্ঞতায় জারিত হওয়ায় প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাস্তবতা ও চরিত্র-চিত্রণ।। এ কাব্যের সর্বত্রই বস্তুরস জমাট বেঁধেছে। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায় কবি নানা জায়গায় ঘটনার বৈচিত্র্য ও চরিত্রগত দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টিতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। সেজন্য বলা হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দেব-মহিমার উপাখ্যান না হয়ে মানব মহিমার আখ্যান হয়ে উঠেছে। রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি এমন কি নারদও আধ্যাত্মিক ভাবমহিমার বিকাশ নন, রক্তমাংসে গড়া মানব জীবনেরই প্রতিনিধি মাত্র। বার্ধক্যহেতু নারদ ও বড়ায়ির অঙ্গবিকৃতি ও ভাবভঙ্গির সরস বর্ণনা একদিকে যেমন কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে বাস্তব জীবন সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতার পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছে। রাধা এবং কৃষ্ণ একাব্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার রূপক না হয়ে সমকালীন প্রাকৃতজীবনের যুগল প্রতিনিধি হয়েছে। বলা যায়, লোকজীবনের একনিষ্ঠ সাধনায় কবি চমৎকার একখানি লোককাব্য রচনা করেছেন। সেই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলার অশিক্ষিত গোপপল্লীর এক অনভিজাত গ্রামীণ জীবনধারার বাস্তব আলেখ্য।

বাস্তবতার বিষয়টি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রচিত্রণে বেশ উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বাহন না হয়ে রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি- এরা সবাই আমাদের পরিচিত সংসারের মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাবতে বেশ ভালো লাগে, এইসব চরিত্র যেন আমাদের এককালের গ্রামীণ জীবনের নিকট-প্রতিবেশীদের গোত্রভুক্ত। এদের সান্নিধ্যে যেন আমরা কিছুক্ষণ পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে প্রমোদ বিহার করার সুযোগ পাই। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের অপূর্ব সৃজনশীলতাগুণে চরিত্রগুলো শুধু বাস্তবতারই প্রতিবিম্ব হয় নি, নাটকীয় রস ও গীতিরসের অনবদ্য মিশ্রণে সৃষ্ট হওয়ায় এরা সাহিত্যিক সত্যের মনোজ্ঞ ভূমিও স্পর্শ করেছে। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস যে একজন উঁচুধারার বাস্তবপ্রিয় কবি ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। নারদ এবং বড়ায়িকে নিয়ে বড়ু কিছু কৌতুকরসও সৃষ্টি করেছেন। বার্ধক্যহেতু নারদ ও বড়ায়ির অঙ্গবিকৃতি ও ভাবভঙ্গির সরস বর্ণনা থেকে এই কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত হয়েছে। যেমন,---

পাকিল দাড়ী মাথার কেশ
বামন শরীর মাকড বেশ।
নাচ-এ নারদ ভেকের গতী
বিকৃত বদন উমত মতী॥

বড়ু চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি, ঘটনা সন্নিবেশ, চরিত্র-চিত্রণ ও অলঙ্কার-প্রকরণ সবই প্রশংসনীয়, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের চরিত্র চিত্রণে তাঁর মধ্যে স্থূল দাম্ভিকতা ও সম্ভোগপ্রিয়তা ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে না পারায় এই চরিত্রের কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

তবে রাধার চরিত্রচিত্রণে বড়ুর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা-চরিত্র মধ্যযুগীয় লোকজীবনে বহমান ট্র্যাজেডির এক বাণীময় প্রতিভাস। রাধার চপলতা, পরিহাস-রসিকতা ও ব্যঙ্গের খোঁচা শেষ পর্যন্ত এক মর্মান্তিক বিরহের দহনে স্বতন্ত্র মহিমার ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। দেহকামনার মধ্য দিয়ে রাধিকার যে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছিলো, 'বিরহখণ্ডে' এসে সেই প্রেমই অকস্মাৎ দেহাতীতের মহিমা স্পর্শ করে। শ্রীরাধা জীবনমুখিনতাকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু 'বিরহখণ্ডে' তার হৃদয়ের যে সংবেদ্য ভাবটি আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা তাঁর নিজের কথায়,

দোশলো প্রথম নিশি, সপন সুন তোঁ বসী,
সব কথা কাহ আরো তোহ্মারে হে
বসিআঁ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে,
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥

দয়িতের বংশীনাদের মাহাত্ম্যে প্রেমজর্জর রাধিকার হৃদয়ানুভূতির মর্মান্তিক প্রকাশ দেখা যায় যখন সে করুণার সাগরজলে নিমজ্জিত হয়ে বলে, -

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥

শ্রীরাধার হৃদয়ের এই আর্তি আর কারুণ্যের ভিতর দিয়েই কাব্যের মুক্তি ঘটেছে বৃহত্তর ভাবের এক উন্নত নভোলোকে।

কাব্যবিচার (রচনারীতি, বর্ণনা-কৌশল, অলঙ্কার-প্রকরণ, উপমা-প্রয়োগ ও ছন্দ-বৈচিত্র্য) ॥ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় স্থূল দেহচেতনা, রুচিগর্হিত রসরসিকতা ও সম্ভোগ-বাসনার প্রকাশে অনেক সমালোচক বড়ু চণ্ডীদাসের মর্ত্যপ্রীতির প্রশংসা করেছেন। দেহকে অবলম্বন করে দেহরসের এরূপ নিঃসঙ্কোচ পরিবেশনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব সুলভ নয়। ভোগলালসার নিরঙ্কুশ বর্ণনা থেকে প্রতীতি জন্মে যে এ কাব্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অপেক্ষা এর প্রত্যক্ষ মানবরস আধুনিক কালের পাঠকচিত্তকে বেশি অভিভূত করেছে। জীবনবোধের তীব্রতা ছাড়াও সম্ভোগবাহুল্য এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে বিকাশ লাভ করেছে। নবজাত বাংলা ভাষা কবির হাতে যে ব্যঞ্জনাশক্তি লাভ করেছে তা বিস্ময়কর। কাব্যের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে তার পরিচয় রয়েছে। সুতরাং ভাষার অভিনব কুশল প্রয়োগে ও কাব্যকলার বিবিধ স্ফুরণে কবি যে প্রাজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

কৃষ্ণের সম্ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থের জন্য রাধিকার জন্ম। বড়ু চণ্ডীদাসের এই পরিকল্পনাই তাঁর কাব্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে। তবে বড়ুর কাব্যে আদিরসের যে প্রাবল্য রয়েছে, কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ই যে তার উৎস, একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। শৃঙ্গাররস উভয় কাব্যেই প্রাধান্য লাভ করেছে।

বড়ুর কাব্যে যে অলঙ্কার প্রকরণ ও শব্দযোজনা আছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবি করে। দানখণ্ড থেকে শ্রীরাধার রূপবর্ণনার একটি অংশ উদ্ধৃত হলো। যেমন,

নীল জলদসম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম-সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডল মণ্ডিত চারু শ্রবণাযুগলা॥

শব্দ বা বাক্যের অভিহিত অর্থ যার মধ্যে অবস্থান করে, সাহিত্যে তাকে বলে 'বাচ্যার্থ'। অন্যদিকে বাচ্য ও অভীষ্ট অর্থের পশ্চাতে যখন তার চেয়েও গভীর একটি অর্থের দ্যোতনা সূচিত হয় তখন সাহিত্যে তা 'ব্যঙ্গার্থ' বলে অভিহিত হয়। এভাবে সেরা সাহিত্যিকের কৃত কৌশলে সাধিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য দেখা দিলে ভাব যথার্থ কাব্যকলায় উত্তীর্ণ হয়। রাধার রূপবর্ণনায় বড়ু চণ্ডীদাসের শিল্পপ্রতিভার এই চমকপ্রদ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, কৃষ্ণের চরিত্র চিত্রণ যথেষ্ট সার্থক না হয়েও বড়ুর অনবদ্য বর্ণনার গুণে তাঁর চারুমণ্ডিত রূপায়ণ আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন,

ময়ুরপুচ্ছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল-মেঘ-ছটা গন্ধ-চন্দনের ফোঁটা
যেন উয়ে গগনে চাঁদ গোটা॥
নির্ম্মল কমল বনে নীল উতপল নয়ানে
রতন কুণ্ডল শোভে কর্ণে।

মাণিক দশন-যুতী   পিঞ শোভে গজমুতী
  স্ত্রীএ বাহি তার দরশনে॥
চন্দন-চর্চ্চিত গাএ   ঘাঘর মগর পাএ
  হেন বেশ হেন দরশনে।
নেত পরিধান লাসী   হাতে মৌহারী বাঁশী
  সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে॥

'নবনীদল কোমল', 'শরত উদিত চান্দ বদন কমল', 'আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন ঝরএ নয়নের পানী' ইত্যাদি বাক্যাংশ ও শব্দযোজনায় যে অলঙ্কার-প্রকরণ ও চারুকলার ব্যবহার রয়েছে তা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র থেকে প্রত্যক্ষভাবেই কবি গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, আলাওল প্রমুখ কবির হাতে বাংলা সাহিত্য কারুকৃতির শিখর স্পর্শ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর রচনার কলানিপুণ সাহিত্যকৃতি পূর্ববর্তী কোনো বাংলা কাব্যের আদর্শ থেকে গ্রহণ করেন নি, সুতরাং এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। বড়ুর পরিবেশনে কিছু কিছু গ্রাম্যতা দোষ লক্ষগোচর হলেও কাব্যের দেহনির্মাণে তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণের নন্দনতাত্ত্বিক নিদর্শনকেই তাঁর কাব্যে জয়যুক্ত করেছেন। এককারণেই তাঁর ব্যবহৃত উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষা রসোচ্ছল ও মাধুর্যপূর্ণ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায়, পরস্পরের হাবভাব, ছলাকলা ও প্রণয়লীলার প্রকাশে বড়ুর ব্যবহৃত উপমা ও রূপকের সার্থকতা অনুভূত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবি জনজীবনে প্রচলিত নানাবিধ প্রবচন ও বাগধারা এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে উপমা চয়ন করেছেন।

ছন্দ-বৈচিত্র্য॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আগে চর্যাপদে ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কিছু কিছু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও তা একটা বিশেষ নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে অবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির ব্যবহৃত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কোনো কোনো জায়গায় মাত্রাসমতা ক্ষুণ্ন হলেও পয়ার ত্রিপদীর মূল কাঠামোটি তাতে অটুট রয়েছে। বড়ুর কাব্যের ছন্দ কুশলতা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীতে পরিণতি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা ও ব্যাকরণ॥ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই সময় বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকায়ত সাহিত্যিক প্রচেষ্টা চলছিলো, তবে সেই বিশেষ সময়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধিরূপে স্মরণযোগ্য কোনো সাহিত্য নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিসীমার অন্তরালে রয়ে গেছে। আদি মধ্যযুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ক্রমপরিণতি আমরা লক্ষ্য করি পরবর্তীকালে মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যে।

চর্যার পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হয়। চর্যা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তৎসম শব্দের প্রয়োগ অধিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হিন্দুপুরাণ ও গীতগোবিন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত; সুতরাং সংস্কৃতের কাছাকাছি থাকা তার পক্ষে বিচিত্র নয়। এতে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ বাহুল্য আছে; যেমন-'বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী', 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ইত্যাদি।

প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ঐ, ঔ এই বর্ণ তিনটির ব্যবহার নেই, চর্যাপদে এদের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিলো ; এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্যাপদ অপেক্ষা মূলের অধিক নিকটবর্তী। যেমন,— শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'দৃঢ়', চর্যাপদে 'দিঢ়', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'যৌবন', চর্যাপদে 'জৌবন' ইত্যাদি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

চর্যাপদে শ, ষ, স, ন, ণ, য, জ ইত্যাদির ব্যবহারে কোনো নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলা হয় নি, তবে কোথাও কোথাও সংস্কৃতের আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইসব শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব মূলকে আশ্রয় করা হয়েছে।

পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের মতো চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দ্বিবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না, একাধিক হলেই বহুবচনের প্রয়োগ হয়। এছাড়া সংস্কৃতের শব্দরূপ অনুসরণে বহুবচন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত চর্যা কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। এরূপ স্থলে গণ, সকল ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বহুবচন নির্দেশিত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে দেখা যায় চর্যাপদ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আধুনিক বাংলার অধিক নিকটবর্তী। চর্যাপদে রা, এরা এইসব বিভক্তির ব্যবহার নেই ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় যেমন, -

বিকল দেখিআঁ তথা রাখো আলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মনে।
আজ্হি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী।
আহ্মারা মরির শুনিলেঁ কাশে।

চর্যাপদে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণে এবং অতীত কালের ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গে ই এবং ঈ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ; যেমন, 'তোহারি কুড়িআ' (চর্যা ১০), 'রাতি পোহাইলী' (চর্যা ২৮) ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই পদ্ধতির অনুসরণ দেখা যায় ; যেমন 'বড়ায়ি লইআ রাহী গেলী সেইখানে'। আধুনিক বাংলায় এসব পদ্ধতি বর্জন করা হয়েছে। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণেও বিভক্তি প্রয়োগ বাহুল্য মাত্র।

কারক-বিভক্তির বিশিষ্ট প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লক্ষ্য করা যায়। আজকাল কর্তৃ ও কর্মকারকের একবচনে সাধারণত বিভক্তির প্রয়োগ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত 'বড়ায়ি', 'রাহী' ইত্যাদি শব্দে এসব নিদর্শন আছে। অবশ্য চর্যার সময়েই তার সূচনা হয়।

করণের দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই শুরু হয় ; যেমন—'দূতা দিয়া পাঠাইলে কর্পূর তাম্বুলে'। চর্যাপদে এরূপ রীতি অনুসৃত হয় নি।

চর্যার অপাদান কারকে অপভ্রংশের প্রভাবজাত 'হুঁ' বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই রীতি অনুসৃত হয় নি ; তার বদলে নতুন শব্দ ব্যবহারের প্রবর্তন দেখা যায় ; যেমন— 'এবে হৈতেঁ দৈবকীর যত গর্ভ হএ', 'আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ মনে' ইত্যাদি। প্রাকৃত 'হিংতো' প্রত্যয় থেকে এরূপ হয়েছে ; এ থেকে পরবর্তী 'হইতে' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

বিভক্তির অভাবে কারকগুলো বিশেষত্বহীন হয়ে পড়লে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেক নতুন শব্দের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। চর্যার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

কর্তৃকারকে এ-কার, তৃতীয়ার এ, এঁ (এনজাত) ; কর্ম, সম্প্রদান ও ষষ্ঠীর ক (কৃতজাত) ; সপ্তমীর এ, এঁ, তে (অস্মিন ও অন্তজাত) প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। চর্যাপদে অপভ্রংশের প্রভাবহেতু সর্বনামের উত্তম পুরুষের হাঁউ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এরূপ রীতি বর্জিত হয়েছে, তার বদলে আম্মা, আম্মি, আম্মে এবং মো, মোঁ ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।*

ব্যাকরণগত দিক থেকে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করলে আদি যুগ ও আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা জন্মে।

তিন ॥ বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় পদ রচনা করেছেন। মৈথিল ভাষা হিন্দির সঙ্গে বিমিশ্র হয়ে ব্রজবুলি নামে পরিচিত হয়। বিদ্যাপতি প্রধানত এই ব্রজবুলি ভাষার কবি। বিদ্যাপতির আদর্শে অনেক বাঙালি কবি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। সেজন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্রজবুলির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বিদ্যাপতির জন্মভূমি মিথিলাসহ উত্তর বিহারের প্রায় গোটা এলাকা একসময় বাংলার সেন রাজবংশের অধীন ছিলো। বাংলার নব্যন্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চায় মিথিলার প্রভাব অনস্বীকার্য।

বিদ্যাপতির জন্মস্থান ও অন্যান্য পরিচয়॥ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বিদ্যাপতি মিথিলার মহারাজ শিবসিংহ প্রদত্ত দ্বারভাঙা জেলার সীতামঢ়ী মহকুমার অন্তর্গত বিসফি নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বংশ পরম্পরায় এদের কৌলিক উপাধি ঠক্কুর অর্থাৎ ঠাকুর। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ পাণ্ডিত্যচর্চায় খ্যাতিমান ছিলেন। কবির অতিবৃদ্ধ ষষ্ঠপুরুষ ধর্মাদিত্য ঠাকুর থেকেই এই বংশের অনেকে মিথিলা রাজের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। কবির প্রপিতামহ বীরেশ্বর 'বীরেশ্বর পদ্ধতি' নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাপতির পিতামহ যোগীশ্বর জয়দত্ত একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কবির পিতা গণপতি ঠাকুর 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

গণপতি ঠাকুর ছিলেন রাজা গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত। বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ 'পদামৃত সমুদ্রে'[৩২] নিজের পরিচয় দিতে বিদ্যাপতি বলেন,

জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলীদেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
রহতহি রাজ সন্নিধান
লছিমা চরণ ধ্যানে কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহ ভণে॥

---

৩২ রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে প্রায় ১৭৩০টি বৈষ্ণব পদ সংকলিত হয়েছে।

মিথিলার রাজপরিবারের রাজা ভোগীশ্বর থেকে রাজা রুদ্রনারায়ণ পর্যন্ত ছয়পুরুষের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষদের অনেকেই।

বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ব্যক্তিরূপে মিথিলার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁর পদাবলীতে মিথিলার যে সমস্ত মহারাজের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন কার্তিক সিংহ, ভৈরব সিংহ, রামভদ্র, শিবসিংহ ও মহারাজ নরসিংহ দেব।

বিদ্যাপতির কালনির্ণয়॥ কবির কাল নির্ণয়ে যে দুটি বিষয় আমাদের সহায়তা করে তা হচ্ছে মহারাজ শিবসিংহ-প্রদত্ত কবির বিসফি গ্রাম লাভ, অপরটি মিথিলার রাজপঞ্জিতে প্রাপ্ত শিবসিংহের সিংহাসন-আরোহণ কাল। শিবসিংহের ভূমিদান সম্পর্কে যে তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে তাতে এই দানপত্রের কাল ২৯৩ সংবত বা ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ বলে জানা যায়। অন্যদিকে মিথিলার রাজপঞ্জি অনুসারে রাজা শিবসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির কাল ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দ। দুটি ঘটনার মধ্যে কাল সংক্রান্ত যে বিভিন্নতা রয়েছে তাতে ৪৬ বছরের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হয়তো দুটো ঘটনার মধ্যে একটির তারিখ সত্য, অপরটির সত্য নয়। বিদ্যাপতির কাল নির্ণয়ে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করা যায় সেগুলো হলো, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি সনের উল্লেখ; বিদ্যাপতির নির্দেশ অনুযায়ী দেবশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সংস্কৃত গ্রন্থ 'কাব্যপ্রকাশে'র যে টীকা রচনা করেন তার শেষ ছত্রে ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দ কালে সনটি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশে' উল্লিখিত হয়েছে বিদ্যাপতির সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের সাক্ষাৎ হয়েছিলো। অদ্বৈত আচার্যের জন্ম খ্রিস্টীয় ১৪৩৪ অব্দে। সুতরাং ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাব্যপ্রকাশের টীকা রচনাকালে বিদ্যাপতি যে যুবক ছিলেন, একরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়; অন্যদিকে অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'লিখনাবলী'র তারিখ ল সং ২৯৯ বা ১৩৩০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪০৮ খ্রিস্টাব্দ। রাজা কীর্তিসিংহের প্রশস্তিমূলক রচনা 'কীর্তিলতা'য় জৌনপুরের সম্রাট ইব্রাহীমের নাম উল্লিখিত হয়েছে। ইব্রাহীমের রাজত্বকাল ১৪০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতির একটি পদে বলা হয়েছে,

মহলম জুগপতি চিরে জিব জীবথু
গ্যাসদীন সুরতান।

'গ্যাসদীন সুরতান' সম্ভবত সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ যাঁর রাজত্বকাল ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ। এসব নানাদিক বিচার করে অনুমান করা যায় বিদ্যাপতির কাল পুরো পঞ্চদশ শতক। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এসম্পর্কে যে অভিমত দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন, ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এবং হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন বিদ্যাপতি ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

বিদ্যাপতির নির্দিষ্ট জীবনকাল এবং মৃত্যুকাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে তর্কবিতর্কের অবসান হওয়া সম্ভব নয়। নিজস্ব মতানুযায়ী এক একজন পণ্ডিত নিজস্ব ধারায় যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তবে সমস্ত যুক্তি এবং তর্কের মধ্যে যে সত্যটি প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের কবি।

কোনো কোনো সমালোচক **বাঙালি বিদ্যাপতি** বলে একজন স্বতন্ত্র বিদ্যাপতির নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর উপাধি ছিলো কবিরঞ্জন; তবে কিছু কারণে মৈথিল বিদ্যাপতি এবং কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির ভিন্নতা সত্যসিদ্ধ নয়। কবিরঞ্জন ভণিতায় যেসব পদ পাওয়া যায় তাতে বিদ্যাপতির রচনাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। 'পদকল্পতরু'র ২৩৯০ সংখ্যক পদে সুরধুনীতীরে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন হয়েছিলো বলে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,—

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুনতহি রূপনারাণ
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ লছিমা পদ করি ধ্যান॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে যে রসতত্ত্ব নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন একথা বোঝা যায়। কিন্তু এতে লোকপ্রসিদ্ধ পদাবলীর কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সন্দেহের নিরসন হয় না। কেননা উক্ত পদে যে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব আলোচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা মিথিলার বিদ্যাপতির ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্তী বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৩] সম্ভবত পরবর্তী কোনো কবি উক্ত রসতত্ত্বের ধারার বিষয়টি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় আরোপ করেন। এছাড়া কবিরঞ্জনের ভণিতায় লেখা অন্যান্য পদেও বিদ্যাপতির পরবর্তী বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত কবিরঞ্জনের দুটি পদ, 'কি কব রাইয়ের গুণের কথা' এবং 'আর কবে হবে মোর শুভখন দিন' বিদ্যাপতির রচনাদর্শ বিরোধী। বিদ্যাপতির ভণিতায় রচিত একটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার পদ,

শুনলো রাজার ঝি তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি একাজ করিলি কি॥

উক্ত পদটি যদিও বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবু এটি বিদ্যাপতিরই রচিত কিনা, না কি কবিরঞ্জনেরই রচনা, এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না। কেননা বিদ্যাপতি মাতৃভাষা মৈথিল ছেড়ে খাঁটি বাংলা ভাষায় পদ লিখেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গোপালদাসের রসকল্পবল্লী ও শাখা নির্ণয় থেকে প্রমাণ করেছেন যে কবিরঞ্জন বলে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের এক শিষ্য ছিলেন এবং তিনি বিদ্যাপতির ধারায় পদ রচনা করতেন; যেমন 'কবিরঞ্জন ভণে, ঐছে নিবেদন, রঘুনন্দন পদদ্বন্দ্বে'; পদবন্ধে ইনি ছোট বিদ্যাপতি বলে অভিহিত হয়েছেন। এইসব দিক বিচার করে এরূপ অনুমান করা যায় যে, একাধিক চণ্ডীদাসের ন্যায় একাধিক বিদ্যাপতি বাংলা পদাবলী সাহিত্যে বিরাজমান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন মিথিলার প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবখ্যাত কবি

৩৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৩য় খণ্ড (কলিকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি:, ১ম সং ১৯৬৬), পৃ. ৬৩২

বিদ্যাপতি, অপরজন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-শিষ্য কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, যিনি ছোট বিদ্যাপতি বা বাঙালি বিদ্যাপতি রূপেও খ্যাত। শেষের জন সম্ভবত সপ্তদশ শতকের কবি। বিদ্যাপতি ভণিতায় যে সমস্ত খাঁটি বাংলা পদ পাওয়া যায় সেসব পদ তাঁরই রচনা বলে অনুমান করা যেতে পারে। বিদ্যাপতির ভণিতায় অন্যান্য যেসব বাংলা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলো হলো,- -

ক. একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায়॥

খ. কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥

গ. যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিব মোর নাম দুই চারি॥

বিদ্যাপতির ভণিতায় রচিত এসব পদ নিশ্চয় কোনো বাঙালি কবির রচনা।

বিদ্যাপতির রচনা-বৈচিত্র্য॥ কবি বিদ্যাপতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর নামে প্রচলিত যেসব পদ ও গ্রন্থাদি পাওয়া গিয়েছে তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। ব্রজবুলি ছাড়াও তিনি সংস্কৃতে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলো ব্রজবুলি ও মৈথিল ভাষায় লিখিত। সংস্কৃতে তিনি যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো হলো, মহারাজ কীর্তিসিংহের প্রশস্তিমূলক রচনা 'কীর্তিলতা'। ধারণা করা হয় বিদ্যাপতির 'কীর্তিপতাকা' নামক অপর একটি গ্রন্থ রাজা কীর্তিসিংহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছে। এই দুটো গ্রন্থেরই মূল বিষয় যুদ্ধবিগ্রহ। রাজা শিবসিংহের আদেশক্রমে রচিত 'পুরুষ-পরীক্ষা'। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত। এটি একটি আখ্যান কাব্য। মহারাজ ভৈরবসিংহ বা হরিনারায়ণের রাজত্বকালে যুবরাজ রামচন্দ্র বা রূপনারায়ণের ইচ্ছাক্রমে রচিত হয় 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। রাণী বিশ্বাস দেবীর প্রেরণায় কবি লেখেন 'গঙ্গাবাক্যাবলী'। স্মৃতিশাস্ত্রমূলক গ্রন্থ 'দানবাক্যাবলী' এবং 'বিভাগসাগর'। এছাড়া তাঁর নামে 'লিখনাবলী' ও 'ভাগবত' নামক দুখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়। রাজা শিবসিংহের রাণী লছিমা দেবীর উৎসাহে কবি ব্রজবুলি মিশ্রিত মৈথিল ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। বিদ্যাপতি তাঁর পদাবলীতে হরগৌরী, কালী, গঙ্গা প্রভৃতি শাক্ত দেবদেবীরও বন্দনা করেছেন। তাতে মনে হয় তিনি কেবল বৈষ্ণব ধর্মসম্মত রাধাকৃষ্ণের উপাসকই ছিলেন না, তিনি বৈষ্ণব, শাক্ত নির্বিশেষে সব দেবদেবীরই উপাসনা করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী ও কবি বিদ্যাপতি॥ বিদ্যাপতি সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে গ্রন্থ রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন বৈষ্ণব পদকর্তা রূপেই খ্যাতিমান। বৈষ্ণব পদাবলীতে তিনি যে প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন, ভক্তি ও রূপমুগ্ধতার অভিসিঞ্চনে নির্মিত তাঁর সেই পদের প্রবাহ চৈতন্যোত্তর পদাবলীতেও প্রবহমান হয়। এই দিক থেকে ধারণা করা যায় কবি বিদ্যাপতিই বাংলা পদাবলী সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রেরণাদায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কবি একটি সামগ্রিক মানবপ্রেমের মহিমায় কল্পনা করে তাতে অধ্যাত্মলোকের তাৎপর্য আরোপ করেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর রসবৈচিত্র্য অনুসরণ করে

পরবর্তী পদকর্তাগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে পদ রচনা করেছেন। এসব বিষয়ে দুর্লভ প্রেরণা সৃষ্টির জন্য বিদ্যাপতি অনেক বৈষ্ণব কবির আদর্শ ছিলেন, এমন মনে করা যায়।

বিদ্যাপতির পদে দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে তাঁর কাব্যভাবনা, অপরটি তাঁর আধ্যাত্মিকতা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা চিত্রণে যে উচ্চতর কবিকল্পনার ঐশ্বর্য পরিকীর্ণ, বিদ্যাপতির পদাবলী এই দিক থেকে মহৎ কাব্যভাবনার দ্যোতক। কবির পদে যে বৈষ্ণব রহস্যবাদ লক্ষ্য করা যায় তা তাঁর অধ্যাত্ম ভাবমহিমার পরিচয় বহন করে। যে মধুর রসতত্ত্বকে কবি তাঁর পদাবলীতে উপজীব্য করেছেন, তার ব্যাখ্যা করলে এরূপ দাঁড়ায় যে পরমাত্মা অসীম ও স্পর্শশূন্য হলেও জীবাত্মার প্রণয়ানুভূতিতে তিনি সসীম হয়ে ভক্তের চিত্তে ধরা পড়েন এবং সেজন্যই তিনি জীবাত্মার কাছে একান্তভাবে ধরা দিয়ে তাঁর প্রণয়পিপাসা চরিতার্থ করেন। সুফী ও মিস্টিক ধারায় তার আভাস আছে।

রাধার চরিত্র চিত্রণে বিদ্যাপতির মৌলিক ভাবকল্পনা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপক। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে কবি যে দৈবলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন তাতেও তিনি প্রাকৃত জীবন ও ভোগশক্তির প্রভাব দেখিয়ে তাকে মানবিক আবেদনে ভরপুর করেছেন। বিদ্যাপতির কিশোরী রাধা কৃষ্ণের প্রেমে ভাবমুগ্ধা নায়িকা ; বয়ঃসন্ধির প্রভাবে তার অন্তরে যে প্রেমের উন্মেষ ঘটতে থাকে, কবি তার স্তরগুলো মধুর রসে অভিষিক্ত করে নিজের মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। সখিগণ রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের দৌত্যে নিযুক্ত হয়ে উভয়ের মিলনের চারপাশে এমন একটি স্নিগ্ধমধুর ও হাস্যপরিহাস মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা কবির বিদগ্ধ রসরুচি ও মৌলিক ভাবকল্পনার পরিচায়ক। অভিসার পরিকল্পনা বিদ্যাপতির মৌলিকতার অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরাধার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকেই কবি এখানে বড়ো করে দেখিয়েছেন। অন্ধকার রজনীতে বর্ষার ঘনঘোর ও দুর্যোগপূর্ণ প্রকৃতি ও পথের দুর্গম বাধা উপেক্ষা করে বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের মিলনে অভিসার করেছে ; এতে কবি শ্রীরাধার প্রণয়ানুভূতির উদ্বেলিত অবস্থাকেই বুঝিয়েছেন। বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ কখনো পরমাত্মার প্রতীক, কখনো নিতান্ত প্রাকৃতজনের প্রতিনিধি ও স্থূল দেহসৌন্দর্যের পিয়াসী। শ্রীরাধা কখনো কৃষ্ণের পরম ভক্ত, কখনো তাঁর সহমর্মিণী রূপে তাঁকে গোঁয়ার বলে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না।

বিদ্যাপতির মাথুরবিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদ॥ বিদ্যাপতির মাথুরবিরহের পদগুলোতে শ্রীরাধার হৃদয়ার্তির প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে রাধা প্রণয়াস্পদকে দায়ী না করে নিজের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে কর্মফল ও অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে। রাধার অন্তরের এরূপ ভাবব্যঞ্জক বিদ্যাপতির একখানি মাথুর পদ উদ্ধৃত হলো,

হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঁওায়ব কি করব সো পিয়া লেহে॥
হরি হরি কি ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু যদি সৌরভ ছোড়ব শশধর বরখব আগি।

চিন্তামণি যদি নিজগুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগী॥
শাঙন মাহ ঘন বিন্দু না বরখব সুবতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব বিদ্যাপতির বহু ধন্দে॥

ভাবসম্মিলনের পদ-রচনায় বিদ্যাপতির কৃতিত্ব যথেষ্ট। শ্রীমতির অসহনীয় বিরহ-জ্বালায় কবির সহানুভূতিশীল হৃদয়টি মথিত হয়েছে। কবি জানেন বাস্তব জীবনে শ্রীরাধার মিলন সম্ভব নয়, তাই তাঁর সহজ অনুভূতি ভাবের রাজ্যে রাধাকৃষ্ণের বিরহ শেষে তাঁদের পুনর্মিলন ঘটিয়েছে। এ মিলনে রাধার আনন্দানুভূতিকে কবি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

বিদ্যাপতি সম্ভোগের কবি॥ বিদ্যাপতির কাব্যে আদিরসের বাহুল্য তাঁর সম্ভোগ-প্রিয়তার নিদর্শন। রসবৈচিত্র্যের দিক থেকে বিদ্যাপতি সম্ভবত জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত। কবির আদিরসের পদে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগবাসনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এ জাতীয় সম্ভোগের প্রায় কোনো লীলাই কবি পরিহার করেন নি। সম্ভোগের চিত্রে বিদ্যাপতির রাধা সম্পূর্ণ স্বাধীন ; সেই সূত্রে তাঁর মন উন্মত্ত হয়ে সম্ভোগবাসনা প্রকাশ করেছে। কবিও শ্রীরাধার পরকীয়াবাদ বিস্মৃত হয়ে তাঁকে প্রায় স্বকীয়াভাবে গড়ে তুলেছেন। বর্ষার ঘনঘোর পরিবেশে প্রিয়মিলন আকাঙ্ক্ষায় শ্রীরাধার মনের অবস্থাকে কবি এভাবে প্রকাশ করেছেন,

এ সখি হামারি দুখের নাহিক ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গোর জস্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

বিদ্যাপতির ভাষা ও অলঙ্কার-প্রকরণ॥ বিদ্যাপতির পদের ভাষা স্নিগ্ধমধুর ও কাব্যরসে অভিসিঞ্চিত। এমনও মনে করা যায় যে বিদ্যাপতির ব্রজবুলিতেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। অলঙ্কারসমৃদ্ধ ব্রজবুলিতে নায়িকার পূর্বরাগ ও অনুরাগের প্রকাশও স্বতঃস্ফূর্ততা পেয়েছে। যেমন,—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

অলঙ্কার-প্রকরণে বিদ্যাপতি সংস্কৃত রীতি মেনে নিয়েও নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। রাধার রূপবর্ণনায় কবি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণ করেও নিজস্বতা রক্ষা করেছেন। শ্রীরাধার কৈশোর থেকে যৌবনের প্রতি পদক্ষেপের বর্ণনায় যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, যমক ও অতিশয়োক্তির ব্যবহার করেছেন কবি, তাতে তাঁর মৌলিকতা গুণটিই বড়ো হয়ে উঠেছে। রাধার রূপবর্ণনার একটি পদ,

গেলি কামিনি গজহুঁ গামিনী কি হসি পলটি নেহারি।
ইন্দজাল বা কুসুম সায়ক কুহকি ভেলি বর নারি॥
জোরি ভুজজুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বদন সুছন্দ।
দাম চম্পক কাম পূজল জাইসে সারদ চন্দ॥

যমকের একটি দৃষ্টান্ত,

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ সারঙ্গ তসু সমাধানে
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ কেলি করথি মধুপানে॥

বিদ্যাপতির পদ সম্পর্কে মতবিরোধ॥ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত সহস্রাধিক পদের মধ্যে সব হয়তো তাঁর রচনা নয়। বিদ্যাপতির পদ বাংলায় ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বিভিন্ন সংগ্রাহক ও গায়েনের হাতে পড়ে কোনো কোনো পদের ভাষার হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত এসব পদে কবিবল্লভ, রায়শেখর, শেখর কবি, ছোট বিদ্যাপতি ইত্যাদি ভণিতা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদ চিহ্নিত করা যায় এভাবে। যেহেতু বিদ্যাপতি চৈতন্যপূর্ববর্তীকালীন কবি, সুতরাং তাঁর নামে প্রচলিত কোনো পদের ভাষায় যদি চৈতন্য-পরবর্তীকালীন ভাবাদর্শ পরিলক্ষিত হয়, তবে সেসব পদ বিদ্যাপতির রচিত নয় বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যান্য দিক থেকে যেসব পদ বিদ্যাপতির হওয়া বাঞ্ছনীয়,— যেসব পদে অবহট্ঠ ও মৈথিল ভাষার নিদর্শন মেলে। যেসব পদ মিথিলার প্রাকৃত জীবনযাত্রার পরিচয়বাহী। যেসব পদ রাজসভার প্রভাবযুক্ত প্রণয় ছলাকলার ভাবপ্রকাশক। রাধাকৃষ্ণের প্রাকৃত প্রেমের পরিচয়বাহী যেসব পদ।

চার॥ চণ্ডীদাস-সমস্যা

বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক বাংলা সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস এই তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। দীন চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তীকালের

কবি একথা তিন চণ্ডীদাসের রচনার ভাব, ভাষা ও আদর্শগত দিক বিচার করে প্রমাণিত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস হচ্ছেন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তীকালীন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির কবি, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য-সমসাময়িক কিংবা তাঁর অল্প পরবর্তী ; পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ ভাবোদ্দীপক অংশগুলো তাঁর রচনা। তৃতীয় জন দীন চণ্ডীদাস ; সংখ্যায় তাঁর পদ বেশি হলেও কাব্যভাবনার দিক থেকে তার মূল্য কম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে জানা যায় বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন বাসলী দেবীর ভক্ত। তিনি বড়ু বা বটু উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে প্রাকচৈতন্যযুগের কবি, বৈষ্ণব সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। যেমন, ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি জয়ানন্দ মিশ্র তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন,-

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত তাঁরা করিল প্রকাশ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে,

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করেন।[৩৪] বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম বলে মনে করা হয়। অবশ্য কেউ কেউ বীরভূম জেলার নান্নুর নামক স্থান বলে নির্দেশ করেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'তে বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের সাক্ষাতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।[৩৫] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, বিদ্যাপতির সঙ্গে যে চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ হয়েছিলো তিনিই হচ্ছেন বড়ু চণ্ডীদাস।[৩৬] তিনি অবশ্য বাঙালি কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিও হতে পারেন। চণ্ডীদাস তাঁর পদে কিশোরী ভজন করেছেন। আলোচ্য চণ্ডীদাসও কিশোরী ভজন করেছেন। যেমন,

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন। কাব্যখানি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কতকগুলো গীতের সমন্বয়। এতে বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব বিশেষভাবে লক্ষগোচর হয়। কাব্যে ঘটনাবিবৃতি, নাট্যরস ও গীতিরসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় কবি যে শিল্পরস অবলম্বন

৩৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড (ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১ম সং. ১৩৭১), পৃ. ৫২

৩৫. সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' (কলিকাতা : ৫ম সং.), ভূমিকা, পৃ. ১৬৬-১৬৭

৩৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫

করেছেন তা অমার্জিত ও গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট হলেও বাস্তবতার সুরটি তাতে অকুণ্ঠিত। এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রত্যক্ষ মানবরসের কাছে পরাভূত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার নিদর্শন,—

আঝর ঝরএ মোর নয়ানের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজএ সুসর বাঁশী নন্দের নন্দন॥

পূর্বেই বলা হয়েছে যে দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের (১৪৮৬—১৫৩৩) সমসাময়িক কিংবা তার অল্প পরবর্তী। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে উল্লিখিত হয়েছে,—

জন্মিলেন আপনি হরি শ্রীচৈতন্য নাম ধরি
সঙ্গে লইয়া পারিষদগণ।

পদটির শেষ অংশে,

আসিবেন আপন নাথ ভক্তগণ লইয়া সাথ
নামপ্রেম করিতে স্থাপন।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস সে চরণে মোর আশ
সর্ব্ব ছাড়িল পশিল চরণ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় দ্বিজ চণ্ডীদাসও দেবী বাসলীর পূজক ছিলেন। দ্বিজ চণ্ডীদাসের অপর একটি পদের ভণিতায় রূপগোস্বামীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,—

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগায় ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

সম্ভবত চৈতন্যদেবের শিষ্য রূপগোস্বামী দ্বিজ চণ্ডীদাসের গুরু কিংবা গুরুস্থানীয় ছিলেন।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। এ ভাষার সুরমাধুরী অনুভূতির গভীরে অনুরণন জাগায়। তাঁর নায়িকা আত্মহারা ভাবতন্ময়তায় আবিষ্ট। কৃষ্ণনাম জপে তার হৃদয় আবেশে ভাববিভোর। কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় নায়িকার হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। একটি উদাহরণ,

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

কিছু অংশ বাদ দিয়ে,—

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

মণীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় যেসব পদ আছে, তাতে দেবী বাসলীর উল্লেখ নেই। মণীন্দ্রমোহন বসুর এই সন্ধান-প্রয়াসকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমাণসিদ্ধ বলে সমর্থন জানিয়েছেন।[৩৭] অধিকন্তু তিনি দীন চণ্ডীদাসের পদে রজকিনী, রামী বা নান্নুর উল্লেখ নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩৮] বড়ু চণ্ডীদাস যেমন একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করেছেন, দীন চণ্ডীদাস তেমনি একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত পদাবলী ছাড়া কোনো ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করেন নি।[৩৯] বড়ু চণ্ডীদাস কিংবা দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনায় ব্রজবুলির ব্যবহার নেই, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পদে ব্রজবুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'নরোত্তমবিলাস' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ, দয়া গতি দীনে॥

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকা অংশে বলা হয়েছে নরোত্তম ঠাকুর আনুমানিক ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতদের মতানুযায়ী দীন চণ্ডীদাস যদি যথার্থই নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে ষোড়শ শতকের শেষপাদ অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক অনুমান করতে পারি। দীন চণ্ডীদাসের কবিত্ব মধ্যস্তরের হলেও আখ্যায়িকার বিস্তারিত বর্ণনায় পুরাণোক্ত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার মাহাত্ম্যকে তিনি তাঁর কাব্যের পরিধিতে ধরে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ পদ কেবলমাত্র চণ্ডীদাস ভণিতায় রচিত। রাধার অন্তরের ভাবকল্পকে তিনি তাঁর পদাবলীতে একটা বিশেষ অনুভূতির রসে সিঞ্চিত করে আবেগমিশ্রিত ভাষায় রূপ দিয়েছেন। যেমন,-

স্বপনে কালিয়া, নয়নে কালিয়া, চেতনে কালিয়া মোর।
শুতে কালিয়া, বসিতে কালিয়া, কালিয়া কলঙ্ক কোর॥

অন্যত্র, --

পীরিতি রতন, করিয়া যতন, পীরিতি করিব তায়।
দুইমন এক, করিতে পারিলে, তবে সে পীরিতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে, এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন, সহজ মানুষ সে॥

উপরের পদাংশ দু'টির ভাব এবং ভাষা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাব এবং ভাষার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ; কাজেই এ রচনা দ্বিজ চণ্ডীদাসের হওয়াও অসম্ভব নয়। দীন চণ্ডীদাসের ভাষায় লালিত্যের অভাব তাঁর পদের শিল্পরসকে ব্যাহত করেছে। তবে এই পার্থক্য নিরূপণ বেশ কঠিন। হয়তো রচনাভঙ্গি দেখে তা আন্দাজ করা যায় মাত্র। যেমন,—

---

৩৭ পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ ৫৯
৩৮ 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, ৫৯
৩৯ পূর্বোক্ত, ৫৯

জীয়ে কিনা জীয়ে রাই, কহিলা তোমার ঠাঁই, পরদশা আসি উপজিল।
বড়ই কঠিন দেখি, শুনহ কমল আঁখি, তুরিত গমনে তুমি চল॥
আছে যদি রাই এ কাজ, তুরিতে সেখানে সাজ, দেখ গিয়া ধনী বিরহিণী।
তুয়া দরশন আসে, তেঁই সে পরাণ আছে, চণ্ডীদাস ভালমতে জানি॥

কিংবদন্তির চণ্ডীদাস॥ এবার বহুল প্রচারিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের একক কাহিনী সম্পর্কে কিছু কথা। যথার্থত বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস কিংবা দ্বিজ চণ্ডীদাস,– এই তিন চণ্ডীদাস সম্পর্কে যত সমস্যা, তার সবটাই পণ্ডিতদের মত মতান্তর-ঘটিত সমস্যা। সাধারণ লোক তা নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং মাথা ঘামান না বলেই তিনজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে চিন্তাও করেন না। অথচ চণ্ডীদাস সাধারণ বাঙালির আবাল্য পরিচিত একটি নাম। বাঙালি তার ধ্যানে-জ্ঞানে, ঐতিহ্যে পরম্পরায়, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে যাঁর কথা ও কাহিনী এবং যাঁর পদাবলী ও কীর্তনগান শুনে মুগ্ধ, তিনিই বাংলার আবহমানকালের কিংবদন্তির চণ্ডীদাস। পাণ্ডিত্যের বিচারে তিনিই সম্ভবত দ্বিজ চণ্ডীদাস। তাঁকে নিয়েই এখন আলোচনা।

বীরভূম জেলার সাকুলীপুর থানাধীন নান্নুর নামক স্থানে চণ্ডীদাসের জন্ম। বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মও বীরভূমের নান্নুর বলে অভিহিত হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান নেই। কবির পিতা দুর্গাদাস বাগচী একজন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চণ্ডীদাসের বয়স যখন খুব কম তখনই তাঁর পিতামাতার মৃত্যু ঘটে। সহায় সম্বলহীন চণ্ডীদাস তখন নিজের গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী নিযুক্ত হন। উক্ত মন্দিরে রামমণি নামে এক রজককন্যা বিশালাক্ষী দেবীর পরিচারিকা হিসেবে কাজ করতো। ক্রমে চণ্ডীদাস ও রামমণির মধ্যে আসক্তি জন্মে এবং ধীরে ধীরে সে আসক্তি গভীর প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়। বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানাধীন শালতোড়া নামক গ্রামে নিত্যাদেবী নামে এক প্রাচীন প্রস্তরময়ী মনসার বিগ্রহ ছিলো। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে চণ্ডীদাস যখন পূজায় নিযুক্ত হন, তখন নিত্যাদেবীর পরিচারিকা বাসলী নাম্নী জনৈক কন্যা শালতোড়া গ্রামে অবস্থান করতেন। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে তিনি ডাকিনী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নিত্যাদেবীর আদেশে একদা বাসলী ব্রজরস প্রচারে বের হন এবং ঘুরতে ঘুরতে নান্নুর গ্রামে এসে পর্ণকুটিরে নিদ্রিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাৎ পান। চণ্ডীদাসকে দেখেই বাসলী বুঝতে পারেন তিনিই হচ্ছে ব্রজরস প্রচারের উপযুক্ত পাত্র। বাসলীর হস্তস্পর্শে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রচারে অনুপ্রাণিত হন এবং রসজ্ঞানের সাধনসঙ্গিনী হিসেবে রামীর সহগামিতা লাভ করেন। চণ্ডীদাস এবং রামী প্রেমের ভাবমূর্তিতে আত্মহারা হয়ে অতঃপর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেন। কিংবদন্তির চণ্ডীদাস গায়ক, ভাবুক ও রসিকের চিত্রে এভাবেই উপস্থাপিত হয়েছেন।

এই চণ্ডীদাস সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা এই যে তিনি সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। পরকীয়া প্রেম হচ্ছে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনতত্ত্বের মূলকথা, চণ্ডীদাস প্রধানত এই পরকীয়া প্রেমেরই কবি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস নন, কিন্তু প্রেমভাবনায় উভয়েই পরকীয়া প্রেমের কবি, যদিও প্রণয় সম্পর্কের ধারণা ও তার অভিব্যক্তিতে দুজনের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে, এবং এই প্রভেদসূত্রে বড়ু চণ্ডীদাস রাধা ও

কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের লীলায় বাস্তবতার অভিক্ষেপ ঘটিয়েছেন বেশি, অন্যদিকে দ্বিজ কিংবা দীন চণ্ডীদাস নিষ্কাম প্রেমের সাধনা করেছেন নিয়ত। অবশ্য আলোচ্য চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনতন্ত্রের মূল প্রবর্তক নন, তাঁর আগে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়া সাধনতন্ত্রের প্রচলন হয়েছিলো। তবে চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনতন্ত্রের অভিব্যঞ্জনায় শ্রেষ্ঠ বটে। পরকীয়া মতের অনুসারীরূপে তিনি কিশোরী ভজন করতেন। এই চণ্ডীদাস সম্পর্কে বহু গালগল্প ও কিংবদন্তি রয়েছে।

কিংবদন্তি অনুসারে রামী বা রামতারা ছিলেন চণ্ডীদাসের সাধন-সঙ্গিনী। রামী নিজেও কবি ছিলেন। ডক্টর দীনেশ সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' রামীর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করেছেন।[৪০] রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের সম্পর্কের জনশ্রুতিমূলক কাহিনী থেকে জানা যায় যে একদা গৌড়েশ্বরের দরবারে রামীর সঙ্গে চণ্ডীদাস যখন পদাবলী কীর্তন করছেন তখন সম্রাটের বেগম তাতে আত্মহারা হয়ে পড়েন। চণ্ডীদাসের প্রতি সম্রাজ্ঞীর অনুরাগ লক্ষ্য করে সম্রাট ক্রোধান্বিত হন। তৎমুহূর্তে অনুরাগ-সঞ্চারী চণ্ডীদাস হস্তী পৃষ্ঠে বন্ধনযুক্ত হয়ে প্রবল কষাঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন। চণ্ডীদাস সম্পর্কে অন্য যে দুটি কাহিনী ও জনশ্রুতি চিত্তকর্ষক ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে একটির বিবরণ হচ্ছে, একদা কবি যখন নিজের ঘরে চিত্তরঞ্জনকারী কীর্তনীয়া গানে বিভোর ছিলেন তখন বাদশাহী ফৌজ সেই ঘর আক্রমণ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। কবির গৃহ অগ্নির লেলিহান শিখার প্রোজ্জ্বল দহনে ভস্মীভূত হয় এবং তিনি তাতে প্রাণ হারান। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর মধুময় সম্পর্কের উপর অন্য আর একটি রোমান্টিক কাহিনী নির্মিত হয়। চণ্ডীদাস রামতারার সংস্পর্শে এক স্বর্গীয় প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হন। এই প্রেম কামগন্ধহীন, কবির ভাষায় 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়'। সুতরাং এ প্রেমের মূলতত্ত্ব হচ্ছে নিষ্কাম প্রেমের পরিচর্যা। সমাজের দুর্বিনীত ইচ্ছার বিরুদ্ধে চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামী তাদের প্রেমের মহিমা প্রচার করেন। এদিকে চণ্ডীদাসের অনর্গল লেখনীর ধারা পদাবলী সাহিত্যে প্রায় বানের তোড় আনে। রামীও কবি, সুতরাং তিনিও লিখেছেন পদাবলী এবং তাতে সহজিয়া প্রেমের জয়গানই গীত হয়েছে। চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমের উপাখ্যান থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাঙালির হৃদয় জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন চণ্ডীদাস ও রামী। এই দুই প্রেমিক-কবি কিংবদন্তির নায়ক আর নায়িকারূপে যুগে যুগে আপামর বাঙালির চিত্তের গভীরে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙালি তাই তাঁদের পদাবলী কীর্তন করে ভাবে হয় বিভোর। স্বর্গীয় প্রেমের অনুপম উপলব্ধিতে শ্রদ্ধান্বিত হয় চণ্ডীদাস-রামতারার প্রতি।

রামী/রামতারা।। বহুদিন পর্যন্ত যে চণ্ডীদাস ছিলেন এক ও অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি আবিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি হয়ে গেলেন ভিন্ন ও বিশেষ আলোচনার বিষয়। চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সাধারণভাবে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও

৪০. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (কলিকাতা : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ., ৮ম সং. ১৩৫৬), পৃ. ১৩৭-১৪০

দীন চণ্ডীদাস এই তিনজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এঁদের কাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক বলে অনুমান করা হয় (পদাবলীর চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী হিসেবে রামী বা রামতারার নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে। এই চণ্ডীদাস সম্ভবত দ্বিজ চণ্ডীদাস হবেন) তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বড়ু চণ্ডীদাসের সাধন সঙ্গিনীরূপে রামীর কথা উল্লেখ করেন।[৪১] এদিকে পদাবলীর দ্বিজ চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিভিন্ন গালগল্পের মাধ্যমে রামী অন্তরঙ্গ নিবিড়তায় বিজড়িত। তাতে রামীর জীবনকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষপাদ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদ বলে অনুমান করা যায়। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রামীর অন্তরঙ্গ প্রেমের সম্পর্ক ও বিষাদময় পরিণতির কথা চণ্ডীদাস রামীর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

রামী কেবল চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী রূপেই খ্যাতি অর্জন করেন নি, তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে রামীর লেখা যে কয়টি পদ উদ্ধৃত করেছেন,[৪২] সেই পদগুলোতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। একটি পদে রামী লিখেছেন,

সুন্দ কলেবর, হইল জর্জর
দারুণ সন্ধান ঘাতে।
এ দুঃখ দেখিয়া, বিদর এ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিনী, শুন গুণমনি
জানিলাঙ তোমার রীতি।
বাসুলি বচন, কবিলে লঙ্ঘন
শুনহ রসিক পতি॥

চণ্ডীদাস ও তাঁর পদাবলী॥ চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনতত্ত্বের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। সহজিয়া সাধকগণের বিশেষ প্রবণতা কিশোরী ভজন। চণ্ডীদাসও তাঁর কাব্যে কিশোরী ভজন করেছেন। কিশোরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি লিখেছেন,

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততই উদয় ভেল।

অন্য জায়গায় একই সুরে নিবেদন করেছেন,

চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে যেমনি
কপিলা চামর পারা।

---

৪১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮
৪২ পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৩৭

সহজিয়া সাধনতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ এই কবির রচনার শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হয় বিষয়-গৌরবে, ভাবের গভীরতায়, ভাষার কোমলতায় ও হৃদয়গত আকুলতার স্পর্শকাতর প্রকাশে। চণ্ডীদাসের রাধার অভূতপূর্ব প্রেমের মধ্যে মিলনে বিরহের ব্যাকুলতা, পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা ও প্রেমিকের সরব উপস্থিতির মধ্যেও তাকে হারিয়ে ফেলার এক রোদনভরা সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়। বিরহের এই অনন্য ছায়াপাত পদাবলীর অন্য কোনো কবির রচনায় প্রায় দেখা যায় না। সেজন্য চণ্ডীদাস বিরহের শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রীরাধার এই অভিনব প্রেমভাবনার অনুষঙ্গে কবির উক্তি,—

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

যদিও এই প্রেমের মধ্যে মানব-কামনার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এই স্পর্শিল কামনার মধ্যেও তাতে অধ্যাত্মভাবের দ্যোতনা আবিষ্কার করা সম্ভব। এ যেন দেহের মধ্যে জন্মলাভ করেও দেহের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। এই প্রেমের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নিখিল-বিশ্বের বিচ্ছেদ পীড়িত নারীহৃদয়ের আর্তি ও ব্যাকুলতা। শ্যামনামের ভাবাবেশে আবিষ্ট শ্রীরাধার কণ্ঠে শুনি,

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মন-প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে॥

আত্মসমর্পণের তাগিদে দয়িতের কাছে রাধার নিবেদন,

বধূঁ কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিচয় হইলাম দাসী॥

রাধিকার ভাবপীড়িত হৃদয়ের এই একনিষ্ঠ অভিব্যক্তির সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির সংমিশ্রণে অনবদ্য গীতিমাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে এসব পদে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষাও ভাবের ভাষা। এ ভাষায় তৎসম শব্দের বাহুল্য ও আড়ম্বর নেই। ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য যে সহজ সরল অথচ কলানিপুণ ভাষার প্রয়োজন, চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত ভাষায় সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এ ভাষা বিশেষ দরদের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনার গূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করেছে। ভাষাকে কত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা যায়, চণ্ডীদাসের পদাবলীর নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো তার সুন্দর নিদর্শন,—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে তেমনি হউক সে॥

মিলনের একটি পদে ভাবের এক মনোরম অভিব্যক্তি,—

বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে॥

আক্ষেপানুরাগের পদের অনুরূপ একটি অংশ,-

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে॥

এবং রসোদ্গারের কিছু অংশ,-

একূলে ওকূলে দুকূলে গোকূলে আপন বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥

এসব পদের ভাব ও ভাষা চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মমতায় মিশে আছে। চণ্ডীদাসই একমাত্র কবি যিনি তাঁর শৈল্পিক ভাবনায় পরকীয়া প্রেমের ভাবকে সহজভাবে প্রমূর্ত করে তোলার কলাকৌশল ধারণ করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য

প্রথম পর্ব (খ্রিস্টীয় ১৫-১৬ শতক)

ভারতে পাঠান রাজত্বের সময় হিন্দু সমাজে সংস্কৃত, বাংলা এবং অল্পাধিক ফারসি, মৈথিল ও হিন্দি ভাষার চর্চা হয়েছিলো। বাংলার মুসলমানগণের মধ্যে মুঘল যুগে উর্দু ও ফারসির চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই চর্চার ফলে বাংলায় অনুবাদমূলক সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্মরণীয় অনুবাদমূলক পুস্তকগুলোর মধ্যে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ। এসব অনুবাদমূলক পুস্তকে তৎকালীন বিশেষ কয়েকজন কবির সৃষ্টিদক্ষতা ও কলানৈপুণ্যও প্রকাশিত হয়েছে। তবে রামায়ণ মহাভারতের বাঙালি কবিগণ কেউ ই মূলকে হুবহু অনুবাদ করেন নি। মূল রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত অনুসরণে তাঁরা লিখেছেন বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও বাংলা কৃষ্ণলীলা কাব্য। তাঁরা ইচ্ছেমতো বাদ দিয়েছেন মূল উপাখ্যানের কোনো কোনো অংশ, কখনো ইচ্ছেনুসারে যোগ করেছেন নিজেদের মনগড়া কথা ও কাহিনী। মুসলমানি পুথি, যথা আলেফ লায়লা, পদ্মাবতী, রসুলবিজয় ইত্যাদি পুস্তক সম্পর্কেও একথা খাটে। সেখানেও কবিগণ মূল আরবি, ফারসি বা হিন্দি কাহিনীকে যথাযথ অনুবাদ না করে তার সারাংশটুকু কেবল গ্রহণ করেছেন, সেই সঙ্গে ইচ্ছেমতো মিশিয়ে দিয়েছেন নিজেদের ভাবকল্পনা ও মনের মাধুরী।

দুই।। রামায়ণ

কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ।। তুর্ক আমলের বিশৃংখল সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের দান অতুলনীয়। কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী থেকে তাঁর সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। কবির পিতার নাম বনমালী এবং মাতা মালিনী। তাঁরা ছয় ভাই, তাঁদের এক বৈমাত্রেয় ভাইও ছিলো।

কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। এক গৌড়েশ্বরের নাম প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা।' পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী পুত্র যদু বা জালালউদ্দীন (১৪১৮-১৪৩১)। তবে এ সম্পর্কে মতভেদও আছে। সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ,[৪৩] বাংলায় যাঁর রাজত্বকাল ১৪৫৯ খ্রি থেকে ১৪৭৪ খ্রি. পর্যন্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেছেন,—কৃত্তিবাস-কথিত গৌড়েশ্বর সম্ভবত রাজা গণেশের পুত্র ও উত্তরাধিকারী

৪৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, (১৩৩৮–১৫৩৮)' (কলিকাতা : ভারত বুক স্টল, ১ম সং. ১৯৬২), পৃ. ৩৬৮

জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। রাজা গণেশের স্বল্প সময়ের রাজত্বকাল অশান্তিপূর্ণ ছিলো। অন্যপক্ষে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৮–৩১ খ্রি.)।[৪৪] ডক্টর আবদুল করিম তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে বলেছেন,– 'আমি মনে করি, সুলতান গিয়াস-উদ্-দীন আজম শাহই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন।'[৪৫] গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকাল ১৩৮৯ খ্রি. থেকে ১৪০৯ খ্রি. পর্যন্ত। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমার মনে হয় কৃত্তিবাস বড়ু চণ্ডীদাসের অব্যবহিত পরবর্তী।'[৪৬] পণ্ডিতদের এসব মতবাদ ও মতভেদ থেকে অবশ্য এটিও প্রমাণিত হয় যে কৃত্তিবাসের সঠিক জন্মতারিখ জানা না গেলেও তিনি আসলে পঞ্চদশ শতকের কবিই ছিলেন, হয়তো কিছুকাল আগে পরে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় গৌড়েশ্বর তাঁর সম্পর্কে কৃত্তিবাসের সাতটি প্রশস্তিমূলক শ্লোক শুনে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। কৃত্তিবাস অবশ্য গৌড়েশ্বরের স্বীকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার রূপে মনে করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ॥ বর্তমান কৃত্তিবাসী রামায়ণে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের বাংলা ভাষার নিদর্শন আর দেখা যায় না। এর কারণস্বরূপ বলা যায় জনপ্রিয় রামায়ণ কাহিনী যুগে যুগে গায়েনদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার চলতি প্রবহমানতাকে ধারণ করে নব নব রূপ লাভ করেছে। এ কাজটি গায়েনরাই শুধু করেন নি ; শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রথম প্রকাশিত রামায়ণের দ্বিতীয় মুদ্রণেও (১৮০২ ১৮০৩) এর কোনো কোনো অংশের পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়।

তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে যদিও কবি সংস্কৃত ভাষায় প্রাজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের রসবোধ ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সহজ সরলভাবে ও ভাষার অনাড়ম্বর মাধুর্য দিয়ে তাঁর রামায়ণ কথা পরিবেশন করেছেন, বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নি। বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাই মৌলিক মর্যাদা পেয়েছে।

কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও পুরাণাদি থেকে ; কিন্তু তাঁর বাংলা কাব্যকে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে দেন নি। তাঁর কাব্যের বিষয়কে তিনি সাধারণ বাঙালি সমাজের রসবোধের অধিগম্য করে আড়ম্বরহীন পাত্রেই পরিবেশন করেছেন। এজন্য তাঁর রচনার প্রধান গুণ হচ্ছে তাঁর বাণীভঙ্গির বিশিষ্টতা এবং প্রাঞ্জল অথচ প্রসাদগুণান্বিত পরিবেশনা। সংস্কৃত কবি বাল্মীকির হাতে গড়া রাম ও সীতা বাঙালির চোখে নিতান্ত বিদেশী, তাঁদের আচার আচরণও তাই ভিন্ন দেশীয় ঐতিহ্যকেই প্রকাশ করে, কিন্তু কৃত্তিবাসের রাম এবং সীতা তাঁদের পরিবার-পরিজনসহ বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যের মধ্যেই লালিত। সুতরাং তাঁরা বাঙালির অনেক আপনজন। কয়েকটি উদাহরণ, –

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তারপর সূপ আদি দিলেন সানন্দ॥

ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরণ॥
শেষে অম্বলান্তে হৈল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।

বাঙালিব আদি ও অকৃত্রিম অতিথিপরায়ণতার নিদর্শন,--

গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রণে একে একে সবাকার ঘরে।

আসলে কৃত্তিবাসী বামাযণ কবির স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ বলে এই কাহিনী ও তার শিল্পবস বাঙালি জীবনেব নানা বৈশিষ্ট্যেব অভিমুখি, সহজেই যা বাঙালির জীবনমন স্পর্শ কবতে পেবেছে।

কৃত্তিবাস ছাড়াও আবো কযেকজন কবি বাংলায বামাযণ কাহিনী পবিবেশন কবেছেন। তবে কৃত্তিবাসেব মতো তাঁবা কেউ তাঁদেব অনুবাদে প্রতিভাব দীপ্তি আনতে পাবেন নি। এঁরা চৈতন্য পববর্তী যুগেব বিধায পবে এই বইযেব ত্রযোদশ অধ্যাযে আলোচিত হযেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিজ গঙ্গানাবাযণ, চন্দ্রাবতী, অদ্ভুতাচার্য, দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রমুখ।

তিন॥ ভাগবত

মালাধর বসু ও তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য॥ কৃত্তিবাস তাঁব কবিত্বগুণে গৌড়েশ্বরেব অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তেমনি মালাধব বসুও কৃষ্ণবিজয কাব্য লিখে বাজ সম্মান লাভ করেন। এ সম্পর্কে কবিব নিজেব উক্তি 'গৌড়েশ্বব দিলা নাম গুণবাজ খান।' এই গৌড়েশ্বব সম্ভবত রুকনউদ্দীন বাববাক শাহ, যাব বাজত্বকাল ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ। তবে কবির 'গৌড়েশ্বব' রুকনউদ্দীন বাববাক শাহ না হযে তাঁব পুত্র শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহও (১৪৭৪ ১৪৮১) হতে পাবেন। এই মত ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহব।[৪৭] কৃষ্ণবিজয় কাব্যেব উৎপত্তি সম্পর্কে কবি বলেছেন,

তেবশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বব দিলা নাম গুণরাজ খান॥

এই হিসেব মতে কাব্যেব বচনাকাল ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ হয়। হয়তো শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহই কবিব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মালাধব বসু বর্ধমানেব কুলীন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, জাতিতে ব্রাহ্মণ। মালাধবেব কাব্যেব উল্লেখ করেছেন জযানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিবাজ তাঁদেব কাব্যে।[৪৮]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥ গৌড়ীয বৈষ্ণবসাহিত্যের এই প্রিয় গ্রন্থখানি ভাগবতেব দশম স্কন্ধের একেবাবে আক্ষরিক অনুবাদ নয, তবে ভাবানুবাদ বটে। ভাবানুবাদে কবি ইচ্ছেমতো

---

৪৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য খণ্ড, পৃ. ৪১৩
৪৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩১ ১৩২

ভাগবত-বহির্ভূত বিবিধ উপাখ্যান সংযোজন করেছেন। কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ, জরাসন্ধের জন্মবিবরণ, শিশুপাল-বধ, শিশুপালের জন্মবিবরণ, বজ্রনাভ দৈত্যবধ ইত্যাদি উপাখ্যান যোজন করে কবি কৃষ্ণচরিত্রে বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছেন। মালাধর বসুর কাব্যের ভাষা সহজ ও অনাড়ম্বর এবং বর্ণনা স্বতঃস্ফূর্ত ও চিত্ররূপময়। যেমন,—

রজনী প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বাছুর রাখিতে গেলা যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে সিঙ্গা বাজাইয়া।
পশ্চাতে চলিলা শিশু বাছুর লইয়া॥
একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ ক্রীড়া করি যায় ধীরে ধীরে॥
কতিহোঁ কোকিল পক্ষ সুস্বর নাদ পূরে
তাঁর সঙ্গে রা কাড়ে রাম দামোদরে॥
কতিহোঁ মর্কট শিশু লাফ দেই রঙ্গে
তেন মতে জাগ কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
কতিহোঁ মউর পক্ষ নানা নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে রাম দামোদরে॥
কতিহোঁ পক্ষগণ আকাশে উড়ি যায়।
তাহার ছায়ার সঙ্গে ধাইয়া বেড়ায়॥
কোথাহ বুলেন ফুল তুলিয়া মুরারি।
কথো কানে কথো হৃদে নানা বর্ণে পরি॥
তেনমতে বৃন্দাবনে গেলেন গোপাল।
বড় ক্ষুধা হৈল সব বসএ ছাওয়াল॥

এই ভাষার সঙ্গে বাঙালির আজন্ম পরিচয়। মালাধর বসু সুকৌশলে কৃষ্ণবিজয়ের মূল বিষয়ের সঙ্গে প্রবহমান বাংলা ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করে কাব্যটিকে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও পরিবেশের উপর দাঁড় করিয়েছেন। ফলে কাব্যের আবেদন মর্মস্পর্শী হয়েছে এবং কাব্যটি অতিসহজেই বাঙালি পাঠকের হৃদয় জয় করতে পেরেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভক্তিভাবের সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তার চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। মালাধর বসুর আগে কোনো কাব্যে এরকম সহজ সরল ভাষায় অধ্যাত্মভাবের স্ফুরণ ঘটে নি। যেমন,-

সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রূপ তনু ধরি।
গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব এক মনে॥
সবাতে আছয়ে হরি এমন ভাবিহ।
আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ॥
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তারে জানে।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে॥
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়।

তেমনি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায়।
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন।
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন॥

আসলে মালাধর বসু বাঙালির সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনার যোগসূত্র রক্ষা করতে চেয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাব্যে ভাবুকতার মধ্যে ভক্তিভাবের অনুষঙ্গটি এমন চমৎকারভাবে মিশ্রিত হয়েছে। যখনই কবি অবকাশ পেয়েছেন তখনই তাঁর সহজাত এই মননের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেজন্য অন্যত্র দেখি, -

জল জন্তু স্থল জন্তু সুন্দর রূপ ধরে।
বৈষ্ণব শরীর যেন সেবিয়া হরিবে॥
বরিষার ধারা পাইয়া গিরি স্নিগ্ধ হইল।
হরি সেবি লোক সব চৈতন্য পাইল॥

বিষয়কে ভাবের অনুগামী করে মালাধর বসু মধ্যযুগের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কে তাঁর অনুভবকে বাংলা ভাষার কোমল মাধুর্যের সঙ্গে মিশিয়ে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, একজন একালের কবির পক্ষেও হয়তো তা সম্ভব নয়। যেমন - 'কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই। নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই।' এর চেয়ে মধুর আর সহজ বাক্য বাংলা ভাষায় আর কী হতে পারে! কিংবা কে তার উপস্থাপনা এত সহজভাবে করতে পারেন"

ষোড়শ শতকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ে কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ আচার্য, রঘুপণ্ডিত, দুঃখী শ্যামদাস প্রমুখ কয়েকজন কবি কাব্য লিখেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এদের সম্পর্কে আলোচনা আছে।

চার॥ মহাভারত

মহাভারতের অনুবাদ॥ বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা সঞ্জয় ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তখন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ছিলেন গৌড়ের সম্রাট। সেসময় ব্যাসদেব ও জৈমিনির মহাভারতের বাংলা সংস্করণ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নোয়াখালী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। অবশ্য একমাত্র কাশীদাসী মহাভারত ছাড়া অন্যান্য বাংলা মহাভারত তখন ততখানি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। কাশীদাসের অনন্য শিল্পকৌশলে মহাভারতের বিষয় বহুলাংশে বাঙালি মানসের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে, ফলে বাঙালি মানস যুগ যুগ ধরে কাশীদাসের ভারত কাহিনীর রসপান করে তৃপ্ত হয়। এখনো তার আবেদন সম্পূর্ণত বজায় রয়েছে বলে মনে করা যায়।

সঞ্জয়॥ সঞ্জয় বাংলা অনুবাদমূলক মহাভারতের আদিকবি বলে অনুমিত। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, সঞ্জয়ের মহাভারতের প্রচার 'সমস্ত পূর্ববঙ্গময়' ছিলো।[৪৯] কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন মহাভারতকার হিসেবে সঞ্জয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।[৫০] তবে সঞ্জয়ের ভণিতায় মহাভারতের যে অস্তিত্ব আছে তা তিনি অস্বীকার করেন না। সঞ্জয়ের

৪৯. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৮৯
৫০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১২১

মহাভারতে মূল জৈমিনি মহাভারতকেই আশ্রয় করা হয়েছে। কেননা সঞ্জয় জৈমিনির প্রসঙ্গ এনেছেন। যেমন,—

> মুনি কহিল কথা ভারত-তন্তর
> শুনিয়া রাজার রোগ খণ্ডিলেক সব॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর॥ হুসেন শাহের আমলে তৎকালীন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর আদেশ ও উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। এই মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। কবীন্দ্রের মহাভারতে মূল মহাভারতের যুদ্ধকাহিনীটুকুই স্থান পেয়েছে। এতে বার বার হুসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরত শাহের নামোল্লেখ হয়েছে। বোঝা যায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী শোনার বিষয়টি এসব উদারচেতা মুসলমান শাসকদের মধ্যে একটা রেওয়াজে পরিণত হয়। কবীন্দ্রের মহাভারত কবিত্বের দিক থেকে উঁচুমানের না হলেও তার ভাষার সারল্য প্রশংসনীয় শিল্পভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

শ্রীকর নন্দী॥ শ্রীকর নন্দী ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের কবি। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তিনি সম্ভবত চট্টগ্রাম ও তৎকালীন ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থান করেই তাঁর কাব্য রচনা করে থাকবেন। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী জৈমিনি সংহিতার অশ্বমেধপর্ব অবলম্বনে বাংলায় এক নতুন অশ্বমেধপর্ব মহাভারত রচনা করেন। গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ। পরাগল খাঁর আদেশে শ্রীকর প্রথমে মহাভারতের অভিষেকপর্ব পর্যন্ত অনুবাদ করেন। পরে পরাগল খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে বাকী অংশ রচনায় উৎসাহিত করেন। অশ্বমেধপর্বে অভিযান বর্ণনার প্রাধান্য থেকে অনুমান করা হয় বাদশাহী সেনাপতিদের এই কাহিনী বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে থাকবে। যৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ জনা, সুধন্বা, প্রমীলা-অর্জুন, বভ্রুবাহন ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যানও শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। ত্রিপুরা অভিযান প্রসঙ্গে কবির উক্তি,

> ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ
> পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥

শ্রীকর নন্দীর রচনার কিছু নিদর্শন, -

> পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খণ্ড মহামতি।
> একদিকে বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
> শুনন্ত ভারত তবে অতিপুণ্য কথা।
> মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
> অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
> সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
> দেশী ভাষায় এহি কথায় রচিল পয়ার।
> সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার॥

ষোড়শ শতকে অন্য যেসব কবি মহাভারত অবলম্বনে কাব্য লিখেছেন তাঁরা হলেন দ্বিজ অভিরাম, রামচন্দ্র খাঁ, নিত্যানন্দ ঘোষ, ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ। এ বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এদের সম্পর্কে আলোচনা আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চৈতন্যপর্বের বাংলা সাহিত্য

(খ্রিস্টীয় ১৫-১৬ শতক)

চৈতন্যদেব

জীবনকথা॥ চৈতন্যদেবের জন্ম-সময় বাংলায় শৈবধর্মের চেয়ে শাক্তধর্মের প্রভাব ছিলো বেশি। তবে বাংলার বৈষ্ণব-সমাজ স্বভাব অনুযায়ীই এসময় রাধাকৃষ্ণের পূজায় নিবেদিত থেকে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশে অধিকতর আগ্রহবোধ করে। ভগবদ্‌ভক্তি ভগবৎ প্রেমে রূপান্তরিত করার সচেতন প্রয়াস চললো এবং ভক্তিভাবও ক্রমশ মাধুর্যরসে পরিণত হলো।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম নবদ্বীপে, ১৪০৭ শকাব্দ বা ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে। তার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী। বংশমর্যাদায় চৈতন্যদেব পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তার পিতা একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষদের বসতি ছিলো শ্রীহট্টে। সেইসূত্রে চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ 'সিলেট হইতে আসিয়াছিলেন।'[২১] চৈতন্যদেবের মাতা শচীদেবী আট কন্যা এবং দুই পুত্রের জননী ছিলেন। আটটি কন্যাই অল্প বয়সে মারা যায়। শ্রীচৈতন্যের মাতৃপ্রদত্ত নাম বিশ্বম্ভর এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ মাত্র ষোল বছর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করেন। বালক বিশ্বম্ভর নিমাই নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি নিম গাছের ছায়ায় অবস্থিত আতুরঘরে জন্মগ্রহণ করায় তার এই নাম হয়। চৈতন্যদেবের সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)। এসময় নবদ্বীপ ছিলো সংস্কৃত ও অন্যান্য শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র ; শাস্ত্রীয় শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত চৈতন্যদেব ভক্তিবাদের পথে নিজের জীবনে দেবত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন।

চৈতন্যদেব বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। তার শৈশবকাল যেন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলারই নামান্তর। 'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীচৈতন্যের শৈশবপ্রকৃতি সম্পর্কে নানাকথা বর্ণিত হয়েছে। পাঁচ বছরের নিমাইর নামে যুবতী মেয়েদের কাছ থেকে একপ্রকার অভিযোগও শোনা যেতো— 'কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।' মাতা শচীদেবী তাকে তিরস্কার করতেন। কেউ কেউ মৃদু ভর্ৎসনা করতেন, কিন্তু তাতে স্নেহের সম্পর্কটি কখনো ছিন্ন হতো না। শ্রীচৈতন্যের প্রবীণ ভক্ত শ্রীবাস তাকে দেখলেই স্নেহের স্বরে বলতেন, 'কোথায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি।' চৈতন্যদেব বাল্যে গঙ্গাদাস, বিষ্ণুদাস ও সুদর্শন নামে তিনজন অধ্যাপকের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তার ফলে তর্কবিদ্যায় বেশ পারদর্শী হন। এমন কি শিক্ষকগণের সঙ্গেও তিনি রসবসিকতা ও তর্ক করতে ভালোবাসতেন। চৈতন্যের এসব বাচালতা ও দুরন্তপনা দূর

---

২১. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ২৮৪

করার জন্য ঈশ্বরপুরী তাঁকে বিভিন্ন শ্লোক পাঠ করে শোনাতেন। কিন্তু চৈতন্য শ্লোকগুলোতে ব্যাকরণগত ত্রুটি আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করতেন।

ব্যাকরণ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে বিশ বছর বয়সে চৈতন্যদেব একটি টোল স্থাপন করেন এবং তাতে অধ্যাপনা শুরু করেন। তখন তিনি একখানি টীকাগ্রন্থও রচনা করেন। এসম্পর্কে 'অদ্বৈতপ্রকাশে' বলা হয়েছে,--

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাঞি পণ্ডিত
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাহার রচিত।

এরকম বলা হয়েছে যে বিখ্যাত পণ্ডিত কেশব ভারতীকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাভূত করেন। বাইশ বছর বয়সে শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে তাঁর এই ভ্রমণকাহিনীর নানাদিক বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকরণে তখন আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ ঘটতে শুরু করে। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যাবার আগে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীদেবী নামের একটি মেয়েকে দেখে শ্রীচৈতন্য তার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে তিনি তাকেই বিয়ে করেন। চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে থাকাকালীন সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু ঘটে। ঘরে ফিরে এই মর্মান্তিক খবর শোনার পর তাঁর মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়। তখন তাঁর জননী শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নামে অপর একটি মেয়েকে চৈতন্যের বধূরূপে ঘরে তোলেন। এদিকে শচীদেবীর বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, ছোট ছেলে বিশ্বম্ভর অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের অবস্থাও সেইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়, এই আশঙ্কায় তিনি খুব তাড়াতাড়ি ছেলের দ্বিতীয় বিয়েটি দিয়ে দেন। এর কিছুদিন পর জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু ঘটলে শ্রীচৈতন্য পিতৃপিণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে গয়া যাত্রা করেন। পথে কুমারহট্ট নামক গ্রামে পৌছলে তিনি দেখলেন ঈশ্বরপুরী ভক্তিভাবে মগ্ন। এই দৃশ্য চৈতন্যের মন বিচলিত করে। তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৫১]

পিতৃপিণ্ড দেওয়ার পর শ্রীচৈতন্য গয়া থেকে ফিরে এলে শচীদেবী ছেলের মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখতে পান, তাতে তাঁর মনে দারুণ আঘাত আসে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হয়েছে যে চৈতন্যের এই বৈরাগ্যের জন্য তিনি অদ্বৈত মহাপ্রভুকে দায়ী করেন। শচীদেবী মনের দুঃখে তখন বলেন,--

কে বলে অদ্বৈত হয় এ বড় গোঁসাই॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এই পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥

চৈতন্যদেবের মনে ভক্তিভাব জাগানোর জন্য যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হচ্ছেন অদ্বৈত প্রভু, কেশব ভারতী ও ঈশ্বরপুরী। ভক্তিরসের তাড়নায় এরপর শ্রীচৈতন্য প্রায় প্রতিদিন ভক্ত শ্রীবাসের ঘরের আঙ্গিনায় সংকীর্তন করতেন। কেননা কীর্তন ভক্তিরস প্রকাশের একটি সুন্দর মাধ্যম। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সেবা করাকেও

---

৫১. পূর্বোক্ত, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫

শ্রীচৈতন্য ধর্মীয় কর্তব্য মনে করতেন। সেজন্য কখনো কখনো তিনি নগর সংকীর্তনেও বের হতেন। গোঁড়া হিন্দুগণ বিষয়টি সুনজরে দেখতো না। একদিন তাদের প্রধানগণ চৈতন্যের বিরুদ্ধে সেসময়ের মুসলমান কাজীর নিকট নালিশ করেন। এদিকে কাজী সাহেব নিজেই শ্রীচৈতন্যের অন্তরে ভক্তিভাবের প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হন।[৫৩] নবদ্বীপ তখন চৈতন্যদেবের ভক্তির রসপ্রবাহে প্লাবিত। ওদিকে গোঁড়া হিন্দু ও ভট্টাচার্যগণের বিরোধিতা চলতেই থাকে। এসব কারণে চৈতন্যদেব নবদ্বীপ থেকে চলে গিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। একদিন তিনি মা শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জল উপেক্ষা করে কাঁটোয়ায় গিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন শুরু করেন। পরমপ্রিয় পতির গৃহত্যাগে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের অবস্থার যে বেদনাবিহ্বল ছবি, সেই চিত্র অঙ্কন করে দীনেশচন্দ্র সেন নিজেও কতকটা ভাববিহ্বল হয়ে বলেন, 'যে কথার যাদুমন্ত্রে পাষাণ জাগিয়া ওঠে ও মঞ্জুরিত হয় চৈতন্যের সেই বাকছলাও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোক অপনোদন করিতে পারে নাই।'[৫৪]

কাঁটোয়ায় শ্রীচৈতন্য মাথার চুল কেটে মুণ্ডিত হয়ে কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্র পড়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁর প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন শুরু হয়। সেসময় তিনি মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে পা দিয়েছেন। সন্ন্যাসীরূপে চৈতন্যদেব অতঃপর দেশভ্রমণে বের হন। সেই সূত্রে তিনি উড়িষ্যা যান। উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য সেই সময়ের বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রবিদ বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে পরিচিত হন। বাসুদেব অল্পবয়েসী চৈতন্যের সন্ন্যাসীর রূপ দেখে বিস্মিত হন, পরে তাঁকে তিরস্কার করেন। কিন্তু চৈতন্যের কাছে উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি নিজেই শেষপর্যন্ত চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ গ্রহণ করে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। সেসময় শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে বাসুদেবের মনের যে প্রকাশ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। যেমন,

নাচিতে লাগিলা সোয় বাহু পশারিয়া।
সার্ব্বভৌম পদতলে পড়িল লুটিয়া॥
হাত জোড়ি সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিল।
তোমার বিরহবাণ হৃদয়ে বিন্ধিল॥
বড় মূঢ় বলি তব বিরহ সহিয়া।
এতদিন আছি মুই পরাণ ধরিয়া॥

বাসুদেব সার্বভৌম ছাড়াও উড়িষ্যার তৎকালীন রাজা প্রতাপরুদ্র এবং মন্ত্রী রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ গ্রহণ করেন। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্ম এরপর দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে অবৈধ সম্পর্কের একটা অবস্থান দেখা যায়, সমাজ তাকে সায় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এমন মনে করা যায় না। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দুসমাজের একটা সমর্থন তাতে পাওয়া যায় ; চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমে দেবত্বের মহিমা আরোপ করায় সেসমাজ তাকে আরো দ্বিধাহীন চিত্তে আপন করে নেয়।

---

৫৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড, পৃ ১৬৯
৫৪. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ ২১০

উড়িষ্যা থেকে চৈতন্যদেব ভারতের দক্ষিণ দিকের অঞ্চলসমূহ ভ্রমণ করার মনস্থ করেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক বছর ধরে তিনি দাক্ষিণাত্যের নানা অঞ্চলে প্রেমধর্ম প্রচার করে বেড়ান। এসব অঞ্চলের মধ্যে কয়েকটি হলো গোদাবরী, ত্রিমন্দ, সিদ্ধবটেশ্বর, বেঙ্কট, গিরিশ্বর, মুন্না, ত্রিপদীনগর, বিষ্ণু কাঞ্চি, তাঞ্জোর, পদ্মকোট, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, ত্রিবঙ্কু, মৎস্যতীর্থ, পয়োষ্ণী, চিতোল, গুর্জরী, পুনা, বরোদা, আহমদাবাদ, ঘোগা, সোমনাথ, দ্বারকা, দেওঘর, চণ্ডীপুর, বিদ্যানগর, রতনপুর ও স্বর্ণগড়। এরপর চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরে আসেন। সেখান থেকে পুনরায় তিনি ভ্রমণ করেন কটক, ঝাড়খণ্ড বা ছোট নাগপুর, বারানসী, প্রয়াগ এবং পরে বৃন্দাবন। এসব অঞ্চল ভ্রমণের পর চৈতন্যদেব পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ৪৮ বছর ৪ মাস বয়সকালে পুরীতেই তার দেহাবসান হয়।

চৈতন্যদেবের মৃত্যু সম্পর্কে জনশ্রুতি।। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর যেসব জনশ্রুতি রয়েছে তার মধ্যে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলা হয়েছে, একদা পুরীতে চৈতন্যদেব যখন কীর্তনগানে বিভোর ছিলেন, তখন একটি ইটের টুকরো এসে সজোরে তাঁর পায়ে আঘাত করে। এই আঘাত পায়ে বিষিয়ে ওঠে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বলা হয়েছে, ভাবের গভীরতায় শ্রীচৈতন্য যখন জগন্নাথকে আলিঙ্গন করেন তখন তাতে তাঁর দেহ লীন হয়ে যায়। তবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এরূপ ইঙ্গিত আছে যে মাত্রাতিরিক্ত ভাববিহ্বলতায় শ্রীচৈতন্যের শরীর ধীরে ধীরে কৃশ ও দুর্বল হয়ে আসে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। অন্য এক মতে পুরীর সমুদ্রে ঘননীল জল দেখে একদিন চৈতন্যদেবের মনে [illegible] কৃষ্ণনামের ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি সেই জলকে কৃষ্ণ ভেবে আলিঙ্গন করার জন্যে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জেলেরা সমুদ্র থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করলেও সেই দেহে তখন কোনো প্রাণ ছিল না। এসব অভিমত অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্যের [illegible] কারণেই সমকালীন কবিগণ তাঁর মৃত্যুর একরূপ অলৌকিক বর্ণনা দেন। তবে তার মধ্যে থেকেই হয়তো কিছু সত্য আবিষ্কার করা যায়।

বৈষ্ণবধর্মে চৈতন্যদেবের প্রভাব।। চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল প্রবর্তক। তার প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম একদিকে যেমন বাংলা কাব্যের তৎকালীন জগতে নব প্রেরণা সৃষ্টি করে, তেমনি অন্যদিকে নতুন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দেয় বাঙালির মনীষায় তা অভিনব কর্মপ্রেরণা যোগায়। আবার প্রেমধর্ম সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য যে দার্শনিক মতবাদ দেন, যদিও তা সামন্তযুগের সমাজ ব্যবস্থা ও মতাদর্শকে খানিকটা অস্বীকার করে, কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিবর্তনে পুরোপুরি সায় দেয় না। জাতিভেদের বিরুদ্ধেও তিনি প্রত্যক্ষ আঘাত হানেন নি, তবে তাঁর নাম সংকীর্তনে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে 'জীবে দয়া এবং স্রষ্টায় ভক্তি' তা সামন্তযুগের অনুদার মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলতে হবে। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব মতবাদে একথা স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই ভক্তির পাত্র, সেই সূত্রে প্রেমের মহোৎসবে সকল জাতের মানুষেরই সমান অধিকার রয়েছে, সুতরাং নাম সংকীর্তনে যবন হরিদাসও সমান মর্যাদায় আমন্ত্রিত। উচু নিচের ভেদরেখা মুছে গিয়ে যে

মহৎ সংস্কারের আদর্শ চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত মতাদর্শে প্রকাশ পেয়েছে তা গণতন্ত্রের মূল নীতিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সংস্কারাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বাঙালির চৈতন্য বিকাশ লাভ করে সংগীতে, দর্শনে এবং সাহিত্যে। চৈতন্য যে ভাবাদর্শ প্রচার করেন তার উপর ভিত্তি করেই তাঁর ভক্ত বৈষ্ণব- পার্ষদগণ জীবনীকাব্য রচনার মাধ্যমে সুনিপুণভাবে তত্ত্বব্যাখ্যা এবং বৈষ্ণব লীলামাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রসর হন। এই দিক থেকে বৈষ্ণব জীবনীকাব্যসমূহ শুধু জীবনীই নয়, এগুলো ধর্মের প্রভাবমুক্তও নয়, ররঞ্চ বলা যায়, এসব জীবনী ভক্তিমাহাত্ম্যের অনুপম কাব্য।

দুই॥ বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ

শ্রীচৈতন্যের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। এঁদের মধ্যে কেউ অধ্যাত্মবাদ, কেউ পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাছাড়া কাব্য, দর্শন, ভক্তিবাদ, অলঙ্কার শাস্ত্র ও মাধুর্য রস স্ফুরণের ক্ষেত্রে এঁরা যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। চৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বয়সের দিক থেকে প্রবীণতম। চৈতন্যের জন্মের আগেই তার বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। চৈতন্যের মৃত্যুর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য॥ অদ্বৈত আচার্যের নিবাস ছিলো সিলেট জেলার লাউড় পরগণায়। তিনি সেখানকার এক পণ্ডিতের পুত্র ছিলেন। তাঁর দুই বিয়ে। প্রথম পত্নী শ্রীদেবী এবং দ্বিতীয় পত্নী সীতাদেবী। অদ্বৈত আচার্য ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ নরসিংহ নাড়িয়াল রাজা গণেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অদ্বৈতের আসল নাম কমলকর ভট্টাচার্য এবং উপাধি 'অদ্বৈত'। তিনি শেষজীবনে শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। স্থায়ীবাস শান্তিপুরে হলেও নবদ্বীপেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে। অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন অদ্বৈত। ভক্তিশাস্ত্র প্রচারেই ছিলো তাঁর আনন্দ। চৈতন্যদেবের জননী কিন্তু অদ্বৈতের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি মনে করতেন অদ্বৈতের প্ররোচনায়ই তাঁর ছেলে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হন। অদ্বৈতের জীবনকাল কারো কারো মতে ১০৫ বছর, কারো কারো মতে ১৫০ বছর স্থায়ী হয়েছিলো।

অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে চারখানা বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থ চারটি হচ্ছে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের সংস্কৃতে রচিত 'অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র', ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ', হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' ও নরহরি দাসের 'অদ্বৈতবিলাস'।

নিত্যানন্দ প্রভু॥ নিত্যানন্দের পূর্বপুরুষ সুন্দরমল্ল বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো মুকুন্দ এবং মাতা পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের জন্ম ১৪৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁরও দুই পত্নী ছিলো—বসুধা ও জাহ্নবী। ভক্তিবাদের বিহ্বলতায় নিত্যানন্দ মনে করতেন অন্তরে ভক্তি থাকলে চণ্ডালও দ্বিজোত্তম হতে পারে। তাঁর সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে তিনি একদা নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নামসংকীর্তন করছিলেন, তখন জগাই মাধাই দুই ভাই মদ্যপানে

মাতাল হয়ে মাটির কলস নিক্ষেপ করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। প্রতিদানে তিনি দুই ভাইকে কৃষ্ণপ্রেম কথা শোনান। জগাই মাধাই তখন নিত্যানন্দের আচরণে মুগ্ধ হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে।

যবন হরিদাস॥ যবন হরিদাস মুসলমানের ঘরে জন্মলাভ করেও শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান সহচর হওয়ার অধিকারী হন। নীলাচলের সর্বত্র তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে নিয়ে নবদ্বীপের মুসলমান সমাজের সঙ্গে চৈতন্যভক্ত মণ্ডলীর যে বিবাদ বাঁধে, সেটি গৌড়ীয় সমাজের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

শ্রীবাস আচার্য॥ নিবাস সিলেট। অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে তিনি নবদ্বীপ আসেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে তিনি প্রবীণত্বের সীমা অতিক্রম করেন। সুকণ্ঠ শ্রীবাসের হরিসংকীর্তন সবাই উপভোগ করতো।

বাসুদেব সার্বভৌম॥ বাসুদেবের পিতার নাম ছিলো মহেশ্বর বিশারদ, নিবাস নবদ্বীপ। মিথিলার ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন তিনি। পক্ষধর তাঁর ছাত্রদিগকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' শীর্ষক দুরূহ একটি গ্রন্থ টীকাটিপ্পনীসহ শুধু পাঠ করতে দিতেন, গ্রন্থের কোনো অংশ কপি করতে দিতেন না। ন্যায়শাস্ত্রমূলক এই গ্রন্থের কোনো দ্বিতীয় অনুলিখন ছিলো না। বাসুদেব তাঁর অদ্ভুত স্মরণশক্তিগুণে সমগ্র পুস্তকটি তার টীকাটিপ্পনীসহ কণ্ঠস্থ করে মিথিলা থেকে নবদ্বীপ ফিরে আসেন। নবদ্বীপে তিনি একটি টোলও স্থাপন করেন এবং তাতে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। শ্রীচৈতন্যের বয়স যখন চব্বিশ, বাসুদেবের বয়স তখন আশি।

রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী॥ বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ক্ষেত্রে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। রূপ গোস্বামী ছিলেন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের অন্যতম গোস্বামী। তাঁর ভাই সনাতন গোস্বামী। রূপ এবং সনাতন ভ্রাতৃযুগল সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩ ১৫১৯) মুখ্য সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬ ১৫৩৩) প্রধান শিষ্য ছিলেন রূপ ও সনাতন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ হিসেবে রূপ গোস্বামী রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল নীলমণি'র নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। সনাতন গোস্বামীর 'হরিভক্তিবিলাস' পাণ্ডিত্য ও ভক্তিমাহাত্ম্যের প্রকাশে একখানি অনবদ্য গ্রন্থ। এছাড়াও এই বৈষ্ণব ভ্রাতৃযুগল বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস॥ সিলেট জেলার লাউড় পরগণার ভূস্বামী দিব্যসিংহ সংসার ছেড়ে শান্তিপুরে এসে অদ্বৈত প্রভুর (খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষপাদ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকে তাঁর নাম কৃষ্ণদাস বা লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। অদ্বৈতের বাল্যজীবনের কাহিনী অবলম্বনে তিনি লেখেন 'অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র' গ্রন্থ। মুদ্রিত গ্রন্থের রচনাকাল ১৪০৯ শকাব্দ বা ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে।

শ্রীনিবাস আচার্য।। শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬---১৫৩৩) আবির্ভাবের শত বৎসর পরে শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন ভাগীরথীর পূর্বপারে অবস্থিত চাখন্দী গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য এবং মাতা লক্ষ্মীদেবী। বাল্যকালে তিনি শ্রীখণ্ডের কাছাকাছি মাতুলালয়ে কাটিয়েছেন। বৈষ্ণবভাবে ভাবাপন্ন হয়ে তিনি পরবর্তীকালে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস গোপাল-ভট্ট ও জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে একদা তিনি জীব গোস্বামীর আদেশে বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থাদিসহ বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে আগমনকালে বনবিষ্ণুপুরের গভীর জঙ্গলে সেখানকার দস্যুরাজা বীর হাম্বীর কর্তৃক আক্রান্ত হন, তাতে তাঁর বৈষ্ণবগ্রন্থ ভর্তি সিন্দুকখানি লুণ্ঠিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের' পাণ্ডুলিপিও সেই সিন্দুকে ছিলো। এই নিদারুণ সংবাদ শুনেই নাকি বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবনাবসান হয়। পরে অবশ্য তা পাওয়া যায় এবং রাজা হাম্বীরও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। শ্রীনিবাস কবি ছিলেন না, তবে দুই একটি বৈষ্ণবপদ লিখেছেন। মূলত তিনি ছিলেন বৈষ্ণবভাবে সমর্পিত প্রাণ। তাঁর কন্যা হেমলতা দেবীও পিতাকে অনুসরণ করেছেন।

বীর হাম্বীর।। বীর হাম্বীর বনবিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজা ছিলেন। এই বংশের আদি পুরুষ আদিমল্ল। বীর হাম্বীর ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে বনবিষ্ণুপুরের রাজা হন এবং ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম ধাড়ী হাম্বীর। বীর হাম্বীর প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং ততোধিক প্রতাপে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতেন। তখনকার যুগে অধিকাংশ সামন্তই নিজের এলাকায় জমিদারী করতেন এবং অন্যের এলাকায় দস্যুবৃত্তি চালাতেন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে উক্ত হয়েছে, গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীনিবাস একদা 'হরিভক্তিবিলাস', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ললিতমাধব', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি ১২১ খানা মহামূল্যবান দর্শন রসশাস্ত্রের বই ও কাব্যনাট্যাদি একটি সুরক্ষিত পেটিকায় ভরে বৃন্দাবন থেকে বাংলায় আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে হাম্বীরের অনুচর কর্তৃক সেই পেটিকা লুণ্ঠিত হয় ও হাম্বীরের কোষাগারে জমা হয়। বলা হয়েছে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' লুণ্ঠনের মর্মান্তিক সংবাদ শুনে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দেন। সে যাই হোক, শ্রীনিবাস কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলো উদ্ধারের আশা ত্যাগ করেন নি। একদিন হাম্বীরের সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি রাজাকে সবকথা জানান। হাম্বীর অনুতপ্ত হয়ে তখন সেই পেটিকা অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও সমস্ত কদাচার ত্যাগ করে সপরিবারে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বনবিষ্ণুপুরের সকলকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। বীর হাম্বীর পদকর্তা রূপেও পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর একটি পদের অংশ, --

শুনগো মরম সখি, কালিয়া কমল আঁখি,
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন,

প্রেম করি গোঙালুঁ পরাণি॥
শুনিয়া দেখিলুঁ কালা, দেখিয়া হইলুঁ ভোলা,
নিবাইতে নাহি পাই পানি॥

বীরভদ্র গোস্বামী/বীরচন্দ্র॥ বাংলার বৈষ্ণবসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে বীরভদ্র গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিছু কিছু যাদুবিদ্যা ও অলৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। বীরভদ্র ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। বীরভদ্রের পূর্বপুরুষ বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে জয়ানন্দ চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে 'চৈতন্যমঙ্গল' (১৫৫০ ১৫৬০) কাব্য রচনা করেন। জানা যায় প্রথম জীবনে শৈবধর্মে বিশ্বাসী বীরভদ্রের সঙ্গে পিতা নিত্যানন্দের মতবিরোধ ঘটলে তিনি প্রথমে অভিমানবশত গৃহত্যাগ করেন, পরে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিবাদে দীক্ষিত হয়ে খড়দহ থেকে পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার শুরু করেন। বীরভদ্র এখানে অন্ত্যজ বৌদ্ধভিক্ষুদের একত্রিত করে তাদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। বৈষ্ণবসমাজে এইসব অন্ত্যজ বৌদ্ধমতাবলম্বী 'নেড়ানেড়ী' নামে অভিহিত।

এজন্য অবশ্য রক্ষণশীল বৈষ্ণবদের সঙ্গে বীরভদ্রের মতবিরোধ ঘটে। তবু তিনি হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কৃত বৌদ্ধভিক্ষুদের উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনকে বিবাহের নিয়মে আবদ্ধ করে কতকটা পারিবারিক সংযমের মধ্যে এনে সামাজিক মর্যাদা দেন। বারোশত নেড়াকে তেরোশত নেড়ী প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

বীরচন্দ্র গোসাঞি তার জানি আসি মন।
বৈরাগীকে শিখাইলেন আপন করণ॥
যদি এই বাক্যে প্রতীত না হয় মনে।
বারশ নেড়াকে তেরশত নেড়ী দিলেন কেনে॥

মুরারিগুপ্ত॥ মুরারিগুপ্ত সম্ভবত ১৪৭১ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁর সতীর্থ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর প্রমুখ গোস্বামীদের সঙ্গে সিলেট ত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' লিখিত হয়। চৈতন্যদেবের মর্ত্যলীলাকে কেন্দ্র করে মুরারীগুপ্তের ভণিতাযুক্ত মোট বারোটি বৈষ্ণবপদ আবিষ্কৃত হয়েছে।

তিন॥ বৈষ্ণব জীবনীকাব্য বা চরিতাখ্যান

চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনেই বাংলা ভাষায় প্রথম চরিতাখ্যান রচনার সূচনা হয়। তবে তাঁর জীবনের স্থূল ঘটনাগুলো প্রথমে রূপ নেয় সংস্কৃত কাব্যে। বৈষ্ণব জীবনীকাব্যগুলোতে চৈতন্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণব প্রধানগণের জীবনকথা উপস্থাপনার মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস এবং রাজনীতির কথাও বিবৃত হয়েছে। অবশ্য এসব চরিতাখ্যান

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবেই বেশি উদ্বুদ্ধ, ফলে এগুলো পুরোপুরিভাবে মানবজীবনের কাব্য হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দেবতার মাহাত্ম্য নিয়েও চৈতন্যদেব, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু এঁরা প্রকৃতপক্ষে রক্তমাংসে গড়া দেহধারী মানব। সুতরাং তাঁদের জীবনীগুলোও একেবারে মানবরস বঞ্চিত নয়। সেজন্য দেখা যায়, জীবনীকাব্যসমূহে মানুষের যে জীবন-কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে তাতে আছে তার ঘর সংসার, পরিবার পরিজন এবং সমসাময়িক সমাজের নানা দিকের প্রসঙ্গ। তারই মধ্যে ধর্মপ্রচার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ প্রচারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এগুলোতে নেই। মানবিক গুণে সমৃদ্ধ চরিত্র-চিত্রণেও কবিদের উৎসাহ কম। অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক ঘটনার সমাবেশেই তাঁদের আনন্দ। কোথাও কোথাও কাহিনী অনাবশ্যক ঘটনার চাপে ভারাক্রান্ত। এসব দিক থেকে বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলোতে মানুষের পরিচয় মুখ্য নয়। মানুষকে দেবমহিমায় উন্নীত করার একরকম জোরকরা প্রয়াসই তাতে প্রাধান্য পায়। অতিভক্তিবাদ প্রকাশের কারণে চৈতন্যদেব ও তাঁর মুখ্য পরিকরবৃন্দের জীবনচরিত বহুলভাবে লৌকিক জগতের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। জীবনচরিত রচয়িতাগণের কবিমানস তাই বস্তুগত তথ্যপুঞ্জের চেয়ে লৌকিক জীবনরহিত ভাবগত সত্যের অনুসরণ করেছে বেশি।

সংস্কৃতে লেখা চৈতন্যজীবনী।। এই পর্যায়ে রয়েছে মুরারিগুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত', কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'। অনুমান করা হয় মুরারিগুপ্ত ছিলেন চৈতন্যসমসাময়িক, কবি কর্ণপুর চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে আবির্ভূত হন। এসব গ্রন্থ সংস্কৃত রীতির অনুবর্তন এবং এগুলোতে মানবিক জীবনের পরিচয় মুখ্য নয়। শ্রীচৈতন্যকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করাতেই কবিদের আনন্দ এবং সেজন্য এগুলোতে অনেক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। চৈতন্যদেবের জীবনের প্রামাণিক ঘটনাগুলো প্রতিষ্ঠিত করার কোনো প্রয়াস এসব গ্রন্থে নেই। এই দিক থেকে বাংলা চরিতাখ্যানগুলো অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে মুরারিগুপ্ত ও কবি কর্ণপুর ভবিষ্যৎ জীবনীকারগণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী।। বৈষ্ণব চরিতাখ্যানগুলো বিষয়বস্তু হিসেবে এবং সময়ের দিক থেকে মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত। সময়ের দিক থেকে চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যপরবর্তী যুগ, এই দুটি পর্যায়ে চৈতন্যজীবনী রচিত হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রধান পরিকরবৃন্দের জীবনচরিত, এই দুই ভাগে জীবনী লেখা হয়।

গোবিন্দদাসের কড়চা।। গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কর্মকার চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁকে নিয়ে বৈষ্ণবসমাজে কিছু মতবিরোধ দেখা দেয়। কড়চাটি তাঁরই রচনা কিনা এবং কড়চায় বর্ণিত শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা কতখানি প্রামাণিক এসম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে এবং বলরাম দাসের 'পদাবলীতে' চৈতন্যদেবের সঙ্গী হিসেবে গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ আছে।

গোবিন্দাসের কড়চার দুখানি পুথি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপুরের পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। পুথি দুখানির ভাষা লিপিকার কর্তৃক শোধিত হয়েছে। পুথিতে গোবিন্দকে কর্মকাব বলা হয়েছে। শূদ্র জাতীয় এই লোকটি চৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকবেন, গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজ তা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়। ফলে তাঁরা গোবিন্দদাসের কড়চার প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।

গোবিন্দদাস বলেছেন,-'চৌদ্দশ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই' অর্থাৎ ১৪৩০ শক বা ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। গোবিন্দদাস তাঁর কড়চায় চৈতন্যদেব সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা দেন। তাঁর বর্ণনা অকৃত্রিম ও আড়ম্বরহীন। ভাবকে সহজ ভাষায় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করার কৌশল জানতেন তিনি। যেমন,— দাক্ষিণাত্যে চৈতন্যদেব লক্ষ্মী ও সত্যবালা নামেব দুই গণিকার কবলে পড়লে,—

কত রঙ্গ কবে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন॥
থরথরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড ভয় পায় মনে॥
কিছুই বিকাব নাই প্রভুব মনেতে।
ধেযে গিয়ে সত্যবালা পডে চরণেতে।

কন্যাকুমাবী বা কুমারিকা অন্তবীপের সাগরসৈকতের বর্ণনা ভাবুকতার সঙ্গে মিশ্রিত হযে চমৎকাব কাব্যসৌন্দর্য লাভ করেছে। যেমন, -

তাম্রপর্ণী পাব হইযা সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমাবী চলিল দেখিবাব॥
কেবল সিন্ধুব শব্দ শুনিবাবে পাই।
পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥
হু হু শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥
দেখিবারে কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ যার মন॥

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'॥ বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবেব অন্যতম সহচর শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও বিধবা নারায়ণী দেবীব পুত্র ছিলেন। আনুমানিক ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেন। বিধবার সন্তান বলে বৃন্দাবন দাস বহু লোকগঞ্জনার সম্মুখীন হন।[৫৫] তাঁকে অবশ্য অনেকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আশীর্বাদের ফল বলে মনে করেন।[৫৬] এটি পরোক্ষভাবে চৈতন্যদেবের চরিত্রের উপরই আক্রমণ। তবে এই কাদা ছোড়াছুড়িব ব্যাপারগুলো হয়তো বহুলাংশে বিদ্বেষমূলক ; নানাকারণে তাতে বিভ্রান্তিও আসে।

৫৫. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ২০৮
৫৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ ৩৩২

বৃন্দাবনের জন্মরহস্য নিয়ে অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করলে তিনি অসহিষ্ণুচিত্তে বলতেন,—

এত পরিহারে যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে॥

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভু ও পরে চৈতন্যদেবের অনুচর হন। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশেই তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনা করেন। এই জীবনী রচনায় চৈতন্যজীবনের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেন খুব কাছ থেকে। সম্ভবত ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'চৈতন্যভাগবত' রচিত হয়ে থাকবে। বৃন্দাবনদাস এ গ্রন্থ শেষ করে যেতে পারেন নি। ফলে চৈতন্যদেবের অন্তঃলীলা এতে বিবৃত হয় নি।

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' কাব্য রচনায় অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছেন নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গদাধর প্রভুও তাঁকে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করেছেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রথমে বৃন্দাবন দাসের কাব্যের নাম রাখা হয়েছিলো 'চৈতন্যমঙ্গল'। কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যলীলার ব্যাসরূপে আখ্যায়িত করেন এবং তখনকার সমাজে অন্যান্য কবিদের চৈতন্যমঙ্গল প্রচলিত থাকায় বৃন্দাবনের কাব্যের নামকরণ হয় 'চৈতন্যভাগবত'।

'চৈতন্যভাগবত' তিনখণ্ডে রচিত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এর আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়াগমন এবং ছাব্বিশ অধ্যায়ে সমাপ্ত মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-গ্রহণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। শেষখণ্ড অসম্পূর্ণ এবং তাতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় স্থান পায় নি।

চৈতন্যভাগবত বিরাট গ্রন্থ। এতে ইতিহাসের কিছু উপাদান আছে। কিন্তু কবির ভক্তিপ্রবণতা বেশি থাকায় ইতিহাসের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যের লীলায় কবি কৃষ্ণলীলার সাদৃশ্য আরোপ করে শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণ করতে বেশি উৎসাহী হন। বাড়াবাড়ি আরো আছে। তবু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে 'চৈতন্যভাগবত' একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের বাল্যজীবন সম্পর্কে এ গ্রন্থে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা বেশ কৌতূহল জাগায়। পথেঘাটে কিংবা তৎকালীন চতুষ্পাঠীতে শিক্ষার্থী এমন কি অধ্যাপকগণকে কূটপ্রশ্ন করে বালক নিমাই তাঁদের বিব্রত করার লোভ সামলাতে পারতেন না। এমন কি প্রবীণ ব্যক্তি শ্রীবাসকেও তিনি নাজেহাল করতে দ্বিধা করেন নি। একদা মুকুন্দ নামে জনৈক বৈষ্ণবপণ্ডিত ঠোঁটকাটা নিমাইকে এড়ানোর চেষ্টা করলে নিমাই সুযোগ বুঝে তাঁকে বাক্যবাণে আক্রমণ করে বসেন। নিতান্ত তুচ্ছ একটি ঘটনা, কিন্তু বৃন্দাবন দাসের বর্ণনাগুণে তা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যেমন,—

দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন পড়ুয়ার স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
পড়ুয়া সকলে বোলে না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্য্যে বা চলিলা কোন ভিত॥

প্রভু বোলে জানিলাম যে লাগি পালায়।
বহির্মুখ সম্ভাষা না করিতে জুয়ায়॥
এ বেটা পড়যে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র।
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥

এমন কি নিমাইর বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ মুরারিগুপ্তও বাদ যান নি। ব্যাকরণের বিষয় নিয়ে নিমাই তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেন,-

প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়।
লতাপাতা দিয়া গিয়া নাড়ী দৃঢ় কর॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইতি॥

'চৈতন্যভাগবতে' নবদ্বীপের তৎকালীন সমাজজীবন ও ধর্মীয় জীবনযাত্রার কিছু পরিচয় আছে। প্রাক চৈতন্যযুগেও যে মনসা ও চণ্ডীর কাহিনী এবং তাঁদের পূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিলো, কবির উক্তি থেকে তা জানা যায়। যেমন,

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
যক্ষ পূজা করে কেহ নানা উপচারে।

সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্যের প্রাকৃতিক শোভা উপভোগের বর্ণনায় বৃন্দাবন দাস চমৎকার কাব্যভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়ে সন্তোষ বড় শ্রীগৌর সুন্দর॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর।
চতুর্দিকে বেড়িয়ে আছয়ে অনুচর॥

চৈতন্যজীবনীর অন্যতম লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে 'চৈতন্যভাগবতে'র যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তিনি বৃন্দাবনদাসকে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন, -

বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশ সর্ব্ব অমঙ্গল॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

চৈতন্যদেবের প্রতি বৃন্দাবন দাস তাঁর প্রবল ভক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে। যেমন, -

বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম॥
তাম্বুল যোগায় কোন অতি ভৃত্য।
কেহ বামে কেহ বা সমুখে করে নৃত্য॥
এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'॥ জয়ানন্দের আনুমানিক কাল ১৫১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। জন্মস্থান বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রাম। তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতা রোদনী দেবী। জয়ানন্দের বাল্যনাম 'গুইএগ।' নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আবিষ্কৃত হয়। এর রচনাকাল আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। জয়ানন্দ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি। তাঁর রচনায় সত্যভাষণের কোনো অপলাপ নেই। কারণ তিনি বৈষ্ণবসমাজে সংঘটিত তৎকালীন ঘটনাসমূহকে অতিরঞ্জিত কিংবা বিকৃত করার চেষ্টা করেন নি। এই কারণে তাঁর রচনার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা সমালোচকদের মুগ্ধ করে। শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্পর্কে অলৌকিকত্ব আরোপ না করার গোঁড়া বৈষ্ণবসমাজে অবশ্য এ গ্রন্থ তেমন আদৃত হয় নি। চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে জয়ানন্দ তাঁর রচনায় যে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তা বাস্তব সত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতার পরিচায়ক। আষাঢ় মাসে পুরীতে কীর্তনরত অবস্থায় চৈতন্যদেব পায়ে যে ইটের আঘাত পান এবং তাতেই যে তাঁর জীবনাবসান হয়, জয়ানন্দের উক্তিতে তা প্রকাশ পায়,-

আষাঢ় পঞ্চমী রথবিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বামপাএ আচম্বিতে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥

জয়ানন্দের এই উক্তি চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে অন্যান্য অনেক চৈতন্য-জীবনীকারের অলৌকিক ভাবের অবতারণা থেকে মুক্ত থাকায় যথেষ্ট বাস্তব সত্যের ইঙ্গিত দেয়। তবে চৈতন্যদেবের প্রতি জয়ানন্দের ভক্তির প্রাবল্যও যে কোনো অংশে কম নয়, তাঁর কাব্যে তারও প্রমাণ আছে। যেমন,—

দ্বিজকুলে জনমিল গৌর ভগবান।
অখিল জীবেরে সে করিবে প্রেমদান॥
ঘরে ঘরে প্রতি গ্রামে হব দেবালয়।
কলি যুগে সর্বলোক হব ধর্মময়॥

অন্যত্র,--

বায়ড়া গ্রামে বিদ্যা বাচস্পতি ভট্টাচার্য।
ধন্য মাতা ধন্য পিতা ধন্য বংশ রাজ্য॥
চলিল চৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে।
সহস্র সহস্র লোক যায় দেখিবারে॥

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'॥ লোচনদাস ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তীকালের লোক বলে অনুমান করা হয়। কবি যে তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন যেমন, 'বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস' তা থেকে জানা যায় বর্ধমানের কোগ্রামে বৈদ্যকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কমলাকর দাস এবং মাতা সদানন্দী। লোচনের অপর নাম ত্রিলোচন দাস। শ্রীখণ্ডের নরহবি সরকাবের শিষ্য ছিলেন তিনি।

লোচনদাসেব তিনখানি গ্রন্থেব সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে 'চৈতন্যমঙ্গল', 'দুর্লভসার' ও 'আনন্দলতিকা'। গুরু নরহরি সরকারের আদেশে ৫২ বৎসব বয়সে তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি মুরারীগুপ্তের সংস্কৃত কড়চা অবলম্বনে রচিত। 'চৈতন্যমঙ্গল' সংস্কৃতে লেখা 'চৈতন্যচরিতে'র অনুবাদ হলেও বর্ণনার স্বকীয়তাগুণে বঙ্গ-রূপাযণেব এ গ্রন্থ বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। অবশ্য চৈতন্যদেবের চরিত্রে লোচন অপরিমিত দৈবঘটনা ও অলৌকিকতা আবোপ করেছেন। তাতে কাব্যের বর্ণিত বিষয়েব প্রামাণিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় জাগে। কবিব ভাষাব কিছু নির্দশন,--

কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিলা যেমতে।
মহেশ সংবাদ মহাপ্রসাদ নিমিত্তে॥
আব অপরূপ কথা রুক্মিনী কহিলা।
শুনিয়া বিহ্বল হিয়া প্রতিজ্ঞা করিলা॥
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব নিজ সুখে॥
ভকতজনার সঙ্গে ভকতি কবিযা।
নিজপদ প্রেমবস দিব তা যাচিযা॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥ বর্ধমান জেলার ঝামট গ্রামে এক বৈদ্যবংশে কৃষ্ণদাসের জন্ম। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৭] ডক্টব দীনেশ সেনের মতে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে।[৫৮] তাঁব পিতার নাম ভগীরথ ও মাতা সুনন্দা। নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে কৃষ্ণদাস সংস্কৃত শাস্ত্র শিখেছিলেন। প্রায় নয় বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি আনুমানিক ৮৫ বছর বয়সে ১৬১২/১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বচনা করেন। এ-গ্রন্থেব বিষয়বস্তু আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই

---

৫৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যেব কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯
৫৮. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ২১১

তিনখণ্ডে সমাপ্ত। 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইতিহাস ও দর্শনের চমৎকার সমন্বয়। কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, সাংখ্য, বেদান্ততন্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ষাটখানা গ্রন্থ থেকে কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যে প্রামানিক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ফলে এ কাব্য তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভাবকেই অধিক মূল্য দিয়েছেন। তাতে চৈতন্যের জীবনী আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে বেশি। তবে কখনো কখনো চৈতন্যদেবের মানবিক সত্তারও বিকাশ ঘটেছে বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শ্রীচৈতন্যের সংলাপে প্রকাশিত,—

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল সর্বনাশ॥
এ অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥

এই বাক্য মাতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসার গভীরতাকে প্রকাশ করে। কৃষ্ণদাসের এরূপ রচনাবৈশিষ্ট্য থেকে তাঁর কাব্যে যে ভক্তির ভাব বেশি, তা বেশ বোঝা যায়।

কৃষ্ণদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে যে অনন্ততার সন্ধান পান, তাতে প্রেম আর কাম আলাদা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এই বিবেচনায় কবির উক্তি,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হৈম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম বেদধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥

চার॥ চৈতন্যপর্বের বৈষ্ণবপদ ও পদকার

প্রেম-ভক্তির এক আনন্দময় সত্তার অনুভব ও বিকাশ হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। বাঙালির জাতীয় জীবনকে পদাবলী এক গভীর মমতার ডোরে বেঁধেছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব এতে ভাবময় ও সুরময় হয়ে উঠবার স্বতঃস্ফূর্ত অবকাশ পায়। এই প্রেমলীলা মানবপ্রেমের স্বাভাবিক ধর্মকে মেনে নিয়েই দেহের সীমা ছাড়িয়ে যায়, পরিণামে সে প্রেম দেবমহিমা লাভ করে। কামনা বাসনা তাতে থাকলেও এই প্রেম চিরন্তনতার পটভূমিকাতেই বিচার্য। পরমাত্মার মধ্যে মানবাত্মার অপরূপ লীলামাহাত্ম্য দর্শন করতে চেয়েছেন পদাবলীর কবিরা। প্রেমের লীলা বর্ণনায় তাঁরা নির্বাচিত শব্দের সযত্ন ব্যবহারে, অনুপ্রাস-যমকের অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য ও ছন্দের উল্লসিত ঝংকার সৃষ্টিতে এবং কবিত্বের মাধুর্য ঢেলে দিয়ে পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চৈতন্যপরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবকবি বলরাম দাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। এছাড়াও অনেক অপ্রধান কবির নাম জানা যায়।

বলরাম দাস॥ বাংলা সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের সন্ধান পাওয়া যায়।[৫৯] আলোচ্য বলরাম চৈতন্যপর্বের পদাবলী সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। বলরামের পৈতৃক নিবাস সম্ভবত বর্তমান বাংলাদেশে ছিলো। তাঁরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন বলরাম বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী জাহ্নবী দেবী ছিলেন কবির মন্ত্রশিষ্য। দীক্ষার পর বলরাম নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দোগাছি নামক পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।[৬০]

বলরাম দাস তাঁর পদে বাৎসল্য রসের যে মমতাপ্লুত ছবি অঙ্কন করেছেন তাতে মুগ্ধ হয়ে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে নিজের শিরোভূষণ পাগড়ি দান করেন। 'প্রেমবিলাসে' বলা হয়েছে বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস এবং মাতার নাম সৌদামিনী। তিনি জাহ্নবী গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁর জন্ম বৈদ্যবংশে।[৬১] 'প্রেমবিলাস' বলরাম দাসের পদাবলীর সংগ্রহগ্রন্থ। বলরাম শতাধিক পদের রচয়িতা। তাঁর কিছু সংখ্যক পদ নিত্যানন্দের লীলাবিষয়ক। তাঁর বাৎসল্য রসের পদগুলো লালিত্য ও লাবণ্যে অপরূপ। এছাড়া কৃষ্ণরূপের বর্ণনায়ও তিনি অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,--

গৌর বরণ মণি আভরণ নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল টলিল সকল দেশ॥
মলুঁ মলুঁ সই ! দেখিয়া গৌর ঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কি বিধি কামের উপরে কাম॥
চাঁপা নাগেশ্বর মল্লিকা সুন্দর বিনোদ কেশের সাজ।
ওরূপ দেখিতে যুবতী উমতি ছাড়ল ধৈরয লাজ॥
ওরূপ দেখিয়া পতি উপেখিয়া নদীয়া নাগরী কান্দে।
ভণে বলরাম আপনা নিছিল গোরাপদ নখ ছন্দে॥

বাৎসল্যরসের একটি বিখ্যাত পদ,--

শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম, মিনতি করিয়ে তো সভাবে।
বন কত অতি দূরে, নব তৃণ কুশাঙ্কুরে, গোপাল লৈয়া না যাইত দূরে॥
সখাগণ আছে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে, ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙা পায় জানি লাগে, প্রবোধ না মানে মোর মন॥

---

৫৯. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ১৮১-১৮২
৬০. সন্তোষকুমার কুণ্ডু, 'বাসুদেব ঘোষের পদাবলী' (কলিকাতা) ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৬১. পূর্বোক্ত, 'বাসুদেব ঘোষের পদাবলী', ভূমিকা দ্রষ্টব্য

জ্ঞানদাস।। জ্ঞানদাস ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি বীরভূম জেলার ইন্দ্রাণী থানার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৬২] জ্ঞানদাস রাঢ়ী ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তাঁদের বংশ 'মঙ্গলবংশ' নামে পরিচিত। নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবী ছিলেন তার দীক্ষাগুরু। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের নামে একটি মঠ আছে। জ্ঞানদাস চিরকুমার ছিলেন। সংসারের প্রতি পরম ঔদাসীন্যই তাঁকে দারপরিগ্রহ থেকে বিরত রেখেছে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রসিদ্ধ খেতুরির মেলায় যোগদান করেন।

জ্ঞানদাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন জ্ঞানদাসের ১৯৪টি পদের উল্লেখ করেছেন।[৬৩] জ্ঞানদাসের পদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ভাবের অকৃত্রিম স্ফুরণ ও ভাষার সহজ সাবলীল রূপ। বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ ও রস সৃষ্টিতে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অতুলনীয় শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক। জ্ঞানদাসের পদে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, কিন্তু প্রাণের চিরন্তন বাণীকে তিনি যেমন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত মরমীয়া ভাষায় রূপ দিয়েছেন, একমাত্র চণ্ডীদাস ভিন্ন সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে তার তুলনা নেই। যেমন,--

তোমার গরবে গরবিণী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে।।
অন্যের আছয়ে অনেক জনা আমার কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি।।

বংশী সম্বোধনের একটি পদে,--

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।।
কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনুঁ রবির কিরণ দেখি।।
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মানিক হারালুঁ হেলে।।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল।

গোবিন্দদাস/গোবিন্দ কবিরাজ।। গোবিন্দদাসের জীবনকাল ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হয়। কবির জন্মস্থান বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক গ্রাম। পরবর্তীকালে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া বুধারিতে বসতি স্থাপন করেন। কবির পিতা চিরঞ্জীব সেন এবং মাতা সুনন্দা। অনুমান করা হয় চিরঞ্জীব হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) অথবা তাঁর পুত্র নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) অমাত্য ছিলেন।[৬৪] কবি বৈদ্যবংশে

৬২. পূর্বোক্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ১৮৪
৬৩. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ১৭৮
৬৪. বিমানবিহারী মজুমদার, 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১), ভূমিকা, পৃ. ২৫

জন্মগ্রহণ করেন।[৬৫] গোবিন্দদাস তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাস নামে প্রায় ১২/১৩ জন পদকর্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে এঁদের মধ্যে আলোচ্য গোবিন্দদাস কবিরাজই পদরচনায় সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। গোবিন্দদাসের ভণিতায় মোট ৪৫৮টি পদ পাওয়া যায়।[৬৬] বৃন্দাবনের জীবগোস্বামী ও বীরভদ্র গোস্বামী বিশেষ আগ্রহ সহকারে গোবিন্দদাসের পদাবলীর রস আহরণ করতেন এবং তাঁরাই কবিকে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত কবির অধিকাংশ বৈষ্ণবপদের ছন্দঝঙ্কারে, অনুপ্রাসে ও অলঙ্কার-প্রয়োগে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বৈষ্ণবপদ রচনায় গোবিন্দদাসকে বেশি প্রভাবিত করেছে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র ও মৈথিলকবি বিদ্যাপতির পদ। জয়দেবের সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা পদও তাঁকে মুগ্ধ করেছে। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি গোবিন্দদাসের হাতে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁর পদের আলঙ্কারিক শব্দচাতুর্য ও ধ্বনিবহুল ব্যঞ্জনামাধুর্য অতি প্রশংসনীয় কাব্যকলার নিদর্শন। যেমন,—

অঞ্জন গঞ্জন জগজন রঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ দল কমল দলারুণ মঞ্জির রঞ্জিত চরণা।।

অন্যত্র,—

কঞ্জ চরণযুগ যাবক রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জির মাঝে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিনি রণরণি কুঞ্জর গমন দমন খিন মাঝে।।

মনোরম কাব্যভাবনা,—

নীরদনয়নে নবঘন সিঞ্চনে পূরল মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকম্পিত ভাব-কদম্ব।।

পদাবলীর লালিত্য ও সহজ-মাধুর্য,—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনি বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোল মদন মূরছা যায়।।

নরহরি সরকার।। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে একাধিক নরহরির নামোল্লেখ আছে। আলোচ্য নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। বলা হয়েছে—'শ্রীখণ্ড নিবাসী নরহরি সরকার চৈতন্যপ্রভুর পার্শ্বচর ও বৈষ্ণবসমাজে একজন পরিচিত পদকর্ত্তা—ইঁহার দ্বিতীয় নাম ঘনশ্যাম।'[৬৭] কবির জীবনকাল ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সুলতান হুসেন শাহের চিকিৎসক ছিলেন। কবির পিতার নাম নারায়ণদেব সরকার। তিনি পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গীদের একজন ছিলেন। তিনি

৬৫. কালীমোহন বিদ্যারত্ন, 'কীর্তন পদাবলী' (কলিকাতা), ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৬৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮
৬৭. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সহিত্য', পৃ. ১৮২

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। নরহরি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীই অধিক লিখেছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে 'নরোত্তমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে'র রচয়িতা নবহরি চক্রবর্তীর পদের সঙ্গে নরহরি সরকারের পদের মিশে যাওয়া সম্ভব।[৬৮] ধামালির প্রভাবে লঘু ভঙ্গিতে নরহবি সরকার কিছু পদ রচনা করেছেন। যেমন,—

ছন্দ ধরি বন্ধ করি কহে কুন্দলতা।
ভানুর কোলে কানু খেলে এই যে ভালকথা॥
নষ্টলোকে দুষ্ট কথা কহিল বুড়ীর কানে।
রুষ্ট হইয়া দুষ্ট মাগী আইলা পূজাব থানে॥

নরোত্তম দাস॥ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। নরোত্তমের পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও মাতা নারায়ণী।[৬৯] কৃষ্ণানন্দ ছিলেন রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গড়ের হাট পরগণাধীন পদ্মাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ খেতুরি গ্রামের নিকস্থ গোপালপুরের সামন্ত জমিদার। নরোত্তম এই জমিদারের একমাত্র পুত্র। সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি বৃন্দাবনের লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। শ্রীনিবাস আচার্যেব সতীর্থ ছিলেন তিনি। জমিদারের একমাত্র পুত্র হয়ে বাজৈশ্বর্যের মায়া কাটিয়ে তিনি বৈবাগীর সাত্ত্বিক জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হন। নিজে কায়স্থ জমিদাবের সন্তান, অথচ বহু ব্রাহ্মণ জমিদার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেবা ধন্য হন। তাঁর অন্যতম মহৎ কীর্তি কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ মূর্তিস্থাপন উপলক্ষে খেতুরীতে এক মহোৎসব অনুষ্ঠান পালন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী ও প্রার্থনামূলক কবিতা। নরোত্তম-ভণিতায় রাগাত্মিকা পদের নিদর্শন,—

সখি পিরিতি আখব তিন। জপহ রজনি দিন॥
পিরিতি না জানে যারা। কাষ্ঠের পুতলি তাবা॥
পিবিতি জানিল যে। অমর হইল সে॥
পিরিতি জনম যার। কে বুঝে মহিমা তার॥ . . .
পিরিতি করহ আশ। কহে নরোত্তমদাস॥

বল্লভ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বল্লভ ভণিতায় বেশ কযেকজন কবিব নাম পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসেব শিষ্য বল্লভদাস কিছু বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। নরোত্তম দাসের শিষ্য অপবজন শ্রীবল্লভ ভণিতা ব্যবহার করেছেন। ইনি ছিলেন গোবিন্দদাস কবিবাজের বন্ধু। কবিবল্লভ[৭০] ভণিতায় একজন কবির একটি চমৎকার বৈষ্ণবপদ পাওয়া গিয়েছে। পদটি উদ্ধৃত হলো,—

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিয়ে অনুখন নৌতুন হোয়॥

৬৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬
৬৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪৫১
৭০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯

জনম অবধি হৈতে ও-রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে হৃদয় জুড়ন নাহি গেল॥
বচন অমিয়-রস অনুখন শুনলুঁ শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়লুঁ না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ-জন রস অনুমোদই অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে মীলয়ে কোটি-মে একি॥

বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ॥ বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং গোবিন্দ ঘোষ-- এই তিন ভাই শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৪--১৫৩৩) সমসাময়িক পদকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এঁদের আদি নিবাস কুমারহট্ট এবং মাতুলালয় সিলেট জেলার বড়ন নামক গ্রাম। পরে তাঁরা নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন।[৭১] তাঁদের রচিত মোট আশিটি পদ পাওয়া গিয়েছে। তিন ভাই সুকণ্ঠ কীর্তন গায়করূপেও খ্যাতি অর্জন করেন। বাসুদেবের প্রায় সবগুলো পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক এবং তিনজনের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন। বাসুদেবের পদগুলো চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের ভাবপ্রকাশক। যেমন,--

আহা মরি মরি সই আহা মরি মরি।
কি ক্ষণে দেখিলুঁ গোরা পাশরিতে নারি॥
গৃহকাজ করিতে তাহে থির নহে মন।
চল দেখি গিয়া গোরার ও চাঁদ বদন॥

রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেগ বিভোর অবস্থার প্রকাশকল্পে রচিত বাসুদেবের নিম্নোক্ত পদাংশ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥

যশোরাজ খান॥ যশোরাজ খান ছিলেন চৈতন্যদেবের (১৪৮৬--১৫৩৩) সমসাময়িক কালের একজন পদকর্তা। অবশ্য তাঁর রচিত 'কৃষ্ণচরিত' শীর্ষক একটি কাব্যে একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়েছে।[৭২] পদটিতে তৎকালীন সম্রাট হুসেন শাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,--

মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ পসাহন করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম।
নীল ধবল কমল যুগলে চান্দ্র পূজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ সোই ইহ রস-জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥

---

৭১. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ৪১৩
৭২ পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ. ১০৯

পাঁচ ॥ চৈতন্যপর্বের দুজন কবি

কবি ও কাব্য-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও চৈতন্যপর্বের দুজন কবিকে এই পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এঁদের রচনা অবশ্য বৈষ্ণবপদাবলীর ঢংগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কঙ্ক॥ চৈতন্য সমসাময়িক কবি কঙ্ক তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বৈষ্ণব ঢং আনয়ন করেন। কঙ্কের জীবনকাল ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুমান করা হয়। এই হিসেবে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬—১৫৩৩) সমসাময়িক। কঙ্ক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম রচয়িতা বলে খ্যাত, তবে শ্রীধর কবিরাজকেও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি বলে বিবেচনা করা হয়। কঙ্ক যখন কাব্য রচনা করেন তখন গৌড়ের সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯)। কঙ্ক ময়মনসিংহ জেলার রাজেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বিপ্রগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুণরাজ, মাতা বসুমতী। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অনাথ কঙ্ক চণ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর চণ্ডাল পিতা এবং মাতাকে হারান। পরে গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখালের কাজে নিযুক্ত হন। কঙ্ক এবং গর্গকন্যা লীলা পরস্পর প্রেমাসক্ত হন।[৭৩] অতঃপর কঙ্ক এক মুসলমান পীরের সংস্পর্শে তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজ তখন তাঁকে অস্পৃশ্য বলে পরিত্যাগ করে। এদিকে লীলা এবং কঙ্কের প্রেমের কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গর্গ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কঙ্ককে বিষপানে হত্যা করার চেষ্টা করে, কিন্তু লীলার সতর্কতায় তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর লীলার উদ্দাম ব্যাকুলতায় কঙ্ক গৃহত্যাগ করে। পরে নৌকাডুবিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে,—লোকমুখে একথা শুনে শোকবিহ্বলা লীলা প্রাণত্যাগ করে। 'ময়মনসিংহগীতিকা'র কঙ্ক ও লীলার এই বিষাদময় প্রণয়কাহিনীর নায়কই হচ্ছেন বিদ্যাসুন্দরের কবি কঙ্ক। একদিকে তিনি কাব্যের রচয়িতা, অন্যদিকে নিজেই কাব্যের নায়ক। কঙ্কের কাব্য আদিরসাত্মক নয়; বরং বৈষ্ণব কবিতার মধুর ভাবসঞ্জাত। যেমন, –

কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ।
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম॥
পাপীতাপী মুঞি প্রভু আমি অল্প মতি।
হইবে কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি॥
হউক বা না হউক পদ না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব॥

দ্বিজ শ্রীধর/শ্রীধর কবিরাজ॥ তিনি দ্বিজ শ্রীধর, শ্রীধর কবিরাজ ও শ্রীধর হিসেবে পরিচিত। কবি তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩ -১৫১৯) প্রশংসা করেছেন,—

নৃপতি নসিরা সাহা তনয় সুন্দর।
সর্বকলা নলিনী ভোগিত মধুকর॥

---

৭৩. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৩২৭

রাজা শ্রীপেরোজ (শ্রী ফিরোজ) সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবিরাজ পরমাণ॥

অতএব কবি শ্রীধর ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। শ্রীধরের পুথির আবিষ্কারক মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তিনি মনে করেন, শ্রীধর ফিরোজ শাহের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু কবি তাঁর কাব্যে কোথাও এমন ইঙ্গিত দেন নি। শ্রীধর সম্ভবত ফিরোজ শাহের পিতা নসরত শাহের আমলেই কাব্য রচনা শুরু করে থাকবেন। কেননা গ্রন্থমধ্যে ফিরোজ শাহকে তিনি অনেক জায়গায় যুবরাজ বলে অভিহিত করেছেন।

শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালি ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

তাঁর কাব্যে ফিরোজ শাহের উল্লেখ থেকে একথা মনে হয় যে কাব্যবচনায় রাজার চেয়ে যুবরাজের দ্বারাই তিনি অধিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। শ্রীধরের অসমাপ্ত দু'খানি পুথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়। কাজেই তাঁকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী মনে কবার সঙ্গত কারণ আছে।[৭৪]

চট্টগ্রামে বিদ্যাসুন্দবেব কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীধব হচ্ছেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি। তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে অনুমান কবা হয়। বিদ্যাব রূপবর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের যে বিজয়, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত তার প্রসার আমবা লক্ষ্য কবি। শ্রীধবেব কাব্যে বিদ্যার রূপবর্ণনাব একটি অংশ,—

ফাটিল তাল পয়োধব দেশ।
কমল-কলিকা জলে কবিল প্রবেশ॥
সমুখে কমলনাসা যেন তিলফুল।
এরামকদলী ভুজ নিতম্ব বিপুল॥
দেখিয়াছি কুমারীর বাহু ভুজঙ্গ।
সুবর্ণ মৃণালবর পদ্মএ সুরঙ্গ॥
ক্ষীণ মাঝা দেখি সিংহ পাই উপহাস।
লজ্জায় করিল গিরি কোটরেতে বাস॥
রক্তপদ্মসম পদযুগ সুকোমল।
নবশশী জিনি পদনখ নিরমল॥
চরণে মল সাজে গমন লীলায়।
চলিতে চলএ যেন রাজহংস যায়॥

ছয়॥ চৈতন্যপর্বের মুসলিম কবির বৈষ্ণবপদ

প্রধানত সুফী সাধকদের ধ্যানধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বাংলার মুসলিম কবির পদসাহিত্যে। যে-অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি সুফী সাধকের মরমিয়া সাধনায় দৃষ্টিগোচর হয়, তারই প্রতিবিম্ব দেখা যায় বাংলা বৈষ্ণব-সাহিত্যে। মিস্টিক তথা মরমিয়া সাধক বিশ্বস্রষ্টাকে

---

৭৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০

অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে সাহ্ন্যসৌন্দর্যে অনুভব করেন। পারস্যের মরমিয়াবাদও প্রধানত এই অনুভূতির ব্যাপকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই মায়াঘন প্রতিবেশেই আন্দোলিত হয়েছে হাফেজ-রুমী-খৈয়ামের শিল্পানুভূতি। পারস্যের সুফীবাদ যে তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দেয়, বৈষ্ণবকবির হলাদিনী শক্তিও সেই তথ্য ও তত্ত্বের উপর রস সঞ্চার করে এবং তারই মধ্যে ধরা পড়ে সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির এক স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়াজাল।

সুফী সাধনায় প্রেমের মধ্যেই পরম পুরুষের স্বরূপ প্রকাশ সম্ভব। সৃষ্টির তাৎপর্যমণ্ডিত অর্থব্যঞ্জনার স্বরূপটি এরকম,—পরম পুরুষ তাঁর অনন্ত প্রেম চরিতার্থের জন্য বহুরূপে আপন স্বরূপের প্রকাশ ঘটান, সেভাবেই তিনি পরম লীলাও উপভোগ করেন। পরমাত্মারূপে যখনি তিনি লীলা করেন, জীবাত্মা তখনি তাঁর প্রধান সহচররূপে লীলায় শরীক হয়। বাংলার মুসলিম কবি-সাধকগণ বহুল পরিমাণে সুফীরূপে ভাবিত। এঁদের দ্বারা বাংলার প্রেমধর্মের সঙ্গে সুফী মরমিয়াবাদের এক চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তাই দেখা যায় বাংলার মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণবপদ সৃষ্টিতে এই সমন্বয়ধর্মী প্রেমধারাকেই নির্বিবাদে গ্রহণ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় রাধিকার প্রেমার্তির প্রকাশকল্পে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ আপন হৃদয়ানুভূতিকে মিশিয়ে দিতে পারেন নি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমানুভূতিকেই তাঁরা বড়ো করে দেখেছেন। এই ধারার মুসলমান কবিদের ভাবদৃষ্টি কিন্তু তার থেকে যথেষ্ট পৃথক। ভক্ত জীবাত্মা ও পরম পুরুষের মধ্যে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ পার্থক্য রক্ষা করে মুসলিম পদকর্তাগণ পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি, কিন্তু তার সবটা পুরোপুরি গ্রহণও করেন নি। তবে পরমাত্মার রসময় ও আনন্দময় সত্তার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন সমান ভক্তি সহকারে। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক আকর্ষণও সম্ভবত তার একটি কারণ। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপদাবলীর রসমধুর সাহিত্য কর্মের শৈল্পিক রূপে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম কবিগণ বৈষ্ণবপদ রচনায় উৎসাহিত হন। তবে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারা ও ভাবদৃষ্টি একটি স্বতন্ত্র ধারা রক্ষা করেছে—একথা যেমন সত্য, তেমনি বাংলার জনমনে যে যোগসাধনা ও ভক্তিসাধনার প্রভাব তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাকেও নিজেদের পদে অনায়াসে যুক্ত করেছেন। সুতরাং মুসলিম কবির পদসাহিত্যে আমরা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক লীলাতত্ত্বে অনুরাগের মধুরতা ও বিরহের তীব্রতা যেমন লক্ষ্য করি, তেমনি দেখি জীবন-জিজ্ঞাসার একটা সর্বব্যাপী দার্শনিক উপলব্ধির অনাবিল প্রকাশ। এই সূত্রে কয়েকজন মুসলিম পদকর্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কবীর॥ শেখ কবীর অথবা কবীর তাঁর পদে সুলতান 'নছিব সাহা'র নাম উল্লেখ করেছেন। এই 'নছিবা সাহা' সম্ভবত গৌড়ের সুলতান নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ (১৫১৯—১৫৩২) হবেন। কবীরের পদটি হচ্ছে, --

অ কি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনী ধনী॥

কাজলে রঞ্জিত নয়ন ধনি ধবল ভালে।
ভোমরা ভোলল বিমল কমল দলে॥
গুমান না কব ধনি খিন অতি মাঝাখানি।
কুচগিরি ফলের তবে ভাঙ্গিয়া পড়িব জৌবনি॥
সুন্দরি চাঁদমুখি বচন বোলসি হাসি।
আমিআ বরিযে জানি স্রেছে শরদে পূরণ শশী॥
শেখ কবিরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে।
ছলতান নছিরা সাহা ভুলিছে কমল বনে॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার আবীর খেলার বিষয় নিয়ে উভয়ের রাগরক্তিম প্রণয়লীলার একটি চিত্র উন্মোচন করেছেন কবীর তাঁর অপর একটি পদে, –

বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন আবীর গুলাব
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥
ফাগু হাতে করি ফিরত শ্রীহরি
ফিরি ফিরি বোলত বাই।
ঘুমট উঠায়ে বয়ান ছপায়ত
বেরি বেরি যৈসে মেঘসে চাঁদ লুকাই॥

ব্রজবুলি মেশানো এই পদটিতে গোবিন্দদাস-বিদ্যাপতির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের চমৎকার সাদৃশ্য যোজিত হয়েছে।

সৈয়দ সুলতান॥ সৈয়দ সুলতান প্রধানত 'নবীবংশের' কবি বলেই পরিচিত। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। তাঁর পদের ভাষা সহজ সবল, কিন্তু ভাবগভীর। যেমন, -

শ্যাম মোরে করিও দয়া।
একেবারে না ছাড়ো মায়া॥
ও কালাচাঁদ পরদেশী॥
প্রেম সাগরে ডুবি।
হর-ঘড়ি তোমারে সেবি॥

অন্যত্র,

মনেতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই।
আজু রাধার শুভদিন মিলিল কানাই॥
অপরূপ বিপরীত কি বলিব কারে।
নানা রূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে॥

ফয়জুল্লাহ॥ 'মীর ফয়জুল্লাহ' (গোরক্ষবিজয়ের কবি?) ভণিতাযুক্ত ফয়জুল্লাহর একটি পদের কিছু অংশ,---

সজনি সই কানু সে প্রাণ ধন মোর।
যে বলে বলুক মোরে
যে করে করিবে নিজপতি॥
সকলি ছাড়িয়া মুই কানুর শরণ লই।
ধিক মোর এই ঘরে বসতি॥

চাঁদ কাজি॥ চাঁদ কাজি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় তিনি চৈতন্যদেবের সময়ে নদীয়ার কাজি ছিলেন। তাঁর রচিত একটি পদ বিশেষ জনপ্রিয়,—

বাঁশী বাজান জান না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।
তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী, আমি মরি লাজে॥

নওয়াজিস খান॥ নওয়াজিস খান তাঁর উপ্যাখ্যানমূলক কাব্য 'গুলে বকাউলি'তে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় তাঁর জীবনকাল সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কাল। নওয়াজিস খানের পদগুলো আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত এবং সেসব পদে ভক্তচিত্তের দীনতার ছবি যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাতে উদ্ভাসিত হয়েছে স্রষ্টায় সমর্পণের ব্যাকুল বাসনা। যেমন,—

দয়াল বিধি রে, পরকাল দেখাইয়া দেহ,
প্রভুর আদেশ হৈল যেহ,
খণ্ডাইতে নারে সেহ, সেহ ভাব মনেত আসিল॥

আর একটি পদে,—

বিপথ লোক রে ধর্মপন্থ করিলা লোপ,
আছিল ঝরণা ধার লোক সব হএ সার
তথা সাঁকো দিলুম ধর্মবাণী, দারুণ মনুষ্যগণ॥

আলাওল॥ 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা ও রোসাঙ্গ রাজসভার শ্রেষ্টকবি আলাওল কিছু রাগ ও পদ রচনা করেছেন। তাঁর কিছু কিছু পদ রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক। বৈষ্ণবপদের লালিত্য ও মাধুর্য পদগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ নিম্নরূপ,—

অরুণ বরুণ যুগল নয়ন
কাজল লজ্জিত ভেল।
কনক কমল উপরে ভ্রমর
খঞ্জন করএ খেল॥
সব অঙ্গ হেন গজেন্দ্র গমন
করী অরি জিনি মাঝ।
কেয়ুর কঙ্কণ কিঙ্কিনী নূপুর
সঘন করএ সাজ॥

হেন কামিনীর হইব কিঙ্কর
শুন সব মতিমান।
নওল যৌবন কামিনী মোহন
শ্রী আলাওলে ভাণ॥

শ্যামরূপে বিভোর রাধার অন্তরের বাণীকে কবি শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে অভিব্যক্তি দেন,—

লা ল সজনি সই তুঝে বলম মুই নাকো।
শ্যামরূপ দেখিয়া প্রাণি বিদরে হিয়া
দেখিয়া শ্যামের রূপ বাধে॥
ভাল ক্ষেণে হইল দেখা আছিল কর্মের লেখা
কানু সঙ্গে ভেল পরিবাদে॥
অখিল গোপাল লৈয়া আর রাধা সঙ্গী হৈয়া
মরমে প্রেম যাচে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা
আলাওল ভাণ মরমে সাধ হইয়াছে॥

আর একটি পদে,-

আজু সুখের নাহিক ওর, আনন্দে মন বিভোর।
শ্রীপতি আসে চিত্তের মানসে, নাগর সদন মোর॥

ছন্দের ঝঙ্কার, অপরূপ কাব্যময়তা এবং অনুরাগের মোহন ভাবাবেশ সঞ্চারে নিম্নোক্ত পদটি আলাওলের শিল্পভাবনার অনন্য নিদর্শন, -

ঘরের ঘরণী, জগতমোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষে, নিশি পরবেশে, কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যূষে বিহনে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুং।
বেলা উদানে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুং॥

শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী কবি আলাওল সুফীবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে তাঁর কাব্যভাবনায় ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর রচনায় মরমিয়া তত্ত্বের আভাসও রয়েছে। যেমন,—

দীনবন্ধু কর পরিত্রাণ।
তুমি বিনে দুর্গতের গতি নাহি আন॥
ভুলিয়া সংসার রঙ্গে তোমা পাসরিলুম।
অনুরূপ প্রতিফল হাতে হাতে পাইলুম॥
না চাহি পরম পদ চাহিলুম সম্পদ।
নিজ দোষে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমএ আপদ॥

সৈয়দ মর্তুজা॥ সৈয়দ মর্তুজা ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। আনন্দময়ী নাম্নী তাঁর এক সাধন-সঙ্গিনী ছিলো বলে লোকসমাজে প্রচলিত। সেজন্য তিনি সৈয়দ মর্তুজা আনন্দ নামেও পরিচিত। সৈয়দ মর্তুজার পদে সুফীতত্ত্বের চমৎকার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল লীলায় স্রষ্টার লীলামাহাত্ম্যের অভিব্যঞ্জনা লক্ষ্য করে বলেছেন,—

আনন্দ মোহন মওলা খেলাএ ধামালী॥
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে, সখি, মওলা গোপতের চিন।
পুরাণ পিরীতিখানি ভাবিলে নবীন॥

অন্যূন ২৮টি পদ রচনা করেছেন তিনি। অধিকাংশ পদই রাধাকৃষ্ণের প্রেমঘটিত বিষয় অবলম্বনে রচিত। বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সংকলিত সৈয়দ মর্তুজার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদ,—

শ্যামবধুঁ আমার পরাণ তুমি।
কোন শুভদিনে, দেখা তোমার সনে,
পাসরিতে নাহি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ, করে আনচান,
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া,
শুন শুন পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে,
না জীয়ব তুয়া বিনু॥
সকল ছাড়িয়া রহিলুঁ তুয়া পানে
জীবন মরণ ভরি।

সৈয়দ মর্তুজার পদে ভাবের সঙ্গে ভাষার যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় তাতে চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের পদাবলীর কথা মনে পড়ে। বৈষ্ণবভাবের সঙ্গে একাত্ম না হলে এরূপ উচ্চমার্গের পদরচনা অসম্ভব।

আলী রজা॥ তিনি 'কানু ফকির' নামেও পরিচিত। মারফতী ভাবের সঙ্গে সমন্বয় করে আলী রজা বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। যেমন,—

কুলবতী যত নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি, শুনিয়া দারুণ বংশীস্বর॥
জাতিধর্ম কুলনীতি, তেজি বন্ধু সব পতি, নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তিধরে, তনু রাখি প্রাণী হয়ে, বংশীমূলে জগতের চিত॥
হীন আলী রজা বলে, হরি-রাধা পদতলে, শুন ঠাকুরাণী রাধা সার।
যে রামা হরিরে ভজে, কদাচিত নাহি তেজে, হরি নিত্য বিদিত রাধার॥

আরকুম॥ ইনি একজন মুসলিম পদকর্তা। সুফী-সাধনার রূপক হিসাবে তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে অভিব্যঞ্জিত করেছেন।

তাঁর একটি পদের কিছু অংশ,—

তুমি আশিক, তুমি মাশুক, তুমি রাজা প্রজা
তুমি দেবতা, তুমি ফুল, তুমি কর পূজা॥

নসীর মামুদ॥ নসীর মামুদ ষোড়শ শতকের একজন মুসলমান পদকর্তা। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। গোষ্ঠবিহার অবলম্বনে তাঁর একটি বৈষ্ণবপদ পাওয়া গিয়েছে।[৭৫] পদটি হচ্ছে,—

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে খেলত রাম সুন্দর শ্যাম।
পাঁচনি কাচনি বেত্র বেণু মুরলি আলাপি গানরি॥
প্রিয়দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি তরুণ তনয়া তীরে কেলি।
ধবলি শাঙলি আওবি আওবি ফুকরি চলত কানরি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি বদন ইন্দু জলদ কাঁতি।
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা হার বদনে মদন ভাণরি॥
আগম নিগম বেদ সাব লীলা যে করত গোঠ বিহার।
নসীর মামুদ করত আশ চরণে শরণ দানরি॥

এছাড়া আরো একটি পদের সন্ধান মেলে।[৭৬]

লাল মামুদ॥ তিনি একজন মুসলিম পদকর্তা। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন তিনি। যেমন, —

সোনার মানুষ নদে এল রে।
ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে
ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে॥

মোহাম্মদ রাজা॥ মোহাম্মদ রাজা কিছু সংখ্যক পদ রচনা করেছেন। তাঁর পদের ভাষা সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ। আন্তরিকতার স্পর্শে পদের ভাব স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজমান। যেমন,—

সখিগণে লয়ে সঙ্গে, রাধিকা চলিলা রঙ্গে, গায় রাধা সমুদ্দব ঘাটে।
কদম্বের তলে বসি, কানাই বাজায় বাঁশী, ধবলী শাঙলি চরে মাঠে॥
কানাই বসিয়া বাটে, রূপ দেখি প্রাণ ফাটে, আজু মোর কি হয় না জানি।
চল সখি ঘরে যাই, কদম্ব তলে যে কানাই, প্রাণ ফাটে তার বাঁশী শুনি॥

সৈয়দ আইনদ্দিন॥ সৈয়দ আইনদ্দিন পদকর্তা শাহ আকবরের শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। তাই তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক বলে অনুমান করা হয়। তাঁর ব্যক্তিপরিচয় প্রায় অজ্ঞাত। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক মোট ১৫টি পদ পাওয়া গিয়েছে। পদগুলো পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও বিরহের বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত। একটি পদ,—

সইরে কত দিন জীব না।
দেখ কত দিন জীব না॥

---

৭৫. 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সংকলিত
৭৬. ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে সংকলিত

কোথা রৈবে মায়ামোহ কোথা রৈবে চারুদেহ
কোথা রৈবে কামের কামনা॥
কোথা রৈবে রঙ্গহাস কোথা রৈবে লাসহাস
কোথা রৈবে এহি রূপ যৌবন।
কোথা রৈবে ধনজন কোথা রৈবে জ্ঞাতিগণ
কোথা রৈবে এ সাজ্ঞ সোহনা।
কোথা রৈবে অহঙ্কারী কোথা রৈবে গৃহবাড়ী
কোথা রৈবে এ সুখ মোহনা॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিন ঠাকুর করহ চিন
যবে আছে ঘটেত চেতনা॥

সালবেগ॥ সালবেগ সম্ভবত ষোড়শ শতকের কবি। তিনি উড়িষ্যাবাসী ছিলেন বলে জানা যায়। উড়িয়া ভাষায় লেখা 'দার্ঢ্যভক্তি' নামক গ্রন্থে তাঁর পরিচিতিমূলক বিবরণী থেকে জানা যায় যে কোনো এক পাঠান সেনাপতি এক হিন্দু বিধবাকে বলপূর্বক বিয়ে করেন। সেই পাঠান সেনাপতির ঔরসে উক্ত হিন্দু মহিলার গর্ভে সালবেগের জন্ম হয়।[৭৭] শেষজীবনে তিনি বৈষ্ণবভক্ত রূপে খ্যাতি লাভ করেন এবং ব্রজধামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি কিছু সংখ্যক বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। একটি পদের নমুনা,---

নবজলধরে কিরে শোভিত দামিনী।
মোহিত নারদ, সুর নর মুনি, মোহিত ব্রহ্মা শঙ্করে।
চাঁদ কিরণহি, বিকসি কুমুদিনী, শোভিত মুখ সরোবরে॥
হংস সারস, তবে কি তাণ্ডব, ডাহুকি শব্দ মনোহরে।
সালবেগ পিয়, নিরখি লাবণি, বরণি নাহি কিছু যাত রে॥

আলী মিঞা॥ একজন মুসলিম পদকর্তা। তাঁর পদ চণ্ডীদাসের পদের অনুকরণে রচিত। যেমন, --

গাছের উপরে লতার বসতি
লতার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কানুএ মজাই জাতিকুল॥

ওহাব॥ তিনিও একজন মুসলিম পদকর্তা। তাঁর পদের ভাষা মধুর ও সুললিত। যেমন,--

রাত্রি পোহাইয়া যায় কোকিল পঞ্চমে গায়।
নিদ্রাতে পাইয়াছ বড় সুখ।
অভাগিনী বলিয়া রে নিশি গোঞাইলুম
উঠ এবে দেখি চাঁদমুখ॥

৭৭. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৭৯

গিয়াস খান।। গিয়াস খান সপ্তদশ শতকের লোক। কবির পরিচয় অজ্ঞাত। বৈষ্ণবপদের অনুকরণে তিনি পদ রচনা করেছেন। যেমন,---

একি সই শুনাল রে কালা বিনে জীবন বিফল
সইরে কানুর লাগিয়া আমি মরি।

গয়াজ।। একজন মুসলিম পদকর্তা। বিরহের পদরচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। যেমন,--

কনক অঙ্গুরি ছিল সে পুনি বলয়া ভেল
সে বলয় হৈয়া গেল তাড়।
প্রভুরে কি দিনু গালি যদি না আইসে আজি কালি
পরাধীনী জীবন অসার।।

শাহ আকবর।। অনেকে তাঁকে বাদশাহ্ আকবর ধারণা করতে চাইলেও তিনি আসলে একজন বাঙালি মুসলিম পদকর্তা। তাঁকে ষোড়শ শতকের কবি বলে ধারণা করা হয়।[৭৮] 'গৌরপদতরঙ্গিণী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত তাঁর একটি হিন্দি মিশ্রিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের দুটি লাইন, -

জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপনি নাচত আপন রসে বিভোর।।

সৈয়দ শাহনূর।। একজন মুসলিম পদকর্তা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনীকে তিনি জীবাত্মা পরমাত্মার রূপকরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি সুফীভাবে ভাবিত হয়ে মরমীয়া পদ রচনা করেছেন। তাঁর পদের একটি অংশ,--

হিন্দুরে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সিতে দেয় বাধা।

---

৭৮. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৭৮

সপ্তম অধ্যায়

অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য

দ্বিতীয় পর্ব প্রথম অংশ (খ্রিস্টীয় ১৫-১৬ শতক)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী তখনকার বাংলার হিন্দুরাজা লক্ষণ সেনকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন এবং বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার উৎখাত করে বাংলাচর্চার পথ সুগম করেন। ক্রমে বঙ্গে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভাষায়, ভাবে এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চায় মুসলিম ঐতিহ্য অবাধে প্রবেশ শুরু করে। অবশ্য পরধর্মসহিষ্ণু মুসলিম শাসকগণ হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারাটিকেও সঞ্জীবিত রাখতে এদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যসেবীদের সমান উৎসাহিত করেন। মুসলিম শাসকগণের দ্বারা সৃষ্ট এই জাতিগত, ভাবগত ও সাংস্কৃতিক সৌহার্দ সৃষ্টির ফলে বঙ্গে মুসলিম ঐতিহ্যনাশী সাহিত্য শুধু সমৃদ্ধই হয় নি, এদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাও দৃঢ় হয়।

তুর্কিরা এদেশে একসময় বহিরাগত ছিলো, কিন্তু পরে অনেককাল এদেশবাসীর সঙ্গে একসাথে বসবাস করে তারা এদেশীয় আচার ও সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক সময় দেখা যায় স্বভাবগত কারণেই ক্রমশ তারা বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়।

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হুসেন শাহের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর আমলে বঙ্গসংস্কৃতি সাহিত্যে, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যশিল্পে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করে। হুসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হিন্দু সম্প্রদায় তাঁকে কৃষ্ণের অবতার মনে করতো। তাঁর পুত্র নসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) পিতার মতোই শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহ ও নসরত শাহের কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকে সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। এঁদের মধ্যে পরাগল খা ও ছুটি খাঁন নাম উল্লেখযোগ্য।

মুঘল শাসনামলের শুরুতে আফগান ও মুঘলদের মধ্যে যুদ্ধসংঘাতে বাংলাদেশের শান্তি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। পাঠান রাজত্বের সময় মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণে বাংলার সমুদ্রপথের ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়। কিছুকাল পরে শায়েস্তা খানের হস্তক্ষেপে বোম্বেটে দস্যুদের উৎপাত অনেক কমে আসে, সামুদ্রিক বন্দরগুলো নিরাপদ হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়।

এরপর মুঘলসম্রাট শাহজাহানের সন্তানদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দিলে বাংলাদেশের শান্তি পুনরায় বিঘ্নিত হয়। এই বিশৃংখলা চলতে থাকে মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। বাংলাদেশের শান্তি শৃংখলা একাধিকবার বিনষ্ট হওয়ায় দেশের বিধ্বস্ত জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক জীবনের গতিও ব্যাহত হয়। সঙ্গতকারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অশান্ত গৌড়ের সুলতানদের মনোযোগ হারিয়ে এরপর বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজাদের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় থেকে অর্থাৎ সতেরো শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের অন্ত্য-মধ্যযুগের শুরু। আরাকান রাজদরবারের পোষকতাপুষ্ট বাংলা

সাহিত্য ক্রমশ দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবির আবির্ভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়। জনসাধারণের মনে বিপুলভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও পুথিসাহিত্যের ধারা। রোসাঙ্গ রাজসভার পাত্রমিত্র নির্বিশেষে গতিশীল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। আশরাফ খাঁ, মাগন ঠাকুর, নবরাজ মজলিশ, সোলেমান, মুসা প্রমুখ রাজসভাসদ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম বাংলা সাহিত্য দ্রুত বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ধারায় এগিয়ে যায়।

নানাকারণে মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের বিচরণের প্রধান ক্ষেত্র ছিলো তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগ। সমগ্র বাংলার আর কোথাও এই অঞ্চলের মতো এত বেশি মুসলিম কবির আবির্ভাব সম্ভব হয় নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে মুসলিম কবিদের বিচরণভূমি চট্টগ্রামের একটি বিশেষ অঞ্চল তখন তৎকালীন আরাকান–ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিলো এবং একথা স্বীকৃত সত্য যে আরাকান এবং ত্রিপুরার রাজারা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগ--সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতি থেকে মুসলিম সভ্যতা অনেক উন্নত হওয়ায় আরাকানের রাজাগণ জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম প্রভাবকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন এবং এই প্রভাবসূত্রেই মগ রাজসভার প্রধানমন্ত্রী ও অমাত্যরা ছিলেন মুসলিম। এইসব মুসলিম মন্ত্রী ও অমাত্য চট্টগ্রাম সিলেট অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। আর তাঁরাই ছিলেন মগ রাজাদের প্রধান উপদেষ্টা। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য সঙ্গতকারণেই মগ রাজাদেরও পোষকতা লাভ করে। রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার সাফল্যও সেকারণেই।

একদিকে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান, অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক কাহিনী -এই দুই ধারাই প্রধানত মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের দিকনির্দেশনা করে। তবে কল্পনাবিহারী মানুষের মন শিল্প সাহিত্যে যেহেতু কাহিনীর সন্ধান করে এবং সেকাহিনী অবশ্যই রোমান্টিক ও চিত্তাকর্ষক হবে--এই কামনা করে, সেজন্য ধর্মকথার মধ্যেও তৎকালীন কবিরা নির্বিচারে তাঁদের কাব্যে স্থান দিয়েছেন অনেক বানানো ও উদ্ভট কল্পকাহিনী। মুসলিম ধর্মকাহিনীগুলোর মধ্যে অবশ্য ইসলাম ধর্মের গৌরব ও মহিমা প্রচারেরও প্রয়াস আছে, তবে তাতে বর্ণনার অতিরঞ্জিত বিষয়কে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাহিনী সৃষ্টির প্রেরণা আসে দুই দিক থেকে। একদিকে উত্তর ভারতীয় রোমান্টিক কাহিনীগুলো মুসলিম কবিদের প্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির ফলে মুসলিম কবিরা উৎসাহের সঙ্গে ইরানি গালগল্পকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেন। এসব কাহিনীতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেও আনন্দের পরিচর্যা বেশি থাকে বলে সাধারণের মনে তার একটি স্থায়ী আসন গড়ে ওঠে। মধ্যযুগের কবিরা হয়তো তাঁদের বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন যে বাস্তব জীবনের অনেক অভাব পূরণ করে সাহিত্য ; এবং সেই সাহিত্যের ধারাটি যদি রোমান্সরসে বেগবান হয় তবে সেই রস পান করে সাধারণ মানুষ বাস্তবতার রূঢ়তাকে ভুলতে পারে। তাই মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের সাহিত্যধারায় আমরা একদিকে যেমন রোমান্স সৃষ্টির সার্থকতা লক্ষ্য করি অন্যদিকে প্রণয়জীবনের আকুতি ও মিলন–বিরহের মধ্যে মানবীয় জীবন–মহিমার স্বভাবসুন্দর স্পন্দন অনুভব করি।

দুই॥ পঞ্চদশ শতকের মুসলিম কবি

শাহ মুহম্মদ সগীর॥ মানবমনে প্রেমের যে ধারা নিয়ত বহমান, যাকে মানবীয় প্রেমের বিষয় বলে আমরা মনে করি, সেই ধারারই সুন্দর প্রকাশ দেখা যায় খ্রিস্টীয় পনেরো শতকের মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে। এই ধারার কাব্যে অলৌকিকতা প্রকাশের কিছু সুযোগ থাকলেও সগীর নিজেকে সেই প্রভাব থেকে সংযত রেখেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির ভালোবাসার বিষয়টিও সগীরের শিল্পীমানসে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন পণ্ডিত মনে করেন শাহ মুহম্মদ সগীরই বাংলার আদি মুসলিম কবি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক কবিই সবাসরি নিজেদের পরিচিতি দিতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করতেন না। সেই সূত্র ধরে অনেকে সোজাসুজি না বলে নিজেদের কথা কিছু ঘুরিয়ে ফিবিয়ে কিংবা কিছু রেখে ঢেকে বলতে ভালোবাসতেন। সগীরও তার থেকে কিছু আলাদা ছিলেন না। ফলে তাঁকে নিয়েও অর্থাৎ তাঁর সময়কাল নিয়েও পণ্ডিতগণ কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছেন। তবে শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর 'ইউসুফ জলিখা' বা 'ইসুফ জোলেখা' কাব্যে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের বাজত্বকাল ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সেই হিসেবে সগীরের আবির্ভাব চৌদ্দ শতকের শেষ এবং অবস্থান পনেরো শতকের প্রথম থেকে তার মাঝামাঝি হওয়া সম্ভব।

সগীব যে-বাদশাহর কথা বলেছেন সেই ব্যক্তিটি অর্থাৎ গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ কখনো কখনো তাঁর বাজনৈতিক জীবনকে অন্তরালে রেখে বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চার প্রতি যে অনুবাগ দেখিয়েছেন, সেই গুণটিব জন্যই মধ্যযুগের অনেক কবি তাঁদের কাব্যে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যেমন, সেসময়ের ভারতেব মিথিলা নামক জায়গার অধিবাসী মধ্যযুগের প্রধান একজন বৈষ্ণবকবি, নাম তাঁর বিদ্যাপতি, তিনি এই গুণবান সম্রাটের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বলেছেন, 'মহলম জুগপতি চিরে জিব জীবথু/গ্যাসদীন সুরতান।' অর্থাৎ মহান গিয়াসউদ্দীন সুলতান যুগ যুগ ধরে চিবকাল বেঁচে থাকবেন। আযম শাহ সম্পর্কে সগীব তাঁর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে যে প্রশংসা করেছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে সম্রাটের শাসন-দক্ষতা, ধর্মবোধ ও পাণ্ডিত্যের প্রতি অনুরাগ। যেমন,—

তৃতীয় প্রণাম করোঁ বাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর॥
রাজরাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত॥
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গেছে পৃথিবীব সার॥

পণ্ডিতগণ মনে করেন এই প্রশংসা গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ সম্পর্কে হওয়াই স্বাভাবিক, এই কারণে যে তখনকার সম্রাটদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক, ধার্মিক এবং মহান রাজা। শাহ মুহম্মদ সগীর পীরবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে অনুমান করা হয়।

বাংলা সাহিত্যে যখন সগীরের আবির্ভাব হয়, তখন প্রেমের কাহিনী রচনায় হিন্দু কবিদের প্রাধান্য ছিলো। কিন্তু সগীর মুসলমান কবি হয়েও এই ধারার কাব্যরচনায় তাঁর

নিজের ধ্যানধারণার কিছু পরিচয় রেখেছেন। সগীরের কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, এতে প্রেমের বিষয়টি মানবমনের চাহিদা অনুযায়ীই রূপায়িত হয়েছে। সেই চাহিদার বাইরে কল্পনাকে সেখানে বড়ো করে দেখানোর কোনো চেষ্টা নেই। সুতরাং সগীর তাঁর কাব্যে মানবীয় প্রেম--ভাবনার একজন খাঁটি রূপকার ছিলেন।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের কবি। এই কাব্যের প্রথম রচয়িতা হচ্ছেন পারস্যের কবি ফেরদৌসী তুসী। ফেরদৌসীর কাব্য ছাড়াও তখন মুসলমানদের মধ্যে সমাদর পায় পারস্যের অন্য এক মুসলিম কবি মোল্লা আবদুর রহমান জামীর 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তবে ফারসি কাব্য সগীরের কবিমনে কতখানি প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে সঠিক করে কিছু বলা যায় না। কেননা, তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী কোরানের কোনো বিষয় হয়তো তাঁকে উৎসাহিত করে থাকবে। তিনি বলেছেন, –

> কিতাব কোরান মধ্যে দেখিলুঁ বিশেষ।
> ইউসুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ।।
> কহিব কেতাব চাহি সুধারস পুরি।
> শুনহ ভকত জন শ্রুতি ঘট ভরি॥
> দোষ ক্ষেম গুণ ধর রসিক সুজন॥
> মোহাম্মদ ছগির ভণে প্রেমক বচন॥

সগীরের কাব্যে যে ফারসি কাব্যের প্রভাব একেবারে পড়ে নি এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। কেননা ফেরদৌসী তুসী তাঁর কাব্যে নারী পুরুষের প্রেমকে যে রোমান্টিক ভাবনায় দেখেছেন, সগীরের শিল্পভাবনা জাত তাঁর কাব্যেও তার কিছু পরিচয় আছে। তবে বাস্তবতার সম্পর্কটি তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। কবিরা সব সময়ই কমবেশি কল্পনার দ্বারা চালিত হন। সগীরও একজন কবি। এবং কবি বলেই কবির পক্ষে যা স্বাভাবিক সেই কাব্যময়তা তাঁকেও আকর্ষণ করেছে। তবে আবারও বলি, সগীরের কবিমানস বরাবরই একটি বিশ্বাসযোগ্য অবস্থানকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। এছাড়া ভিন্ন ভাষার ভাবকে বাংলা ভাষায় রূপ দেওয়ার কৌশলটিও তিনি জানতেন।

লায়লী মজনু এবং শিরি ফরহাদের অমর প্রেমের কাহিনী যেমন সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিশেষ আদরের বস্তু, 'ইউসুফ জোলেখা'ও সেই দিক থেকে সেরকম দাবি করে। 'ইউসুফ জোলেখা'র প্রেমকাহিনীর আর একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য এই যে এতে জটিল অধ্যাত্মতত্ত্ব ও পারস্যের মরমিয়াবাদ খুব বেশি প্রভাব না ফেলায় রহস্য-ঘেরা রূপকের কর্তৃত্ব থেকে এটি প্রায় মুক্ত। ফলে সাধারণ লোক 'ইউসুফ জোলেখা'র প্রেমকাহিনীটি সহজে ধারণ করতে পারে।

সগীর তাঁর কাব্যে ইউসুফের প্রতি জোলেখার প্রেমের গভীরতাকে বাস্তববোধের নিরিখে বিচার করেছেন। জোলেখা ইউসুফকে পাওয়ার আশায় সমাজ এবং নিজের সংসারটি ছাড়তে দ্বিধা করে নি, এমন কি নিজের অধিকারের ধনসম্পদও তাকে টেনে রাখতে পারে নি, একাল পরকাল কিংবা পাপপুণ্য সবই তার কাছে মিথ্যে। ইউসুফকে এক পলক দেখলে তার দেহমনে সুখ যেন উপচে পড়ে, -

আজি সে সাফল্য মোর সর্ব অঙ্গে সুখ।
সমদিষ্টে ইছুফে দেখিল মোর মুখ॥
রুদিত নয়ন তান সন্তাপিত মন।
ছল ছল নয়ন সজলে বহে ঘন॥
মুঞি শুষ্ক শস্য তুমি জলদ নিপুণ।
বিন্দ্যেক পড়িলে জল ন হৈবেক উন॥

মনঃপূত পুরুষের প্রতি নারীর প্রেমের এই ধারা আবহমানকালের। চিরকালের এই সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সত্যে দীপিত হয়ে জোলেখাও অতএব নির্দ্বিধায় বলতে পারে,—

কিছুমাত্র না করি আজিজক ভীত।
আজিজক মারিতে আমি পারিব ইঙ্গিত॥
বিষ দিয়া মারিব করিয়া ঘোর মতি।
চৈতন্য হারাই তাব পরলোক গতি॥

এই নিষ্ঠুর কাজটি কবলে যে পাপটি তাকে স্পর্শ করবে, সেটি দূর কবার কৌশলটিও সে জানে। পৃথিবীতে টাকা পয়সার ভক্ত নয় কে? টাকা পযসা খরচ করলে পাপও পুণ্যের স্থানটি দখল কবে নিতে পারে। এই নির্জলা সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন সগীর তাঁর নায়িকা জোলেখার মুখ দিয়ে, -

আর কহি ধর্মেত বিরোধ এই কর্ম।
নিমেষেক মহাপাপে হরে সেই ধর্ম॥
বহু ধন ভাণ্ডার আছে এ মোর পাশ।
দান ধর্ম করিলে হইব পাপ নাশ॥

সগীরেব রচনায় কবিত্বের পরিচয় আছে। যেমন,—

মদনমঞ্জরী তনু ত্রিবলি সুবলি।
অরবিন্দে কুসুমিত জেহ্ন পেখি অলি॥
তনুকান্তি নির্ম্মল কমল কলাবতী।
প্রভাতে উদয় জেহ্ন সুরজ দীপতি॥
হিমকর জনি জ্যোতি বদন প্রকাশ।
আকাশ প্রদীপ কি প্রফুল্ল মনিহাস॥
বদন নির্মল জেহ্ন বিকচ কমল।
জেহ্ন পূর্ণ শশধর জ্যোতি নিরমল॥

গোঁড়া মুসলিম সমাজেব বিরোধিতা সত্ত্বেও সগীর বাংলায় কাব্য রচনা করে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অপার মমতার পরিচয় দিয়েছেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রাখার জন্য গোঁড়াদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশও দিয়েছেন। যেমন,—

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ।
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন॥

না লেখে কেতাব কথা মনে ভয় পায়।
দুষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়॥
শুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা।
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা॥

জৈনুদ্দীন॥ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান কবি জৈনুদ্দীনের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' নামক বইয়ে। সুফিয়ান সাহেব বলেছেন, জৈনুদ্দীন রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের সভাকবি ছিলেন। বাংলায় সুলতান বারবাক শাহের রাজত্বকাল ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান আরো বলেছেন কবি জৈনুদ্দীন জাতিতে পাঠান ছিলেন এবং তাঁর জন্মস্থান হিরাট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একজন হিরাটবাসী পাঠানের পক্ষে বাংলায় কাব্যরচনা করা কিভাবে সম্ভব। তাহলে হিরাটের কবিকে প্রথমে বাংলা শিখতে হয়েছে। সুফিয়ান সাহেবের যুক্তি হচ্ছে বারবাক শাহের দরবারে আরব দেশ থেকে বহু জ্ঞানীগুণীর আগমন হয়েছিলো।[৭৯] জৈনুদ্দীন সেই গুণবানদেরই একজন। কথাটা শোনতে ভালো লাগলেও যুক্তির দিক থেকে কতখানি গ্রাহ্যশীল তা বিবেচনার বিষয় বটে। প্রায় চারশ বছর আগের কবি জৈনুদ্দীন আসলেই হিরাটের অধিবাসী ছিলেন কিনা, কোনো পণ্ডিতের পক্ষেও তা ঠিক করে বলা সম্ভব মনে হয় না।[৮০] অতএব তাঁকে আমরা একজন বাঙালি কবি হিসেবেই বিবেচনা করে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করবো।

জৈনুদ্দীন যে বারবাক শাহের আমলেরই একজনই কবি ছিলেন এ কথাটি বোধ হয় সত্য। কেননা কবি তাঁর 'রসুলবিজয়' কাব্যের এক জায়গায় সুলতান বারবাক শাহের পুত্র ইউসুফ খানকে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন,—

শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান,
বিরচিলুঁ পাঞ্চালি সন্ধান।
ভাবে ভব কল্পতরু জানে শুক্রজ্ঞানে গুরু,
ধ্যানে হয় মহেশ সমান॥

এই ইউসুফ শাহ পরে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ রূপে ১৪৭৪ থেকে ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। ইউসুফ শাহ পিতার মতোই গুণীর কদর করতেন। তাঁরই উৎসাহে কবি জৈনুদ্দীন তাঁর 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। জৈনুদ্দীনের মন্তব্য থেকে তাঁকে পনেরো শতকের শেষ থেকে ষোল শতকের প্রথম দিকের কবিরূপে মনে করা যায়।

জৈনুদ্দীন তাঁর কাব্যে পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়েছেন। নিজের বংশলতিকা অনুসরণ করে কবি বলেছেন,—

---

৭৯. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', ২য় খণ্ড (ঢাকা : ২য় স.), পৃ. ৪৯

৮০. আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য', ১ম খণ্ড (ঢাকা : ১ম সং. ১৯৭৮), পৃ. ৪৩৩

সিদ্দিকে সিদ্দিক সম সিদ্দিক বংশেতে জন্ম
পিতামহ আবদুল্লাহ অংশ
তান বংশ অবতংস দানেত হাতিম অংশ
শাহা আলি প্রভু সনে নেহা।
তান সুত জ্ঞানবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পীর সাহা জালালদ্দীন
তান পুত্র মতিমান প্রভু ভাবে ভক্ত জান
দিন ঠুনি হএ মৈনুদ্দীন।
তান পুত্র জগহীন ক্ষুদ্রমতি জৈনুদ্দীন॥

কবির এই বংশ-পরম্পরা থেকে আমরা পাচ্ছি প্রথম পুরুষ আবদুল্লাহকে, তারপর ক্রমান্বয়ে শাহা আলী, জালালদ্দীন, মৈনুদ্দীন ও মৈনুদ্দীন-পুত্র জৈনদ্দীনকে। কবি বলেছেন 'সিদ্দিক বংশেতে জন্ম'। সিদ্দিক বংশ অভিজাত বংশ রূপেই জানা যায়। সুতরাং তিনি ছিলেন এক মান্যগণ্য পরিবাবেব সন্তান। এবকম পরিবারের সঙ্গে পীবদেব কিছু সম্পর্ক থাকে। কবির উক্তি থেকে জানা যায় শাহ মোহাম্মদ নামে তাঁর একজন পীরও ছিলেন। যেমন,---

শান্তদান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
পীব শাহা মোহাম্মদ খান।
তান পদ-রজ-পঙ্ক ভালে তিন পবি রঙ্গ
কহে জএনুদ্দীন ইহ লোকে।

এই শাহ মোহাম্মদেব প্রতি কবির যে প্রচুর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিলো তাও বোঝা যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যে যে ধারা আমবা লক্ষ্য করি তাতে হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর 'বিজয়গাথা' বা 'প্রশংসা-গান' করাব রেওযাজ থাকায় এরূপ কাব্যকে 'মঙ্গলকাব্য' বা 'বিজয়কাব্য' বলা হতো। যেমন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, জগন্নাথবিজয় ইত্যাদি। এই বিজযকাব্যগুলোর মতো মধ্যযুগের অনেক মুসলিম কবিও তাঁদের কাব্যেব নাম 'বিজয়কাব্য' রেখেছেন। যেমন জৈনুদ্দীনের 'রসুলবিজয়', মীর ফযজুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়', 'সত্যপীর-বিজয', 'গাজীবিজয়' ইত্যাদি। ধর্মীয় ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকায তখনকাব হিন্দু কবিবা 'বিজয়' শব্দটিকে যেভাবে তাঁদের কাব্যের শিরোনামে যোগ করেছেন সেভাবে, হয়তো এই রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়েই, মুসলিম কবিরাও ইসলাম ধর্মের মহান ব্যক্তিদের জীবনকথা তাঁদেব কাব্যেব বিষয় কবে 'বিজয়' শব্দটিকে কাব্যের শিরোনামে জুড়ে দিয়েছেন। তবে 'বিজয়' শব্দের পেছনে বাজশক্তির প্রভাবের কথাও অনুমান করা চলে। রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের রাজদরবাব থেকেও এই প্রথা চালু হতে পারে। যার ফলে বাববাক শাহের দরবারের পোমকতায় মালাধর বসু লেখেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য এবং জৈনুদ্দীন লেখেন 'রসুলবিজয়' কাব্য। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যগুলোও হয়তো এই ধারারই অনুসরণে রচিত হয়ে থাকতে পাবে।

জৈনুদ্দীনের 'রসুলবিজয়' যে মধুর ভাব ও বিষয়ে ভবা, কবি তার উল্লেখ করে বলেছেন,—

রসুল বিজয় বাণী সুধারস ধার।
শুনি গুনিগণ মন আনন্দ অপার॥

আসলেও তো রসুলুল্লাহর জীবনকাহিনী সুধারসে ভরপুর। এই সুধায় ভরা জীবনকথার সঙ্গে মুসলিম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সুন্দর সংযোগ থাকায় ঐতিহ্যগর্বী মুসলমানদের কাছে জৈনুদ্দীনের 'রসুলবিজয়' খুবই প্রিয়। আবার কাব্যের বিষয়বস্তুতে কবিকল্পনারও কিছু যোগ আছে। ফলে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আনন্দরস যোগান দিয়ে লোকপ্রিয় করার চেষ্টাও কবি করেছেন।

হজরত মুহম্মদের সঙ্গে ইরাকের সম্রাট জয়কুমের যুদ্ধকাহিনী 'রসুলবিজয়ে'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। মূল কাহিনীর সঙ্গে ইসলামের অন্যান্য যেসব বীরের কাহিনী যুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো হজরত ওমর, হজরত আবু বকর, ওসমান, আলী এবং হাসান হোসেন ও হানিফার কাহিনী। রসুলুল্লাহ মানব হিসাবে যেমন বড়ো ছিলেন, যোদ্ধা হিসেবেও তেমন। নবীর যুদ্ধযাত্রায় তাঁর সুসজ্জিত বাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন কবি এভাবে,—

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্যরথে।
সুসজ্জ হইলা সব সংগ্রাম করিতে॥
তার পাছে সুসজ্জ হইলা নবীবর,
আকাশে উদিত যেন হইল শশধর॥
ধবল অশ্বেতে নবী আরোহিলা যবে,
আকাশের মেঘে ছায়া ধরিয়াছে তবে॥
নিঃসরিলা নবীবর সঙ্গে অশ্ববার,
প্রচণ্ড মৃগেন্দ্র যেন সাতাইশ হাজার॥
চলিল সকল সৈন্য করিয়া যে রোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিল্লোল॥

এছাড়াও আছে যুদ্ধক্ষেত্রের জমজমাট বর্ণনা। কাফেরদের সঙ্গে মুসলমান বীরদের যুদ্ধ,—

গজে গজে যুদ্ধ হৈল দন্ত পেশাপেশি।
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল দুই মেশামেশি॥
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ।
বরিষার মেঘের যেন বরিষে সঘন॥
অস্ত্রজালে ভরি গেল গগনমণ্ডল।
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলটল॥

হিন্দুপুরাণের কুরুপাণ্ডব কিংবা রাম-রাবণের যুদ্ধকাহিনী মুসলিম কবিদের কাছেও বেশ আকর্ষণীয় ছিলো বলে মনে হয়। কবি জৈনুদ্দীনের মুখে তাই শুনি,—

যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার।
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর॥

এবং,—

কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ।
হেন মল্লযুদ্ধ না দেখিছি কদাচন॥

যদিও মুসলমানদের এ যুদ্ধ কবির কাছে অনেক বড়ো, কিন্তু তাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে যে হিন্দুপুরাণের যুদ্ধটিকে উদাহরণ হিসেবে আনা দরকার এটি কবি বুঝেছিলেন। বিধর্মীরা এরপর টিকতে না পেরে,—

ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ।
পদ্মাকূল বাএ যেন উপটে তরঙ্গ॥

চার শ বছর আগের পদ্মা নদীও জৈনুদ্দীনের কলমের ডগায় বেশ জীবন্তভাবে বেরিয়ে এসেছে।

মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর আদর্শ পুরুষ হজরত আলী তাঁর বাহিনীকে নিয়ে বিধর্মী-মারণযজ্ঞে যেভাবে মেতে উঠেছেন কবি জৈনুদ্দীন নিজেও সম্ভবত তাকে ঠেকাতে না পেরে পাঠকের কাছে সেই দুর্ধর্ষ বীরের বর্ণনাটি অবলীলায় তুলে ধরেন,—

শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়া হায়দার।
মারেন্ত আছাড়ি সব ভূমির উপর॥
অতি কোপে ধরি শত করিবর দন্ত।
ভ্রমাই ক্ষেপন্ত সৈন্য মারন্ত অনন্ত॥
যদি কভু সম্মুখে দেখন্ত গিরিবর।
উপাড়ি ক্ষেপন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্য পর॥

এরপর যখনই 'কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকটে' তখনই কাফেরদের উদ্দেশ্যে মুমিন মুসলমানগণ উপদেশ দিচ্ছেন, —

বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ।
অবিলম্বে তোম যাই নবীর চরণ॥

জৈনুদ্দীন তাঁর 'রসুলবিজয়' কাব্যরচনায় ফারসি কাব্যকে আদর্শ করলেও তাঁর স্বাধীন শিল্প-কৌশলটি তিনি এতে রক্ষা করেছেন। ফলে এ কাব্য সাধারণ মানুষের আনন্দরসের কারণ হয়েছে।

তিন॥ ষোড়শ শতকের মুসলিম কবি

সাবিরিদ খান॥ সাবিরিদ খান বা শাবারিদ খান চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন অনুমান করা হয়। কবি তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে নিজের একটি বংশলতিকা দিয়েছেন। বংশলতিকাটি অনুসরণ করে তাঁর বংশের যে-কয়জন উল্লেখযোগ্য পুরুষের নাম জানা যায় তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে পিয়ার মল্লিক, উজিয়াল, মুসা খান, নানুরাজ এবং সাবিরিদ খান। কবির পিতামহের উপাধি সম্ভবত 'ঠাকুর'। সাবিরিদ খান নানুরাজ মহল্লিক নামক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রামের কিংবদন্তি অনুসারে নানুরাজের নামানুসারে সেখানকার নানুপুর গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে। সাবিরিদ খানের বংশলতিকাটি কবির নিজের ভাষায়,—

পিয়ার মল্লিক সুত বিপ্রবর শাস্ত্রযুত
উজিয়াল মল্লিক প্রধান।

তান পুত্র জিঠাকুর তিন সিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুসা খান॥
রসেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অর্কসুত।
ধৈর্যবন্ত যেন মেরু জ্ঞানেত বাসব গুরু
মানে কুরু ধর্মে ধর্মসুত॥
তান সুত গুণাধিক নানুরাজ মহল্লিক
জগতে প্রচার যশ খ্যাতি।
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিরিদ খান
পদবন্ধে রচিত ভারতী॥

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের উদ্ধারকৃত সাবিরিদ খানের ভণিতায় তাঁর কুলের পরিচয়জ্ঞাপক আর একটি অংশ নিম্নরূপ[৮১], –

হাওলা, দেয়াঙ্গি মৈষমূঢ়া, কাঞ্চনা মহাম্নদপুর।
হাশিমপুর, বাঙ্গালিয়া এই আষ্ট শ্রী॥
চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ী।
কাঞ্চন প্রহরী রৈল জমসের চৌধুরী॥
আলি মুন্দার, হাদু মুন্দার, বাড়াইয়া মুন্দার ভাই।
ফরমানী মুন্দার পাইল জামিজুড়ি যাই॥

চট্টগ্রামের বিভিন্ন গ্রামের নাম 'আলি মুন্দার', 'হাদু মুন্দার' ইত্যাদি। এসব গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই বেশ প্রতিষ্ঠাবান ও অভিজাত বলেও জানা যায়। চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কূলে ছিলো সাবিরিদ খাঁর বাসস্থান। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—

শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কূলে শঙ্খ নদীর মোড়।
সাধু খাঁ সাবিরিদ খাঁ তারা দুই ঘর॥

সাবিরিদ খাঁর সঙ্গে জনৈক সাধু খাঁর অবস্থানও ছিলো সেখানে। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকান-রাজের অধীনে ছিলো বলে জানা যায়।[৮২] সাবিরিদ খান এই দক্ষিণ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলেই অনুমান করা হয়। তাঁর কাল খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে।

সাবিরিদ খান 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুলবিজয়' এবং 'হানিফা ও কয়রা পরী', এই তিনটি কাব্যের রচয়িতা। কাব্যগুলোর কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। বিদ্যাসুন্দরের পাতার সংখ্যা আট, রসুলবিজয়ের তেরো এবং হানিফা ও কয়রা পরী মোট বিশ পাতার বই। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি এসেছে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। আদিরসের কাহিনী হিসেবে বিদ্যাসুন্দরের খ্যাতি আছে। বাংলায় এ কাহিনীর আদি-রচয়িতা ছিলেন সাবিরিদ খান। অন্যান্য রচয়িতা হচ্ছেন

৮১. আহমদ শরীফ, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং. ১৯৮৩), পৃ. ৪১৫
৮২. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬

কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর, গোবিন্দদাস, মদনদত্ত এবং পরে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। কাব্যে নন্দনতাত্ত্বিক মাধুর্যদানের কুশলী শিল্পী ছিলেন কবি সাবিরিদ খান। ছন্দ, উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষার চমৎকার ব্যবহার দেখা যায় তাঁর কাব্যে। বোঝা যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের নানা বিষয়ের উপর তাঁর দখল ছিলো গভীর। সাবিরিদ খানের অলঙ্কার-প্রয়োগের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর কাব্যে কবিত্বের সঙ্গে বৈদগ্ধ্যের সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। 'বিদ্যাসুন্দরে'র নায়িকার রূপবর্ণনায় কবিত্বের যেমন ঘটা, তেমনি তাতে রয়েছে কবির পাণ্ডিত্যের কিছু পরিচয়। একটি উদাহরণ,—

মুখবিধু পূর্ণ ইন্দু কিয়ে অরবিন্দ।
মৃগবংশ নেত্র কিবা লীলামত্ত ভৃঙ্গ॥
বালে জিনিয়া ভাল শ্রীমন্ত উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর সুগোল॥
রদ পাঁতি মুতি দ্যুতি বাচ সুমধুর।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিঃসবে প্রচুর॥
কণ্ঠরেখা এসি কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা-কুচ হৃদয়ে উগিল॥
কৈছন অঙ্গের লীলা কে আর স্বরূপ।
কৈছন নাসিকা শ্রুতি কর ভুজযুগ॥
কৈছন কুমারী মধ্যভাগ পাদছন্দ।
কৈছন নিতম্ব উরু জঙ্ঘের প্রবন্ধ॥

কবির কল্পনায় শারীরিক সৌন্দর্যের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধির যে মিলন ঘটানো হয়েছে তা মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে ছিলো বিরল।

সঙ্গতকারণেই বলা যায় আদি মধ্যযুগের ভাষা হয়েও সাবিরিদ খানের ভাষায় রয়েছে এমন এক শক্তি যার বিকাশ ঘটেছে কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে। সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে তৎকালীন হিন্দুসমাজেরও কিছু পরিচয় আছে। দেশে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিলো। পাঁচ বছরের বিদ্যাকে 'গুরুস্থানে সমর্পণ কৈল' এবং চার বছরের সুন্দরের 'জ্ঞানহেতু হাতে খড়ি হয়।' হিন্দুসমাজে প্রচলিত দান-ধ্যান, অতিথি-সেবা ও ব্রত-পালনের কথাও বলা হয়েছে। বিতর্কমূলক প্রতিযোগিতার দ্বারা জ্ঞান ও বিদ্যার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। 'বিদ্যাসুন্দরে' নাটকীয় ভাবেরও চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেও এ সম্পর্কে সচেতন। যেমন,-

এ নাটগীতেত তাল ন করিবা ভঙ্গ।
এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ॥

রূপকধর্মী এই কাব্যে কবি সুফীবাদ-প্রভাবিত অধ্যাত্মতত্ত্বকে অবশ্য বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন নি। তবে তাতে তত্ত্বের বাড়াবাড়ি না থাকায় কাহিনীর শিল্পরস ব্যাহত হয় নি। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে কাব্যে নন্দনতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য যোজনায় মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে কবি সাবিরিদ খান ছিলেন এক অদ্বিতীয় শিল্পী।

বারো পাতার খণ্ডিত কাব্য 'রসুলবিজয়ে' হজরত মুহম্মদের বিজয়াভিযানের এক বর্ণবহুল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সাবিরিদ খানের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই কাব্যেও।

'মোহাম্মদ হানিফা ও কয়রা পরী'র কাহিনী কবির রোমান্টিক চেতনার এক চমৎকার বাণীবদ্ধ রূপায়ণ। ফারসি সাহিত্যে হজরত আলীর পুত্র মোহাম্মদ হানিফা এক অসাধারণ বীররূপে চিত্রিত হয়েছেন। সাবিরিদ খান হানিফার সেই বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকেই তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন। সাহিরাম রাজার বীর্যবতী কন্যা জয়গুনকে বাহুবলে পরাস্ত করে হানিফা তাকে বিয়ে করেন এবং বিয়ের পর জয়গুনকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। বীর হানিফা এরপর দিগ্বিজয়ে বের হন। কিন্তু এই বীরও বাহরাম রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে একদিন আহত হন। এদিকে শাহাপরীর কন্যা কয়রা পরী হানিফার প্রতি আসক্ত হয় এবং সেই আসক্তি দিনে দিনে এমন প্রবল হয় যে কয়রা দিনে একবার হানিফাকে না দেখলে প্রায় পাগল হয়ে যায়। প্রেমের এই আকর্ষণে কয়রা পরী শেষ পর্যন্ত হানিফাকে অপহরণ করে। হজরত আলী রসুলুল্লাহর মাজারে গিয়ে একথা টের পান। এরপর বীরাঙ্গনা জৈগুন রোকাম শহর আক্রমণ করে সেখানকার দুর্মিক রাজাকে পরাজিত করেন। দুর্মিক ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। পুথির বাকি অংশ খণ্ডিত।

ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে কবি সাবিরিদ খান 'হানিফা ও কয়রা পরী'তে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে একদিকে তাঁর রোমান্টিক মনের বিকাশ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, অন্যদিকে শিল্পরসের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে। কাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগ মধ্যযুগের কবিদের একটা রেওয়াজ ছিলো। সাবিরিদ খানের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তবে কবি শিল্পের যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। যেমন,--

ভুরুযুগ কন্দক মৃণাল শোভন।
চারুকর কঙ্কণ কেয়ূর সুশোভন॥
করতল কমল অশোক শোক লাজে।
রত্নময় অঙ্গুরী আঙ্গুলময় সাজে॥
সুরেখ লখর সব জিনি পুষ্পরাগ।
ভাল ইন্দুনিভ নখত লুকিত ভাগ॥
উরস সম উরসি জিনি উপমা।
চারুতর রোমরাজি তনু রম্ভা সমা॥
ত্রিবলি সবলী বালা মধ্যদেশ ক্ষীণি।
নিদনাভ সুধাকুণ্ড পীনোন্নত ক্ষীণি॥

চট্টগ্রামের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে একটি উঁচু পর্বতের শিখরদেশে হানিফা ও কয়রা পরীর একটি টঙ্গী আছে,--এই বিশ্বাস থেকে স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করে, সেই টঙ্গীর কাছাকাছি পৌঁছলে সেখান থেকে নাকি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হয়। তাছাড়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে শাহাপরীর দ্বীপ আছে। এবং রোকাম আরাকানের প্রাচীন নাম, সম্ভবত রোসাঙ্গের অপভ্রংশ। হানিফা ও কয়রা পরীর আলোচনা প্রসঙ্গে এসব কথা জানিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামল হক।

শেখ কবীর॥ মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 'কবীর' নামধারী কয়েকজন কবিকে নিয়ে বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেননা তখনকার পুথির জগতে বেশ কয়েকজন কবীর নামধারী কবি তাঁদের নামগুলোকে পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। নামের মাহাত্ম্য তার কারণ কিনা বলা মুশকিল। এই সূত্র ধরে আমরা শুধু 'কবীর' নামীয় কবিকে যেমন পাই, তেমনি পাই 'শেখ কবীর' ও 'মুহম্মদ কবীর'কে। নানা বিচার-বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ 'কবীর' এবং 'শেখ কবীর'কে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। তার বাইরে যে-কবীর আছেন, তিনি 'মধুমালতী' কাব্যের সুপরিচিত কবি মুহম্মদ কবীর। বর্তমান আলোচনার বিষয় শেখ কবীর।

মধ্যযুগের পুথিগুলো লিপিকারদের হাতে পড়ে কখনো কখনো কোনো-কোনো অংশের মূলরূপ হারিয়ে ফেলে, কিংবা মূল পুথিখানি তার ভিন্নতর রূপ লাভ করে। যেমন, কবি শেখরের একটি পদের সঙ্গে শেখ কবীরের একটি পদের মিল রয়েছে। মিলটি এরকম,—

ক. কবি শেখব ভণে অপরূপ রূপ দেখি।
রায় নসরত শাহ ভজিল কমলমুখি॥

খ. সেখ কবীবে ভণে অহি গুণ পামরে জানে।
ছলতান নছিরা সাহা ভুলল কমল বনে॥

এই সাদৃশ্য থেকে 'কবিশেখর' ও 'শেখ কবীর' যে অভিন্ন ব্যক্তি তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আর এই বিভ্রান্তি যে লিপিকারের দৌরাত্ম্যেই ঘটেছে তা-ও মনে করার কারণ আছে। সুতবাং ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে কবেন, কবিশেখব আসলে শেখ কবীব। একই যুক্তি খাড়া করে অন্যদিকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, কবিশেখর যদি শেখ কবীর হতে পারেন, তবে অনুলিপিকারের দোষে শেখ কবীর কবিশেখর হতে প্যারবেন না কেন?[৮৩]

আসলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। আমরা যদি মনে করি 'কবিশেখর' 'শেখ কবীরে'র একটি সম্মানসূচক উপাধি হতে পারে তাহলে হয়তো বিভ্রান্তির কিছুটা অবসান হয়। তবে পণ্ডিতদেব মধ্যে লিপিকারের স্বেচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি-ঘটানোর কথাটিও এক্ষেত্রে মনে বাখতে হবে।

শেখ কবীর যে তাঁর পদে সুলতান নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) নাম উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁকে আমরা চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) সমসাময়িক ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের লোক বলে মনে করতে পারি। এবং নসরত শাহের গুণ-গরিমার বর্ণনা ও তাঁর অন্তবঙ্গ পরিচিতি থেকে এমনও মনে কবতে পারি যে হযতো সুলতানের অধীনে কবি বাজকার্যে কার্যরত ছিলেন। সুলতান নসরত শাহ যে একজন বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিসেবী সম্রাট ছিলেন, ইতিহাসে তা সুবিদিত। মধ্যযুগের অনেক কবি তাঁব এই গুণের কথা উচ্ছ্বাস সহকাবে ব্যক্ত করেছেন। সম্রাটের সমসাময়িক শেখ কবীরও এই গুণবান বাজপুরুষের গুণকীর্তন করে ধন্য হয়েছেন। যেমন,—

অ কি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি॥

৮৩. মুহম্মদ এনামুল হক ; 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ৩য় সং. ১৯৬৮), পৃ. ৭১

কাজলে রঞ্জিত নয়ন ধনি ধবল ভালে।
ভোমরা ভোলল বিমল কমল দলে॥
গুমান না কর ধনি খিন অতি মাঝাখানি।
কুচগিরি ফলের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িব জৌবনি॥
সুন্দরী চান্দমুখি বচন বোলসি হাসি।
আমিআ বরিষে জানি জৈছে শবদে পূরণ শশী॥
সেক কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে।
ছলতান নছিরা সাহা ভূলল কমল বনে॥

সংস্কৃতিসেবী সম্রাট যে রূপেরও পূজারী ছিলেন, এই বিষয়টি অনুভব করে কবি রাধিকার উচ্ছ্বসিত রূপবর্ণনার দ্বারা সম্রাটকে মুগ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। শেখ কবীর প্রধানত একজন পদকার। কোথাও কোথাও তিনি শুধু কবীর, শেখ কবীর নন। তবে কবীর আর শেখ কবীর যে কোনো ভিন্ন ব্যক্তি নন, সে সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন, শেখ কবীর ও কবীরকে আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলে অনুমান করি।

শেখ কবীরের পদে সুফীবাদের সুন্দর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। শুধু শেখ কবীর কেন, তখনকার সব মুসলিম পদকর্তাই প্রধানত সুফী সাধনার ধারাকে তাঁদের রচিত পদাবলীতে ধারণ করেছেন। সুফী সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে প্রধানত পারস্যের মরমিয়াবাদকে আশ্রয় করে। সুফীবাদের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্যের একটা অন্তর্ধর্মগত মিল লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব কবির জীবাত্মা পরমাত্মা ঘটিত চিন্তাচেতনার উপর সুফীবাদ নিবিড় প্রভাব সঞ্চার করে। ফলে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রীয় অনুভূতির স্পর্শে যে মায়াঘন রহস্যময়তার অভিক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় সেখানেও সুফীবাদের প্রভাবকেই প্রধানভাবে মেনে নিতে হয়। ডক্টর সুকুমার সেন কবীরের একটি পদ আবিষ্কার করেছেন যে-পদটিতে সেই অতীন্দ্রীয় অনুভূতির স্পর্শসঞ্জাত মায়া আর রহস্যময়তা লৌকিক জীবনের বিবিধ বর্ণনার মধ্যেও জীবন সম্পর্কে এক নিস্পৃহ ভাবনার জন্ম দেয়। পদটিতে শুধু 'কবীর' ভণিতা পাওয়া যায়। যেহেতু গবেষকগণ কবীর ও শেখ কবীরের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন না, এবং ডক্টর সুকুমার সেনও এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, সুতরাং এই পদের রচয়িতা হিসেবে আমরা শেখ কবীরকেই চিহ্নিত করতে পারি। কবীরের পদটি হচ্ছে,—

অব কেয়া করে গান গাব--কতুয়ালা।
শ্ব মাংস--পসারি গীধ বাখওয়ালা॥
মূসা কি নাও বিলাই কাড়ারী।
সোএ মেড়ুক নাগ পহারী॥
বলদ বিয়াওযে গাভি ভই বাঞ্ঝা।
বাছুরি দুহাওযে দিন তিন সাঞ্ঝা॥
নিতি তিনি শৃগালা সিংহ সনে জুঝ।
কহে কবীরে বিরল জনে বুঝ॥

পদটি যে হিন্দি ব্রজবুলি মিশ্রিত বাংলায় রচিত তা সহজেই বোঝা যায়। ডক্টর সুকুমার সেন এর আধুনিক বঙ্গ ভাষান্তরিত রূপটি দিয়েছেন এভাবে,—

এখন কি কি গান করছে গ্রাম-কোতোয়াল? কুকুর দিয়েছে মাংসের পসার, নজর রাখছে গৃধ্র। ব্যাঙ শুয়েছে, প্রহরী নাগ। বলদ বিয়ালো, গাই হল বাঁঝা, বাছুর দোহা হচ্ছে দিনে তিন সন্ধ্যা। নিত্য নিত্য শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সাথ। কবীর কহেন, কম লোকেই বোঝে।

ডক্টর সেন কবীরের এই পদটি পেযেছেন একটি পুরোনো বাংলা পুথিতে মীরার দুটি হিন্দি পদাবলীর এবং জ্ঞানদাস ও মীর ফৈজুল্লাহ আলীব কয়েকটি ব্রজবুলি পদাবলীর সঙ্গে। পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির অনুবৃত্তি পাওয়া যাচ্ছে কবীরের গানে। একাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সহজ সাধনাব গঙ্গাধারার সঙ্গে সুফী-সাধনার যমুনা-ধারাকে মিলিয়ে দিলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান সাধক কবিরা।'[৮৪]

সুফী সাধনায প্রেমধর্মের যে বিশ্লেষণ তাতে দেখা যায় পরম পুরুষ নিজেও যথারীতি প্রেমেব উৎসবে শরীক হন। যখন তিনি প্রেমের লীলায় মত্ত হন, জীবাত্মা তখন তাঁব প্রেবণায় এবং অর্ন্তপ্লাবী এক তাড়নায পরমাত্মাব সঙ্গে যুক্ত হয়। মধ্যযুগের মুসলিম পদকর্তারা বহুলভাবে এই সুফীভাবে ভাবিত। এভাবেই বাংলার বৈষ্ণব প্রেমধর্মের সঙ্গে সুফী প্রেমধর্মের একটি সহজ সমন্বয় গড়ে উঠেছে। তবে পারস্যের সুফী সাধনার প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাব বৈষ্ণবধর্মের স্বাভাবিকতাকে কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেন নি এ দেশেব মুসলিম কবিরা। বৈষ্ণবধর্মের মৌল প্রেবণা রাধাকৃষ্ণেব জৈবলীলার মনোরম উৎসারণ এবং তার মধ্যেই জীবাত্মা পরমাত্মাব লীলাব প্রকাশ ঘটে অবলীলায়, এই উপলব্ধি সূত্রে মুসলিম কবিবাও নির্দ্বিধায শবীক হযেছেন রাধাকৃষ্ণেব প্রেমের মহোৎসবে।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের আবির খেলাব বিষয় নিয়ে কবীর একটি পদ বচনা কবেছেন। পদটি বচিত হযেছে ব্রজবুলি-মিশ্রিত বাংলায়। গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসেব ভাষাগত বৈশিষ্ট্যেব সাদৃশ্য লক্ষ্য কবা যায় এই পদে। উপরন্তু চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসেব নিবিড় ভাবলোকও স্পর্শ করেছে পদটিকে। পদটি হচ্ছে,—

বরজাকিশোরী কান্ত খেলত রঙ্গে।
চুয়াচন্দন, আবির গোলাপ, দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥
ফাগু হাতে করি, ফিবত শ্রীহরি, ফিরি ফিবি বোলত রাই।
ঘুনঠ উঠায়েঁ, বগান ছাপায়ত, বেরি বেবি যৈছে মেঘসেঁ চাঁদ লুকাই॥
ললিতা এক সখি, ফাগু হাতে করি, দেয়ত কানু নয়ান।
বৃযভানু কিশোরী, দুহুঁ বাহু ধরি, মানত শ্যাম বয়ান॥

রাধিকাব এই রূপের বর্ণনা শুনেই যে সুলতান নসরত শাহ প্রেমের কমলবনে প্রবেশ করে প্রেমমুগ্ধ হয়েছিলেন, কবীরের এই মন্তব্যেব তাৎপর্য অনুযায়ী পাঠকেব মনে সেই বিশ্বাস আসতে বাধা কোথায?[৮৫]

দৌলত উজির বাহরাম খান॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বোমান্টিক প্রণযোপাখ্যান-মূলক কাব্যের ধারায় দৌলত উজির বাহরাম খান একজন উল্লেখযোগ্য কবি। বোমান্টিক

কাব্যে প্রেমের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির চিত্রগুলোকেই কবিগণ তাঁদের কাব্যভাবনায় রূপ দিয়েছেন। এই ধারার অধিকাংশ কাব্যের পরিণতি নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। কাব্যভাবনার দিক থেকে দৌলত উজির বাহরাম খান ছিলেন বিরহের কবি। তবে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের একজন শিল্পদক্ষ কবি হিসেবেও তাঁকে বিবেচনা করা যায়।

মধ্যযুগের কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে বঙ্গাধিপতি আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) নাম সর্বজনবিদিত। দৌলত উজির বাহরাম খানের পূর্বপুরুষ হামিদ খান ছিলেন হুসেন শাহের সচিব। হুসেন শাহের গুণগান করে কবি দৌলত উজির বলেছেন,

পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হুসেন শাহাবর।
তান বত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়তে শোভিত মনোহর॥

এই গুণবান সম্রাটের প্রধান উজির হামিদ খানেরও 'গুণের অন্ত নাই।' তাঁর কীর্তির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় অন্নশালা স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ ও পুষ্করিণী খনন। এসব জনহিতকর কাজ করায় হুসেন শাহ তাঁকে 'প্রসাদ কবিলা দুই সিক'। এই দুই সিক বা পরগণা ছিলো চট্টগ্রামে। হামিদ খান তার মালিক হয়ে অবশেষে চট্টগ্রামেই চলে আসেন।

চট্টগ্রাম এক সময় নিযাম শাহের অধিকারে আসে। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি,—

অনুক্রমে বংশকথা গঞ্জিলেন্ত এই মত
গৌড়ের অধীন হৈল দূষ।
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহা সুর॥

চাটিগ্রাম অধিপতি নিযাম শাহের দরবারে-কবি হলেন প্রথমে মুবারক খান ও পরে তাঁর পুত্র বাহরাম খান। নিযাম শাহ অবশ্য তৎকালীন আরাকান-রাজের নিযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। চট্টগ্রাম তখন ফতেয়াবাদ নামে পরিচিত। রাজধানীর নামও ছিলো ফতেয়াবাদ।

কবি দৌলত উজির তাঁর আবির্ভাব-কালের সঠিক কোনো কালনির্দেশনা দিতে পারেন নি। কবির উক্তি অনুযায়ী তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের তখনকার শাসনকর্তা নিযাম শাহের 'দৌলত উজির' বা 'দিওয়ান'। বোঝা যায় পেশায় তিনি ছিলেন রাজকর্মকর্তা, কিন্তু নেশা ছিলো তাঁর কাব্যরচনা। কবি দৌলত উজির তাঁর নিজের একটি বংশ পরম্পরাগত বিবরণী দিয়েছেন। যেমন,—

এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান
তাহান বংশেত উৎপত্তি।
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
সদা এ ধর্মেত তান মতি॥
তান প্রতি মহীপাল খেতাব অধিক ভাল

স্থাপিলেন্ত দৌলত উজ্জির।
সাধু সৎলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিত রঙ্গে
ধর্মরূপে তেজিলা শরীর॥
তান পুত্র ক্ষুদ্র সন নাম মোর বহরাম
মহারাজ গৌরব অন্তরে।
পিতামাতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিল মোরে॥

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম তৎকালীন আরাকান শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[৮৬] নিযাম শাহ এই কালপরিধির কোনো এক সময় আরাকান রাজা কর্তৃক নিযুক্ত চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন। নিযাম শাহ সামরিক দিক থেকে হয়তো এক কৃতি পুরুষ ছিলেন। সেজন্য তাঁর নামের শেষে শূর শব্দটি যুক্ত হয়। অথবা তিনি হয়তো শূরবংশীয় আফগান বংশোদ্ভূত ছিলেন। আসলে হামযা খান মসনদ-ই-আলা (মৃত্যু আনুমানিক ১৫৩০-৫৫) ছিলেন তখন উত্তর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা উজির। নিযাম শাহ ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের সামন্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য কবি বাহরাম খান তাঁকে 'নৃপতি নেজাম শাহা সুর' বলে সম্মান দেখিয়েছেন এবং তাঁর অধীন কর্মকর্তা হয়ে নিজেকে বলেছেন 'দৌলত উজির'। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কবি বাহরাম খান নিযাম শাহ কর্তৃক দৌলত উজির উপাধি পান।[৮৭] কবি তাঁর পিতা মুবারক খানের উত্তরাধিকারীরূপে এই উপাধি পান। এই উপাধিপ্রাপ্তির এক কি দেড় দশক পরে বাহরাম খান 'লায়লী মজনু' কাব্য রচনা করলে কাব্যের কাল হয় ১৫৭০/৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

তবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী মজনু' কাব্যের রচনাকাল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী হুসেনশাহী বংশের পরে চট্টগ্রাম শূরি, কররানি, মগি ও ত্রিপুরা রাজগণের অধীনে আসে। পরে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তাতে কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের কাল শত বছর পিছিয়ে যায়। মধ্যযুগের কবিদের কালনির্ণয় ব্যাপারে গবেষক ও পণ্ডিতগণ শুধু ঢালাও মন্তব্য করেছেন, কিন্তু জোরদার তেমন কোনো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন নি। ফলে কার মন্তব্য সঠিক সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি আসে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কারোর মতামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

এবার কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যের প্রসঙ্গ। দৌলত উজির তাঁর গুরু আসাউদ্দীনের দোয়া নিয়ে 'লায়লী মজনু' কাব্য রচনায় হাত দেন। কাহিনী শুরু করার আগে আল্লাহ, রসুল, রসুলের চার আসহাব ও গুরু আসাউদ্দীনের প্রশংসা কীর্তিত হয়।

৮৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬
৮৭. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ৯৪

'লায়লী মজনু' প্রেমের কাব্য এবং সে প্রেম বিরহের। কাহিনীর সর্বত্রই বিরহবিধুর চিত্তের যে মর্মস্পর্শী আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে তাকে সুকৌশলে কবি সম্পূর্ণভাবে মানবীয় ভাবের মধ্যেই রূপায়িত করেছেন, মধ্যযুগের অনেক কবির মতো তিনি কোনো অলৌকিক ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হন নি। এইদিক থেকে তার 'লায়লী মজনু' বিশেষ উৎকর্ষ দাবি করে।

পারস্যের একটি সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে 'লায়লী মজনু'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। তবে মূল গল্পের সঙ্গে ফারসি কাব্যের সম্পর্ক থাকলেও এ কাহিনীর বাংলা রূপান্তরে কবি দৌলত উজির বাহরাম খান তাঁর মৌলিকতা গুণটিকে কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেন নি। ঘটনা-চিত্রণে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব হয়তো এসেছে, কিন্তু তার পরিবেশনটি হয়েছে সম্পূর্ণত বঙ্গীয় আদর্শ ও রীতিনীতির অনুসরণে। দেশীয় ঐতিহ্যকে কবি কোনোক্রমেই বিস্মৃত হন নি। সেজন্য দৌলত উজিরের 'লায়লী মজনু' বিয়োগান্তক কাব্য হিসেবে একটি সার্থক সৃষ্টি। কবির ঐতিহ্যপ্রীতি তাঁর একটি কারণ।

রোমান্স সৃষ্টির কারণে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণা মধ্যযুগের কাব্যের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে 'লায়লী মজনু' সেই দিক থেকে একখানি রোমান্টিক কাব্য হলেও এর বেশির ভাগ বিষয় অলৌকিকতার স্পর্শমুক্ত। একাব্যের প্রথম দুই একটি অংশ ছাড়া বাকি অংশগুলোতে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ নেই।

কবি দৌলত উজির বিরহের কবি। পদাবলীর চণ্ডীদাসও বিরহের কবি। নায়ক নায়িকার হৃদয়ে বিরহের দাহ সৃষ্টি করেও পরস্পরের চিত্তদমনের তীব্রতা সৃষ্টিতে উভয় কবির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। লায়লীর প্রতি কয়েস যখন উক্তি করে,—

তোমার পিরীত হৈল মোর প্রাণের বৈরী।
দেখিলে আকুল চিত্ত না দেখিলে মরি॥

অনুরূপ উচ্ছ্বাসবশে লায়লী যখন বলে,—

জীবন যৌবন মোর তনুমন হিয়া॥
ভাবের সাগরে উঠে উঠিল তরঙ্গ।
আনলে পড়িয়া যেন দহিল পতঙ্গ॥

তখন বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবের বৈশিষ্ট্য দৌলত উজির বাহরাম খানের রচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবির শিল্প- ভাবনায় লায়লী এখানে শ্রীরাধার মতোই নিখিল বিরহিণীর সর্বভূত ভাবমায়ার প্রতীক। বিরহের রূপ সৃষ্টিতে দৌলত উজিরের রসচেতনার উৎসারণ ঘটেছে কথার বিন্যাস-পারিপাট্যে ততটা নয়, যতটা ভাবের সংহত রূপের অভিব্যঞ্জনায়। করুণরসের এই পরিবেশন-পদ্ধতি সমকালীন কাব্যের জগতে অভিনব।

দৌলত উজিরের 'লায়লী মজনু' কাব্যে অশ্লীল রস পরিবেশনের সুযোগ থাকলেও কবি সেই চিরাচরিত প্রথাটির প্রয়োগ থেকে বিরত থেকেছেন। ভাষাপ্রয়োগে কবি সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসির মিলন-সৌষ্ঠব রক্ষা করেছেন। 'লায়লী মজনু' কাব্যে প্রবাদবাক্যের মতো কয়েকটি নীতিমূলক বাক্য আছে। যেমন,—

ক. বিহঙ্গমা বন্দী নহে মর্কটের জালে।
সিংহের আহার কভু না পায় শৃগালে॥

খ. এক নারী দুই পতি নাহিক সুগতি।
এক দেশে দুই নৃপ না হয় বসতি॥

গ. পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভয় বিবাদ।
মূর্খের সঙ্গে খেলা বিষম প্রমাদ॥

পঙ্‌ক্তিসমূহ গভীর ভাবোদ্দীপক ও কাব্যমধুর তো বটেই।

শেখ ফয়জুল্লাহ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'ফয়জুল্লাহ' নামযুক্ত একাধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে। এসব পুথির কোনোটায় 'শেখ ফয়জুল্লাহ', কোনোটায় 'মীর ফয়জুল্লাহ' নাম পাওয়া যায়। নামের এই বিভ্রাট কেন হয়েছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে 'শেখ' আর 'মীরে'র বিভ্রাট-মোচনে এইটুকু অনুমান করা হয় যে ফারসি থেকে আগত 'মীর', 'মীর্জা', 'আগা' এগুলো পারিবারিক পদবী। অন্যদিকে 'শেখ' দরবেশ ও কামেল লোকদের বলা হয়।[৮৮] তবে আজকাল 'শেখ'ও পারিবারিক বা বংশানুক্রমিক পদবী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমন হতে পারে যে যেহেতু কবি ফয়জুল্লাহ তাঁর কাব্যের অনেক জায়গায় অধ্যাত্ম যোগমহিমার কথা বলেছেন সেজন্য তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন লোকসমাজে তাঁকে শেখ ফয়জুল্লাহ রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। 'শেখে'র মাহাত্ম্য ধারণ না করেও আজকাল অবশ্য অনেকেই 'শেখ' হয়েছেন। তবে এখন শুধু একটা জায়গায় শেখের মাহাত্ম্য ধারণ না করলেও চলে। সে হচ্ছে 'শেখ' এখন ঢালাওভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের যেকোনো ব্যক্তিকেই বলা হয়। যেমন, 'শোনো হে শেখের পো'।

'শেখ ফয়জুল্লাহ' ও 'মীর ফয়জুল্লাহ'র নামবিভ্রাট প্রসঙ্গে আর একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে যেহেতু মধ্যযুগের পুথিগুলো লিপিকারগণ অনুলিখন করতেন, সুতরাং একজন লিপিকারের অনুলিখন-দোষে মীর ফয়জুল্লাহ তাঁর পারিবারিক পদবীচ্যুত হয়ে হয়তো শেখ ফয়জুল্লাহতে রূপান্তরিত হয়েছেন, কিংবা এমনি করে শেখ ফয়জুল্লাহ মীর ফয়জুল্লাহতে। সুতরাং শেখ ফয়জুল্লাহ ও মীর ফয়জুল্লাহ যে অভিন্ন ব্যক্তি তা হয়তো অনুমান করা যায়।

মধ্যযুগের কবিদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে শেখ ফয়জুল্লাহও তাঁর কাল সম্পর্কে কিছু হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তি রেখে গেছেন। এসব হেঁয়ালির কারণে আমরা যারা পণ্ডিত নই, তারা যে তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা যে এরূপ হেঁয়ালির দ্বারা খুব উল্লসিত হন তা খুব বোঝা যায়। কেননা ইচ্ছেমতো তাঁরা হেঁয়ালিগুলোর ব্যবচ্ছেদ করে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। হেঁয়ালি বোধহয় গবেষণার জন্য একটি বাড়তি সুবিধা।

শেখ ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীর' সূত্রে তাঁর 'গোরক্ষবিজয়' পুথিতে বলেছেন,-

এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন॥
মুনি বস বেদ শশী শাকে কহে সন।
শেখ ফয়জুল্লাহ ভণে ভাবি দেখ মন॥

---

৮৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫

'অঙ্কস্য বামাগতি' রীতি অনুসারে 'রস'কে ছয় ধরে হিসেব করলে দাঁড়ায় ১৪৬৭ শকাব্দ, তার সঙ্গে ৭৮ যোগ কবলে হয় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ। এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।[৮৯] অন্যদিকে 'রস' শব্দটিকে নয় ধরে ডক্টর আহমদ শরীফের অভিমত ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ। দুজনের অভিমতের মধ্যে ফয়জুল্লাহর কালগত পার্থক্য খুব ব্যবধানপূর্ণ নয়। সুতরাং তাঁদের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা শেখ ফয়জুল্লাহকে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফেলতে পারি।

ফয়জুল্লাহর 'গাজীবিজয়' কাব্যের মূলবিষয় রংপুরের খোঁটা দুয়ারের পীর ইসমাইল গাজীর জীবনকথা। ইসমাইল গাজী রুকনউদ্দীন বাববাক শাহের (১৪৫৯-৭৬) অধীনে সেনানী শাসক ছিলেন বলে জানা যায়। সম্রাটেব বিরাগভাজন হয়ে ইসমাইল গাজী একসময় নিহত হন। এই হিসেব অনুযায়ী ইসমাইল গাজী পঞ্চদশ শতকেব তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন। তাঁকে নিয়েও ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাব্য রচনা সম্ভব। শেখ ফয়জুল্লাহ গাজীকে নিয়ে কাব্য রচনা করায় তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা যায়।

ফয়জুল্লাহর নিবাস সম্পর্কেও কবির কোনো সুস্পষ্ট উক্তি নেই। কবি শুধু বলেছেন, 'বলে ফয়জুল্লাহ কবি পাচনায় বসতি।' এই উক্তি অনুসারে ডক্টর সুকুমাব সেন মনে করেন, ফয়জুল্লাহর নিবাস ছিলো পশ্চিমবঙ্গের পাচনা গ্রামে।[৯০]

শেখ ফয়জুল্লাহর নামে মোট পাঁচটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্যগুলো হচ্ছে,— 'গোর্খবিজয়' বা 'গোরক্ষবিজয', 'গাজীবিজয়', 'সত্যপীর', 'জয়নাবের চৌতিশা' ও 'রাগনামা'।

ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' পুথিতে 'ভীমদাস', 'ভীমসেন রায়' ও 'শ্যামদাস সেন' ইত্যাদি ভণিতা পাওয়া যায়। তবে অনুমান করা হয় এসব ভণিতা আসলে গায়েনের নাম। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চব্বিশ পরগণাব বারাসতে সরকারি শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার সময় সেখানকার এক গৃহস্থেব বাড়িতে একটি প্রাচীন পুথির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পাতা আবিষ্কাব করেন। একটি পাতায় যে-অংশ ছিলো তাব উদ্ধৃতি নিম্নরূপ। যেমন,—

গোর্খবিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত।
কহিলাম সব কথা শুনিলাম যত॥
খোঁটাদুয়ারের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন।
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন॥
মুনি-রস-বেদ-শশী শাকে কহি সন।
শেখ ফয়জুল্লাহ ভণে ভাবি দেখ মন॥

উদ্ধৃত অংশটি থেকে বোঝা যায় ফয়জুল্লাহ গোরক্ষের কাহিনী শুনে এ বিষয়ে কাব্য রচনায় উৎসাহিত হন। ফয়জুল্লাহ যাঁব কাছ থেকে গোরক্ষের কাহিনী শোনেন তিনি জনৈক কবীন্দ্রদাস। কবীন্দ্রদাসের ভণিতা একাব্যে আছে। সেই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও

৮৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪

৯০. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (কলিকাতা : ইস্টার্ণ পাবলিসার্স, ২য় সং. ১৯৬৫) পৃ. ৪৬২

মনে করেন ফয়জুল্লাহ্ কবীন্দ্র উপাধিধারী জনৈক নাথগুরুর কাছে গোরক্ষকথা শোনেন। কবি তাঁর শিষ্যরূপে 'কবীন্দ্রদাস' ভণিতা ব্যবহার করে থাকবেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় পুথিতেও আছে,—

কহেন কবীন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, এই আদ্যকথা অর্থে আদ্যপুরাণ বোঝায়। এবং এই আদ্যপুরাণ অবলম্বনেই গোরক্ষবিজয় রচিত হয়েছে। কবি ফয়জুল্লাহ্ কবীন্দ্রের মুখ থেকে আদ্যপুরাণ শুনে গোরক্ষবিজয় কাব্য রচনা করেন।[৯১] ডক্টর আহমদ শরীফও গোরক্ষবিজয় ফয়জুল্লাহর রচনা বলে মনে করেন। কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, ভীমসেন রায় কিংবা শ্যামদাস ভণিতাকে তিনিও গায়কের ভণিতা বলে মনে করেন।

বিতর্কিত এই গোরক্ষবিজয় কাব্য ষোড়শ শতকে রচিত হয়ে থাকবে। ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয় কাব্য থেকে বোঝা যায় তিনি নাথসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। কামচর্চা জীবন ধ্বংসের উৎস এবং জীবন উৎপাদী শুক্র বা বিন্দুকে ধারণ করার শক্তিই হচ্ছে অমরত্ব লাভের উপায়- -যোগসাধনার এই ধ্যানধারণা ও প্রক্রিয়াই হলো নাথসাহিত্যের তাৎপর্য। এই তাৎপর্যের উপর ভিত্তি করে যেসব বাস্তব চরিত্র নিয়ে নাথসাহিত্য রচিত হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন মীননাথ, জালন্ধরীপাদ, কানুপা, গোরক্ষনাথ প্রমুখ। স্বসমাজে ও স্বকালে তাঁরা সিদ্ধপুরুষরূপে মর্যাদা পান। শেখ ফয়জুল্লাহ হিন্দুর নাথশাস্ত্রীয় তত্ত্বকে যেভাবে তাঁর রচনার আদর্শ করেছেন, সমকালীন ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে বিচার করলে এতে তাঁর কিছুটা সাহস ও অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির নিরপেক্ষ চেতনার অভিব্যক্তি ও ভাবের স্ফূর্তি আনয়নের মধ্যেই যে সাহিত্যের সার্থকতা, ফয়জুল্লাহর শিল্পীমনে এই বোধটি নীরবে কাজ করেছে বলেই তিনি তাঁর সাহিত্যকে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে অবলোকন করেন নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, ফয়জুল্লাহর কাব্য-সাধনায় তার সুন্দর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ ছিলেন একজন যোগী ও মহাজ্ঞানে প্রাজ্ঞ। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি একদা কদলী নগরে যান। সেখানে তিনি ষোলশত রমণীর কুহকে পড়ে জপতপ, ধ্যানজ্ঞান ভুলে যান এবং ভোগসুখে জীবনযাপন শুরু করেন। যোগীর সাধনায় স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ, অথচ মীনানাথ সেই স্ত্রীকুহক-চক্রেই আটকে পড়েন। মীননাথের চরিত্রটি দুর্বলচিত্ত মানবজীবনের প্রতীক। তাঁর উৎকট ইন্দ্রিয়লালসা ও ভোগবিলাসের বর্ণনায় কবি জীবনবাস্তবতার চমৎকার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন,—

কহিলেন মীননাথ মনে মায়া ধরি।
জগতেও পাই যদি এমন সুন্দরী॥
বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই।
রঙ্গ কৌতুকরসে রজনী পোয়াই॥

---

৯১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৬

গুরুর অধঃপতনের বিষয়টি গোরক্ষনাথ বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নেন তিনি গুরুকে নারীর কামানল থেকে উদ্ধার করবেন। ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন উত্তীর্ণ হয়ে গোরক্ষনাথ নর্তকীর বেশে কদলীপত্তনে যান। সেখানে আত্মবিস্মৃত গুরুর চৈতন্যোদয়ের জন্য যথারীতি মৃদঙ্গের বোল তোলেন। গুরুকে বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্কেতে মহাজ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়াসও চলে। গুরুর মনে অবশেষে পূর্বস্মৃতি জাগে। তিনি হীন ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তির জগৎ ছেড়ে সাধনার জগতে ফিরে আসেন। গোরক্ষনাথ এভাবেই গুরুকে তাঁর আত্মবিস্মৃতির জগৎ থেকে উদ্ধার করেন।

দেহতত্ত্বের এই কাহিনীটি কবি লোকজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে রূপায়িত করেন। এতে সরস কবিকৌশল প্রয়োগ করায় যোগসাধনার দুর্বোধ্য নিগূঢ়তত্ত্বও উপভোগ্য হয়েছে। তাছাড়া কাব্যের সর্বত্র মানবিক রসের ধারাটিও অব্যাহত রয়েছে। নীতিভ্রষ্ট গুরুর চৈতন্য জাগানোর প্রয়াসে গুরু ও শিষ্যের পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে সজীবতা প্রকাশ পেয়েছে, নিঃসন্দেহে তা মানবীয় চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

ফয়জুল্লাহর দ্বিতীয় পুথি 'গাজীবিজয়ে' খোঁটাদুয়ারের পীর ইসমাইল গাজীর কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে। রংপুরের পীরগঞ্জে যে কাটাদুয়ার আছে, সেটিই সম্ভবত তখনকার খোঁটাদুয়ার। এখানে ইসমাইল গাজীর মাজারও রয়েছে। রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের দুর্ধর্ষ সেনানী ইসমাইল গাজীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য 'গাজীবিজয়ে'র উপজীব্য। গাজী ইসমাইল একসময় কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরকে পরাভূত করেন। তবে ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে সুলতানের বিরাগভাজন হয়ে তিনি নিহত হন। তাঁর ছিন্নশির রংপুরের পীরগঞ্জে ও বিচ্ছিন্ন দেহ হুগলীর মান্দারনে দাফন করা হয়।

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুসারে সত্যপীরের মা হুসেন শাহের বাঁদীর গর্ভজাত ছিলেন বলে মনে করা হয়। পরে সত্যপীর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত হন। সত্যপীরের আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে ফয়জুল্লাহ 'সত্যপীর' কাব্য লেখেন।

ফয়জুল্লাহর 'জয়নাবের চৌতিশা' মহরমের বিষাদবিধুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এ কাব্যের মাত্র এক জায়গায় কবির ভণিতা থাকায় কাব্যটি ফয়জুল্লাহর রচনা কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে অনেক পণ্ডিত মনে করেন 'জয়নাবের চৌতিশা' ফয়জুল্লাহরই রচনা। স্তব, স্তুতি ও বিলাপ প্রকাশের জন্য চৌতিশা কাব্য এক বিশেষ পদবন্ধে রচিত হয়ে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শেখ ফয়জুল্লাহই সম্ভবত এই ধারার কাব্যের স্রষ্টা। পরবর্তীকালে মক্তুল হুসেন কাব্যরচনার প্রেরণাও চৌতিশা কাব্যের ধারা থেকে এসে থাকবে। কেননা চৌতিশাও শোককাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

শেখ পরাণ।। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাবে শেখ পরাণ ততখানি আলোচিত কবি নন। শেখ পরাণ নিজের সম্পর্কে কিংবা নিজের কাব্য সম্পর্কে এমন কিছু তথ্যাদিও রাখেন নি। তবে তাঁর পরিচিতির বিষয়টি জানা যায় তাঁর পুত্র ও মধ্যযুগের অন্যতম মুসলিম কবি শেখ মুত্তালিবের আত্মবিবরণীর মারফত।

শেখ পরাণেব নামে দুখানি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। একটির নাম 'নূরনামা', অন্যটি 'নসিহতনামা'। কাব্য দুখানির একটিতেও কাব্যরচনার তারিখ নেই। শেখ মুত্তালিব পিতার সম্পর্কে এবং তাঁর কাব্যাদি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা তাঁর রচিত কাব্য 'কিফায়তুল মুসল্লিন'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় শেখ মুত্তালিব নিজেকে 'পরাণ-তনয়' ও 'পরাণ-নন্দন' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন,—

ক. কিফায়তুল মুসল্লিন শুন দিয়া মন।
বঙ্গভাষে কহে শেখ পরাণ-নন্দন॥
সব মসায়েল তিনি করি একত্তর।
কহিয়াছে কায়দানী কেতাব ভিতর॥

খ. সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন।
তাহান নন্দন হীন মুত্তালিব ভাণ॥

গ. মৌলবী রহমতুল্লাহ সর্বগুণ ধাম।
চতুর্দশ এলেম অবধান অনুপাম॥
তাহান আদেশে শেখ পরাণ-নন্দন।
হীন মুত্তালিব কহে শাস্ত্রের বচন॥

ঘ. ওয়াজির কথা কহি শুন যেই হএ।
হীন মুত্তালিব শেখ পরাণ-তনএ॥

এরকমভাবে শেখ মুত্তালিব তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে পিতা শেখ পরাণ সম্পর্কে কিছু বলাব চেষ্টা করেছেন। শেখ পরাণ তাঁর সমসাময়িককালে কাব্যরচনায় অথবা সামাজিক দিক থেকে হয়তো একজন খ্যাতিমান লোক ছিলেন। সেই কারণে কবিপুত্র শেখ মুত্তালিব তাঁর কাব্যে পিতার কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। ডক্টর আহমদ শরীফ মনে করেন, শেখ মুত্তালিব শেখ পরাণেরই পুত্র ছিলেন।[৯২] উত্তরাধিকার সূত্রে তাই মুত্তালিব কবিত্ব এবং কবিখ্যাতি দুটোই লাভ করেন।

শেখ পরাণ যে চট্টগ্রামেব সীতাকুণ্ডের অধিবাসী ছিলেন একথাটি পরাণ-পুত্র মুত্তালিব আমাদের জানিয়েছেন,—

সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন।
তাহান নন্দন হীন মুত্তালিব ভাণ॥

শেখ মুত্তালিব তাঁদের পরিবাব-জীবন সম্পর্কেও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাতে শেখ পরাণ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বলে মনে হয় না। যদি খাওয়া পরার ভাবনা না থাকতো তাহলে পিতার মৃত্যুর পর পিতৃহীন শিশু মুত্তালিবকে হয়তো জনৈক রহমতুল্লাহ মৌলবীর কাছে লালিত হওয়ার দুর্ভাগ্য অর্জন করতে হতো না।

শেখ পরাণের কালগত বিষয়টিও তর্কাতীত নয়। এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য তাঁরা প্রত্যেকেই কবিপুত্র শেখ মুত্তালিবের মন্তব্যের উপর নির্ভর

---

৯২ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৭

করেছেন। শেখ মুত্তালিব তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' কাব্যের রচনাকালের একটি তারিখ দেন,—

এসলাম এবাদত নামাক্ত সমাপ্ত।
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত॥
সপ্তমে চইল পুনি এবাদত নাম।
যেই দিন সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম॥

এই উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁর মতে আরবি আবজাদ রীতি অনুসারে পুস্তকটির সমাপ্তিব তারিখ ১০৪৯ হিজরী বা ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ।[৯৩]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকেব ব্যাখ্যা অনুসারে ধারণা করা যায় ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে যদি পুত্র মুত্তালিব তাঁর কাব্য রচনা করেন, তাহলে পিতা শেখ পরাণ তার কয়েক দশক আগে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। যদি তাই হয়, তাহলে তিনি ষোড়শ শতকের শেষার্ধের লোক।

কবিপুত্র শেখ মুত্তালিবের পিতৃহীন হওযার ব্যাপারটিকে ধরে ডক্টর আহমদ শরীফের অভিমত, শেখ মুত্তালিব শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুত্তালিবকে ৩৫ বছরের ব্যক্তি ধবে পিতাকে মধ্যবযসের ধবলে শেখ পরাণের জন্মসাল ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে কিংবা তাব দুই এক বছব আগে পরে হতে পারে। পরাণের মৃত্যুব সময় মুত্তালিব দশ বছরের হলে পিতা পবাণ ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে মারা যান। এই হিসেব অনুযায়ী শেখ পরাণের জীবনকাল যোড়শ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়। অর্থাৎ ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ।

মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতান শেখ পবাণের সমসাময়িক কবি ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। 'নূবনামা' কাব্যে শেখ পবাণ সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশে'ব উল্লেখ করে বলেছেন,—

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবদান।
ফাতেমাকে বিভা কৈল আলি মতিমান॥
নবীবংশ রচিচ্ছেন্দ ছৈয়দ ছোলতান॥

সমসাময়িক কবি হাজী মুহম্মদ তাঁর 'নসিহতনামা' কাব্যে শেখ পরাণের নাম উল্লেখ করেছেন, —

ছুরতনামার মধ্যে ইমানে ছিফত।
রচিচ্ছেন্দ হাজী মোহাম্মদ ভাল মত॥
তেকারণে এথা মুঞি ন কৈলুং সমাপ্ত।
কিঞ্চিৎ কহিলুং বুঝিতে ইঙ্গিত॥
সএক পরাণে কহে শুন গুণিগণ।
সভানের পদতলে করম নিবেদন॥

এসব উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় শেখ পরাণ মধ্যযুগের অন্য দুজন বিখ্যাত কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০–১৬৪৮) ও হাজী মুহম্মদের (১৫৬৫–১৬৩০) সমসাময়িক কবি ছিলেন।

---

৯৩. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৬২

তবে শেখ পরাণ সম্ভবত সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদের কিছুকাল পরের লোক। সেজন্যই অগ্রবর্তী কবি হিসেবে তিনি তাঁদের নামোল্লেখ করেছেন। ভাষার প্রাচীনত্ব তিন কবির মধ্যেই আছে। তবে সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদের কাব্যরচনার পর যখন তাঁদের গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়, তারপরই হয়তো শেখ পরাণ গ্রন্থরচনায় হাত দেন।

শেখ পরাণের নামে দুটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়,—'নূরনামা' ও 'নসিহতনামা'। কবির 'নূরনামা' কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আলোচিত হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা থেকে কাব্যের শুরু। 'রোজ ই আজল' অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ়কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি 'নূর-ই-মুহম্মদী'র সৃষ্টির কথা ব্যক্ত করেছেন। সৃষ্টির মাহাত্ম্য তাতে প্রকাশ পাওয়ার পর কবি সৃষ্টিতত্ত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেন। কবি বলেন, 'নূর-ই-মুহম্মদী'র সৃষ্টি থেকেই একে একে অন্যান্য বিষয়ের আবির্ভাব সম্ভব হয়। তবে কাব্যের আদ্যন্ত ধর্মতত্ত্বের নীরস বর্ণনা প্রাধান্য পাওয়ায় একাব্যে শেখ পরাণের কবিত্বশক্তি প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তবে কাব্যে পরাণ তাঁর কবিত্বের উর্ধ্বে যে ধর্মীয় চেতনাকে প্রকাশ করেছেন এটি তাঁর ধর্মসম্বন্ধের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচায়ক। কবি হিসেবে শেখ পরাণ ছিলেন বিনয়ের অবতার।

শেখ পরাণ তাঁর 'নসিহতনামা' কাব্যের রচনাপ্রসঙ্গে বলেন,—

ফারছি ভাষে সেই কথা আছিল লিখন।
বাংলা ভাষায় কৈলুং বুঝিতে কারণ॥

অর্থাৎ নসিহতনামা কাব্যটি কবির মৌলিক রচনা নয়। ফারসি ভাষায় এ জাতীয় অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। ধর্মভীরু কবি ধর্মের কথা সাধারণ লোকের কাছে বিবৃত করার প্রয়াসে একটি ধর্মীয় কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পান। তাই তিনি ফারসি থেকে ধর্মীয় কথার সার সংগ্রহ করে বাংলায় 'নসিহতনামা' কাব্য রচনা করেন। 'নসিহতনামা' শেখ পরাণের নীতিগত চিন্তার এক চমৎকার ফসল।

শেখ পরাণের 'নসিহতনামা'য় প্রধানত পবিত্র কোরান ও হাদিস-সম্মত বিষয়ই স্থান পেয়েছে। সেই সূত্র ধরে কবি ওজু ও নামাজের ফরজ, বিভিন্ন ওজুর নাম, গোসলের ফরজ, চার কুর্সী, মজহাবের কথা, সপ্ত ইমাম প্রসঙ্গ, রগ ও দেহের লোমের সংখ্যা ও তার বিবরণ ইত্যাদি বিবিধ ধর্মীয় রীতিসংক্রান্ত উপদেশ ও পালনীয় আচরণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। শেখ পরাণের বিনয়ের কিছু প্রমাণও একাব্যে আছে। কাব্যের শেষাংশে কবি পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন,—

কিতাবেতে যেন মত আছযে লিখন।
তেন মতে পদবন্ধে করিলুং রচন॥
তবে পণ্ডিতেরা সবে কৃপা কর মন।
মোর প্রতি দোষ পাই খেমিবা তখন॥

নীরস ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করায় শেখ পরাণ কবি হিসেবে তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। তবে একজন ধর্মীয় কবি হিসেবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামটি সুবিদিত।

সৈয়দ সুলতান।। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের মধ্যে সৈয়দ সুলতান নানা কারণে একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে চিহ্নিত। পণ্ডিতগণ তাঁর সময় নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। তবে জোরদার যুক্তির অভাবে তাঁদের গবেষণা কেবল সম্ভাব্য সত্যের ইঙ্গিত দেয়। আসলে সৈয়দ সুলতানের রচনায় তাঁর কাল সম্পর্কে যা-কিছু আভাস আছে, তার উপরই মধ্যযুগেব কাল-বিশারদ পণ্ডিতদের নির্ভর করতে হয়।

সৈয়দ সুলতানের সুপরিচিত কাব্য 'নবীবংশ'। এ কাব্যের প্রস্তাবনায় কবি লিখেছেন,—

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি।।
হিন্দু মুসলমান তা-এ ঘরে ঘরে পড়ে।
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।।
গ্রহ শত রস যুগে অব্দ গোঞাইল।
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।।

'গ্রহ শত রস যুগে' শব্দগুলো ধবে পণ্ডিতগণ মধ্যযুগের কবিদেব কাল নির্ণয়েব একটি সূত্র পান। সৈয়দ সুলতানেব উক্তিব উপব এ প্রসঙ্গে তাঁরা বিচাব-বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তও দিযেছেন।

ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এস্থলে 'রস'কে ৯ ধরে ৯৯৪ হিজবি অনুমান কবেন।[৯৪] বিশিষ্ট গবেষক মৌলভী আদমউদ্দীন 'গ্রহ'কে ৯ ধরেন, 'রস'কে ধবেন ৬ এবং 'যুগ'কে ৪ ; অঙ্কসূত্রে পান ৯৯৪ হিজরি।[৯৫] অধ্যাপক আলী আহমদের মতে ৯৬২ হিজবি।[৯৬] এবং ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হকের বিশ্লেষণটি হচ্ছে,—গ্রহশত=৯০০ ; রস=৬ কি ৯ দুটো সংখ্যাকেই ধবা যায়, তবে এক্ষেত্রে তিনি ৯ ধবাব পক্ষপাতী, এবং যুগ=৪। সংখ্যাগুলো পরপব সাজালে দাঁড়ায় ৯৯৪ হিজরি বা ১৫৮৫/১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ।[৯৭] ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, নবীবংশেব উপসংহার শবেমেবাজ লেখা হয়েছিলো ১০৬৪ ('দশশত বস যুগে অব্দ গোঙাইল') হিঁজরি বা ১৬৫৪ ৫৫ খ্রিস্টাব্দে।[৯৮] ডক্টর সেন 'গ্রহশত রস যুগ' বাক্যটি সংশোধন কবে 'দশ শত রস যুগ' বলাব অভিলাষী। তাঁর সংশোধন অনুযায়ী সৈযদ সুলতানের কাল সপ্তদশ শতাব্দীব শেষার্ধ হয়। কিন্তু ডক্টর সেনের এ সিদ্ধান্ত মানা যায় না। কেননা সৈয়দ সুলতানেব শিষ্য মুহম্মদ খানের কাল ডক্টর শহীদুল্লাহর মতে ১৫৯০ থেকে ১৬৭০-এর মধ্যে হওয়াব দীক্ষাগুরুর কাল শিষ্যেব পরে হতে পারে না।[৯৯]

এবার ডক্টর আহমদ শরীফের অভিমত। তিনি পরোক্ষ তথ্য প্রমাণের উপর নির্ভর কবে 'নবীবংশ' বচনার সময ধরে সৈয়দ সুলতানকে ৯৯২ হিজরি বা ১৫৮৪-১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফেলেন।[১০০]

---

৯৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যেব কথা,' ২য খণ্ড, পৃ. ১২৩
৯৫. মৌলভী আদমউদ্দীন, 'মাসিক মোহাম্মদী', ৭ম সংখ্যা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
৯৬. আলী আহমদ, 'ওফাতে বসুল', [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]
৯৭. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৪৩
৯৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৪৪
৯৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলাা সাহিত্যেব কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭
১০০. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮৫

প্রায় সব পণ্ডিতই স্বীকার করেন সৈয়দ সুলতান ষোড়শ শতকের কবি। সুতরাং তাঁর কাল সম্পর্কে মোটামুটি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তা হচ্ছে কবি সৈয়দ সুলতান ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক।

এবারে কবির নিবাস কোথায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। সৈয়দ সুলতান বলেছেন,—

লস্করের পুরখানি আলিম বসতি।
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি॥

ইতিহাস থেকে জানা যায় লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম অভিযানকালে 'লস্করের পুর' বা 'পরাগলপুর' অঞ্চলের পত্তন করেন। লোকস্মৃতিতেও লস্কর বলতে পরাগল খাঁকেই বোঝায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন, সৈয়দ সুলতানের পৈতৃক নিবাস ও জন্মভূমি চক্রশালা চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোথাও হতে পারে।[১০১]

কবি মুহম্মদ খান ছিলেন সৈয়দ সুলতানের শিষ্য। অতএব সৈয়দ সুলতান যে পীর বংশের লোক ছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মুহম্মদ খানের মুগ্ধদৃষ্টিতে পীরের যে পরিচয় তাতে সৈয়দ সুলতান ছিলেন রূপে গুণে অনুপম, শ্যামসুন্দর পুরুষ এবং দানে-ধ্যানে অতুলনীয় মহিমার অধিকারী। মুহম্মদ খান বলেন,-

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরস দধি॥
শ্যাম নব জলধর সুন্দর শরীর।
দানে কল্পতরু পৃথিবীর সম স্থির॥
পূর্ণচন্দ্র ধিক মুখ কমল লোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন॥
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর।
সেবক বৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর॥

সৈয়দ সুলতান রচিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ—নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ, রসুল বিজয়, ওফাৎ ই-রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলিসনামা, জ্ঞানচৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ, মারফতী গান ও কিছু পদাবলী।

সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। যা উপরের গ্রন্থ তালিকায় বিধৃত হয়েছে, সেভাবে পর্বগুলো হচ্ছে 'শব-ই-মিরাজ', 'রসুলবিজয়' বা 'রসুলচরিত', 'ওফাৎ-ই-রসুল', 'জয়কুম রাজার লড়াই' ও 'ইবলীসনামা'। এগুলো 'নবীবংশে'র অনুসৃত অধ্যায়। সেযুগে মহাকাব্যের ধারণা ছিলো না। কিন্তু এতগুলো পর্ব নিয়ে গঠিত বিশাল 'নবীবংশ' সৈয়দ সুলতানের মননের গভীরতায় যে সৃষ্টিমহিমা লাভ করেছে তাতে এ কাব্য যেন যথার্থই মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে।

'সৃষ্টিপত্তন' দিয়ে 'নবীবংশ' কাব্যের আরম্ভ। বিশ্বসৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনী বিবৃতির পর হজরত মুহম্মদের আবির্ভাবে তার সমাপ্তি। প্রাসঙ্গিকভাবে হজরত আদমের কথাও কিছু বলা

---

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৫

হয়েছে। কবি হিন্দু দেবদেবীদেরও পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। শীশ, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা প্রমুখ পয়গাম্বর ; তাঁদের সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ এঁরাও সেই মর্যাদা পেয়েছেন। সৈয়দ সুলতানের অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির এ হচ্ছে এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

'নবীবংশে' যেমন নবীদের কথা বলা হয়েছে, তেমনি তাতে ইবলিসের প্রভাবের কথা আছে। এই অশুভ প্রভাবের কারণে হিন্দুর সুরাসুর হয় বিভ্রান্ত, বেদ এবং ঈসার কিতাব হয় বিকৃত। ইসলামেব মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কবির আন্তরিকতাব অভাব নেই। মুসলমানদের মনে ঐতিহ্যচেতনা ও ধর্মবোধ জাগানোই হচ্ছে কবির সেই আন্তরিকতা প্রকাশের কারণ।

মানবজীবনেব চরম সত্যকথা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি সৃষ্টিচেতনায উদ্বেল আদম ও হাওয়ার জীবনকাহিনী শোনান। আদিমানব ও আদি মানবীব পারস্পরিক আকর্ষণ ও ইচ্ছার পরিণতিতে কাম ও ক্ষুৎপিপাসাসহ মানবজীবনে অবশ্যম্ভাবীভাবে দাম্পত্যেব স্বাদ ও পূর্ণতাব স্বীকৃতি অনিবার্য হয়। কিন্তু এই স্বীকৃতির পেছনে ইবলিসের ভূমিকা যে নিতান্ত অনুজ্জ্বল নয়, পরোক্ষভাবে তারও আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে সব দুঃখের মূল ইবলিসের প্ররোচনায রিপুতাড়িত মানুষের নির্মম পরিণতিকে বেশ ফলাও করে দেখানো হয়েছে 'নববংশ' কাব্যে। মহানবী হচ্ছেন সৎ কর্মেব প্রতিনিধি, ইবলিস সকল রিপুর উৎস এবং আদম ও হাওয়া ইবলিসরূপী রিপুব প্রথম শিকার। বিপুতাড়িত আদম হাওয়া শেষ পর্যন্ত স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে সাধাবণ মানুষরূপে পৃথিবীতে এসে সংসাবধর্মে নিবেদিত হন এবং সেই সূত্রে নির্বিচাবে সন্তানবৃদ্ধি শুরু কবেন।

ক্রমান্বয়ে কবি যেসব নবীব বর্ণনা দেন তাতে আদমের পব তৎপুত্র শিশ্, শিশেব পব মযাল, তারপর একে একে সমাইল, বারদ, ইদ্রিস এবং পরে নুহ আসেন। প্রসঙ্গক্রমে নবীদের দুশমন দানিয়াল, নমরুদ এবং ফেবাউন, আনসারী, তউস, আবু জেহাল প্রমুখ বিরুদ্ধশক্তিব প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও ধ্বংস দেখানো হয়েছে। বিশাল আকারের গ্রন্থ 'নবীবংশে' এইসব ব্যক্তিসত্তা ও তাঁদেব কাহিনীর জমকালো বর্ণনা একদিকে কবির ধৈর্য, অন্যদিকে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করে। এককথায় বলা যায় 'নবীবংশ' মহানবীর জীবনকাহিনীব মাধ্যমে ইসলামের মর্মকথারই এক শিল্পসুন্দর অভিব্যক্তি। ইসলামের কাহিনী ও ঐতিহ্যেব বর্ণনায়ণে যে মহাকাব্যিক বিশালতা এতে লক্ষ্য করা যায়, তৎকালীন সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে তা অভিনবও বটে।

'নবীবংশে'র দ্বিতীয় খণ্ড 'রসুলচরিত'। উন্মেষপর্ব, মেরাজপর্ব ও ওফাতপর্ব এ তিনটি বিভাগ রয়েছে এতে। গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় দেশীয় সংস্কার, রীতিনীতি ও আচার-আচরণের বাস্তবসম্মত উপস্থাপনা। খাদিজা এবং মুহম্মদের যখন বিবাহের আয়োজন হয় তখন তাতে যে পারিবারিক সংঘাত ও সম্মতি অসম্মতির বিষয়টি জড়িত হয়, তার সঙ্গে উপমিত রেখে বাঙালির ঘরোয়া জীবনের অতি সাধারণ চিত্র যেমন যৌতুক, ভোজ ও ভোজ্যসামগ্রী ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন,---

সুজনি চাদর দিলা বসিতে বিবিগণ।
হীরা জরি চান্দোয়া যে মাণিক্য পেখম॥
চিনি আদি সর্করা আঙ্গুর খোরমান।
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ অমৃত সমান॥

যে পবিত্র রাতে হজরতের বেহেস্ত সন্দর্শন হয়, যা মুসলমান সমাজে মিরাজ নামে পরিচিত, সেই ঘটনার বিষয় 'শব-ই-মিরাজ' পর্বের অন্তর্গত। মিরাজে নব্বই হাজার বিষয় নিয়ে আল্লাহ ও রসুলের মধ্যে কথোপকথন হয়,—

নব্বই হাজার কথা শুনিয়া রসুল।
হৃদএ তরঙ্গ হৈল সমুদ্রের তুল॥

হজরতের মিরাজের সঙ্গে বোরাকের একটি ধারণা জন্মে। এই অংশে কবির কবিত্ব শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

সেই তুরঙ্গের নাম বোরাক আছিল॥
বোরাকের মুখমণ্ডল নরের আকার।
চিকুর লম্বিত অতি নারীর বৈভাব॥
বোরাকের দুই কর্ণ উটের চরিত।
নরের বচন কহে অতি সুললিত॥
অশ্বের আকার পৃষ্ঠ চলন গম্ভীর।
চলিলে বিজুলি যেন বহিতে সুধীর॥
নীলা কষা জমরুদের বরণ তাহার।
দেখিতে সুন্দর অতি বড় শোভাকার॥

'জয়কুম রাজার লড়াই'য়ে জয়কুম রাজার সঙ্গে হজরত আলীর যুদ্ধের বিষয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। 'ওফাৎ ই-রসুল' কবির বার্ধক্যের রচনা। হজরতের প্রাণ নেওয়ার জন্য আজ্রাইলের আবির্ভাব ও প্রাণত্যাগ কালে প্রিয় উম্মতদের জন্য নবীর ভাবনা,—এসব বিষয়ের একটি করুণ রসাত্মক কাহিনী বিবৃতির প্রয়াস দেখা যায় এই অংশে। মহামানব হজরতের প্রাণহরণে মৃত্যুদূত আজ্রাইলেরও ভয়-ভাবনার অন্ত নেই। দ্বিধাজড়িত পদে তিনি হজরতের দ্বারে আসেন,—

আজ্রাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি
রছুলের পুরির দুয়ারে।
রছুলের নাম ধরি ডাকি কহি ভক্তি করি
আজ্ঞা মাগে যাইতে অন্তঃপুরে॥
পএগাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেখিবারে
দ্বারেত আসিছে কোন্ জন।
কি কারণে অন্তঃপুরে ডাকি কহি আসিবারে
বুঝ গিয়া তার বিবরণ॥
রছুলের আজ্ঞা পাই ফাতেমা গেলেন্ত ধাই
দেখিলা আরব একজন।

বিবি ফাতেমারে দিখি সতত চরিত্র লক্ষি
ছালাম করিলা সেই ক্ষণ॥

কবির অল্প বয়সের রচনা 'জ্ঞানচৌতিশা'। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি,—

হীন অতি শিশুমতি ছৈয়দ ছোলতান।
ক্ষীণ বুদ্ধি রচিলেক চৌতিশা যে জ্ঞান॥

পীরালি পেশায় নিয়োজিত সৈয়দ সুলতান পরিণত বয়সে শিষ্যদের মধ্যে সুফী সাধনতত্ত্ব ও যোগ সাধনতত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান বিতরণের তাগিদে 'যোগকালন্দর' জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এ ব্যাপারে শাহ হুসেন নামক জনৈক গুরুর সান্নিধ্যে কবি অনুপ্রেরণা পান,—

শাহ হোছন গুরু সমুদ্রের তুল।
একে একে পাইলুম জ্ঞান সে অমূল॥

সৈয়দ সুলতানের যোগসাধনতত্ত্বের ব্যাখান,—

মেরুদণ্ড ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই নাবী।
যেন বৃক্ষ দুই পাশে লতা আছে বেড়ি॥
দক্ষিণে ইঙ্গলা নাড়ি যেন দিবাকর।
বামপাশে পিঙ্গলা নাড়ি যেন সুধাকর॥
ইঙ্গলা বহয় গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা।
মেরুদণ্ড মধ্যে বহে নাম যে সুষমা॥
তিন নাড়ি এক হই আছে ভুরু বাট।
জ্ঞানী সবে বলে তাই ত্রিবেণীর ঘাট॥

সৈয়দ সুলতান মারফতী গান ও পদাবলীর কবিরূপেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভাবের বিভোরে প্রণীত তাঁর এজাতীয় পদের দুটি নমুনা,—

ক. রে মন! কত না কহিনু, কত নিবেদিনু
কত চেতাইনু তোকে।
দিনের ভিতরে, নাম নিরঞ্জন,
বারেক না লইলু মুখে॥
পুত্র পরিজন, সব অকারণ,
ভুলি রইলু মায়ামোহে।
কহে ছোলতান, জীবন স্বপন,
মরণ জানিঅ সার।
সে পন্থ ছাড়িয়া, আসরে মজিয়া,
ভুলি রইলু অনিবার॥
[মারফতী]।

খ. মনতে আনন্দ অতি ঘরে কেহ নাই।
আজু রাধার শুভদিন মিলিল কানাই॥
অপরূপ বিপরীত কি বলিব কারে।
নানারূপে করে কেলি ভ্রমরা না ছাড়ে॥
[পদাবলী]

সৈয়দ সুলতানের সমগ্র কাব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনি তাঁর কাব্যে প্রায়শ কিছু-না-কিছু নীতিকথা ও উপদেশ দান করেছেন। এর পেছনে মুসলিম মানসে ধর্মবোধ জাগানোর প্রয়াসই ছিলো মুখ্য। 'নবীবংশ' কাব্যে কবি মানুষকে ইবলিসরূপী শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে মুক্ত থেকে সৎসাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন। বোঝা যায় মানবজাতির কল্যাণ কামনায় তিনি তাঁর আন্তরিক অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। সুফী সাধনা ও সুফী চিন্তায় প্রাণিত হওয়ায় সৈয়দ সুলতানের মধ্যে চিশ্‌তিয়া সম্প্রদায়ের সুফীদের মতো অধ্যাত্ম সাধনতন্ত্র, ভজন, পূজন, আত্মার আকূতি ও আত্মবোধনের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যথার্থই একজন অধ্যাত্ম ভাব-সাধনার কবি ছিলেন।

আফজাল আলী।। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য মুসলিম কবির মতো আফজাল আলীও তাঁর কাব্যে পরিচিতিমূলক তেমন কোনো নিদর্শন রাখেন নি। ফলে একজন বিতর্কিত কবিরূপে তার সম্পর্কেও অভিযোগ রয়েছে। আফজাল আলী খুব একটা পরিচিত কবি না হলেও তাঁর 'নসিহতনামা' কাব্যখানি নানাকারণে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একজন উল্লেখযোগ্য পদকার হিসেবেও আফজাল আলীর নাম রয়েছে।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, নসিহতনামা কাব্যখানি দুই শতাধিক বছরের প্রাচীন।[১০২] এই কালটি অবশ্য অনুলিপিকারের সময়। তারও কয়েক শতাব্দী আগে মূল পাণ্ডুলিপি রচিত হয়ে থাকবে। সুতরাং আফজাল আলীর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশয় থাকে না। জনৈক মুহসিন আলী, যিনি 'মোকাম মঞ্জিল কথা' নামক কাব্যের রচয়িতা, তাঁকেই নসিহতনামা কাব্যের অনুলিপিকার মনে করা হয়। কেননা এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি,-

এই পুস্তক লিখিলাম মোছন আলী হীনে।
সাঙ্গ হৈল চব্বিশ মঘীর বারই আশ্বিনে।।

এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেন--নসিহতনামা নকল করা হয় ১১২৪ মঘী অর্থাৎ ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে। তবে এই সন ১০২৪ মঘী বা ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দও হতে পারে।

আফজাল আলী যে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত 'মিলুয়া' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন তা একরকম নিশ্চিত। কেননা তিনি নিজেই একথা বলেছেন, -

চাটিগ্রাম মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র এক গ্রাম।
মিলুয়া করিয়া আছে যে গ্রামের নাম।।

আফজাল আলীর পিতার নাম ভঙ্গু ফকির। ইসলামি তত্ত্বে তিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই কবি শরীয়তি তত্ত্বে দীক্ষালাভ করে থাকবেন। এবং শাহ রুস্তম নামে তাঁর একজন পীরও ছিলেন। এই পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কবি উচ্ছ্বসিত,---

সেই গ্রামে হৈল এক ফকির আল্লার।
এ চারি মঞ্জিল ভেদ দিল করতার।।

১০২. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে', পৃ. ৭২

শাহা যে রুস্তম করি ছিল তার নাম।
আল্লাহর হইল কৃপা গুণে অনুপাম॥
গায়েবী নরতবা প্রভু তাহানে যে দিলা।
গায়েবীর ভেদ যত কহিতে লাগিলা॥
গায়েবী ফকির বলি দেশ দেশান্তর।
তান খেয়াতি একে একে হইল প্রচার॥

এই উক্তিতে কবি আফজাল আলীর ধর্মপ্রাণতা সম্পর্কেও কিছু ধারণা করা যায়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় এখনো রুস্তমের হাট রয়েছে। সেখানে শাহ রুস্তমের দরগাহ আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে, তিন চারশ' বছর আগে এই দরবেশ জীবিত ছিলেন। কবির রচিত একটি উক্তি থেকে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। উক্তিটি হচ্ছে,- 'ছৈয়দ পেরোজ শাহা, সুধাময় অবগাহা ভজ সখি সুরঙ্গ চরণ।' ছৈয়দ পেরোজ শাহা এখানে বাদশাহ ফিরোজ শাহের ইঙ্গিত দেয়। এই ফিরোজ শাহ সম্ভবত সুলতান নসরত শাহের (১৫১৯ ১৫৩২) পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৫৩২ - ১৫৩৩)। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমত, ফিরোজ শাহকে কবি 'সুলতান' রূপে অভিহিত না করে 'সৈয়দ' রূপে অভিহিত করায় একথাই স্পষ্ট হয় যে ফিরোজ শাহ তখন যুবরাজ ছিলেন। কাব্যরচনায় হয়তো কবি তাঁর দ্বারা কিছু উপকৃত হয়ে থাকবেন। সেজন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কাব্যে তাঁর কিছু গুণগান করেছেন। এই যুক্তিবলে কবি আফজাল আলীকে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের সমসাময়িক কিংবা তার দুই এক দশক পূর্ববর্তী মনে করা হয়।[১০৩]

কবি আফজাল আলীর রচনায় তামাক ও গাঁজা খাওয়ার কুফল সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা থেকে পণ্ডিতগণ তাঁর কাল সম্পর্কে একটা ধারণা দেন। তামাক খাওয়ার কুফল সম্পর্কে কবি বলেছেন,

সংসারেত যে সকলে তামাকু পিয়এ।
অন্তরে কালির বর্ণ হইয়া আছএ॥
তামাকুর পায়ররি করিয়া পঞ্চজন।
নুটি হস্তে কতল করিব নিরঞ্জন॥
তামাকু যে ক্ষতি করে, যেবা মাখি দিছে।
যে জনে ভরিল হুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে॥
আর যে সকল ভক্ষে এই পঞ্চজন।
হিসাবেতে 'ছেতা' বর্ণ হইবে বদন॥
কিবা ভাল কিবা মন্দ নাহি বিচারএ।
এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ॥

জ্ঞানবান মুসলমান কেন এই অপকৃষ্ট, অপকারী ও দোষণীয় নেশায় আসক্ত, কবি তা বোঝেন না,

১০৩ পূর্বোক্ত. 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'. পৃ. ৭৩

জ্ঞানবন্ত মুসলমান যে সকল হএ।
তবে কেন হেন চিজ ভক্ষণ করএ॥

এরপর কবি গাঁজা সেবনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন,--

আর স্বপ্ন দেখিলেন্ত গাঁজা যে পিয়ন।
সে সবের সর্ব অঙ্গ ইব্লিস বাহন॥
সে সবের সঙ্গতি যে মেলা কবিবার।
নিষেধ করিছে নবী হাদিস মাঝার॥

'নসিহতনামা'য় এই যে তামাক ও গাঁজা খাওয়ার পাপ ও কুফল সম্পার্কে কবি বলেছেন, কবির সেই বক্তব্য থেকে ডক্টর আহমদ শরীফ অনুমান করেন, কবি আফজাল আলী যে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের পরের কবি তা মনে করা যায় ; কেননা তামাক সেবন এদেশে সপ্তদশ শতকের আগে চালু হয় নি। এই সূত্র ধরে তাঁর অভিমত 'নসিহতনামা'র কবি আফজাল আলী আঠারো শতকের লোক।[১০৪]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আফজাল আলীকে একজন পদকার রূপেও মনে করেন। তবে ডক্টর আহমদ শরীফ নসিহতনামা-প্রণেতা আফজাল আলী ও পদকর্তা আফজাল আলীকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে অভিমত দিয়েছেন।

আফজাল আলীর 'নসিহতনামা' একখানি ধর্মোপদেশমূলক কাব্য। এতে ইসলাম ধর্মের উপদেশাত্মক বাক্যসমূহ ধর্মচ্ছলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কবির গুরু শাহ রুস্তম স্বপ্নে শিষ্য আফজাল আলীর মুখে ইসলামি তত্ত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। ইসলাম বিষয়ক তত্ত্বের গভীর ভাবোদ্দীপক বাণীসমূহ পবিত্র কোরান ও হাদিস সমর্থিত। কবি আফজাল গুরুর বাক্য শিরে ধারণ করে ইসলামের অমিয় বাণী রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,--

অধম আফজল আলী অতি গুণাগার।
পদবন্ধে যত স্বপ্ন দেখিলু তোমার॥
খোয়াবের যত বাণী আদ্যেত লেখিয়া।
তত্ত্ববিজ্ঞ করিল ফাজিলের পাশে নিয়া॥
উপহাস্য করে বুলি মোনাফেকগণ।
আয়েত হাদীছ লেখিয়াছি তেকারণ॥
খোয়াব বলিয়া শাহা রুস্তমে কহিল।
খোয়াব বলিয়া তবে পদবন্দী কৈল॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উপদেশাত্মক কাব্য বিরল। শেখ পরাণ, আফজাল আলী প্রমুখ কয়েকজন কবি ইসলামের উপদেশাত্মক বাণী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। সেই দিক থেকে আফজাল আলীর 'নসিহতনামা' কাব্যের একটি ধর্মসংশ্লিষ্ট তত্ত্বগত মূল্য রয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে কবিত্বের স্ফুরণ নেই, উপদেশ-প্রবণতাই বেশি। তত্ত্বীয় ভাবের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কবি বলেন--

১০৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৫

শাহ রুস্তম পদে মাগি পরিহার।
যতেক কহিলা গুরু সব বাক্য সার॥
দিনে দিনে বুঝি পাইনু বচন তোমার।
হেন বুদ্ধি না দেখি আখের হৈতে পার॥

কাব্যরসের অভাব সত্ত্বেও আফজাল আলীর 'নসিহতনামা'য় ইসলামি তত্ত্ব ও ধর্মোপদেশ প্রকাশের দ্বারা মানুষকে ধর্মপথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি'র যে সদিচ্ছা লক্ষ্য করা যায়, সেই দিক থেকে কাব্যটির মূল্য আছে। 'নসিহতনামা'র মতো ধর্মোপদেশপূর্ণ কাব্য ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বড়ো একটা দেখা যায় না। আফজাল আলীর 'নসিহতনামা' সেই দিক থেকে যুগের প্রতিনিধিত্ব করে।

'নসিহতনামা'র আফজাল আলী ও পদকার আফজাল আলী যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন তাহলে একজন মুসলিম পদকর্তা হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবীয় ঢঙ্গে লেখা তাঁর রচিত বিরহ ও প্রার্থনা বিষয়ক তিনটি পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। দুটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে ও একটি পদ ১৩২৫ সনের পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় সংকলিত হয়।

শেখ চান্দ॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শেখ চান্দকে প্রধানত শাস্ত্রব্যাখ্যার কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনুমান করা হয় তিনি ষোড়শ শতকের কবি ছিলেন। শেখ চান্দ যে ষোড়শ শতকের কবি ছিলেন, তার প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য কবির 'কেয়ামতনামা' গ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। কাব্যে উল্লিখিত দুটি তারিখ এরকম,—

ক. এক সও বাইস পুস্তক রেচান।
সাহা চান্দ ফকিরে বোলে সোন গুণিগণ॥

খ. মুরসিদের আজ্ঞা পাইয়া কহে হিন্য চান্দে।
এগারস বাইস সন রচিল প্রবন্ধে॥

এই উক্তি অনুযায়ী 'কেয়ামতনামা'র রচনাকাল ১১২২ সন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে কবির সাহিত্য-জীবন ত্রিপুরায় অতিবাহিত হওয়ায় এই সন ত্রিপুরাব্দ হতে পারে। তদনুসারে তা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ হওয়া সম্ভব।[১০৫] ডক্টর আহমদ শরীফ অবশ্য কেয়ামতনামার রচনাকাল ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ মনে করেন।[১০৬] তাতে কবির জীবনকাল আরো কিছুকাল এগিয়ে যায়।

এবার কবি কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন যে সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। সৈয়দ মুর্তাজা আলী 'সিলেট সাহিত্য-সংসদে'র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে শেখ চান্দ দক্ষিণ সিলেটের অন্তর্গত ভানুগাছ পরগণার অন্তর্গত ভাগেরহাট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন কবির আদিনিবাস সিলেটে থাকতে পারে। তবে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায়

---

১০৫. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৫০
১০৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৯

এই দাবি না-ও টিকতে পারে। তাঁর মতে, কবির জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় ত্রিপুরায়। তাঁর প্রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপি ত্রিপুরায় পাওয়া যায়। কবির মৃত্যুও হয় ত্রিপুরায়। তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার লালামাই রেল স্টেশনের ৮/১০ মাইল দূরবর্তী বাকসার গাঁয়ে কবির সমাধি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন ডক্টর আহমদ শরীফ। অধ্যাপক আলী আহমদের 'কলমী পুঁথির বিবরণ' নামক গ্রন্থেও এই সূত্রটির উল্লেখ রয়েছে। এ.টি.এম. রুহুল আমিন নামক জনৈক গবেষক জানিয়েছেন শেখ চান্দ ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী শেখ চান্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ঐ অঞ্চলের নামকরণ সম্ভবত কবির নামের অনুসরণে শেখ চান্দপুর রাখা হয়। রুহুল আমিন সাহেব আরো জানিয়েছেন আজো সেখানে কবির কোনো কোনো বংশধরের খোঁজ পাওয়া যায়।[১০৭]

মধ্যযুগের অনেক কবিই গুরুর উল্লেখ করেছেন। গুরুর প্রতি শিষ্য কবিরাও যথেষ্ট ভক্তি দেখিয়েছেন। কবি শেখ চান্দও এই পরম্পরা রক্ষা করে তাঁর গুরু শাহাদৌলা পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন,—

শাহাদৌলা পীর জ্ঞান আল্লার নিজ জাত।
ফকিরিতে দম ধরে নূরের ছিফত॥
চারি পীর চৌদ্দ খান্দান জেই জানে।
শরিয়ত পন্থ জান সে সকল মানে॥
শরিয়াত তরিকত হকিতক মারেফত।
এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত॥
পরগণে কুদুফা নাম হুর গ্রাম ঘব।
তালুক ভূমি অল্প তান শিষ্য বহুতর॥
সকল শিষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একজন।
নাম হীন চান্দু ফতে মোহাম্মদের নন্দন॥
আউয়ালে আখেরে আশা শাহাদৌলা পদে।
দিনের ইমান দিয়া বিকাইল চান্দে॥

তত্ত্বজ্ঞানী পীর শাহাদৌলার প্রতি শেখ চান্দ তাঁর ভক্তির মাত্রা একটু বেশিই প্রকাশ করেছেন। তবে যোগদর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বে পীর সাহেবের জ্ঞান হয়তো যথেষ্ট ছিলো। কেননা কবি শেখ চান্দ ধর্মতত্ত্বের একজন বড়ো সাধক হয়েও শাহাদৌলাকে গুরুর পদে বসিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

কবি শেখ চান্দ মোট পাঁচখানি কাব্য রচনা করেছেন। এসব কাব্যের নাম যথাক্রমে 'রসুলবিজয়', 'শাহাদৌলা পীর', 'তালিবনামা', 'কেয়ামতনামা' ও 'হরগৌরী সংবাদ'। তবে বিষয়বস্তু পাঠ ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে 'শাহদৌলা পীব', ও 'তালিবনামা' আসলে দুটি মিলে একটি গ্রন্থ ; এবং 'কিয়ামতনামা'ও 'রসুলবিজয়ে'র অংশবিশেষ। পীব শাহাদৌলার উপদেশ ও আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে কবি তাঁর সবগুলো কাব্য রচনায় হাত দেন বলে জানিয়েছেন।

শেখ চান্দের 'রসুলবিজয়' কাব্যের উপজীব্য আরবি 'কাছাছুল আম্বিয়া'র ফারসি অনুবাদ। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি—

কাছাছুল আম্বিয়া এক কিতাবেত শুনি।
পঞ্চালি বাঁধিয়া তাকে পুস্তকেত ভণি॥

এই কাব্যে হজরত আদম থেকে শুরু করে ইসলামের শেষনবী হজরত মুহম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত বিভিন্ন নবীর কথা আছে। এর অন্যান্য বর্ণিত বিষয়সমূহ হচ্ছে—ইব্লিসের শোক, তালেবনিধন, জকিনামা, মুরিদের কথা ইত্যাদি। একশ ষোল অধ্যায় রচনার পর 'শবে মিরাজ' নামে একটি বিশাল অংশ এতে সংযোজিত হয়।

'রসুলবিজয়' হজরত মুহম্মদের পবিত্র চরিত্রসমৃদ্ধ 'নবীবংশে'র ধারায় রচিত। কবি এতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন যে হজরত জিব্রাইল নূর-ই-এলাহী মুহম্মদ রূপী স্বর্গীয় পারিজাত আবদুল্লাহর হাতে দিলে আবদুল্লাহ তার ঘ্রাণ নেন। এভাবেই আবদুল্লাহর মধ্যে হজরত অন্তর্লীন হন। অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে আবদুল্লাহ অতঃপর নফলঙ্গ রাজকুমারী কর্তৃক প্রেমাসক্ত হন। স্বর্গের ফিরিস্তাগণের দৌত্যে উভয়ের গোপন বিয়ে সমাধা হয়।

'রসুলবিজয়ে' শেখ চান্দের রোমান্টিক শিল্পীমনের কিছু পরিচয় আছে। এ ছাড়া হজরতের জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সঙ্গে ইসলাম প্রচারের বিষয়টিও স্থান পেয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমাজচিত্রই যেন প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন,

ধুতি উতারিয়া তারে ইজার পরাইল।
গিলাফ কাড়িয়া তারে পরাইল নিমা।
টিকি মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল॥

ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য কাফেরদের উৎসাহের অন্ত নেই,—

মুসলমান কৈল তারে পড়াই কলিমা॥
পুরাণ করিয়া রদ কোরান লইল।
এ মতে তিন দ্বিজ মুসলমান হৈল॥
মূর্তিপূজা রদ করি নামাজ পড়ি নিতি।
হরির নাম রদ করি কলিমা করে স্থিতি॥
কৃষ্ণনাম রদ করি বোলে মোহাম্মদ।
টিকি মুড়াইয়া শিরে টুপি দিল ছদ॥

গুরু শাহাদৌলার জীবনকাহিনী অবলম্বনে শেখ চান্দ লিখেছেন 'শাহাদৌলা পীর'। যদিও এটি একটি জীবনচরিত, কিন্তু এতে কবি মারফতী তত্ত্বের বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেন। মারফতী তত্ত্বের উপস্থাপনা হিসেবে শিষ্য কর্তৃক গুরুকে জিজ্ঞাসিত বিবিধ জটিল ও তত্ত্বমূলক বিষয়ের জবাব এ পুস্তকে দেওয়া হয়েছে।

গুরুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিয়ে কবি বলেন,—

আউয়ালে আখেরে আশা শাহদৌলা পদে।
দিলের ইমান দিয়া বিকাইল চান্দে॥

সুফীতত্ত্ব ও যোগতত্ত্বের বিষয় নিয়ে কবি গদ্যেপদ্যে 'তালিবনামা' কাব্য লেখেন। এই জাতীয় কবিকর্মকে চম্পুকাব্য বলা হয়। গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরে বহু তত্ত্বকথার সমাবেশ একাব্যে দেখা যায়। জীব, জীবন, সমাজ, সংসার সবই আসলে শূন্যের উপর ঝুলছে। মানুষের মনের শূন্যতাও কম নয়। চিরকালের শূন্যতা নিয়ে মন চিরকাল শুধু হাহাকার করে,--

শূন্যে দম শূন্যে তন শূন্যে মোর আশা।
শূন্যে মেলা শূন্যে খেলা শূন্যে মোর বাসা॥
শূন্যে জীউ শূন্যে পীউ শূন্যে সব জিন্দা॥
শাহাদৌলা গুরু আজ্ঞা কহে হীন চান্দা॥

চম্পুকাব্যের সঙ্গে গদ্যের একটা সম্পর্ক থাকে। ষোড়শ শতকের শেষার্ধের কবি শেখ চান্দের 'তালিবনামা'য় বাংলা গদ্যের নমুনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বক্তব্যের বিষয়টি তাত্ত্বিক, কিন্তু সেই তত্ত্বের বাহন গদ্য। যেমন,--

মুর্শিদ কে? মিহতর আজরাঈল।
তান মুর্শিদ কে? মিহতর ইসতাফী॥
তান মুর্শিদ কে? মিহতর জিবরাঈল।
তান মুর্শিদ কে? যে দুনিয়ায় অটল সে॥
অক্ষয় নিরঞ্জন যে সংসারে সার॥

যোগতন্ত্রের কাব্য 'হরগৌরী সংবাদ'। মাত্র তিন পাতার এই কাব্যে কবি সৃষ্টির অধিকারীকে বন্দনা করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর এই ত্রি আদিদেবতাসহ ইন্দ্র-যম-বরুণ--কুবের প্রমুখ তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জ্ঞাপন করেন এবং চন্দ্র-সূর্য অষ্টলোকপাল ব্যাস বৃহস্পতি-মহামায়া-জাহ্নবী প্রমুখকে অর্চনা করেন। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি কবির এই প্রীতি ও প্রবণতা লক্ষ্য করে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন,— 'যোগতত্ত্বের আলোচনায় হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গে শেখ চান্দের কোনো বিরূপতা ছিল না।'[১০৮] শেখ চান্দ বলেছেন, --

যোগসাধন তত্ত্ব শুনহ সানন্দে।
মহেশ গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে॥

শেখ চান্দ যে প্রধানত তত্ত্বকথার কবি, তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অংশে তিনি তার নিদর্শন রেখেছেন। যেমন 'হরগৌরী সংবাদে',—

শূন্যরূপ নিরঞ্জন বান্দার জীবন।
শূন্যগুণে পালে প্রভু এ তিন ভুবন॥
চক্ষের উপরে কালা তাত ফুটে জ্বল।
মণিতে বসতি নূর জগত উঝল॥

---

১০৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৫৩৬

দেহতত্ত্বের বিষয়টি কবির ভাবনায় যেভাবে বিশেষিত হয়েছে,—

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ডাইনে বানে স্থিতি।
কণ্ঠেত সুষুম্না নাড়ী ভবানী মূরতি॥
বাসন্তর কোঠা তাতে নাভিদেশে ঠান।
অষ্টকলে কণ্ঠদেশে বাজে নিত্ত নাম॥

জীবের জন্মের উৎস শুক্রের রহস্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি,—

চন্দ্র-সূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার।
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস॥

শেখ চান্দের রচনায় তত্ত্বের প্রাধান্য আছে, হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়িও তাতে রয়েছে ; কিন্তু তত্ত্বের ভূমিকার মধ্যেও কবি কাব্য-ভাবনার কথা বিস্মৃত হন নি। ফলে উপমা-রূপক-যমক-অনুপ্রাস ও তৎসম শব্দের উপযুক্ত ব্যবহারে রচনা যে যথার্থ শিল্পমর্যাদা পায়, তাঁর কাব্যে তার প্রমাণ আছে। আমেনার রূপবর্ণনায় কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রসসম্ভারকে কাব্যরূপ দিয়েছেন,—

অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়নের কোলে।
পদ্ম পরে ভোমরায় মধুলোভে ভোলে॥
নাসিকা শোভয়ে যেন এক তিল ফুল।
বেশর শোভয় তাতে মুকুতা হিল্লোল॥
গৃধিনী পক্ষিণী জিনি শ্রবণ শোভিত।
মণিময় কুণ্ডল আছে তাতে বিরাজিত॥
সুন্দর তিলকের জেন চন্দনের বিন্দু।
সূর্য আচ্ছাদিয়া জেন রহিয়াছে ইন্দু॥
চাঁচর চিকুর দেখি চামরী লজ্জিত।
তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গ সহিত॥
রক্তবর্ণ অধর জিনিয়া বিম্ব ফল।
মুকুতার হার জিনি দশন বিমল॥

দোনাগাজী চৌধুরী॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য নানা কারণে জনপ্রিয়তার দাবি করে। প্রথমত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে কাব্যখানির একটি আলাদা মর্যাদা আছে। দ্বিতীয়ত, বিষয়ানুযায়ী কাব্যের সর্বত্র কবিগণ তাঁদের কল্পনাশক্তি ও কবিত্বকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। এবং তৃতীয়ত, একাব্যের কাহিনীটি এতই ঐশ্বর্যপূর্ণ যে পুথিসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য হিসেবে আজও তা বাঙালি মুসলিম মানসে রোমান্সের এক অপরূপ শিহরণ জাগায়। দোনাগাজী চৌধুরী এই 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালের'ই একজন বিশিষ্ট কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'সয়ফুলমুলক' সম্পর্কে আর যাঁদের কবিখ্যাতি রয়েছে তাঁরা হলেন আলাওল, বিরহিম ও মুনশী মালে মোহাম্মদ। এক সময় মনে করা হতো দোনাগাজী চৌধুরী আলাওলের পরবর্তী কালের লোক। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ গবেষক বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে দোনাগাজী আলাওলের পূর্ববর্তী কবি।[১০৯]

১০৯. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে', পৃ. ৮৪

দোনাগাজীর পাণ্ডুলিপির একাধিক কপি পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লিপিকার কর্তৃক কাব্য লিপিকৃত হয়েছে। ফলে তাঁর কাব্যে ভণিতা-বিভ্রাট দেখা যায়। গায়েনগণও তার জন্য দায়ী। দোনাগাজীর পাণ্ডুলিপি প্রথম পাওয়া যায় যথেষ্ট জরাজীর্ণ অবস্থায়। পাণ্ডুলিপিখানির পত্রসংখ্যা ৫-১৮৫। অনুমান করা হয় কাব্যের অনুলিখন প্রায় আড়াই শ' বছর আগের। আলীগঞ্জ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত তরিক মিঞা প্রথমে একাব্যের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। কাব্যের ভাষা, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগগত দিকসমূহ বিচার করে সহজেই বোঝা যায় পুথিখানি বহু প্রাচীন যুগের হওয়াই সম্ভব।

দোনাগাজীর পুথিতে বিভিন্ন ভণিতার ব্যবহার দেখা যায়। লিপিকার ও গায়েনগণই যে তার জন্য দায়ী সেকথা বলা হয়েছে। 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে' কমপক্ষে তিনটি ভণিতার ব্যবহার আছে। তার মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত পুথিতে পাঁচটি ভণিতার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন,—

ক. দোনাগাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেশ।
রচিল বিরহ পুথি চিত্তের আবেশ॥

খ. কহে দোনাগাজী শুন দুঃখের কাহিনী।
এ হৃদএ স্থলএ অতি বিরহ আগুনি॥

গ. কহে দোনাগাজী দুঃখ ধীরে ধীরে যাএ।
যাইতে নাহিক শ্রদ্ধা ফিরে ফিরে চাহে॥

অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত পুথিতে কবির দুটি ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন,

ক. কহে শ্রী দোনাগাজী হিমালের দৃষ্টে।
ভোজন করিতে যাএ গজ লৈয়া পৃষ্ঠে॥

খ. কহে হীন দোনাগাজী নিয়তি নির্দিষ্টে।
ভোজনের কালে পুনি গজ বহে পৃষ্ঠে॥

দোনাগাজী চৌধুরীর কাব্যের ভাষাবিচারে তাঁকে আলাওল পূর্ববর্তী কবি হিসেবে নির্ধারণ করা যায়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবির কাব্যের ভাষাবিচার করে এ সম্পর্কে তাঁর যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ,-

ক. দোনাগাজীর কাব্যে ব্যবহৃত 'পতিক', 'দোহাক' ইত্যাদি শব্দে 'কে' স্থলে প্রাচীনতর 'ক' ব্যবহার দেখা যায়।

খ. 'নাচন্তি সুন্দরী সবে গাহেন্তি সোন্দর'- এই পঙ্ক্তিতে 'নাচিতেছি,' 'গাহিতেছি' স্থলে যথাক্রমে প্রাচীনতর 'নাচন্তি', 'গাহেন্তি' ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. 'তেকারণে রবি শশি জলেদি লুকাএ'--'এই চরণে 'দিয়া' স্থলে প্রাচীন প্রয়োগ 'দি' লক্ষ্য করা যায়।

ঘ. যুবকের স্ত্রীলিঙ্গে 'জুবকী' ও 'দুর্বাক্যে'র স্থলে 'দুরাক্ষর' ইত্যাদি প্রাচীনপন্থী প্রয়োগ যে কাব্যখানির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন করে, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এসব বিষয়

বিচার-বিবেচনা করে দেখিয়েছেন।[১১০] সুতরাং প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত যে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র কবি দোনাগাজী চৌধুরী ষোড়শ শতকের শেষার্ধের লোক হতে পারেন।

দোনাগাজী চৌধুরী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের প্রেক্ষিতে বিচার্য হলেও 'সয়ফুলমুলকে'র অন্যান্য কবি যেমন আলাওল প্রমুখের তুলনায় তিনি ততখানি উঁচুমানের কবি ছিলেন না। প্রাকৃত ভাবের প্রকাশে তাঁর কাব্যের ভাষা যথেষ্ট স্থূল ; ছন্দোশৈথিল্য ও অন্ত্যানুপ্রাসের অপব্যবহার প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে তিনি 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র আদিকবি হিসেবে স্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র রোমান্টিক কাহিনী পল্লীর বৃহত্তর জনসমাজকে এক অভিনব জগতে ভ্রমণের সুযোগ দেয়। তাই একাব্যের সামাজিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য এরূপ মন্তব্য করা যায় যে, দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র কাহিনী মুসলিম জগতের সর্বত্রই সুপরিচিত।

সুতরাং এই রোমান্টিক কাব্যের কাহিনীটি বহু প্রাচীন হলেও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও আনন্দোচ্ছ্বাসকে সজীব রাখার জন্য এ জাতীয় কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি নানা ভাষায়ও এ কাহিনী রচনার ব্যাপকতা ও লোকসমাজে তার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গজজনের চিত্তের পিপাসাও যুগ যুগ ধরে নিবৃত্ত করে আসছে ফারসি থেকে আগত এই উপাখ্যান।

দোনাগাজীর কাব্যের উপাখ্যান এরূপ,-- অনেক সাধ আর সাধনার পর মিসররাজের এক পুত্রসন্তান জন্মে। সেই পুত্রের নাম রাখা হয় সয়ফুলমুলক। এই অনিন্দ্যসুন্দর কুমার সম্পর্কে জ্যোতিষগণ ভবিষ্যৎবাণী করেন, 'সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈব বিচক্ষণ। রূপগুণ তুলনা বর্জিত ত্রিভুবন।।' ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়। বাল্য ও কৈশোর উত্তীর্ণ কুমার ক্রমান্বয়ে যৌবনে পা বাড়ায়। বয়ঃসন্ধির প্রভাবে এক শুভক্ষণে সয়ফুলমুলক গোলেস্তা ইরামের পরীরাজ শাহবালের অনুপম সুন্দরী কন্যা বদিউজ্জামালের লাবণ্যময়ী চিত্রপট দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। এই প্রগাঢ় আসক্তিবশে সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালকে পাওয়ার জন্য উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠে। মনের বিভ্রান্তিতে অতঃপর সে কখনো তরু, কখনো পাখি, কখনো পবনকে রাজকুমারীর সংবাদ জিজ্ঞেস করে। সয়ফুলমুলকের শৈশবসঙ্গী সায়াদ বন্ধুর অবস্থা রাজাকে জানায়। পুত্রের অবস্থা জানতে পেরে রাজা চিন্তিত হন। তিনি রাজ্যের ওঝা সম্প্রদায়কে ডেকে তাদের উপর যুবরাজের মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের আদেশ দেন। বহু চেষ্টা করেও রাজকুমারের মনের কথা কেউ জানতে পারে না। প্রাণপ্রিয় বন্ধু সায়াদ তখন আত্মহত্যা করার ভয় দেখালে কুমার তাকে সব কথা খুলে বলে। তখন সাজ সাজ রব তুলে রাজার অনুচরবৃন্দ রাজকুমারী বদিউজ্জামালের খোঁজে অজানা মুলুকে যাত্রা করে। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও তারা জায়গাটার হদিস পায় না। বিফল হয়ে অবশেষে তারা দেশে ফিরে আসে। এদিকে এক রাতে সয়ফুলমুলক স্বপ্নে রাজকুমারী বদিউজ্জামালের সাক্ষাৎ পায়। অজানা রাজ্যের সন্ধানটিও সে এই সঙ্গে পেয়ে যায়। তারপর এক শুভদিন দেখে সয়ফুলমুলক বন্ধু সায়াদ ও লোকলস্কর-পরিবৃত হয়ে তার স্বপ্নের রাজকুমারীর রাজ্যে যাত্রা

১১০ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ৮৬

করে। পথে তাদের বহু বিপদ আপদ, ঝড়ঝঞ্ঝা ও দেও-দানোর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। সব বিপদ আপদ উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে রাজকুমারী বদিউজ্জমালের সঙ্গে রাজকুমার সয়ফুলমুলকের সাক্ষাৎ হয়। বহু প্রতীক্ষার, বহু আকাঙ্ক্ষার এ মিলন। তারপব বন্ধু সায়াদের সম্পর্কে তার ভাবনার উদয় হয়। যার আন্তবিকতায় এই মিলন সংঘটিত হয় তারও যে এখন একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন একথা তাব চেয়ে কে বেশি অনুভব করবে। সরুন্দ্বীপের রাজকন্যা মালেকাকে সযফুলমুলক একদা বিপদ থেকে উদ্ধাব করেছিলো, তখন বাজকুমারের সঙ্গে তার ধর্মভাই সম্পর্ক হয়। এই ভাই-বোন সম্পর্কেব সুবাদে সয়ফুলমুলকের ইচ্ছা জাগে সায়াদের সঙ্গে মালেকার মিলন সংঘটিত হোক। এভাবে বহু লোমহর্ষক ঘটনা ও বিপত্তি শেষে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাহিনীটি সর্বাঙ্গীণ মিলন-মধুবতায় পর্যবসিত হয।

দোনাগাজীব 'সযফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্যেব সঙ্গে আলাওলের 'সযফুলমুলক বদিউজ্জামালে'ব তুলনামূলক বিচাব থেকে স্পষ্টতই প্রতীযমান হয যে দোনাগাজীর শিল্পীমানস ততখানি উন্নত নয, যতখানি আলাওলেব শিল্পমানস। দোনাগাজীব ভাষায মাধুর্যেব অভাব রযেছে ; কবিত্বেব ব্যঞ্জনা অপবিস্ফুট ও ছন্দোপ্রযোগ শিথিল। এই অপটু ভাষা ও কাব্যকলাব একটি নিদর্শন,--

কস্তুরী হবিণী কিছু তাহাব ববণ।
অদ্যাবধি সুগন্ধে বেষ্টিত এ কাবণ॥
মুনি তপস্বীবা যে বর্ণেত মঙ্গিল।
কোবান পুবাণ বেদ কালি দি লিখিল॥
অদ্যাবধি সেই কালা বর্ণ মনে তুলি।
গাহেন্ত নিত্যকী সবে শ্যামকলা বুলি॥
তার বর্ণ ছায়া কত জলদেব গাএ।
তেকারণে রবি শশী জলে দি লুকাএ॥

পাশাপাশি আলাওলের কবিত্বশক্তি ও লালিত্যময ভাষাবৈশিষ্ট্য,- -

নবীন জলদ জিনি শ্যান কেশভাব।
চলাচল নাহি তাতে অতি অন্ধকাব॥
মোহন সীমান্ত রূপ চপলা বেকর্ত।
সেই লক্ষে স্বর্গে যাইতে মন্মথ পথ॥
ললাটে সিন্দুব কিবা অরুণ কিবণ।
সেই পথে অস্তাচলে করয গমন॥
ভালে ভাল বালচন্দ্র অরুণে সে মেলা।
দুই শিশু একত্রে বসিয়া করে খেলা॥

দোনাগাজী অবশ্য অন্যদিক থেকে স্মবণীয। তাঁব কাব্যে ষোড়শ শতকেব মুসলিম সমাজেব জীবন্ত চিত্র অঙ্কনেব প্রযাস আছে। রচনায় কবি কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। ফলে স্বসমাজ ও তাঁর জীবনদৃষ্টিব অনেক বিষয়কে তিনি অবলীলায তাঁব কাব্যে স্থান দিতে পেরেছেন। তাছাড়া তাঁব দৃষ্টিচেতনাও ছিলো বাস্তবমুখি। তিনি তাঁর রচনায সমাজ--জীবনেব

রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও উৎসবাদির বাস্তব ছবি অঙ্কন করেছেন। তাঁর বলার ভঙ্গিটিও বহুলাংশে জনচিত্ত আকর্ষণ করার বিশেষ উপযোগী।

মুহম্মদ কবীর॥ 'মনোহর-মধুমালতী' নামক প্রেমোপাখ্যানের রচয়িতা মুহম্মদ কবীরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা হয়। এ ব্যাপারে আমাদের নির্ভর করতে হয় প্রধানত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্যের উপর। মধুমালতীর বিষয় নিয়ে মধ্যযুগের একাধিক মুসলিম কবি কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শাকির মাহমুদ, সৈয়দ হামজা এবং উনিশ শতকের কবি চুহর, গোপীমোহন দাস, জোবেদ আলী, নূর মোহাম্মদ প্রমুখ।

১৯৩৭ সালে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অন্তর্গত জোরওয়ারগঞ্জে 'মধুমালতী' নামক একটি পুথি পান। সেই পুথিতে অনুলিখকের নাম ছিলো 'শ্রী আবদুল আলী, সাং পরাগলপুর, সন ১১০১ মাঘীর (১৭৩৯ খ্রিঃ) বৈশাখ মাস'। পুথিটিতে 'মোহাম্মদ কবীর' ভণিতা পাওয়া যায়। পুথির সন তারিখগত কালটিও যথারীতি হেঁয়ালির আকারেই লেখা হয়--'অন্ত অন্তে অন্ত রএ সিন্ধু তাব পাছ। পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরির পাঁচ॥' পদটি বিশ্লেষণ করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন কাব্যের রচনাকাল ৯৯৭ হিজরি বা ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ।[১১১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পদের উপরের বাক্যের একটি সংশোধনী দেন--'অঙ্ক অন্তে অঙ্ক'। তবে ডক্টব হকের মন্তব্য তিনি সমর্থন কবেন।[১১২]

'মধুমালতী' পুথির বচনাকালগত বিষযে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদেব পত্রালাপ হয। ১৯৪৯ সালেব ২২ জুলাই এক পত্রে সাহিত্যবিশারদ ডক্টর হককে জানান সেসময় তিনি যে 'মধুমালতী' পুথির একটি প্রতিলিপি পান তাতে ভণিতার আগে যে হেঁয়ালি ছিলো তা হলো, -

অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ রস বিদ্ধ তার কাছ।
পঞ্চালি ভণিতে তৈল হিজরির পাঁচ॥

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এই পদের শুদ্ধ পাঠ দেন এভাবে,—

অঙ্গ সঙ্গে রত্নে রস বিন্দু তার কাছ।
পঞ্চালী ভণিতে গেল হিজরির পাঁচ॥

এই শুদ্ধ পাঠ সত্ত্বেও সাহিত্যবিশারদেব পত্রে উদ্ধৃত পদটি তাঁকে দ্বিধায় ফেলে। এই দ্বিধাবশে তাঁর ধারণা হয পুথিটি ৮৯০ হিজরী অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দেও বচিত হতে পারে। তাহলে দুই তাবিখের মধ্যে প্রায় ১০৩ বছবের পার্থক্য লক্ষগোচর হয়।

মঙ্গলকাব্যেব কবি বিজযগুপ্তের 'মনসামঙ্গল' (১৪৯৪) ও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' (১৪৮৫) কাব্যের ভাষা প্রাচীন হলেও কবীরের 'মধুমালতী' কাব্যের ভাষা আরো প্রাচীন মনে করা অসমীচীন নয়। কবীরেব ভাষার প্রাচীনত্বের কয়েকটি নমুনা। যেমন–কবীর

---

১১১. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ৯৬
১১২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যেব কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭

কে' বিভক্তির জায়গায় 'ক' বিভক্তি ব্যবহার করেছেন—'কুমারক', 'নৃপতিক, উজীরক' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ব্যবহৃত ভাষার মতো 'আহ্মি', 'তুহ্মি', 'গেলন্ত', 'দেখন্ত', ধামালি', 'নেহা', গোহারি', 'কেহ্নে' ইত্যাদি। এই প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের চেয়ে কবীরের প্রাচীনত্ব বেশি প্রমাণবহ।[১১৩]

ডক্টর আহমদ শরীফ মনে করেন, আরো কিছু পাণ্ডুলিপি না পাওয়া গেলে কবীরের কাল ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা ঠিক নয়।[১১৪] তবে ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার অন্য দিক থেকে বিচার করে কবীরের 'মধুমালতী' কাব্যের রচনাকাল খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে ফেলবার পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি হলো মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' কাব্যের উপজীব্য ছিলো ১৬৪৯ সালে রচিত ফারসি কাব্য 'কিস্‌সা-ই-মধুমালত ওয়া কুঁওর মনুহর'।[১১৫] ডক্টর তরফদার কবীরকে যত কাছের মানুষ মনে করেন, কবি বোধ হয় ততটা কাছের নন। কেননা, 'মধুমালতী' কাব্যে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের ভাষানিদর্শন মেলে। এক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের ধারণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। সেই সূত্রে কবীরকে চট্টগ্রামের অধিবাসী মনে করা যায়। কবি যে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ডক্টর আহমদ শরীফ কবীরের কাব্যে ব্যবহৃত কিছু শব্দের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দের মিল খুঁজে পেয়েছেন। যেমন,--মিখ (দিকে, পানে), কোনে (ক), কুনি (কোথায়), লুলালুলি মৃদুভাবে মর্দন), ফেলেফ্যারি (ফ্যালফ্যাল), তু (থেকে), থু (থেকে) ইত্যাদি। ভাষাগত ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করে মুহম্মদ কবীরকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই চট্টগ্রামের অধিবাসী মনে করা যায়।

'মনোহর-মধুমালতী'র কাহিনীটি মুহম্মদ কবীর সরাসরি হিন্দি অথবা ফারসি উপাখ্যান থেকে নিয়েছেন কিনা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। পণ্ডিতগণ এব্যাপারেও বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। কবীর তাঁর কাব্যে যে ভণিতা ব্যবহার করেছেন সেগুলো সন্দেহের নিরসন না করে বরং সন্দেহ আরো বাড়িয়ে দেয়। কবীরের নামে প্রচলিত দুটি পুথিতে কবি যে ভণিতা ব্যবহার করেছেন সেগলো নিম্নরূপ,---

ক. মোহাম্মদ কবিরে কহে মন কুতুহলি।
আছিল ফারসী ছন্দ রচিল পঞ্চালী॥

খ. মোহাম্মদ কবিরে কহে সুরস পঞ্চালী।
আছিল ফারসী কিতাব করিল হিন্দুয়ালী॥

অন্য একটি পুথিতে আছে,--

১৩. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮
১৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭

এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দীতে আছিল।
দেশী ভাষায় মুঞি পঞ্চালী ভণিল॥

কবীরের এসব মন্তব্য থেকে কোন্ বিদেশী ভাষার কাব্য তাঁর অবলম্বন ছিলো তা বলা মুস্কিল।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অনুমান করেন কবীরের 'মধুমালতী' গোলে-বকাওলী জাতীয় কাব্য। সম্ভবত মূল গল্পের সন্ধান ছিলো কোনো হিন্দীকাব্যে। কোনো ভারতীয় মুসলিম কবি মূল হিন্দি থেকে ফারসি ভাষায় এর কাব্যরূপ দিতে গিয়ে পরী ইত্যাদি ইরানী উপাদান তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। কবীর ফারসি থেকেই বাংলায় তার রূপ নির্মাণ করে থাকবেন। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে হিন্দিতে মধুমালতী কাব্যের রচয়িতা ভারতের চুনার নিবাসী শেখ মুহম্মদ মনঝন। সৈয়দ আলী আহসান বাংলা মধুমালতী হিন্দি কবি মনঝনের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ বলে মনে করেন।[১১৬] ডক্টর শরীফ মনে করেন পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে নব্য ভারতীয় ভাষায় প্রেমকথারূপে কিংবা অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতীকরূপে মসনবীতে ও কাব্যে তার রূপায়ণ ঘটে। কবীরের ভণিতা থেকে মনে হয় একদিকে তাঁর আদর্শ ছিলো এ বিষয়ক কোনো ফারসি কিতাব, অন্যদিকে তিনি জানতেন মধুমালতী উপাখ্যানের উদ্ভব উত্তর ভারতে।

'মনোহর মধুমালতী' খুবই জনপ্রিয় উপাখ্যান। একাহিনীর জনপ্রিয়তার কারণ এতে অনেক রোমান্সধর্মী বিষয়ের উপস্থাপনা আছে। অবিচল নীতিবাদের শাসনে অবরুদ্ধ থাকলেও মানুষের মন কখনো রোমান্স আর রোমান্টিকতার প্রভাবশূন্য নয়। মধ্যযুগের বহু মুসলমান কবি সাধারণ মানুষকে নীতিকথার দ্বারা বিশুদ্ধ জীবন যাপনের উপদেশ দেন। মানুষ সেই উপদেশ মেনে নিয়েও রোমান্সধর্মী গালগল্পের ভেতর নিজেদের মনের খোরাক অনেক বেশি খুঁজে পায়। মধুমালতী সেই দিক থেকে মানুষের মনে আনন্দরসের সঞ্চার করে একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান হিসেবে বিপুল মর্যাদা পায়।

মধুমালতীর উপাখ্যানটি হচ্ছে - কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা সূর্যভান ও রানী কমলাসুন্দরীর পুত্র যুবরাজ মনোহর। রাজ্যের জ্যোতিষীদের ডেকে রাজা যুবরাজের ভাগ্য পরীক্ষা করান। জ্যোতিষীগণ অভিমত দেন যে পরীরা নিজেদের বাসনা চরিতার্থের জন্য পনেরো বছর বয়ঃক্রমকালে যুবরাজ মনোহরের সঙ্গে মহারস রাজকন্যা মধুমালতীর পরস্পর আকর্ষণজনিত এক মিলন মহড়ার আয়োজন করবে। রাজকুমার ও রাজকন্যার মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ গভীর হলেও সহজভাবে কেউ কাউকে পাবে না। যথাসময়ে ব্যাপারটা এভাবে ঘটে। কঙ্গিরা রাজ্যের যুবরাজের অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষে রাজকুমার রাত্রে উদ্যানে পালঙ্কের উপর শয়ন করে। গভীর রাতে যুবরাজ যখন গভীর নিদ্রাভিভূত, তখন কঙ্গিরা রাজ্যে পরীদের অভিসার ঘটে। পরীজাদীদের চক্রান্তে পালঙ্কসহ ঘুমন্ত মনোহর ঘুমন্ত মহারস রাজকুমারী মধুমালতীর পালঙ্কপার্শ্বে নীত হয়। তখন,---

কন্যার পালঙ্ক পাশে কুমার পালঙ্ক।
পরীসব থুইল নিয়া ধীরে এক সঙ্গ॥

ঘুম থেকে জেগে উঠে রাজকুমার ও রাজকুমারী পরস্পরকে দেখে অবাক হয়। বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে উভয়ের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয। তখন পরস্পরেব মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়। আর অনুরাগ মানেই তো প্রেম। প্রেমেব নিদর্শন হিসেবে তখন পরস্পরের মধ্যে অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়, উভয়ে পালঙ্ক বদল করে ; তারপর আদর সোহাগ শেষে উভয়েই আবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। কৌতুকোচ্ছল পরীকুল নতুন পালঙ্কেব উপর নিদ্রিত মনোহরকে পুনরায় তার স্বস্থানে রেখে আসে। ঘটনাটি ঘটে রাতেব অন্ধকারে। প্রভাতে অরুণ রবির মৃদুস্পর্শে নিজ নিজ রাজ্যে কুমার ও রাজকুমারী জেগে উঠে একজন আব একজনকে দেখতে না পেয়ে বিষাদের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। একদিকে প্রেমেব তীব্র দহন, অন্যদিকে স্বপ্নের মতো তার অপসারণ, সব কিছু অনুভব করে রাজকুমার ও রাজকুমারী পরস্পরের বিচ্ছেদে আকুল হয়। যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে উভয়েই কেন নতুন পালঙ্কে শায়িত। যদি মিথ্যে হয়, তাহলে প্রত্যেকেরই চম্পক অঙ্গুলী দুর্লভ ও সম্পূর্ণভাবে নতুন অঙ্গুরীয়তে শোভিত কেন? তাই তাদেব দৃঢ় বিশ্বাস হয় নিশার ঘন বেবাটোপে সাধিত প্রেমেব সেই গোপন আয়োজন কিছুতেই স্বপ্ন হতে পারে না। তখন প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরকে পাওযাব জন্য অধীর হয়। রাজকুমার মনোহর রাজকুমারী মধুমালতীর সন্ধানে সসৈন্যে অভিযান চালায। পথে জটবহরের রাজা চন্দ্রসেনেব কন্যা পায়মার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয। পায়মা তখন এক দৈত্য কর্তৃক অপহৃত হয়ে এক টঙ্গীতে বন্দীজীবন যাপন করেছিলো। সেই দৈত্যের সঙ্গে মনোহরের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয। যুদ্ধে মনোহর জয়লাভ করে ও পায়মাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দেয়। ওদিকে মধুমালতীর সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু কলঙ্কের আশঙ্কায় মধুমালতীর মা তাকে মন্ত্রবলে শুকপাখিতে পরিণত করে। শুকরূপী মধুমালতী একদিন উড়তে উড়তে মানিক্যরাশের রাজা তারাচাঁদের হাতে ধরা পড়ে। রাজা পাখির মুখে সব কথা শুনে তাকে মহারস রাজ্যে পৌঁছে দেন। মহারসের রাজাও তারাচাঁদের মুখে সব কথা অবগত হয়ে মনোহর মধুমালতীর পরিণয় সম্পন্ন করেন।

মধুমালতী কাব্যখানি রোমান্সরসের প্রাচুর্যে ভরপুর। এতে অবশ্য অনেক অলৌকিক বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। ঝড় ঝঞ্ঝা, বিপদ আপদ ও নানারকম বাধা বিপত্তি শেষে প্রেমিক প্রেমিকার মিলন মধুরতার মধ্য দিয়ে কাহিনীর যে পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে তাতে কাব্যখানির পরিতৃপ্তিমূলক ব্যঞ্জনামাধুর্য অনুভব করা যায। কাহিনীর এই ব্যঞ্জনাময় পরিণতি ছাড়াও কাব্যখানির অন্তর্ধর্মী শান্ত ও সৌম্যরস এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

মুজাম্মিল॥ নানা বিচার-বিবেচনায় মুজাম্মিলকে ষোড়শ শতকেরই একজন মুসলিম কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুজাম্মিল যদিও অনেকের কাছে খুব একটা পরিচিত কবি নন, কিন্তু জ্ঞানসাধনার কবি হিসেবে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন শক্তিধর পুথিকার রূপে বিবেচিত হতে পারেন। তবে তাঁর কালনির্ণয়ের ব্যাপারটা তর্কাতীত নয়।

কবি মুজাম্মিলের কালনির্ণয় ব্যাপারে কাব্যে তাঁর ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দ পণ্ডিতদের বেশি সহায়তা করে। উনিশ শতকের মুসলিম কবি মুহম্মদ মুকিম তাঁর 'গুলে বকাউলি' কাব্যে তাঁর পূর্ববর্তী কবি হিসেবে মুজাম্মিলের কথা উল্লেখ করেছেন। মুকিমের উক্তিও কবি মুজাম্মিলের কালনির্ণয় ব্যাপারে গবেষকদের উৎসাহ যোগায়।

কবি মুজাম্মিলের নামে মোট তিনটি পুথি পাওয়া গিয়েছে। পুথিগুলো হলো--'নীতিশাস্ত্র বার্তা', 'সায়াৎনামা' ও 'খঞ্জনচরিত্র'। 'নীতিশাস্ত্র বার্তা' ও 'খঞ্জনচরিত্র' পুথির কোনো কোনো জায়গায় 'যুসুফ' ও 'মুহম্মদ শফী' ভণিতা পাওয়া যায়। ফলে গবেষকগণ পুথির প্রকৃত রচয়িতা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ভণিতা-বিভ্রাটের এই ব্যাপারটিকে অনুলিপিকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন এবং বলেন, সেকারণে সায়াৎনামার শেষে মুহম্মদ শফী কর্তৃক ১৬৮৯ শকাব্দ বা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুথি রচনার যে উল্লেখ দেখা যায় তা প্রামাণিক হতে পারে না।[১১৭] আসলে একথা ঠিক যে প্রখ্যাত কোনো কবির নামের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা তৎকালীন বহু অনুলেখকের মধ্যেই বর্তমান ছিলো। যুসুফ কিংবা শফীর মধ্যেও যে তা ছিলো না, কথাটি জোর দিয়ে কে বলবে? যদি তা-ই হয়, তাহলে যুসুফ ও শফী যে অমর হয়েছেন সে তো বলাই বাহুল্য।

ডক্টর সুকুমার সেন শফীর অনুলিখনের তারিখটি ১৬৭৯ শকাব্দ বা ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁর মতে সায়াৎনামার রচনা তারিখও উক্ত সাল।[১১৮] ব্যাপারটি প্রামাণিক না ও হতে পারে এই কারণে যে ডক্টর সেন তাঁর ধারণার উপর কোনো যুক্তি দেন নি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর নিজস্ব ধারণা থেকে মুজাম্মিলকে ষোড়শ শতকের কবি হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[১১৯]

উনিশ শতকের প্রথম দিকের বটতলার পুথিকার মুহম্মদ মুকিম তাঁর 'গুলে বকাউলি' কাব্যে চট্টগ্রামের অগ্রজ কবি হিসেবে মুজাম্মিলকে স্মরণ করে লিখেছেন, 'আর বৃদ্ধ মহাশক্য আবদুল নবী নাম। গআছক, মুজাম্মিল সুধীর উগাম॥' মুকিমের এই বাক্য ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফ দুজনেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে। এর উপর নির্ভর করে পুথিসাহিত্যের এই দুই প্রাজ্ঞ বিশারদ মনে করেন মুজাম্মিল মুকিমের পূর্ববর্তীকালীন লোক। তবে ডক্টর হকের মতে কবি মুজাম্মিলের সময়কাল পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ এবং ডক্টর শরীফের মতে ষোড়শ শতক।

কবি মুজাম্মিলের পুথির ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফ দুজনেই। তাতে কবির কাল-সংক্রান্ত প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মুজাম্মিলের 'সায়াৎনামা'র প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা নেই। 'নীতিশাস্ত্র বার্তা'র ভাষাও প্রাচীন। একাব্যে উল্লিখিত পীরের আবির্ভাবের সময়টিও প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করে। ডক্টর এনামুল হক 'নীতিশাস্ত্র বার্তা' কাব্যের প্রথম অংশ থেকে আটটি চরণ উদ্ধৃত

---

১১৭. পূর্বোক্ত, মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ৬৬
১১৮. পূর্বোক্ত, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৬০
১১৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৫

করেছেন। এসব চরণ নিশ্চিতভাবেই বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অবহিত করে। যেমন,—

আরবী ভাষায় লোকে ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন॥
যে বলে বলৌক লোকে কবিলুঁ লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দন যাএ খণ্ডন॥
রচিলেক মোজাম্মিলে পঞ্চালি সুছন্দ।
দেশি ভাষে রচিলুং মাঝে মৃদু মন্দ॥
নীতিশাস্ত্র বার্তা যেজন পড়এ শুনএ।
আপুযশ বাঢ়ে জ্ঞান দারিদ্র্য খণ্ডএ॥

ডক্টর হকের মতে এরূপ শব্দের ব্যবহার যেমন 'কৈলুঁ', 'বলৌক', 'কবিলুঁ', 'রচিলুং' ইত্যাদি সপ্তদশ শতকের বাংলা ভাষায় বিরল। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে থাকতে পারে।[১২০]

মুজাম্মিলে রচনায় 'র' ও 'ল'-এর পদান্ত মিল লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর আহমদ শরীফ মুজাম্মিলের রচনার এই মিলকে আদি মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে ব্যবহৃত 'র' ও 'ল'-এর পদান্ত মিলের প্রভাব-সঞ্জাত বলে অনুমান করেন। যেমন, মুজাম্মিলের কাব্যে এই 'র' ও 'ল'-এর পদান্ত মিল এভাবে দেখা যায়, 'ঘর বহর আখেরে মিলে, গোসলে শরীরে আওয়ালে ভিতরে, নির্ভরে আওয়ালে আখেরে, বিস্তরি পঞ্চালি, কুতুহলে উপরে।'

একথা খুবই সত্য যে অষ্টাদশ শতকের আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মুসলিম-সমাজে হিন্দুয়ানি ভাষারূপে বিবেচিত হতো। পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর, ষোড়শ শতকের কবি সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ এবং সপ্তদশ শতকের কবি আবদুন নবী, শেখ মুত্তালিব, আবদুল হাকিম প্রমুখ কবির কাব্যে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলিম সমাজের অবজ্ঞার প্রতিবাদ ও মাতৃভাষার প্রতি কবিদের সংবেদ্য সমর্থন সূচিত হয়েছে।[১২১]

যাই হোক, নানা দিক বিচার বিশ্লেষণ করে কবি মুজাম্মিলকে ষোড়শ শতকের কবি হিসেবেই অনুমান করা যায়। মধ্যযুগের অনেক মুসলিম কবির কাব্যে পীরপ্রশস্তি লক্ষ্য করা যায়। মুজাম্মিলের 'সায়াৎনামা' কাব্যে কবি পীরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেছেন,—

শাহা বদরুদ্দিন পীর কৃপাকুল হরি।
শত মুখে সে বাখান কহিতে ন পারি॥
তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিয়া।
রচিলেন্ত মোজাম্মিলে মনে আকলিয়া॥

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পীর বদরুদ্দিন বদরে আলম বিহারের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বর্ধমানের কালনায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। চট্টগ্রামের পীর বদর শাহ ও বিহারের পীর বদরুদ্দিন বদরে আলমকে অনেক গবেষক এক ও অভিন্ন মনে করেন। সেই

১২০. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ৬৭-৬৮
১২১. দ্রষ্টব্য আহমদ শরীফ সম্পাদিত কবি মুজাম্মিল রচিত 'নীতিশাস্ত্র বার্তা' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী)

সূত্রে ডক্টর আহমদ শরীফের অভিমত এই যে, পীর 'বদরুদ্দিন বদর-ই-আলম' চট্টগ্রাম আবাদ করেছেন বলে জনশ্রুতি আছে। চট্টগ্রামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো বলে অনেকে মনে করেন। চট্টগ্রাম শহরের বুকে বদরচেরাগ ও বদরপাতি নামক কৃত্রিম সমাধি তারই স্মৃতিমণ্ডিত বলে অনুমান করা হয়। ওদিকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে বদরুদ্দিন বদরে আলম ১৪৪০ সালে বিহারে মারা যান। বর্ধমানের কালনায় তাঁর একটি নকল সমাধিও রয়েছে।

পীর বদরুদ্দিন চট্টগ্রাম আগমন করলে কবি মুজাম্মিল তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ করে থাকবেন বলে অনুমান করা হয়। এই সূত্র ধরেই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মুজাম্মিলকে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধেব মধ্যবর্তী সময়ের লোক মনে করেন। সেই দিক থেকে কবির ব্যবহৃত ভাষায়ও রয়েছে তৎকালীন সমযের ভাষাবৈশিষ্ট্য, যা তাঁর সময় ও পুথির প্রাচীনত্বের প্রায় নিঃশর্ত পরিচয় বহন করে।

কাব্যবিচারে বোঝা যায় কবি মুজাম্মিল সুফী জ্ঞান- সাধনার পথে স্বকীয় ভাবের বিকাশ সাধন করেছেন। পীর বদরুদ্দিনের আদেশমাল্য শিরোধার্য করে লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে মুজাম্মিল তার 'সায়াৎনামা' পুথিখানি পবিত্র দেশী ভাষায রচনা কবেন। পুথি আরবি থেকে ভাবানুবাদ করা হয়েছে। কবি তাঁর কাব্যে সুফীভাবের বিকাশ ঘটালেও বাংলাদেশের চিরাচরিত সংসারের সঙ্গে তাব বিষয়বৈশিষ্ট্যকে এতে নির্দ্বিধায মিলিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যই ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁব মনে পড়ে, -

শ্রাবণ মাসেত যদি কেতো বান্ধে ঘর।
সেই দোযে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর॥
মাধবী মাসেত নব মন্দির বান্ধিব।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী সব তাহার বাড়িব॥

একই বিষয়ে কবি আরো বলেন,—

আদিত্য বাবে যদি সে গৃহ নির্মএ।
অনলে দহিবে কিবা ঝড়েতে ভাঙ্গএ॥
সোমবারে গৃহ যদি বান্ধে কোন নব।
সুত না জন্মিবে সুতা জন্মিবে সে ঘর॥

বাংলাদেশে মশার উপদ্রব প্রায় চিরকালের। মশক-দংশন কারোব জন্যই খুব প্রিয় নয়, কবিদের জন্য তো নযই। রাত জেগে কবিদের কাব্য রচনা করতে হয, সুতরাং মশক-দংশনের কথাটি তাঁরা ভুলতে পারেন না। কেননা মশার উপদ্রব রাতেই বাড়ে বেশি। কবি ঈশ্বরগুপ্ত যেমন বলেন,—'রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি', ষোড়শ শতকের কবি মুজাম্মিলও বাঙালির স্যাঁতসেতে ঘরে মশার উপদ্রব সম্পর্কে বলেছেন,---

মনুষ্য থাকিতে যদি ঘব নিরমিল॥
সেই ঘরে মশক হইব বহুল॥

সতরাং আমবা বুঝতে পারি মুজাম্মিল তাঁর কাব্যে দেশীয় সংস্কার, রুচি ও প্রাকৃতিক সংকটের কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

কবির 'খঞ্জন-চরিত্র' 'সায়াৎনামা'র একটি অংশ মাত্র। সামান্য কয়েকটি পাতা নিয়ে এ পুস্তক। তাই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের উক্তি, খঞ্জন-চরিত্রকে কোনো আলাদা পুস্তক মনে করা যায় না। সায়াৎনামার একটি অধ্যায়ের সঙ্গে এর রচনার মিল লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর হকের অভিমত অনুযায়ী বলা যায় কোনো অনুলিপিকার খঞ্জন-চরিত্রকে আলাদাভাবে নকল করে প্রচার করেছেন বিধায় রচনাটি একটি ক্ষুদ্র পুথির আকার ধারণ করে।

কবি মুজাম্মিল ছিলেন একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি। কাব্যের বিষয়কে তিনি লঘু না করে বরং তত্ত্বীয় ভাবের ডোরে বাঁধবার প্রবণতা দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর কাব্য কোনো হাল্কা রোমান্সরসের আধার না হয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনার ইঙ্গিত বহন করে।

হাজী মুহম্মদ॥ হাজী মুহম্মদ প্রকৃতপক্ষে একজন মারফতী তত্ত্বের কবি। তরিকত, হকিকত সম্পর্কে তাঁর ধর্মীয় দর্শনচিন্তার চমৎকার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'নূরজামাল' কাব্যে। হাজী মুহম্মদ ও তাঁর 'নূরজামাল' কাব্য সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। সাহিত্যবিশারদের আলোচনাটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের সাপ্তাহিক 'মাহে নও' পত্রিকায়। তাঁর আগে হাজী মুহম্মদের পরিচয় কারো জানা ছিলো না। সাহিত্যবিশারদ হাজী মুহম্মদকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করতে না পারলেও তাঁর আলোচনার প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের এই কবি অনেক সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে হাজী মুহম্মদের জীবন ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে গবেষণা করতে গবেষকগণ নতুন প্রেরণা পান। সেই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক হাজী মুহম্মদের আরো কিছু পরিচয় তুলে ধরেন। ডক্টর হকের অভিমত,—'হাজী মুহম্মদ আমাদের একজন প্রাচীন কবি। তিনি শেখ পরাণ (১৫৬০-১৬২৫) ও সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮) সমসাময়িক তো বটেই, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী লোকও হইতে পারেন।'[১২২] তাঁর এই মন্তব্য অবশ্য অনুমান-ভিত্তিক। হাজী মুহম্মদ নিজেও তাঁর নিজের পরিচিতিমূলক কোনো অংশ তাঁর কাব্যে যোজনা করেন নি। ফলে হাজী সাহেবের জীবন ও কাব্যের গবেষণায় গবেষকগণকে পরোক্ষ প্রমাণ ও অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। ষোড়শ শতকের কবি শেখ পরাণ তাঁর 'নসিহতনামা' কাব্যে হাজী মুহম্মদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সেই উল্লেখের অংশটি হচ্ছে,

ছুবতনামার মধ্যে ঈমানে ছিফত।
রচিছেন্ত হাজী মোহাম্মদ ভাল মত।
তেকারণে এথা মুক্রি ন কৈলুঁ সমাপ্ত।
কিঞ্চিৎ কহিলুং বুঝিতে ইংগীত॥
সএক পরাণে কহে শুন গুণিগণ।
সভানের পদতলে করম নিবেদন॥

শেখ পরাণের ভাষা যে প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবাহী, উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। শেখ পরাণ তাঁর কাব্যে হাজী মুহম্মদের উল্লেখ করায় এরূপ অনুমান করা যায় যে হাজী সাহেব পরাণের

---

১২২. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৬৪

জাত সিফতে সেই নূর অনুপাম।
নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম॥
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা।
সেই নূর হোস্তে আল্লা সকল সৃজিলা॥
এক হোস্তে হইল দুই দুই হোস্তে সকল।
বীজ হোস্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোস্তে ফল॥

প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা শুধু সৃষ্টির নির্মাতাই নন, সৃষ্টির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িতও। স্রষ্টার এই সৃষ্টিসংলগ্নতার কারণেই তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি অমন সুন্দর ও রহস্যময়। সৃষ্টির অণুপরমাণুতে মহান স্রষ্টার করুণা, দয়া আর প্রীতির রেণু ছড়িয়ে আছে বলেই সৃষ্টির মাহাত্ম্য অশেষ ও অপরিমেয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে হাজী মুহম্মদ লিখেছেন,-

এক হোস্তে হৈল দুই, দুই হোস্তে সকল।
বীজ হোস্তে বৃক্ষ যেন, বৃক্ষ হোস্তে ফল॥
ফল বৃক্ষ বীজ এই তিন নাম হয়।
এক হয়ে তিন জন, তিনে এক হয়॥

কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা আড়াল থাকবেই। এই ব্যবধানের কারণেই সকল সৃষ্টি হচ্ছে অদৃশ্য এক করুণাময়ের তৈরি শিল্পকর্ম। সেজন্য স্রষ্টা আর সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লা আর বান্দা এক নন। কবি তাই বলেছেন,--

বীজ বৃক্ষ ফল হোস্তে কেহ ভিন্ন নয়।
তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন ন যায়॥
তেন মতে জানিহ যে আল্লাহ আর বন্দা।

ষোড়শ শতকের অন্য দুই কবি সৈয়দ সুলতান ও আবদুল হাকিমের কাব্যে যেমন তৎকালে 'দেশী ভাষা' ও 'হিন্দুয়ানি' অক্ষররূপে পরিচিত বাংলা ভাষার প্রতি সমকালীন মুসলিম সমাজের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি হাজী মুহম্মদের কাব্যেও সেই প্রতিবাদের সমর্থন আছে। যেমন,—

হিন্দুয়ানি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা॥
বাংলা অক্ষর পরে আল্লি মহাধন।
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ॥
যে আল্লি পীর সবে করিছে বাখান।
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোস্তে জ্ঞানের প্রমাণ॥
যেন তেন মতে সে জানৌক রাত্র দিন।
দেশি ভাষা দেখি মনে না করিও ঘিন॥

বাংলা ভাষার সপক্ষে কবির এই বিবৃতি মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ও মমতার বহিঃপ্রকাশ।[১২৭] একটি ধর্মান্ধ সমাজে বসবাস করেও কবি হাজী মুহম্মদ ছিলেন একজন অন্ধ সংস্কারমুক্ত মুসলিম, যিনি ধর্মীয় প্রাণতায় ছিলেন আসাধারণ ঋদ্ধ এক মহান পুরুষ।

---

১২৭. পূর্বোক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,' পৃ. ৯৩

অষ্টম অধ্যায়

নাথসাহিত্য

(খ্রিস্টীয় ১৬-১৭ শতক)

নাথপন্থী সাধকেরা একটা বিশেষ ধর্মকর্মের সঙ্গে যুক্ত। যোগসাধনাই সেই ধর্মের মূল প্রেরণা। এজন্য নাথপন্থী সাধকদের যোগী বলা হয়। নাথধর্মের সঙ্গে চর্যাপদের সহজপন্থী ধর্মমতের হয়তো কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু মিলটিও সেই পরিমাণে কম নয়। এ সম্পর্কে মণীন্দ্রমোহন বসুর মন্তব্য,—

> প্রকৃতপক্ষে এই সকল ধর্মমত একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বিশিষ্টতাসম্পন্ন হইয়াছে। নাথ অর্থে "সদ্‌গুরুনাথ," এবং গুরু বুঝাইতে এই শব্দটি চর্য্যাতেও ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা "ভক্তি ন পুচ্ছসি নাহ" (চর্য্যা ১৫)। এই গুরুপরম্পরায় প্রচারিত বিশিষ্ট মতবাদই নাথ-ধর্মেরও বিশেষত্ব। চর্য্যাতেও ধর্মার্থে গুরুকেই অনুসরণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে এই দুই মতবাদের বিভিন্নতা কোথায়?[১১৮]

তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু ধরা পড়ে। মণীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন,--

> চর্য্যাতে গুরুর উপদেশে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া লোকে চিত্তজয়ী হইয়া থাকে। কিন্তু নাথ সাহিত্যে (গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গান প্রভৃতি গ্রন্থে) মহাজ্ঞান-মন্ত্রবলে সাধক যমকে তাড়না করে, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে পারে। পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজরামরত্ব লাভ করা অপেক্ষা মন্ত্রবলে এইরূপ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হওয়াই নাথধর্মের বিশেষত্ব। এই জন্য নাথগণ পরবর্ত্তীকালে এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তথাপি অনেক প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যকেই তাহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।[১১৯]

দশম শতাব্দীতে সারা ভারতই নাথপন্থীদের বিচরণক্ষেত্র ছিলো। হাজার বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসেও নাথপন্থী যোগীদের সাধনভজনের কাহিনী শ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এদেশের ছড়াপাঁচালী, লোকগীতি ও কিছু কিছু আখ্যানকাব্যে নাথপন্থী যোগীদের ধর্মকর্ম ও আচার-আচরণের অনেক চিত্তাকর্ষক কাহিনীকে রূপদান করা হয়েছে। জনচিত্ত আকর্ষণকারী ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের গান এবং গোরক্ষবিজয়-কাহিনী এই নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই সব কাহিনী দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হলেও পরবর্তীকাল একই বিষয়ের ভিত্তিমূলে উৎপন্ন অনেক ছড়াগান উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মুখে মুখে প্রচলিত হয়। কাজেই এসব ছড়ায় প্রাচীন ভাষাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বৌদ্ধগান ও দোহার ভাবরূপের পরিচয় মেলে নাথসাহিত্যে। উভয় ধারার সাহিত্যেই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের উল্লেখ রয়েছে। এই সব সিদ্ধপুরুষ হচ্ছেন মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ, জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপা, গোরক্ষনাথ বা

---

১১৮. মণীন্দ্রমোহন বসু, 'চর্য্যাপদ' (কলিকাতা : কমলা বুক ডিপো, ১৯৫৯), ভূমিকা, পৃ. ১৩
১১৯. পূর্বোক্ত, 'চর্য্যাপদ', ঐ, পৃ. ১৩

গোরখনাথ এবং কানুপা বা কাহ্নপাদ। এঁদের সময় ও স্থানিক অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নন। রূপকাবদের ধ্যানে হোক, স্তানে হোক কিংবা কল্পনায়ই হোক, নাথগীতিকার সিদ্ধাচার্যগণ যোগসাধনায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়ে সেভাবেই নিজেদেবকে পরিচিত করেছেন। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রেব প্রভাবমুক্ত নাথগীতিকার বিষয় প্রাকৃত জনসাধারণের উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে মিশে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। প্রাকৃতমনে রস পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করেছে নাথযোগীদের ভোগবাসনাময় কাহিনী। একসময় এক শ্রেণীর অবধূত-সম্প্রদায় তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত বেশভূষায় আচ্ছাদিত হয়ে তাদের নিজস্ব যোগবিভূতির দ্বারা রংপুর কোচবিহার অঞ্চলে সিদ্ধাচার্যগণের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা প্রচারের প্রয়াস পায়। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকদের কাছে তাই নাথগীতিকার সমাদর লক্ষ্য করা যায়। এগুলোব লিখিত রূপ পরে পাওয়া যায়।

নাথসাহিত্য দুটি ভাগে বিভক্ত-- এক. মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়, দুই. ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান। ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানের মূল বিষয়টি হচ্ছে রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস এবং রাজমাতা মযনামতী ও তাঁব গুরু জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপার যোগসাধনার কথা। এ দুটি কাহিনীকে ঘিবে যোগী সিদ্ধাচার্যগণেব অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা জনগণের মুখে মুখে চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। সাধাবণ লোকের স্থূলচেতনায এ কাহিনীব চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলো গভীরভাবে প্রভাব সঞ্চাব করে। তাই এগুলোব জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীব সঙ্গেও এদের কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের মূলবিষয় শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক কামিনী-মোহগ্রস্ত গুবু মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথেব উদ্ধার। গোরক্ষনাথকে কেউ কেউ ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করেন। অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীব কোনো এক সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়। ডক্টব দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীব লোক।'[১৩০] গোবক্ষপন্থীরা মনে কবেন গোরক্ষনাথ পাঞ্জাবে আবির্ভূত হন, পরে বিহারেব গোরক্ষপুরে তাঁর অধিষ্ঠান হয়। তবে এসব বিষয়েব কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই। পববর্তীকালে গোরক্ষনাথকে নিযে নানা গালগল্প তৈরি হয।

দুই।। মীনচেতন/গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান

মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী।। এই চিত্তাকর্ষক কাহিনীটির শুরু সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে। শিব গৌরীকে যখন মহাজ্ঞান শোনান, তখন তার প্রভাবে গৌরী ঘুমিয়ে পড়েন। মৎস্যবেশী মীননাথ অলক্ষে এই মহাজ্ঞান শোনেন, কিন্তু দেবাদিদেবের কাছে তা গোপন থাকে না। তিনি অভিশাপ দেন মীননাথ সেই মহাজ্ঞান বিস্মৃত হবেন। যোগীর গুহ্যসাধনায় স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য গৌরী একদিন মোহিনীর বেশ ধারণ করেন। গোরক্ষনাথ ব্যতীত সবাই গৌবীর মোহজালে আটকে পড়েন। গোরক্ষনাথ শিশুভাবে গৌরীকে ভজন করেন। অন্যদিকে গোবক্ষ-গুবু মীননাথ কদলীপত্তনে গিযে সেখানকার নারীদেব

---

১৩০ পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৩৮

কুহকজালে আবদ্ধ হন। যাবতীয় সাধনতত্ত্ব ভুলে গিয়ে তিনি ইন্দ্রিয়-সেবায় নিজেকে ভাসিয়ে দেন। ললনারা তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে। কিন্তু গৌরী অসাধারণ মোহিনীবেশে সজ্জিত হয়েও গোরক্ষনাথকে প্রভাবিত করতে পারলেন না। গোরক্ষকে মাছি বানাতে গিয়ে দেবী নিজেই তাঁর কাছে মাছিরূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। শিবের অনুরোধে সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথ পরে গৌরীকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু মহাদেব ভুললেন না। তিনি কৌশলে এক তপস্বিনী রাজকন্যাকে গোরক্ষনাথের সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু কামবিজয়ী পুরুষ গোরক্ষনাথ শিশুভাবে স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ করেন। তবে স্ত্রী গোরক্ষের নির্দেশানুযায়ী তাঁর কৌপীন ধোয়া জল পান করে পুত্রবতী হন। পরবর্তী পর্যায়ে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধার। স্ত্রীপুত্র সংসার ত্যাগ করে গোরক্ষনাথ যোগসাধনায় বের হন। পথে কানুপার কাছে অবগত হন গুরু মীননাথ নারীর কুহকমোহে আবদ্ধ হয়ে আপন শক্তিসাধনা বিস্মৃত হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি কদলীতে ভোগবাসনায় কালযাপন করছেন। গোরক্ষনাথ তখন কদলীপত্তনে যান এবং কমলা ও মঙ্গলা নাম্নী দুই রমণীর মোহবন্ধন ছিন্ন করে রাজদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গুরুর চৈতন্য জাগানোর অভিপ্রায়ে মৃদঙ্গের শব্দ তোলেন। বাদ্য ও নৃত্যের ঝংকার তুলে শিষ্য গুরুকে মহাজ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেন; গুরুর তখন পূর্বস্মৃতি জাগে। তিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জগৎ ছেড়ে যোগসাধনার পথে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মীননাথ অতঃপর স্ত্রীকুলের মোহবন্ধন ছিন্ন করে গোরক্ষনাথের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

গোরক্ষবিজয় উপাখ্যানে এই যে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় গুরুশিষ্য দুজনের চরিত্র একই ধাতুতে গড়ে উঠলেও মীননাথ পার্থিব ভোগবাসনার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ গোরক্ষনাথ যদিও নিজের শক্তি ও কৌশলে মীননাথকে রমণীদের মোহজাল থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সন্ন্যাসের পথে ফিরিয়ে আনেন, কিন্তু বাস্তব তাতে দারুণভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় কাহিনীর যে রসহানি ঘটেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন রূপক ও হেঁয়ালির মাধ্যমে যে তত্ত্বরস এতে প্রকাশিত হয়েছে তাতে লোকজীবনের স্পর্শ থাকায় নীরস হওয়ার অপবাদ থেকে কাহিনীটি যদিও মুক্ত, কিন্তু হেঁয়ালির ভাষায় তত্ত্বকথার যে বিবরণ এই কাহিনীতে প্রদত্ত হয়েছে, তা দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। যেমন একটি উদাহরণ,—

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে।
বাসাঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥
ঝিম যাউক বরিয়া শীতলে যাউক মীন।
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্র গহীন॥

আর এক জায়গায় আছে,—

মহাতেজে কুড়ালেতে সমর্পিলা গুরু।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গরু॥

আসলে তত্ত্বকথা তাত্ত্বিকভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিদের বাধ্য হয়ে এই হেঁয়ালির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে বলে মনে হয়।

তবে একথাও ঠিক যে 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীর এই তত্ত্বপ্রাধান্য তার মানবিক রসের ধারাকে যে সব সময় ব্যাহত করেছে এমন নয়। নীতিভ্রষ্ট গুরুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের বাকবিতণ্ডা ও আচার-আচরণের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ দেখা যায়। নিয়তি-নির্ধারিত পথে গুরুশিষ্য উভয়ে দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েও পরস্পরের কার্যকলাপে নিজেদের মানবসন্তান রূপেই প্রকাশ করেছেন। উভয়ের নিয়ম-নিষ্ঠা-নীতিবোধের প্রতি দুর্বলতা, দায়িত্ব-পালনে একদিকে কঠোরতা অন্যদিকে শিথিলতা এ সব কিছুই দুজনকে অধ্যাত্ম-সংগ্রমরত দুই মানবাত্মার বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পরিচিত করেছে। গুরু মীননাথ সম্পর্কে শিষ্য গোরক্ষনাথের গভীর মমতার প্রকাশকে কবি বাহুল্যবর্জিত বাক্যে ফুটিয়ে তুলেছেন,—'বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায়।' মীননাথ অনন্য এক যোগী হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় আচার আচরণকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই ভোগলালসা ভরা ইন্দ্রিয়-পরিচর্যার জীবন ত্যাগ করে যখন পুনরায় তিনি সন্ন্যাসের পথে পা বাড়ান, তখন কদলীর ললনাদের ঘিরে মোহময় জগতের আকর্ষণ যেন তাঁর মন থেকে কেটেও কাটতে চায় না। কিন্তু কোনো এক নিয়তির অমোঘ বিধানে শেষপর্যন্ত সেই মোহময় জগতের অবসান ঘটে, বাস্তব জীবনের আসক্তির জাল ছিন্ন করে মীননাথ ও গোরক্ষনাথ দুই গুরুশিষ্য সাধনার উত্তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করেন। হতভাগিনী দুই রাণী মঙ্গলা ও কমলা প্রিয়বিচ্ছেদের অভিশাপ নিয়ে পড়ে থাকে কদলী নগরে।

গোরক্ষবিজয়ের কবি।। মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনীর দুটি অভিন্ন পুথি -- 'গোরক্ষবিজয়' বা 'গোর্খবিজয়' ও 'মীনচেতন'। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি রচিত 'গোরক্ষবিজয়ে'র সন্ধান পাওয়া যায়। তবে বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং তার অন্তর্গত গানগুলো মৈথিলীতে রচিত। বাংলায় গোরক্ষবিজয়ের তিনটি পুথি সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদন করেছেন শ্যামদাস সেন রচিত 'মীনচেতন'। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদন করেছেন শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত 'গোরক্ষবিজয়' এবং ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল-সম্পাদিত ভীমসেন-রচিত 'গোর্খবিজয়'। পণ্ডিতগণ সংশয় প্রকাশ করেন তিনটি পুথিই আসলে এক, কেননা পুথি তিনটির কাহিনীগত কোনো পার্থক্য নেই। সেই সূত্রে তিন কবিও হয়তো মূলে এক ও অভিন্ন ; অথবা কেউ কেউ গায়েন মাত্র। নলিনীকান্তের সম্পাদিত পুথির নাম 'মীনচেতন', এ পুথির দুই জায়গায় শ্যামদাসের ভণিতা থাকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন পুথিটি শ্যামদাসের লেখা। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়ে' কবীন্দ্রদাস, শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমদাস ও শ্যামদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। সাহিত্যবিশারদ অনুমান করেন শেখ ফয়জুল্লাহই পুথির রচয়িতা, বাকি তিনজন গায়েন মাত্র। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তা মনে করেন।[১৩১] 'গোরক্ষবিজয়ে'র আদিলেখক হিসেবে মনে করেও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এরূপ মন্তব্য করেন-'ফয়জুল্লাহকে আমরা "গোরক্ষ বিজয় বা মীনচেতন" পুস্তকের আদি লেখক বলিয়া মাল্য-চন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু 'আদি লেখক' অর্থে আমরা শুধু সঙ্কলয়িতা বুঝাইতে চাই।'[১৩২] পণ্ডিত ও গবেষকদের এরূপ সংশয় থাকবেই। কেননা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য প্রাচীন

১৩১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫
১৩২. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৩৮

বলেই এই সংশয় থাকাটা স্বাভাবিক। তাই পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে কোনো পণ্ডিত বা গবেষক এ বিষয়ে অভিমত দিতে পারেন না।

ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী।। ময়নামতীর জন্ম মেহেরকুলে। তিনি সেখানকার রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা। পরে ময়না বাংলাদেশের রাজা মানিকচন্দ্রের পাঁচ রাণীর অন্যতমা রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। একদিন রাজপুরীতে সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথের আগমন ঘটে। ময়না এই সিদ্ধাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে গুণবতী ময়নার সঙ্গে তাঁর সপত্নীদের ঝগড়া লেগেই থাকে। ফলে ময়না ফেরুসা গ্রামে নির্বাসিত হন। ইতিমধ্যে রাজার মন্ত্রীদের অত্যাচারে রাজ্যে অশান্তির ঝড় বয়। প্রজারা শিবের কাছে নালিশ করে। রাজা মানিকচাঁদ তখন পরলোকে। গঙ্গা একথা ময়নাকে জানায়। ময়না যমপুরীতে গিয়ে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিব মানিকচাঁদের প্রাণদান অসম্ভব বলেন, তবে ময়নাকে তিনি আশ্বস্ত করেন এই বলে যে সে পুত্রবতী হবে ; পুত্র তান্ত্রিক হাড়িপার শিষ্যত্ব পেয়ে মহাজ্ঞান লাভ করবেন। এদিকে হাড়িপা পূর্ব থেকেই ময়নার দীক্ষাগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য।

ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের জন্মকালে তাঁর সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যৎবাণী করা হয় যে উনিশ বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি মারা যাবেন। গোপীচন্দ্র বারো বছর বয়সকালে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হলে এই মৃত্যুযোগ খণ্ডন হবে। এদিকে গোপীচন্দ্র দ্বাদশ বর্ষে পৌঁছলে ময়না তাঁকে গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার শিষ্যত্ব নিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সন্ন্যাসী হতে বলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র দুই স্ত্রী অদুনা পদুনা ও শত নারীর দুরন্ত ভোগলিপ্সা ছেড়ে নিচজাতীয় সিদ্ধাযোগী হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হতে অস্বীকার করেন। তাছাড়া অদুনা পদুনাও স্বামীহারা হতে চায় না। গোপীচন্দ্র মাকে বলেন,

পাইসালে খাটে হাড়ি না করে সিনান।
তার ঠাঞি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান।।
আমি রাজা গোবিন্দাই সর্বলোক জানে।
কেমনে ধরিতে বল হাড়ির চরণে।।

ময়না পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানী হাড়িপার শক্তি ও সাধনা সম্পর্কে অবহিত করেন, এবং বলেন গোপীচন্দ্রের অদৃষ্টলিপিতে যে অকালমৃত্যুর ইঙ্গিত আছে তা কাটানোর জন্য তাঁর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করা অপরিহার্য। গোপী মা'র কাছে তাঁর পিতার মৃত্যুর কারণ জানতে চান। ময়না তখন বলেন, মানিকচাঁদকে তিনি মহাজ্ঞান দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামী হয়ে স্ত্রীকে গুরুর মর্যাদা দিতে তিনি চান নি, ফলে নিয়তি তাঁর প্রাণ হরণ করে। গোপীচন্দ্র তখন ময়নার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে হাড়িপার সঙ্গে তাঁর কুৎসিত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেন, -

হাড়ির খাইছেন গুয়া মা হাড়ির খাইছেন পান।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গিয়ান।।
হাড়ির গিয়ানে তোমার গিয়ানে জননী একস্তর করিয়া।
আমার পিতাকে মারছেন মা গরল বিষ খাওয়াইআ।।

বুদ্ধি পরামিশে আমাকে বনে পাঠাইয়া।
গুওয়া বিচি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া॥
হাটে গেছেন বাজারে গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই?

ময়না তখন দুঃখ করে বলেন হাড়িপা ও আমি দুজনেই গোরক্ষনাথের শিষ্য। গুরুভাইয়ের সঙ্গে গুরুবোনের অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারপর ময়না তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখান। তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হলেন না; যতুগৃহে প্রবেশ করলেন, সেখানেও তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। ময়না এভাবে নিজেব সতীত্ব প্রমাণ করলে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হন। মায়েব কাছে মহাজ্ঞান লাভ করে এক অপূর্ব দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হন তিনি। তাঁর মনে হয়,—

সংসার জলে বিম্ব সব মিছা ছায়া।
এ তিন ভুবনে দেখ আপনাব কায়া॥
ইস্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব মিছা কায়।
কাষ্ঠের পুতলা যেন বাদিয়া নাচায়॥

অদুনা পদুনা স্বামীকে বাধা দেয়, ব্রাহ্মণকে ঘুষ দেয় তাবা, নাপিতকে ধরে। কিন্তু গোপীচন্দ্র কৌপীন পরে, কানে কুণ্ডল আর হাতে শিঙা নিযে স্ত্রীদেব কাছে বিদায় চায়। রাণীদের সব চেষ্টা যখন বিফলে যায় তখন তারা স্বামীব সহযোগী হওযার প্রার্থনা জানায়। গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপা তখন ময়নামতীর ছেলে বাজা গোপীচন্দ্রের গুরু। হাড়িপা কামিনীকাঞ্চন সম্পর্কে সদা সতর্ক। তিনি শিষ্য গোপীচন্দ্রকে শ্বাসপ্রশ্বাস, ষটচক্র, যোগপদ্ম ইত্যাদি যোগাচারে শিক্ষা দেন। হাড়িপার প্রভাবে গোপীচন্দ্র স্ত্রীদের মাতৃ সম্বোধন করেন। অদুনা পদুনা তখন মনের দুঃখে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। হাড়িপা তাদের জীবন দান করে গোপীচন্দ্রকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

হাড়িপা অতঃপর গোপীচন্দ্রের পরীক্ষা শুরু কবেন। কাঁটাবন সৃষ্টি করে তিনি শিষ্যের দেহ ক্ষতবিক্ষত করেন। গহনবনে কাতব রাজা সূর্যের মুখ দেখতে চান, কিন্তু বন সবে গিযে সেখানে মরুভূমি সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বালুকণায় গোপীচন্দ্র যন্ত্রণাবিদ্ধ হন। এতসব পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে গুরুশিষ্য কলিঙ্গ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু তখনো গোপীচন্দ্রের পরীক্ষার বাকি থাকে। হাড়িপা তাঁকে হীরানটী নাম্নী এক বারাঙ্গনার বাড়িতে রাখেন। হীরার বাড়িতে গোপীচন্দ্র দাসত্বে নিযোজিত হন। গোপীচন্দ্র একদা যে তাঁব মায়ের চরিত্রে কলঙ্কআরোপ করেছিলেন সেজন্য তাঁকে গণিকার দাসত্ববৃত্ত করতে হয়। হীরা রাজাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু গোপীচন্দ্রের চরিত্র থাকে অম্লান। যোগেব পরীক্ষায় গোপীচন্দ্র উত্তীর্ণ হন। তখন দ্বাদশ বছর পর তিনি গুরু হাড়িপার সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে আসেন। যোগীর বেশধারী গোপীচন্দ্রকে রাণীরা চিনতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়। ময়নামতীও পুত্রমুখ সন্দর্শন করে সুখী হন। রাজবাড়িতে তখন আনন্দের বন্যা বয়।

গোপীচন্দ্রের গানের এই কাহিনী বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ভারতের নানা জাযগায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। অছাড়া মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির কাব্যের অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে গোপীচন্দ্রের গানের লৌকিক

রূপটি যুগ যুগ ধরে প্রবহমান হয়। প্রাকৃত-জনমনে দেবকল্পনার উদ্ভটরূপের সঙ্গে পারলৌকিক সংস্কারের একটা সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে ; গোপীচন্দ্রের গানে তার পরিচয় আছে, ফলে তা প্রাকৃত-জনগণের লোককাব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। গোপীচন্দ্রের গানের যে মানবিক আবেদন, তার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। ময়নামতী তাঁর সন্তানের মমতার ডোরে বাঁধা পড়ে গোপীচন্দ্রকে তাঁর সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার উপদেশ দেন। ময়নার এই আচরণে যে মানবীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে তা যথার্থই স্পর্শকাতর। পুত্রের বিশ্বাস উৎপাদনে একদিকে মাতার সতীত্বের পরীক্ষা, অন্যদিকে মাতার চরিত্রে অসতীত্বের কলঙ্ক আরোপ করায় পুত্র গোপীকে দ্বাদশ বছর নানা কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া--এসব বিষয়ের সঙ্গে লোকজীবনের সম্পর্ক নিবিড় না হলেও এগুলোতে মাতাপুত্রের স্নেহনিবিড় সম্পর্কের যে অবস্থান, তাতে মানবিক রূপটিই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মানবীয় সম্পর্কের সঙ্গে গোপীচন্দ্রের গানের বাস্তবতার সম্পর্কটিও অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। এক অর্ধসভ্য, ক্রূর, অমার্জিত সংস্কৃতি ও অসংবৃত ভোগলালসাময় জীবনবোধ নিয়ে গোপীচন্দ্রের গানের যে সমাজ-পরিমণ্ডল, তার বাস্তব-উপস্থাপনা কবিদের কৃতির পরিচায়ক। এই বাস্তব-সমাজের মধ্যস্থিত স্নেহপ্রেমের মধুময় দিকগুলোর প্রকাশের মধ্যে ফুটে উঠেছে মানব-চিত্তবৃত্তির দুর্বল অংশসমূহ। রাজার সন্ন্যাস যাত্রায় রাণী অদুনার উচ্ছ্বাসের মধ্যে তার অভিলাষ ও আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা ধরা পড়ে,

না যাইও না যাইও রাজা দূর দেশান্তর।
কার লাগিয়া বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর॥
বান্ধিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পরে কালি।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দশ গিরিশ মাও বইন রবে স্যামী লইবে কোড়ে।
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
জীয়ন জীবন ধন আমি কইন্যা সঙ্গে গেলে।
বাঁধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥
পিপাসার কালে দিমু পানি।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥

নারীহৃদয়ের করুণ আর্তি আর ব্যাকুলতার মধ্যে কবি যুগযুগান্তরের বিরহের সন্ধান দিয়েছেন। আসন্ন প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনাকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে,--

কতকাল রাখিব যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।
বাহির হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া॥
নেতে বান্ধিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কারো নয়॥
নেতে বান্ধিলে যৌবন চটকিয়া উঠে।
স্বামীকে পাইলে যৌবন কভু নাহি টুটে॥

সময়োপযোগী যৌবন-চরিতার্থতার প্রতি এই অনিবার্য মোহ জীবনবাস্তবতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

রাজা গোপীচন্দ্রের কথা॥ যোগীপাল, মহীপাল, ভোগীপাল ইত্যাদি গীতিকায় পালবংশীয় রাজগণের যে গাথা আছে, সেই সূত্র ধরে গোপীচন্দ্রের গানের প্রধান ব্যক্তি গোপীচন্দ্র সম্পর্কে কারো কারো ধারণা তিনি পালবংশীয় এক রাজা ছিলেন। গোরক্ষবিজয় আবিষ্কারের সূত্র ধরে কেউ কেউ তাঁকে চন্দ্রবংশীয় রাজা মনে করেন।[১৩৩] ইতিহাস বলে চন্দ্রবংশীয় রাজারা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। 'গোপীচন্দ্রের গানে' রাজা গোপীচন্দ্রের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে আভাস আছে,--'বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রিকুল হেলায় হারামু।' তবে এমন হওয়াটা অসম্ভব নয় যে ক্ষত্রিয়ত্ব বিখ্যাত রাজকুলের পরিচয় বহন করে বিধায় তখনকার সব রাজাই তার দাবি করতেন। গোপীচন্দ্রের পরিচয়ে 'বেনিয়াকুল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এটি গন্ধবণিককুলেরও আভাস দেয়। গানের এক জায়গায় বলা হয়েছে—'এক ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরি' অর্থাৎ এক ভাই 'তাম্বলি' বা এক শ্রেণীর বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। এ ধরনের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য থেকে রাজা গোপীচন্দ্রের জাতিগত অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না।

কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত নৃপতি রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলের শিলালিপিতে (১০২৪ খিঃ) উল্লিখিত বাংলাদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রাজেন্দ্রচোল রাজা গোবিন্দকে পরাভূত করেন। তবে ময়নামতীর গানে তার উল্টো কথা বলা হয়েছে।[১৩৪]

গোপীচন্দ্রের গানের পুথি ও কবি॥ সুপণ্ডিত জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করে নাথসাহিত্যের বিষয়টি বিশেষভাবে বিদ্বৎসমাজের গোচরে আনেন। গ্রিয়ার্সনের একনিষ্ঠ গবেষণায় গোপীচন্দ্রের গান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাইরে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। গোপীচন্দ্রের গানের একটি তালিকা,—

১. মাণিকচন্দ্র রাজার গান,—সংকলন করেছেন জর্জ আব্রাহার গ্রিয়ার্সন।

২. গোবিন্দচন্দের গীত,—ময়ূরভঞ্জের যোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত।

৩. ময়নামতীর গান,—রংপুর নীলফামারী অঞ্চলের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষভাবে উৎসাহী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

৪. রাজা গোবিন্দচন্দের গান,—সপ্তদশ শতকের কবি দুর্লভ মল্লিক কর্তৃক রচিত এবং শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত।

৫. ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের পাঁচালী,—চট্টগ্রামের ভবানী দাস কর্তৃক রচিত ও মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত।

---

১৩৩. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৩৫
১৩৪. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৩৪

৬. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস,—রংপুর সিন্দুরকুসুম গ্রামের অধিবাসী শুকুর মামুদ কর্তৃক রচিত ও উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলা থেকে সংগৃহীত।

উপর্যুক্ত পুথিগুলোর মধ্যে মূল বিষয়ের কোনো তারতম্য নেই, মূলে এক ও অভিন্ন। তবে আখ্যানবর্ণনা, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কারণ ঘটে থাকবে সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের কাব্যভাবনার ভিন্নতার দরুন। দুর্লভ মল্লিকের কাব্যে রাজমাতা ময়না যোগশাস্ত্রে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী ছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁর ভূমিকা উজ্জ্বল। ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গানে' ছড়াপাঁচালীর প্রভাব বেশি, তাতে বৈষ্ণবরস অনায়াসে নিসিক্ত হয়েছে। শুকুর মামুদের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' ময়নার চরিত্র-চিত্রণে কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ে। ময়না এখানে প্রখরা, কোথাও কোথাও স্বামীর প্রতি মোটেও অনুগত নন। গোরক্ষনাথকে এতে হীনভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। হাড়িপা এখানে সময় সময় ভাংখোর নেশাগ্রস্ত পুরুষ। তবে শুকুর মামুদের কাব্যে তত্ত্বারোপ সত্ত্বেও বিষয়ের স্বাদগ্রহণে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়' কাব্যে সাধনভজন বিষয়ক কতকগুলো ছড়া আছে। তাঁর আবিষ্কৃত পুথি 'যোগীর গান', 'যুগীকাচ', 'গোর্খসংহিতা' ও 'যোগচিন্তামণি'তে হঠযোগ, তন্ত্র ইত্যাদি নাথতত্ত্বঘটিত বিষয়কে রূপকের ছদ্মাবরণে প্রকাশ করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়

বাংলা মঙ্গলকাব্য
(খ্রিস্টীয় ১৪-১৭ শতক)

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিকথা

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কিছু ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যের সন্ধান মেলে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সব ধর্মমূলক আখ্যানকাব্যকে 'মঙ্গলকাব্য' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। 'মঙ্গল' অর্থাৎ কল্যাণ, এবং কল্যাণের সঙ্গে মাহাত্ম্যসূচক একটা সম্পর্ক যোজনা করে দেবদেবীদের মহিমা-কীর্তনের অভিপ্রায়ে রচিত হয়েছে বাংলা মঙ্গলকাব্য। আসলে দেবদেবীদের মহিমার প্রকাশ করা হয়েছে প্রধানত তাঁদের স্বেচ্ছাচারজনিত ভয়-ভীতির কারণে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে কিছু পাওয়ার অভিলাষে। এসব অভিপ্রায়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বিশেষ কোনো শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিংবা দেবতার গুণকীর্তন করে এই ধারার কাব্যের সূচনা করেন।

তবে মঙ্গলকাব্যে সাধারণত হিন্দুপুরাণনির্ভর কোনো কাহিনীর আশ্রয়ে বিশেষত মানবভাগ্যের কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনীর নায়ক একজন স্বর্গচ্যুত ব্যক্তি। তিনি অশেষ মানবিক গুণের অধিকারী। এই দিক থেকে একথা মনে করার কারণ আছে যে মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের যে আধিপত্য তাতে পরোক্ষত স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব সঞ্চার করে, কিন্তু এই হীন কূটকৌশলগত দৈবপ্রয়োগ দেবতার অধিকার বাড়ায় না, বরং মানুষের অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতির মধ্যেই দেবসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই জয়গান। সার্বজনীন মানবতার বিকাশ-সাধনের জন্যই, একথা বলা যায়, মঙ্গলকাব্যের কাব্যমূল্যও অটুট। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংকট-সমস্যাজনিত পর্যায়ের মুখোমুখি হয়। এরূপ অবস্থায় বাংলার সামাজিক জীবনে লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় ঘটেছে, তার ইতিহাস লক্ষ্য করি বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। তবে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির স্তরগুলো প্রধানত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত।। বাংলাদেশের যুগসঙ্কট মোচনের অভিপ্রায়ে মঙ্গলকাব্যের কবিরা স্বর্গের দেবদেবীদের লৌকিকরূপে মর্ত্যভূমে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। মঙ্গলকাব্যে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সমস্যার নির্মাতা ও সমাধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীহিসেবে মনসামঙ্গলের মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীকে কল্পনা করা হয়েছে। পুরুষ-দেবতা হিসেবে ধর্মমঙ্গলের ধর্ম ও শিবমঙ্গলের শিবের নাম উল্লেখ করা যায়। যেহেতু এইসব দেবদেবীকে কল্পনা করা হয়েছে প্রধানত দেশের জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যার ত্রাণকারী হিসেবে, সেজন্য তাঁরা সাধারণের কাছ থেকে একচেটে ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হন। কবিদের কল্পনায় লালিত এঁরাই তখন সমস্যাপীড়িত জনসাধারণের একমাত্র সান্ত্বনা ; এঁদের আশ্রয়ে জনগণ অনেক দুঃখ-বেদনার সমাধান সন্ধান করে। বিনিময়ে তাঁরা ভক্তের কাছ থেকে অক্লেশে পূজাস্বরূপ উৎকোচ গ্রহণ করেন।

এসব দেবদেবীকে মর্ত্যভূমে প্রতিষ্ঠিত করার আরো কিছু কারণ আছে। এক সময় ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের অধিকার প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের এই ব্যাপক প্রভাব থেকে বৈদিক হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য যখন সংস্কারের আবশ্যক হয়, তখন স্বর্গের দেবদেবীদের লৌকিক রূপ দিয়ে মর্ত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা কবিদের মধ্যে দানা বাঁধে। সংস্কৃত পুরাণগুলো রচিত হয়েছিলো এঁদের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। এক একটি পুরাণ এক একটি দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন করে প্রণীত হয়। এবং এই পুরাণের প্রেরণা থেকেই বাংলায় বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্যের রচনা শুরু হয়।

কিন্তু স্বভাব ও পরিবেশের তাড়নায়ই হযতো পৌরাণিক আদর্শ রক্ষার চেয়ে লৌকিক আদর্শ রক্ষার প্রতি বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিগণের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সেন রাজগণের পতনের পর এদেশে মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। তার ফলে শুরুতে মুসলিম ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধ বাধে। মুসলিম রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলোর বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে বহিরাগত একটি নতুন ধর্মের সঙ্গে আপোস করতে না পেরে দেশের জনগণ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে থাকে। তখন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য বাঙালি কবিরা স্বর্গের দেবদেবীগণকে মর্ত্যভূমে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ঐহিক জগতের যাবতীয় সুখসুবিধা ও দুঃখদুর্দশা স্বর্গের দেবদেবীগণের ইচ্ছাধীন মনে করে কবিগণ ধর্ম ও সমাজের সঙ্কটময় মুহূর্তে এদেশের বিপন্ন জনগণকে দেবদেবীদের পরাক্রমের কাছে আশ্রয়লাভের উপদেশ দেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে এত সব মানসিক আয়োজন তার আসল কথা হলো প্রবল মুসলিম রাজশক্তির দ্বারা শাসিত দুর্বল হিন্দুসমাজ আত্মশক্তিতে আস্থা হারিয়ে অবশেষে নিঃসহায়ভাবে তখন দৈবনির্ভর হয়ে পড়ে।

তবে মুসলিম রাজশক্তি সম্পর্কে স্থানীয় জনমনে যে ভীতি ও আতঙ্ক, তার সম্বন্ধ যোজনা হয় বাইরের দিক থেকে ; কিন্তু ভেতরের দিক থেকে যে অভিঘাত, তার প্রকাশ ঘটে ব্যাধি ও মহামারী সম্পর্কে জনসাধারণের ভয়-ভাবনা এবং হিংস্র জীবজন্তুর কবল থেকে উদ্ধারলাভের প্রার্থনার মাধ্যমে। এক সময় কলেরা ও বসন্তের নির্মম ছোবলে পল্লীবাংলার আক্রান্ত অঞ্চলগুলো মৃত্যুজনিত কারণে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়তো। এই দুই নারীশক্তিকে যথাক্রমে ওলাবিবি ও শীতলাদেবী কল্পনা করে তাদের দুষ্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভীতকম্পিত জনসাধারণ পূজাপ্রথার মাধ্যমে তাঁদেরকে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এঁদের গাথা রচনার প্রয়াসও একই কারণে হয়।

এই পরিস্থিতিতে এক একটি ধর্মসম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। এসব ধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন কবি বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছেন বলে জনসাধারণের কাছে দাবি করেন। তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় সংঘাতের বাইরে জনগণের এই দৈবনির্ভরতা থেকে এরূপ মনে করা যায় যে বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে যে দেববন্দনা, তার মূলে কাজ করেছে বাঙালির মনোজগতে আন্দোলিত প্রেম আর ভক্তি

নয়, বরং তার বিপরীত ভয় আর ভীতি। এবং এই ভয় আর ভীতির দেবতা ওলা, শীতলা, মনসা প্রমুখের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণও আসলে তাঁদের সহচর রোগবালাই ও সর্পদংশন-রূপ বিপদ-আপদ থেকে সাধারণের পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়-সন্ধান।

দুই।। মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক বিবেচনা ও সাহিত্যিক আবির্ভাবের দিক থেকে মনসামঙ্গলকেই আমরা পূর্ববর্তী মনে করতে পারি। তবে রামায়ণ কিংবা মহাভারতের কোথাও মনসার উল্লেখ নেই। দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার উল্লেখ থাকলেও এ দুটি আসলে অর্বাচীন উপপুরাণ মাত্র। দেবী ভাগবতে মনসার নাম জগৎগৌরী, নাগেশ্বরী, বিষহরি ও সিদ্ধাযোগিনী। তবে মনসামঙ্গলের ধারাটিকে পুরাণকাহিনীর সঙ্গেই তুলনা করা যায়। এই কাব্যে যেসব উপকাহিনীর সমন্বয় ঘটেছে সেগুলো হলো লখিন্দর-বেহুলার মূল কাহিনীর পাশাপাশি বিরাজমান দেবখণ্ডে বর্ণিত শিব-পার্বতীর বিবাহ, তাঁদের সংসার-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘাতের চিত্র, মনসার জন্মবৃত্তান্ত, পার্বতীর সঙ্গে তার বিরোধের চিত্র, মনসার স্বজনবর্জিত নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাময় আলেখ্য এবং হয়তো নৈরাশ্য ও নৈঃসঙ্গ থেকে উদ্ভূত এক ধরনের চিত্তবৈকল্যের কারণে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পূজাগ্রহণের প্রতি তাঁর অদম্য পিপাসা ; নরখণ্ডে বর্ণিত চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার প্রতিযোগিতা, চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা ও ধ্বংসের চিত্র, বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ ও বাসরঘরে কালনাগিনীর ছোবলে লখিন্দরের মৃত্যুর দৃশ্য, বেহুলার কঠোর তপস্যা ও ভক্তি-সাধনায় স্বামীর জীবন ফিরে পাওয়ার চিত্র- এইসব কাহিনীর বর্ণনায় পুরাণকাহিনীর স্বাদ যোগানো কবিদের যতটুকু প্রয়াস, তার চেয়ে বাস্তবরস পরিবেশনের প্রতি তাঁদের বেশি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তির কারণ খুব সহজেই নির্ণয় করা যায়। তৎকালীন পূর্ববাংলা বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, খালবিল ও নদীনালায় পরিপূর্ণ ছিলো। প্রকৃতির এই অনুপম রাজ্য কালনাগিনীদের আবাসভূমি বলা চলে। অথচ জীবিকার তাগিদে পূর্ববঙ্গবাসীদের তখন বাতেবিবাতে যাতায়াত করা অপরিহার্য ছিলো। একদিকে জীবিকার তাড়না, অন্যদিকে জীবনধারণের তাগিদে নানাদিকে ছুটাছুটির প্রেরণা ও তার অনিবার্যতা - এই সব দিক সামলানোর কারণে সর্পদেবী মনসার পূজাতর্পণ করাকে তারা আবশ্যকীয় মনে করতো। সমাজের এই প্রেক্ষিতেই রচিত হয় মনসার ভাসান ও বেহুলা-লখিন্দরের গান।

মনসার কাহিনী।। মনসামঙ্গলের আর এক নাম পদ্মাপুরাণ। তবে এই কাব্যের দেবী মনসা আসলে অর্বাচীন দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক নারী। অর্বাচীন বলেই সম্ভবত মনসার কাহিনীটি রুচির পরিচয়ে পরিচ্ছন্ন নয়। মনসার জন্মবৃত্তান্তটিই আসলে কামুক মহাদেবের যৌন লালসার উৎপন্ন ফসল। ধ্বংসের দেবতা মহাদেবের উৎকট যৌনলালসার চিত্রায়ণে মনসার কবিরাও বেশ উৎসাহ বোধ করেছেন। ষোড়শী সুন্দরী মনসাকে ঝিলের পাড়ে দেখে জন্মদাতা মহাদেবই একদা বেসামাল হয়ে পড়েন। দেবাদিদেবের এই চিত্রোদ্ঘাটন সরস কাব্যকলার নিদর্শন হলেও হিন্দুপুরাণের বিকৃত রুচির পরিচয় তাতে আচ্ছন্ন থাকে না।

মহাদেবের ঘরে একদা ভরাযৌবনা পদ্মা বা মনসার আবির্ভাব ঘটে। মহাদেবের চরিত্র সম্পর্কে তখন তাঁর স্ত্রী দেবী-ভগবতীর সন্দেহ জন্মে। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে মনসাকে প্রহার করেন। মনসা তখন সর্পমূর্তি ধারণ করে দেবীকে দংশন করেন ; দেবী প্রাণ হারান। অতঃপর মহাদেবের অনুরোধে মনসা ভগবতীর প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর নারদ মুনির ঘটকালীতে জরৎকারের সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মনসার বিবাদ বাধে। ফলে জরৎকারও একদিন সর্পদংশনে প্রাণ হারান। জরৎকার শিবের বদৌলতে প্রাণ ফিরে পান। এ ধরনের অনাসৃষ্টির ভয়ে শিব মনসাকে বিসর্জন দেন। নির্বাসিতা মনসা দৈবনির্ভরতার কথা চিন্তা করেন। আসলে এখান থেকেই মনসার পালার আরম্ভ।

প্রতিমা-পূজা বিরোধী হাসান-হোসেন দলন মনসার প্রথম (অপ?) কীর্তি। হোসেনের শ্যালক কাজী পদ্মার ঘট ভেঙে ফেললে উগ্রতেজা মনসা জোলাপল্লীতে তাঁর বাহন সর্প প্রেরণ করেন। সাপের অত্যাচারে জোলাপল্লীতে ত্রাহি রব ওঠে। এই অবস্থায় নারদ মুনির উপদেশে কাজী মনসার পূজা দিলে সাপের অত্যাচার বন্ধ হয়। এরপর চন্দ্রধর বণিকের পারিবারিক জীবনে পূজা প্রচলনের জন্য চন্দ্রধর বা চাঁদবেনের পূজা আদায় আবশ্যক হয়। কিন্তু মনসা-বিরোধী চাঁদ কিছুতেই চ্যাংমুড়ির পূজা দেবেন না। মনসার ক্রোধানলে তখন চাঁদের ছয়পুত্র একে একে প্রাণ হারায়। চাঁদ বাণিজ্যগমন করলে তাঁর 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়। পরে চাঁদের স্ত্রী সনকার গর্ভে জন্ম নেয় লখিন্দর। উজানী নগরে জন্মগ্রহণ করে লখিন্দরের ভাবী বধূ বেহুলা। কিন্তু চাঁদের কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও বিয়ের বাসররাতে কালনাগের দংশনে লখিন্দর প্রাণ হারায়। তখন স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলা যমপুরীর উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসায়। নেতা ধোবানীর সহায়তায় বেহুলা স্বর্গে পৌঁছে। স্বর্গে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের সন্তুষ্ট করে। চাঁদবেনে মনসার পূজা দেবেন, এই শর্তে বেহুলা তার স্বামী লখিন্দর ও চাঁদের ছয়পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। সতীলক্ষ্মী বেহুলার পানে তাকিয়ে চাঁদ মনসার পূজা দিলে পৃথিবীতে এই ক্রূর দেবীর পূজা প্রচলিত হয়।

মনসার কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন॥ মনসার কাহিনী জুড়ে অবাস্তব ও অসম্ভব কবি-কল্পনার আধিপত্য থাকায় এর কাব্যমূল্য কখনো কখনো উঁচুমান দাবি করে না। তবে মনসামঙ্গলে অঙ্কিত চাঁদ সদাগরের অনমনীয় পৌরুষদীপ্ত চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের সকল পাঠক ও ইতিহাসজ্ঞের প্রশংসা অর্জন করেছে। শেষ পর্যন্ত বেহুলার সোনার সংসারটি রক্ষা করতে গিয়ে চাঁদকে যে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে 'চ্যাংমুড়ি'র পূজা প্রবর্তনে অবনত হতে হলো, এই বিষয়টি মর্মান্তিক। চরিত্রগত দিক থেকে মনসার দেবদেবীগণ উন্নত মহিমা লাভ করার বদলে তাঁদের কর্মকাণ্ডের কারণেই স্বার্থপররূপে চিত্রিত হয়েছেন। হয়তো কবিদের অজান্তেই তাঁরা দাপট দেখাতে গিয়ে আরো বেশি ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছেন ; তাতে তাঁদের দেবত্বও খুব মহিমা লাভ করে নি। মনসার চরিত্র তো হিংস্রতার সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত। স্বার্থের খাতিরে এই সর্পদেবীকে যে নিষ্ঠুর হতে হয়েছে তা যে দেবসুলভ নয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনসার জন্মবৃত্তান্তে অশ্লীলতার যে প্রকাশ, তাও কোনো উঁচু

কাব্যভাবনার পরিচয় বহন করে না। তবে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতিব্রত্যের উপাখ্যানটি বেশ আকর্ষণীয়। লোকসাহিত্যের বিষয়গত অবস্থানের সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য যোজনা করাও সম্ভব। এই দিক থেকে মনসার উপাখ্যানকে প্রাকৃতজনের কাব্য হিসেবেও শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

মনসামঙ্গল কাব্যে দৈবলাঞ্ছিত মানবাত্মার যে করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, ট্র্যাজেডির চমৎকার প্রকাশ হিসেবে এই অংশের কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। চাঁদ সদাগরের ভাগ্যবির্যয়ের কাহিনীটি যথেষ্ট সংবেদ্য ও মর্মান্তিক। সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার, বেহুলা-লখিন্দরের দাম্পত্যজীবনের নিষ্ঠুর পরিণতি, শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী মনসার বেদীমূলে চাঁদের দেবনিরপেক্ষ উদ্যমের অবমাননা—এসব বিষয়ের মূলে প্রতিহিংসাপরায়ণা মনসার যে ক্রুর ভূমিকা— তার রূপায়ণে মনসার কবিদের কাব্যভাবনা প্রশংসার দাবি করে।

মনসামঙ্গলের কবি।। বিভিন্ন সময়ে অনেক কবিই মনসামঙ্গল লিখেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের উল্লেখে মোট ৬২ জন।[১৩৫] এঁরা সবাই যে কবিখ্যাতিতে ব্যতিক্রমী ছিলেন এমন নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাব্যভাবনায় স্মরণীয়—এ রকম কয়েকজন কবি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

কানা হরিদত্ত।। মনসামঙ্গলের আদিকবি হিসেবে কানা হরিদত্তের নাম পাওয়া যায়। হরিদত্তের কাব্যভাবনা সম্পর্কে মনসামঙ্গলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি বিজয়গুপ্ত কিছু অশোভন মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য হয়তো বিদ্বেষপ্রসূত। এই বিদ্বেষের তাৎপর্য উপলব্ধি করে এরূপ ধারণা হয় যে, পূর্বসুরি কবি হিসেবে হরিদত্ত সম্পর্কে বিজয়গুপ্তের কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিলো না। বিজয়গুপ্তের মন্তব্য এরকম, —

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাহিতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেয় কেবল মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে কানা হরিদত্ত পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন ; এবং তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের কবি।[১৩৬] পূর্ববঙ্গ জলা, ডোবা ও নদীনালায় ভর্তি বলে এখানে সাপের উপদ্রপ বেশি। সেজন্য সর্পদেবী মনসার গীতের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গে হওয়াই স্বাভাবিক। কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রাচীন পুথি থেকে সংগ্রহ করে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত

১৩৫. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ২৬৩
১৩৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯

মহাদেবের ঘরে একদা ভরাযৌবনা পদ্মা বা মনসার আবির্ভাব ঘটে। মহাদেবের চরিত্র সম্পর্কে তখন তাঁর স্ত্রী দেবী-ভগবতীর সন্দেহ জন্মে। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে মনসাকে প্রহার করেন। মনসা তখন সর্পমূর্তি ধারণ করে দেবীকে দংশন করেন ; দেবী প্রাণ হারান। অতঃপর মহাদেবের অনুরোধে মনসা ভগবতীর প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর নারদ মুনির ঘটকালীতে জরৎকারের সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মনসার বিবাদ বাধে। ফলে জরৎকারও একদিন সর্পদংশনে প্রাণ হারান। জরৎকার শিবের বদৌলতে প্রাণ ফিরে পান। এ ধরনের অনাসৃষ্টির ভয়ে শিব মনসাকে বিসর্জন দেন। নির্বাসিতা মনসা দৈবনির্ভরতার কথা চিন্তা করেন। আসলে এখান থেকেই মনসার পালার আরম্ভ।

প্রতিমা-পূজা বিরোধী হাসান-হোসেন দলন মনসার প্রথম (অপ?) কীর্তি। হোসেনের শ্যালক কাজী পদ্মার ঘট ভেঙে ফেললে উগ্রতেজা মনসা জোলাপল্লীতে তাঁর বাহন সর্প প্রেরণ করেন। সাপের অত্যাচারে জোলাপল্লীতে ত্রাহি রব ওঠে। এই অবস্থায় নারদ মুনির উপদেশে কাজী মনসার পূজা দিলে সাপের অত্যাচার বন্ধ হয়। এরপর চন্দ্রধর বণিকের পারিবারিক জীবনে পূজা প্রচলনের জন্য চন্দ্রধর বা চাঁদবেনের পূজা আদায় আবশ্যক হয়। কিন্তু মনসা-বিরোধী চাঁদ কিছুতেই চ্যাংমুড়ির পূজা দেবেন না। মনসার ক্রোধানলে তখন চাঁদের ছয়পুত্র একে একে প্রাণ হারায়। চাঁদ বাণিজ্যগমন করলে তাঁর 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়। পরে চাঁদের স্ত্রী সনকার গর্ভে জন্ম নেয় লখিন্দর। উজানী নগরে জন্মগ্রহণ করে লখিন্দরের ভাবী বধূ বেহুলা। কিন্তু চাঁদের কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও বিয়ের বাসররাতে কালনাগের দংশনে লখিন্দর প্রাণ হারায়। তখন স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলা যমপুরীর উদ্দেশ্যে ভেলা ভাসায়। নেতা ধোবানীর সহায়তায় বেহুলা স্বর্গে পৌঁছে। স্বর্গে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের সন্তুষ্ট করে। চাঁদবেনে মনসার পূজা দেবেন, এই শর্তে বেহুলা তার স্বামী লখিন্দর ও চাঁদের ছয়পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে আনে। সতীলক্ষ্মী বেহুলার পানে তাকিয়ে চাঁদ মনসার পূজা দিলে পৃথিবীতে এই ক্রূর দেবীর পূজা প্রচলিত হয়।

মনসার কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন।। মনসার কাহিনী জুড়ে অবাস্তব ও অসম্ভব কবি-কল্পনার আধিপত্য থাকায় এর কাব্যমূল্য কখনো কখনো উঁচুমান দাবি করে না। তবে মনসামঙ্গলে অঙ্কিত চাঁদ সদাগরের অনমনীয় পৌরুষদীপ্ত চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের সকল পাঠক ও ইতিহাসজ্ঞের প্রশংসা অর্জন করেছে। শেষ পর্যন্ত বেহুলার সোনার সংসারটি রক্ষা করতে গিয়ে চাঁদকে যে তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীতে 'চ্যাংমুড়ি'র পূজা প্রবর্তনে অবনত হতে হলো, এই বিষয়টি মর্মান্তিক। চরিত্রগত দিক থেকে মনসার দেবদেবীগণ উন্নত মহিমা লাভ করার বদলে তাঁদের কর্মকাণ্ডের কারণেই স্বার্থপররূপে চিত্রিত হয়েছেন। হয়তো কবিদের অজান্তেই তাঁরা দাপট দেখাতে গিয়ে আরো বেশি ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়েছেন ; তাতে তাঁদের দেবত্বও খুব মহিমা লাভ করে নি। মনসার চরিত্র তো হিংস্রতার সঙ্গেই বেশি সম্পৃক্ত। স্বার্থের খাতিরে এই সর্পদেবীকে যে নিষ্ঠুর হতে হয়েছে তা যে দেবসুলভ নয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনসার জন্মবৃত্তান্তে অশ্লীলতার যে প্রকাশ, তাও কোনো উঁচু

কাব্যভাবনার পরিচয় বহন করে না। তবে বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতিব্রত্যের উপাখ্যানটি বেশ আকর্ষণীয়। লোকসাহিত্যেব বিষয়গত অবস্থানের সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য যোজনা কবাও সম্ভব। এই দিক থেকে মনসাব উপাখ্যানকে প্রাকৃতজনের কাব্য হিসেবেও শ্রেণীবদ্ধ কবা যায়।

মনসামঙ্গল কাব্যে দৈবলাঞ্ছিত মানবাত্মার যে করুণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, ট্র্যাজেডিব চমৎকার প্রকাশ হিসেবে এই অংশের কাব্যমূল্য অস্বীকাব করা যায় না। চাঁদ সদাগবের ভাগ্যবির্যযের কাহিনীটি যথেষ্ট সংবেদ্য ও মর্মান্তিক। সনকার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার, বেহুলা-লখিন্দরের দাম্পত্যজীবনেব নিষ্ঠুর পরিণতি, শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারী মনসার বেদীমূলে চাঁদের দেবনিবপেক্ষ উদ্যমের অবমাননা—এসব বিষয়েব মূলে প্রতিহিংসাপরায়ণা মনসার যে ক্রুর ভূমিকা—তার রূপাযণে মনসার কবিদেব কাব্যভাবনা প্রশংসার দাবি করে।

মনসামঙ্গলের কবি॥ বিভিন্ন সময়ে অনেক কবিই মনসামঙ্গল লিখেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের উল্লেখে মোট ৬২ জন।[১৩৫] এঁবা সবাই যে কবিখ্যাতিতে ব্যতিক্রমী ছিলেন এমন নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাব্যভাবনায় স্মরণীয়—এ রকম কয়েকজন কবি সম্পর্কে এখানে আলোচনা কবা হলো।

কানা হরিদত্ত॥ মনসামঙ্গলেব আদিকবি হিসেবে কানা হরিদত্তেব নাম পাওয়া যায়। হবিদত্তেব কাব্যভাবনা সম্পর্কে মনসামঙ্গলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি বিজয়গুপ্ত কিছু অশোভন মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য হযতো বিদ্বেষপ্রসূত। এই বিদ্বেষেব তাৎপর্য উপলব্ধি কবে এরূপ ধাবণা হয যে, পূর্বসুরি কবিহিসেবে হরিদত্ত সম্পর্কে বিজয়গুপ্তেব কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিলো না। বিজয়গুপ্তেব মন্তব্য এরকম, –

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোর ছলে॥
কথাব সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বব।
এক গাহিতে আব গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেবল মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোব উপজে বেতাল॥

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহব মতে কানা হরিদত্ত পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন ; এবং তিনি খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকেব গোড়াব দিকের কবি।[১৩৬] পূর্ববঙ্গ জলা, ডোবা ও নদীনালায় ভর্তি বলে এখানে সাপেব উপদ্রপ বেশি। সেজন্য সর্পদেবী মনসার গীতের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গে হওয়াই স্বাভাবিক। কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত একটি পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রাচীন পুথি থেকে সংগ্রহ করে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত

১৩৫. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ২৬৩
১৩৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯

করেছেন।[১৩৭] এছাড়া কানা হরিদত্তের ভণিতাসহ আর একটি পদ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে' উদ্ধৃত করেছেন।[১৩৮] এই পদটিতে কবির কাব্যরূপায়ণ উন্নত মানের নয়। যেমন,—

ধূপ ধরে কেহ স্তব পঠে রে
ঘৃতের প্রদীপ সুললিত।
বিষাণের বাদ্য মনসা হরিষ রে
সম্মুখে গায়েন গায় গীত॥
চারি চতুর্বেদ নিশি জাগরণ করে
পূজা হইলে ছাগ বলিদান।
কবি কহে হরিদত্ত যে জ্ঞানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান॥

অথচ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উদ্ধৃত পদটিতে কাব্যভাবনার পরিচয় আছে। যেমন,—

দুই হস্তের শঙ্খ হৈল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগে শোভে সুন্দর কিঙ্কিনী।
সখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।
কজ্জলিয়া নাগে কজ্জল শোভে ভাল॥
নীল নাগে দেবী বান্ধিল কেশপাশ।
অঞ্জনিয়া নাগে করে অঞ্জন বিলাস॥
বাসুকি তক্ষক দুই মুকুট উজ্জ্বল।
এলাপত্র নাগে করিল তোড়ল মল॥

পদটির ভাষা তেমন প্রাচীন নয়। ফলে তা হরিদত্তের রচিত কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বিজয়গুপ্ত॥ মনসামঙ্গলের কবি-পরম্পরা অনুযায়ী কানা হরিদত্তের পরেই বিজয়গুপ্তের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে বিজয়গুপ্তের ভণিতায় একটি অখণ্ড পুথি কোথাও পাওয়া যায় নি। তাঁর পুথিতে কর্ণপুর, বর্ধমান দাস, চন্দ্রপতি, হরিদত্ত, পুরুষোত্তম, জানকীনাথ, দ্বিজ কমলনয়ন ইত্যাদি কবির ভণিতা পাওয়া যায়। সেজন্য বিজয়গুপ্তের কাব্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহের কারণ আছে। তথাপি তথ্য যা আছে, তার উপর ভিত্তি করেই তাঁকে বিচার করা হয়।

বিজয়গুপ্ত বাখরগঞ্জের গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিনী।

বিজয়গুপ্ত তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা হলো,—

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥

---

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮
১৩৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩১০

এতে কাব্যের রচনাকাল ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কবি সুলতান হুসেন শাহের উল্লেখ করেছেন। হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাই কবির কাব্যরচনার কালনির্দেশক উক্তি ও হুসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এজন্য ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য কবির কালনির্দেশক উক্তিটিতে শূন্য স্থানে শশী যুক্ত করে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ বলে মত পোষণ করেছেন।[১৩৯] অর্থাৎ 'ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক' স্থলে হবে 'ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক'। তাহলে বিজয়গুপ্তের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বিজয়গুপ্তের পুথির নাম 'পদ্মাপুরাণ'। কিন্তু এ পুথি কোনো পুরাণ-কাহিনীর অনুবাদ নয়, তবে পুরাণের স্বাদ তাতে আছে। বিজয়গুপ্তের কাব্যে সমাজ-সম্পর্কের যেমন পরিচয় আছে, তেমনি তা শিল্পরসে উপাদেয়। কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত চরিত্রসমূহ ভাবৈশ্বর্যে গৌরবান্বিত নয়। তিনি চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে পারেন নি। চাঁদ নির্দ্বিধায় মনসার হিংস্রতার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাতে তাঁর চারিত্র্য-মাহাত্ম্য দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। তবে একথা ঠিক যে Folk Poem বা প্রাকৃতজনের কাব্য হিসেবে বিজয়গুপ্তের কাব্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে তা রুচির পরিচয়ে খুব উন্নত নয়। সর্পাঘাতে নিহত জোলার জন্য তার পত্নীর বিলাপ-প্রসঙ্গে কাহিনীর একটি অংশ,—

আরে আরে আরে জোলা, উঠি দেখ মাউগ-পোলা,
আচম্বিতে তোমারে হইল কি।
এইখানে বিছানায় ছিলা, নানা সুখ আরো পাইলা,
কোছোর কাড়িয়া খাইলা পান॥

বিজয়গুপ্ত অশ্লীলতাকে লুকাতে পারেন নি। তার খোলামেলা প্রকাশ দেখা যায় জোলা-পত্নীর বিলাপে। এই প্রসঙ্গের আরো কিছু অংশ,—

মোর দুঃখের ওর নাই, নিকা বসি যার ঠাঁই,
মাসেক না থাকি তার ঘরে।
কত দুঃখ সব গায়, দশ দিন নাহি যায়,
এই মাসে তিন নিকা মোরে॥
এই দুঃখে আমি কাঁদি সতরটা করি যদি,
এত আদর নাহি কার হাতে।
আসিনু তোমার ঘরে, খোদায় বঞ্চিল মোরে,
তোমা হারাইলাম আচম্বিতে॥

তবে তৎকালীন নিত্য ব্যবহার্য বিষয়ের বর্ণনায় বিজয়গুপ্তের বাস্তব-প্রিয়তার পরিচয়টি বেশ উজ্জ্বল। যেমন,—

হাটে যাইতে কহি ঝাটে, লড় দিয়া যাইত হাটে,
বেশাতি আনিত নানা ভাইতে।

১৩৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' (কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, পরিবর্ধিত ৫ম সং. ১৯৭০), পৃ. ৩২৪-৩২৫

শৌল মাগুর কৈ, আলু মানকচু চৈ,
গুয়া পানি আনিত নানা মতে॥
আদার সুন্দর ঝাল, খাইতে পোড়ায় গাল,
কহিতে বিদরে মোর বুক।
কি মোর হইল আজি, কেন বিধি দিল বাজী,
এখানে চাইব কার মুখ॥

বিজয়গুপ্তের কাব্যের বাস্তবতার আর একটি নিদর্শন,—

হাসি বলে চণ্ডী আই, তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাইবে পান খাইতে,
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে॥

এছাড়া শিব ও চণ্ডীর দারিদ্র্য-দশার বর্ণনায় বিজয়গুপ্ত যথেষ্ট বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কাজীর অত্যাচার ইত্যাদির বর্ণনায় সমসাময়িক সমাজ-জীবনে সংঘটিত নানা উৎপীড়নের কথা আছে।

বিপ্রদাস পিপিলাই॥ বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি। বিপ্রদাস পিপিলাই বিজয়গুপ্তের এক বছর পর কাব্য রচনায় হাত দেন। তাঁর কাব্যের নাম 'মনসা-বিজয়'। বিপ্রদাসের কাব্যে তাঁর একটি আত্মপরিচিতি-মূলক বিবরণ আছে। এই বিবরণে ইতিহাসের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। তাতে তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আত্মবিবরণীটি উদ্ধৃত হলো,—

মকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়া বটুগ্রাম॥
বাৎস্যগোত্র পিপিলাই পঞ্চপ্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালি রচিতে পদ্মা করিল আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
কবিগুরু ধীরজনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥

কবির এই আত্মবিবরণীতে কাব্যের কালনির্দেশ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান॥
হেনকালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত॥

কবির এই উক্তি অনুযায়ী বিচার করলে বলা যায় নৃপতি হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সুলতান তখন ১৪১৭ সন বা ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে কবি পদ্মার গীত রচনা করেন। বিপ্রদাস চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত নাদুড়্যা বটগ্রাম নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য নদীয়া জেলায়ও নাদুড়্যা নামক গ্রাম আছে।[১৪০] কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত।

বিপ্রদাসের পুথি খণ্ডিত আকারে আবিষ্কৃত হয়েছে। মনসামঙ্গলের মূল কাহিনী এতে নেই। আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুথিতে চাঁদের নৌবাণিজ্য-যাত্রা অবধি বর্ণনা আছে। পুথির নাম 'মনসার পাঁচালী'।

পূর্ববর্তী কবি বিজয়গুপ্তেব কাব্যে যে পাঠ-বিকৃতি, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও তা আছে। পাঠ-বিকৃতির ধরণ থেকে কাব্যের কোনো কোনো অংশ পরবর্তীকালের রচনা বলে অনুমিত হয়।

পুথিতে ব্যবহৃত বাহিনু, ডাকিনু, কহিনু, দিনু, দিলাম ইত্যাদি আধুনিক শব্দপ্রয়োগ আছে। ভাষায় প্রাচীনত্বেব লক্ষণ প্রায় নেই। এই কারণে বিপ্রদাসের পুথির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। কেননা প্রাপ্ত পুথির ভাব ও ভাষা বিচাবে এ কাব্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পূর্ববর্তী হওয়া অসম্ভব।[১৪১] তবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার অবকাশও নেই। কেননা পুথির লিপিকাল পরবর্তীকালে হওয়ায় এতে আধুনিকতার ছাপ পড়া অসম্ভব কিছু নয। এবং আধুনিকতার ছাপ পড়ায় কাব্যের ভাষা সহজ গতিসম্পন্ন। যেমন,—

প্রথমে কহিব তত্ত্ব,   শুন নর এক চিত্ত,
মহাযজ্ঞ করে দেবগণ।
গঙ্গা হরের ঘরে,   নিরঞ্জন আমি তাঁরে,
যেন মতে দিলা দরশন॥
নাগ ঈন্দ্র রক্ষা কাজে,   কালীদহে গজরাজে,
মনসা জন্মিল যেন মতে।
চণ্ডীর সহিত বাদ,   হৈল বড় পরমাদ,
নির্বাসিলা সিদ্ধুয়া পর্বতে॥

তাছাড়া পুথির অংশবিশেষে সঙ্গতির অভাবও পরিদৃষ্ট হয়। এই অসঙ্গতির জন্য উপাখ্যানের কোনো কোনো চরিত্র ও অংশবিশেষের পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে। চাঁদ সদাগর এখানে 'চাঁদো রাজা' রূপে উল্লিখিত হয়েছে। শিব নিজেই এখানে ধর্মঠাকুরের তপস্যায় রত। বিপ্রদাসের কাব্যের এই যে অভিনবত্ব, সপ্তদশ শতকের কবি বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে তার প্রভাব লক্ষ্য কবা যায়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের প্রথম দিকের বেশির ভাগ জুড়ে বিবৃত হয়েছে ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডীর কলহ, বিবাদ ও বিরোধের চিত্র। কাব্যের শেষ অংশে সামান্যমাত্র অংশ অধিকাব করে থাকে উপাখ্যানের মূল অংশ বেহুলা-লখিন্দরের

---

১৪০. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩৩৫
১৪১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাস,' পৃ. ৩৩৬

কাহিনী। তবে বিপ্রদাসের রচনার প্রধান গুণ এই যে তিনি বাঙালির সংসারের ছবি হিন্দু পুরাণের ছত্রছায়ায় যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার সঙ্গে বাস্তব-জীবনের সুখ-দুঃখগুলো এমন অর্থপূর্ণভাবে সমন্বিত হয়েছে যে, মনসামঙ্গলের সব কবির পক্ষে সেই উপস্থাপনা সম্ভব হয় নি।

নারায়ণ দেব।। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা হয়।[১৪২] কবি রাঢ়দেশ থেকে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার তাড়াইল থানাধীন বোরগ্রামে বসতি গড়ে তোলেন। আসাম অঞ্চলে কবির 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যখানি পাওয়া গিয়েছে। সেজন্য আসামিরা তাঁকে আসামবাসী মনে করেন। তাঁদের অভিমত নারায়ণ দেব আসামের দরঙ্গরাজের সভাকবি থাকাকালীন রাজাদেশে তাঁর 'সুকনান্নি' নামক কাব্য রচনা করেন।[১৪৩] অবশ্য দরঙ্গরাজের রাজত্বকাল ছিলো খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক। নারায়ণ দেব তাঁর বহু পূর্ববর্তী। আসামবাসীগণ মনে করেন নারায়ণ দেব তৎকালে আসামের অন্তর্ভুক্ত সিলেট জেলার অধিবাসী ছিলেন। এ সম্পর্কে একটি সত্য এই যে তখন ময়মনসিংহের পূর্বপ্রান্ত ও সিলেটের পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সীমান্তরেখা টানা হয় নি। কাজেই ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীরা বোরগ্রামকে যেমন নিজেদের জেলার অন্তর্ভুক্ত মনে করতো, তেমনি আসামবাসীরা উক্ত গ্রামকে তৎকালে আসাম-অন্তর্ভুক্ত সিলেট জেলায় অবস্থিত বলে মনে করতো। অবশ্য পরে এই দুই জেলা পৃথক হয়ে যায় এবং বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে সিলেট এককালের পূর্ববাংলা ও পরে পূর্বপাকিস্তান এবং অতঃপর বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। বোরগ্রাম ময়মনসিংহের প্রান্তে অবস্থিত হলেও বিস্তৃত হাওরের জন্য গ্রামটি এই জেলার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে নিকটবর্তী ভৌগোলিক অন্তরায়মুক্ত সিলেটের সঙ্গে বোরগ্রামের যোগাযোগ অধিকতর নিবিড়। এই কারণে নারায়ণ দেবের কাব্য সিলেট হয়ে আসামে প্রবেশ করা বিচিত্র কিছু নয়।

নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতার নাম রুক্মিনী। এঁরা জাতে কায়স্থ ছিলেন। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ কাব্যখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে দেবতার বন্দনা ও আত্মপরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ডে পুরাণের বিবরণ এবং তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। কাব্য-প্রেরণার কারণ হিসাবে কবি দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন,—

তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহি ত কারণ।।
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি।।
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।।

---

১৪২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩১৪
১৪৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৩

আসামবাসীগণ নারায়ণ দেবকে নিজেদের কবিজ্ঞানে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রাচীন অহমিয়া ভাষার লেখকদের মধ্যে নারায়ণ দেবকেও নির্দেশ করা হয়ে থাকে। তবে একথা বলা হয় যে নারায়ণ দেবের কাব্য আসাম অঞ্চলে গিয়ে পাঠান্তরিত হয়েছে।[১৪৪] তার একটি উদাহরণ,—

বাংলা।। ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতি তলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে।।
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর।।
মাও সোনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিব পরাণি।।
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্রশোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ।।

অহমিয়া।। উঠা উঠা প্রাণেশ্বরী কত নিদ্রা যাস্।
মোক খাইল কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস্।।
তোর সম অবাগী নাহিকে ক্ষিতি তলে।
অকালতা বাঁরী ভৈলী খণ্ড ব্রতর ফলে।।
কতো জন্মে খণ্ড ব্রত কৈলি বহুতর।
সেহি দোষে তোক এরি যাওঁ লখিন্দর।।
মাও সনেকা মোর মরণ শুনিলে।
অগনি জ্বালিয়া মাও গাওর অঞ্চলে।।
আমার মরণে মাও মরির পুরিয়া।
খ্যাতি রাখিবো মায়ে সংসার জুড়িয়া।।

শ্রীরায় বিনোদ।। ডক্টর মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার উদ্ধারকৃত শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণে'র পাণ্ডুলিপি মনসামঙ্গলের নতুন গবেষণার উৎসাহ দেয়। ডক্টর মিয়া বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করে তার মাধ্যমে অভিমত দেন যে 'কবি শ্রীরায় বিনোদ খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের শেষার্ধে তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' কাব্য রচনা করেন, এবং কবির আবির্ভাবকালও ষোড়শ শতাব্দী।[১৪৫] বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস কিংবা নারায়ণ দেবেও মনসামঙ্গলের যেসব বিষয় নেই, রায় বিনোদে তা আছে ; সেই দিক থেকে শ্রীরায় বিনোদ অধিকতর মৌলিকতার দাবিদার। রায় বিনোদের কাব্যে 'হাসান-হোসেন পালা' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে কবির আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব দেখা যায়।

দ্বিজ বংশীদাস।। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যোৎপত্তির কালনির্দেশক একটি পদ,—

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।

পদটি থেকে কবির কাব্যরচনার কাল ১৫৭৫ সালের মধ্যে ফেলা যায়।[১৪৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উক্ত মতের সমর্থক। দ্বিজ বংশীদাসের জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুয়ারী নামক গ্রাম। কবি নারায়ণ দেবের জন্মভূমি বোরগ্রাম থেকে এই গ্রাম মাত্র তিন ক্রোশ পশ্চিমে। কবির পিতামহ হৃদয়ানন্দ এবং পিতা যাদবানন্দ। দারিদ্র্য-পীড়িত কবি দ্বিজ বংশীদাস সংসারের ব্যয়-নির্বাহের জন্য দল বেঁধে স্বরচিত ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার ভাসান গান গাইতে গাইতে বংশীদাস গ্রাম থেকে বহুদূরে চলে যান। বাড়ি ফিরবার পথে এক বিশাল হাওরের মধ্য দিয়ে চলাকালে তিনি দস্যু কেনারামের কবলে পড়েন। কেনারাম তাঁকে বধ করবার উপক্রম করলে তিনি তার কাছে শেষবারের মতো স্বরচিত ভাসান গান গাওয়ার অনুমতি চান। দস্যু তাঁর শেষ ইচ্ছায় সম্মত হয়। কবির ভক্তহৃদয় তখন বেহুলার দুঃখের ভাসানে বিগলিত হয়। সেই গান শুনে কেনারামের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। দস্যু তখন দরবিগলিত চিত্তে ভক্তকবির চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। সেই থেকে কবির ভক্তশিষ্য কেনারাম কবির সঙ্গে ভাসান গান গেয়ে বেড়ায়। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী 'ময়মনসিংহগীতিকা'র অন্তর্গত 'মলুয়া ও কেনারামের পালা'র কবিরূপে বিশেষভাবে পরিচিত।

বংশীদাস তাঁর পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যে দ্বিজ বংশী, বংশীধর, বংশীবদন ও বংশীদাস ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করেছেন। দ্বিজ বংশীদাসের কবিখ্যাতির অন্তরালে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে তা হচ্ছে তিনি নিজেই যেমন গান রচনা করতেন, তেমনি নিজেই সেই গান গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর কাব্যের অন্তর্নিহিত সত্যটি হচ্ছে তাঁর ভাষা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ; ভাবকে সহজে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিলো। করুণরসের বিগলিত ধারাকে তিনি বাঙালির অন্তঃকরণে অবলীলায় প্রবহমান করে দিতে পেরেছেন। কবির ভাষার নিদর্শন,—

বিলাপ করয়ে লোকে, স্বামীর মরণ শোকে,
ফেলায় কেহ শঙ্খ সিন্দুর।।
বাড়ী বাড়ী উঠে রোল, রাজ্যময় গণ্ডগোল,
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়।
চান্দর চরণে পড়ি, যায় লোকে গড়াগড়ি,
স্ত্রীপুরুষে ধুলায় লুটায়।।
চান্দ বলে প্রজাগণ, কেন কান্দ অকারণ,
যে করিমু শুন কহি কথা।
যত ডিঙ্গা ডুবাইছে, সকলে লইব পাছে,
সে কাণীর লাগ পাই যথা।।

১৪৬. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ২৮১

এবং —

যে কান্দে আমার এথা তাহার মুড়ির মাথা
দেশে রাখি তারে নাহি কাজ।
কাতর হইলু জানি হাসিবেক লঘু কাণী
সেহি মোর বড দুঃখ লাজ॥

মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারার মধ্যেও বংশীদাস তাঁর কাব্যে স্বাতন্ত্র্যধর্মী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। বংশীদাসের কন্যা **চন্দ্রাবতী**ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। ডক্টর দীনেশ সেনের মতে চন্দ্রাবতীর জন্ম ১৫৫০ সাল। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আছে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ॥ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি।[১৪৭] কেতকাদাসের মতে মনসা কেয়াপাতায় জন্ম নেন, ফলে তাঁর অন্য নাম কেতকা। এই অনুভবে কবি নিজেকে কেতকাদাস বলেছেন। কেতকাদাস তাঁর কাব্যে একটি আত্মপরিচিতি দিয়েছেন। তাতে বারা খাঁ, বিষ্ণু দাস, ভারামল্ল প্রমুখ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,—

নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই, জগন্নাথপুর পাই,
প্রাতঃকাল নিশি অবসান।
তথায়েতে নীলাম্বর, উত্তরিতে দিল ঘর,
হাড়ি চাল সিদা গুয়াপান॥
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই, তাহারে ভেটিতে যাই,
নাম তার ভারামল্ল।
তিনি দিলেন ফুল শন, আর তিনখানি গ্রাম,
লিখাপড়া বসতি স্থান॥

কবির এই নিবাসে মুচিনীর বেশে মনসা তাঁকে দেখা দেন এবং কবিকে মনসার গান রচনা করতে বলেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কবির রচনায় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'রামায়ণের' প্রভাব অনুভূত হয়। তাঁর রচনারীতি গ্রাম্যতা-মুক্ত ; কবিত্ব-শক্তি খুব মানসম্পন্ন না হলেও তাতে শিল্পীমনের স্পর্শ আছে।

তিন॥ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পটভূমি

বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণ প্রথম পর্যায়ে এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ ভীতির সঞ্চার করেছিলো। তাতে দৈবনির্ভর মানুষ কিছু দেবদেবীকে ত্রাণকারী হিসেবে পূজা করে। যেসব দেবদেবী সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস আর আত্মনির্ভরতা সঞ্চার করেছিলো তার মধ্যে

---

১৪৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,' পৃ. ৩৫২

মনসার পরেই আছে চণ্ডীর স্থান। চণ্ডী প্রথমে অনার্যদের পূজ্যা ছিলেন, পরে তিনি ব্রাহ্মণ্য-সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অবশ্য একসময়ের অনার্যপূজিত দেবী চণ্ডীর এই ব্রাহ্মণ্য-প্রভুত্ব আদায়ের ব্যাপারটি কখন কোন্ সময়ে ঘটেছিলো তার সঠিক তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক পণ্ডিতেব অনুমান, ঘটনাটি হয়তো খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের আগেই ঘটে থাকবে। কেননা ষষ্ঠ শতকে বঙ্গে চণ্ডীমাহাত্ম্য, দুর্গামাহাত্ম্য ও গাথা সপ্তশতী ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। আনুমানিক পঞ্চদশ শতকে রচিত বায়ুপুরাণ ও বামনপুরাণে চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। এসব পুরাণে উল্লিখিত চণ্ডী, কালী বা দুর্গার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বামনপুরাণে চণ্ডীর আবির্ভাবের ব্যাপারটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, শুম্ভ নিশুম্ভ পরস্পর যুদ্ধলিপ্তকালে দেবী তাঁর একগোছা চুল ভূমিতে ফেলেন, সেই চুলের গোছা থেকে চণ্ডমারীর জন্ম সম্ভব হয়। শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিহত দুই অমাত্য চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকের মালা ধারণ করে চণ্ডী চামুণ্ডা বা চণ্ডিকাব রূপ পরিগ্রহ কবেন। মৎস্যপুবাণ ও কালিকাপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে অন্ধকাসুরের রক্তপানের জন্য মহাদেব চণ্ডীকে সৃষ্টি করেন। যদিও বিভিন্ন পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ আছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত চণ্ডী কিংবা তাঁর কাহিনী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারায় এমনভাবে মিশ খেয়েছে যে মনে হয় চণ্ডী এখানে পুরোপুরিভাবেই বাঙালির মৌলিক সৃষ্টি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট চরিত্র কালকেতু যে বরাবর একজন ব্যাধরূপে বনের পশুদের ভীতির কারণ হয়েছে, সেই বিশেষ লোকটিব আবাধ্য দেবী হলেন চণ্ডী। শরৎচন্দ্র রায়েব 'ওঁরাও বিবরণী'তে বলা হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর সঙ্গে ওঁরাওদের পূজ্য 'চণ্ডী' দেবীব নানাদিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর আশীর্বাদপুষ্ট কালকেতুর যে কাহিনী তাতে অনার্য প্রভাব বেশি। চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় বর্ণিত বিষয় 'ধনপতি-শ্রীমন্ত- উপাখ্যান'। এই উপাখ্যানের আরাধ্য দেবী হলেন মঙ্গলচণ্ডী। তিনি মঙ্গল নামক অসুর নিধন করেছিলেন বলে তাঁর এই নাম। ধনপতি শ্রীমন্তেব কাহিনীতে চণ্ডী ঝড়-ঝঞ্চা আর প্লাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজিত। একসময় তিনি ছিলেন 'আদ্যা', যাঁর লৌকিক দেবীত্ব নিম্নবর্ণের লোকসমাজে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত ছিলো। এই অপবাধে উচ্চবর্ণের লোকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পাবেন নি তিনি। সেজন্যই উচ্চবর্ণের ব্যক্তি হিসেবে ধনপতি বামপাযে দেবীর ঘট স্পর্শ করে তাঁব সম্পর্কে একটি অসম্মানসূচক উক্তি করে,— 'স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি কবি।' পবে সম্ভবত এই বিরোধেব অবসানকল্পে কালকেতু-কাহিনী ও ধনপতি-শ্রীমন্তের কাহিনী পাশাপাশি বিরাজ করে। 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' থেকে অনুমান কবা যায চণ্ডীমঙ্গলের লৌকিক কাহিনীই পববর্তীকালে জনসমাজে ব্রতকথা রূপে প্রচলিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল উপাখ্যান॥ বৈচিত্র্যমণ্ডিত চণ্ডীমঙ্গল উপাখ্যানে দেবতা ও মানুষের সংঘাত ও বিবোধের চিত্র থাকলেও তাতে উগ্রতাব ছাপ নেই। একটা মধুর অনুভূতির স্পর্শ কাহিনীব সর্বত্র স্নিগ্ধ প্রলেপ সঞ্চার কবেছে। এই উপাখ্যানের চণ্ডী উগ্রচণ্ডী নন, ববং মাতৃত্বের স্নেহসুধা বিতরণে জননীর মূর্তিতে সর্বত্র বিরাজমান। কৌতুকের রসোচ্ছলতায় তিনি ভক্তের পরীক্ষা করেন, কিন্তু তাকে রক্ষা করেন ভালোবাসা আর গভীব মমতার প্রকাশ ঘটিয়ে। চণ্ডীমঙ্গলেব

দুই অংশে চণ্ডীর দুই রূপ,—কালকেতু-উপাখ্যানে চণ্ডী স্বর্ণগোধিকা, ধনপতির উপাখ্যানে তিনি মায়ামরীচিকারূপিণী এক গজলক্ষ্মী।

প্রথমে কালকেতু উপাখ্যান। এই উপাখ্যানে কালকেতু নিম্নবর্ণের এক ব্যাধ বিশেষ। বনেব জন্তু শিকার করে মাংস বিক্রি করে তার জীবিকা চলে। পশু শিকারে তার নৈপুণ্য ব্যাধসমাজে তাকে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাধকন্যা ফুল্লরা তার জীবনসঙ্গিনী। কবির কল্পনায় তারা শাপভ্রষ্টা দেব-দম্পতি। কালকেতু বনের পশুশিকার করে, ফুল্লরা পশুর মাংস বিক্রি করে। এভাবেই চলে তাদের অনটনের সংসার। মাতৃশক্তি চণ্ডী একদিন স্বর্ণগোধিকার রূপে কালকেতুকে ধরা দেন। এদিকে ফুল্লরার ঘরে তিনি আবার লাবণ্যময়ী এক নারী হয়ে দেখা দেন। ভয় পেয়ে যায় ফুল্লরা পাছে এই সুন্দরীই না তার স্বামীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। অতএব ছদ্মবেশী দেবীকে ফুল্লরা সতী নারীর ধর্ম রক্ষা করে স্বামীর ঘরে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়। ফুল্লরা তার দারিদ্র্যের কথাও দেবীকে শোনায়। কিন্তু দেবী অনড়। তিনি তো ফুল্লরার ঘরের শ্রী বাড়ানোর জন্যই এসেছেন। ফুল্লরা তার বারো মাসের দুঃখের কাহিনী শোনায়। তখন কালকেতুর আবির্ভাব ঘটে। সেও ছদ্মবেশধারিণীকে স্বামীগৃহে চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়। কিন্তু দেবী অটল। তখন কালকেতু তার আজন্মলালিত সংস্কারবশে তীর ধনুক দিয়ে দেবীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয। দেবী স্বমূর্তি ধারণ করেন। শেষে দেবী তাকে একটি দামী আংটি দেন। আংটি বিক্রি করে তার অনেক অর্থ হয়। সেই অর্থ দিয়ে কালকেতু অরণ্য পরিষ্কার করে নগরপত্তন করে। নানা জাতিব লোকসমাগমে কালকেতুর নগব ক্রমে জনবসতিপূর্ণ হযে ওঠে। ধূর্ত ভাঁড়ু দত্ত তার কূটকৌশল প্রযোগ কবে কালকেতুর কাছ থেকে উচ্চপদ পায, কিন্তু পদটির সদ্ব্যবহার করতে না পারায় এক সময় কালকেতু কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়। ক্ষিপ্ত ভাঁড়ু তার ডিপ্লোম্যাটিক চালে কলিঙ্গরাজের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং কালকেতুর সঙ্গে তার যুদ্ধ বাধিয়ে দেয। যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত হয় এবং কলিঙ্গরাজ কর্তৃক কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হয়। কাবাগারে কালকেতু দেবীকে স্মরণ করে। তখন দেবীর হস্তক্ষেপে সে মুক্ত হয এবং নিজের রাজ্যে ফিরে আসে। ফুল্লরাকে নিযে অতঃপর সুখে-শান্তিতে জীবন শুরু করে।

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীটি ধনপতি খুল্লনার জীবনকথা। দেবতাব কোপে রত্নমালা হলো স্বর্গভ্রষ্টা এক মানবী। তাব নাম খুল্লনা। পোষা পায়রার খোঁজে বেরিয়ে উজানীর বণিক ধনপতি খুল্লনার সন্ধান পায়। খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে বণিক তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। ধনপতির পূর্বস্ত্রীর নাম লহনা। লহনাকে চাটুবাক্যে ভুলিয়ে ধনপতি খুল্লনাকে বিয়ে করে ঘরে তোলেন। বিয়ের কিছুদিন পর ধনপতি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভিন্নদেশে যাত্রা করেন। ধনপতির অবর্তমানে লহনা দাসী দুর্বলতার প্ররোচনায় খুল্লনার উপর অত্যাচার শুরু করে। অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশায় খুল্লনার দিন অতিবাহিত হয়। আধপেটা খেয়ে সে বনে বনে ছাগল চড়িয়ে বেড়ায়। এই অবস্থায় সে একদিন মঙ্গলচণ্ডীর পূজারতা পঞ্চ দেবকন্যার সাক্ষাৎ পায়। খুল্লনা তাঁদের কথামতো দেবীর পূজা দিলে দেবী তাকে স্বামীপুত্র লাভের বব দেন। দেশের বাইরে ধনপতি একদিন দুঃস্বপ্ন দেখে বাড়ি ফিরে সব ঘটনা অবহিত হন। কিন্তু তিনি লহনা কিংবা

দুর্বলা কাউকে কিছু না বলে কিছুকাল খুল্লনার সঙ্গে কাটিয়ে পুনরায় সিংহল যাত্রা করেন। পথে কমলে কামিনী দর্শন করেন ; এছাড়া আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। সিংহল পৌঁছে তিনি রাজাকে তাঁর দেখা অলৌকিক বৃত্তান্তের কথা বলেন। রাজা তা দেখতে চান। তবে শর্ত হলো, রাজাকে এসব দৃশ্য দেখাতে পারলে ধনপতি সিংহলরাজের অর্ধেক রাজত্ব পাবেন, তার বিপরীত হলে তিনি আজীবন কারাগারে থাকবেন। ধনপতি রাজাকে কিছুই দেখাতে পারলেন না, ফলে শর্ত অনুযায়ী তাঁর কারাদণ্ড হলো। এদিকে খুল্লনার ঘরে শ্রীমন্তের জন্ম হয়। শেষপর্যন্ত শ্রীমন্তের চেষ্টায় ও চণ্ডীর কৃপায় বাপ-বেটা দুজনেই বিপদমুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। এই কাহিনীর সঙ্গে আরো অনেক উপকাহিনীর সংযোগ হয়েছে, তবে সর্বত্রই অলৌকিকতার বাড়াবাড়ি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী-আলোচনা॥ মানবরস ও উজ্জ্বল সমাজচিত্র উপস্থাপনার জন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ গৌরবে চিহ্নিত। এই কাহিনীতে দেব-মানুষের যে সম্পর্ক, তাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আর সংঘাত থাকলেও অন্য কারণে উভয়ের মধ্যে যে একজনের ভক্তি এবং আর একজনের আশ্রয় প্রদানের আশ্বাস রয়েছে সেটি কখনো বিঘ্নিত হয় নি। চণ্ডীমঙ্গলের উভয় কাহিনীতে চণ্ডিকাদেবীর মাতৃমূর্তির প্রকাশ তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে তাৎপর্যমণ্ডিত।

চণ্ডী ব্যাধসমাজে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। কালকেতু-উপাখ্যানে চণ্ডী এক স্বর্ণগোধিকা, ধনপতি উপাখ্যানে হস্তি-ভক্ষণকারী কমলে কামিনী। এই দেবীর তুষ্টিতে কালকেতু ও ধনপতির কারামুক্তি ঘটে। তিনি চান ভক্ত তাঁর পূজা অর্চনায় এগিয়ে আসুক। শাস্তিদানে কঠোর নন বলেই কেউ তাঁকে বিস্মৃত হলে নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়ে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তাঁর দৈবশক্তি অসীম। আসলে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর নানামুখি বিস্তার কাহিনীর বৈচিত্র্য আনয়নে বেশ সহায়ক হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয় ও উপস্থাপনা মনসামঙ্গল কাব্যের তুলনায় অনেক পরিমাণে দেবশাসন-শিথিল। এখানে প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ-বিন্যাসের প্রতি কবিদের মনোযোগ বেশি। চণ্ডী দেবী হয়েও এই সমাজ বিন্যাসের সঙ্গে প্রায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দেবতার রোষ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভীতির পরিমাণ এখানে অনেক কম। মানব-জীবনের উপর দেবতার প্রভাব থাকলেও তার চাপ অসহনীয় নয়, ফলে মনুষ্যধর্ম তাতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। মনসামঙ্গল কাব্যে সমাজ-জীবনের যে উপস্থাপনা তাতে একটা বিশেষ ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য চাঁদ সদাগর, লখিন্দর ও বেহুলাকে সেই ভাবের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে, উপাখ্যানের প্রাণকেন্দ্রে তা আবদ্ধ নয়। ধর্মমঙ্গলের লাউসেন, ইছাই ঘোষ, লখাই প্রমুখ চরিত্রের বিকাশপথে প্রাধান্য পেয়েছে তাদের অতিমানবিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক সম্পর্ক তার বহিরাবরণ মাত্র। অন্যদিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সমাজ-জীবনের যে উপস্থাপনা, তার অবস্থান উপাখ্যানের প্রাণকেন্দ্রে নিহিত ; ফলে তাতে সমাজ-জীবন একটা সুস্থ সবল জীবন্ত সত্তায় বিকাশলাভ করেছে। কালকেতুর ব্যাধ সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের ধারায়, ভাঁড়ুদত্তের আচার আচরণে যে বাস্তবতার প্রোজ্জ্বল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাতে সমাজ-জীবনের গভীর ছাপ

বিদ্যমান। কালকেতুর নগরপত্তনে সমাজের নানাদিক থেকে যে লোকসমাগম হয়, সেখানে সমাজ-জীবন তার অনমনীয় সত্তায় অনুপ্রবেশ করেছে। চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলো দৈবশাসিত নিয়মকানুনের একচ্ছত্র আধিপত্যে নির্মিত না হওয়ায় এদের মধ্যে যে মানবিক গুণের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে জীবন-বাস্তবতার একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তারা কোনো ভাবের বাহন নয়, তাদের বিকাশ সহজ সরল মানব-সমাজের লোকায়ত চত্বরে, দৈবশাসন তাতে কোনো অনভিপ্রেত প্রভাব সঞ্চার করতে পারে নি।

সুতরাং মানব-জীবনের স্বভাবসুন্দর বিকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রসমূহ মঙ্গলকাব্যের জগতে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে দেবতার শাসন-নির্ভর পরিসরে তারা আবদ্ধ হয় নি। কালকেতু-ফুল্লরার সংসার-জীবনের যে ছক, নিশ্চয় তা কোনো উচ্চতর নীতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে নি। কালকেতুর ব্যাধ-সংস্কারের মধ্যেও বাঙালির জীবন-প্রতিবেশ নানাভাবে বিকাশলাভ করেছে। দ্বিতীয় কাহিনীতে ধনপতি-খুল্লনার প্রেমের চিত্রায়ণে বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ধর্মেরই জয় হয়েছে। লহনা-খুল্লনার স্বপত্নীবিদ্বেষের চিত্রায়ণে কবি বাঙালির স্বভাবধর্মের চমৎকার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এই সব কারণে বাংলা মঙ্গলকাব্যের জগতে চণ্ডীমঙ্গল বাঙালি জনগণের মনমানসিকতার অনেক কাছাকাছির কাব্য।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি।। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে মধ্যযুগের শেষস্তরে। সুতরাং এই কাব্যের কোনো কবিই পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী নন।

মানিক দত্ত।। মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি বলে স্বীকৃত। ষোড়শ শতকের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে মানিক দত্তের নাম উল্লেখ করেছেন,-

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।
বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবি কঙ্কণ।
প্রণাম করিয়া মাতাপিতার চরণ।।

মুকুন্দরামের এই মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় মানিক দত্ত তাঁর পূর্ববর্তী কবি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত মানিক দত্ত মুকুন্দরামের দুইশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।[১৪৮] সংক্ষিপ্ত আকারে মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবির নিবাস ফুলুয়ানগর। ফুলুয়ানগর সম্ভবত মালদহ জেলার বর্তমান ফুলবাড়ি নামক স্থান।[১৪৯] তবে তাঁর কাব্যে 'লড় দিয়া', 'খুলনাইর' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার থেকে তাঁকে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা আজকের বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলের লোক মনে করা অসমীচীন নয়। তাঁর আত্মবিবরণী থেকে আরো জানা যায় তিনি অন্ধ ও খঞ্জ ছিলেন। আরাধ্য দেবীর অনুগ্রহে তিনি রোগমুক্ত হন। এছাড়া দেবীর দয়ায় কবি কলিঙ্গরাজের রোষমুক্ত হন।

---

১৪৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৯
১৪৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৬০

দেবীর প্রসাদে মানিক দত্ত যখন কবিত্বশক্তির অধিকারী হন, তখন চণ্ডীদেবীর আদেশক্রমে তিনি 'অষ্টমঙ্গলা' কাব্য রচনা করেন। মানিক দত্তের কাব্যখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অর্বাচীন রূপ। কাব্যে মালদহ অঞ্চলের নদী, নালা, খাল, বিলের পরিচয় আছে। তাঁর রচনাযও ছড়াপাঁচালীর ধাঁচে অর্বাচীন চণ্ডীমঙ্গলের রূপটি স্পষ্ট। যেমন,—

আমারে বোলে ডানরে বুড়িরে আমারে বোলে ডান।
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান॥
ডান নইরে ডান নই হই এ মুখ দোষী।
দ্বারে বোসে খাইনু মুই চৌদ্দ ঘর পড়শি॥

লহনা-খুল্লনার ঝগড়ার বর্ণনায় বাস্তবতার স্বরূপটি অবশ্য আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন,—

খুল্লনাব বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া॥
চুলেত ধবিয়া গালেত দিল চড।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকেব উপর॥
কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।
পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞিঞার বসন॥

দ্বিজ মাধব॥ দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদাচবিত' বা 'সারদা-মঙ্গল'। 'সারদা-মঙ্গলে'র দ্বিজ মাধব ও 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে'ব দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য—নামের বিভ্রান্তিতে উভয় কবি অভিন্ন কিনা সে-ব্যাপারে অনেকের মধ্যে সংশয় আসা অস্বাভাবিক কিছু নয। 'সারদা-মঙ্গলে'র কবি আত্মপবিচয় ছলে বলেন,—

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতাব॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে বামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥

এই পবিচিতি থেকে জানা যায় গৌড়েব বাদশাহ ছিলেন তখন আকবর। সেই সূত্রে আরো অনুমান কবা যায় খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে দ্বিজ মাধবের কাব্য রচিত হয়ে থাকবে। তাছাড়া কবির কাব্যোৎপত্তিব কালনির্দেশক যে পদটি আছে—'ইন্দুবিন্দু বাণধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধব গায় সাবদাচরিত', এটি বিশ্লেষণ করে ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।[১৫০] বাদশাহ আকবর যে মহানুভব সম্রাট ছিলেন, এই বিষয়টি কবির রচনা থেকে স্পষ্ট হয়। দ্বিজ মাধবের পিতার নাম পরাশর। রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পবাশর এক সময় সপ্তগ্রামবাসী ছিলেন, পরে ময়মনসিংহের মেঘনাতীরবর্তী ন্যানপুর বা নবীনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সারদামঙ্গলের কবির কাব্যে কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের একটা সুহৃৎ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায। পববর্তী কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র-চিত্রণের যে

১৫০. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৭২

কৌশল, দ্বিজ মাধবের রচনায় সেরকম বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। দরিদ্র গৃহস্থ বধূর অভাব অনটনের চিত্রায়ণে মাধব যথেষ্ট বাস্তবানুগামিতার পরিচয় দিয়েছেন। লহনা-খুল্লনার পারিবারিক জীবনে সপত্নী-বিদ্বেষের চিত্র থেকে কিছু অংশ,—

খুল্লনা বাঁধিল ছেলী নিয়া অজাশালে।
শালের পাতে লহনা ক্ষুদের অন্ন ঢালে॥
অল্প অন্ন দিল তাতে পোড়াই বহুল ।
এক পাশে ঢালি দিল পাকা কলার মূল॥
অন্ন দিয়া লহনা হাতেত ধরি পাত।
খুল্লনারে দিল নিয়া ঢেঁকিশালে ভাত॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে ফুল্লনা বান্যানী॥
ধূঞা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়।
ক্ষুধার কারণ রামা তার পিছু খায়॥
ঘৃণা জন্মিল তাতে পিপীলিকা দেখি।
অন্ন হতে হস্ত তুলি কাঁদে ইন্দুমুখী॥

দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে তাঁব উপাখ্যানের অংশবিশেষে 'বিষ্ণুপদ' নামে ক্ষুদ্র গীতিকবিতা সংযোজন করেছেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি তাঁব কাব্যে জীবনমুখিন বাস্তবতার যে পরিচয় দিয়েছেন, সমকালীন কাব্যের জগতে তা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তাঁব এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের অন্তর্নিহিত শিল্পসত্যে ধরা পড়ে। ব্যক্তিজীবনের অনেক অভিজ্ঞতাকে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে বিশেষ কলাকুশলতাব সঙ্গে রূপদান করেছেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে বিস্তৃত আত্মপরিচিতি দিয়েছেন। এই আত্মপবিচিতি তাঁর পিতা, মাতা, পুত্র, পুত্রবধূ এবং নিজের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর কাল সম্পর্কে আলোকপাত কবে। মুকুন্দরাম দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত দামুন্যার অধিবাসী মহামিশ্র জগন্নাথের পৌত্র। কবিব পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র। প্রসঙ্গটি ধরে কবি বলেছেন—'মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদযমিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল কবিকঙ্কণ॥' মুকুন্দরামের এই আত্মপরিচিতি থেকে আরো জানা যায় তাঁর পুত্র শিবরাম, পুত্রবধূ চিত্রলেখা, কন্যা যশোদা ও জামাতা মহেশ।

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে রাজা মানসিংহের উল্লেখ করে বলেছেন,-

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ।
যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিপ।

মানসিংহের সুবেদারীর কাল ১৫৯৪-১৬০৬ খিস্টাব্দ। এই দিক থেকে মুকুন্দরামকে ষোড়শ শতকের শেষ দিকের লোক বলে অনুমান করা যায়।

মুকুন্দরামের বাস্তুভিটা ত্যাগের একটি করুণ কাহিনী আছে। তাকে উপলক্ষ করে তিনি তাঁর কাব্যে নিজের দুঃখের কাহিনী মর্মান্তিকভাবে পেশ করেছেন। রাজনৈতিক অরাজকতায় তাঁকে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে অনিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের পালধি বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে তৎপুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রায় জমিদার হন। তিনি মুকুন্দরামকে তাঁর সভাসদ্ নিযুক্ত করেন। তাঁর নির্দেশে কবি কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা পান। পরে মুকুন্দরামের কাব্যের রসাস্বাদ করে রঘুনাথ তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন,—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীতা হরের বণিতা॥

সংস্কৃত অভিধান মতে 'রস' অর্থ 'ছয'। পুরো বাক্যটি বিশ্লেষণ কবে ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৪৬৬+৭৮ অর্থাৎ ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ পাওযা যায। এদিকে কবিব কাব্যে মানসিংহের উল্লেখ আছে। মানসিংহ ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাব সুবেদার ছিলেন। তাছাড়া পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নেব মতে জমিদার বঘুনাথ বায়ের ক্ষমতায় থাকার অবস্থান ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব। এসব কারণে কাব্যোৎপত্তির বিষয়টি কিছুটা বিভ্রান্তিমূলকও বটে। সুতরাং এ মন্তব্য যথার্থ যে 'ভাবা যাইতে পারে যে ১৫৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দের আগে কবি গ্রন্থ রচনা করেন নাই।'[১৫১]

মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত জীবনের একটি বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, কবির দুই স্ত্রী বর্তমান ছিলেন।[১৫২] পত্নীদ্বয় সপত্নী বিদ্বেষেব তাড়নায় হয়তো খুব সদ্ভাবে পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন নি। সেই করুণ অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো লহনা-খুল্লনার সপত্নী বিদ্বেষ প্রকাশের বর্ণনায় কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে বলেছেন,—

একজন সহিলে কোন্দল হয দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্তী ঠাকুর।

মুকুন্দরামের কাব্যে যেসমস্ত দেবদেবী বন্দনা আছে তাতে তাঁকে পঞ্চোপাসক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে অনুমান করা হয়। কারো কারো মতে তিনি বৈষ্ণব-উপাসক ছিলেন।

কাব্য-আলোচনা॥ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় তাঁর ভাষা-প্রয়োগ ও চরিত্র-চিত্রণ কুশলতা। এই ভাসা মানবরস প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ

১৫১. সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' (নয়া দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, ১ম সং ১৩৮২), [ভূমিকা দ্রষ্টব্য], পৃ. ২৫
১৫২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৪৮৮

উপযোগী। সেজন্যই কথাসাহিত্যের চমৎকারিত্ব তাঁর রচনায় ঔজ্জ্বল্য পায়। জীবনরসিক কবি মুকুন্দরামের হাতে সমাজ-জীবনের পাশাপাশি চরিত্র-চিত্রণও উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীকাব্যে যেসব মানুষের উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন, সেই মানুষ তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত কোনো মানবসন্তান নয়। তাঁর অভিজ্ঞতার রসে জারিত বলেই মানুষগুলো তাঁর কাব্যে জীবন-বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিপৃক্ত। সমাজের সমস্যাসঙ্কুল পরিমণ্ডল থেকেই তাদের আবির্ভাব। ফলে সমাজ-জীবনেব বাইরে কোনো পবমাত্মাব বন্দনা-মুখর বিগ্রহ নয় সেই সব মানুষ। তাই বোঝা যায়, দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করতে গিয়েও কবি মানব-জীবনের স্বভাবগত ধর্মকে বিস্মৃত হন নি। সম্ভবত মুকুন্দরামের সমকালীন সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে মানব-মহিমার এই স্বীকৃতি কবির একক কৃতিত্ব। সেজন্যই বলা যায়, যে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা জীবন-বাস্তবতার সম্পর্ককে কবি তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেছেন, মঙ্গলকাব্যের অলৌকিকতার যুগে তা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বাংলা সাহিত্যে মানুষকে মানুষ হিসেবে গৌরবান্বিত করার প্রথম কৃতিত্ব মুকুন্দবামের। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে সমাজ-জীবনের যে চিত্র অঙ্কন কবেছেন তা তাঁর কাল অতিক্রম করে আবহমান বাংলাব ঐতিহ্য- সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনের মর্মস্পন্দনকে ধারণ করেছে। মুকুন্দরাম আমাদের প্রতিদিনের সংসারের চিত্রকে অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। সেখানে বাঙালির ঘবোয়া জীবনেব বাস্তবসুন্দর দিকগুলো স্বভারের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, তাতে কোনো কৃত্রিমতার প্রবেশ নেই।

তবে এমন যে বাস্তব কবি মুকুন্দরাম, তাঁর মধ্যেও কিন্তু অলৌকিকতার প্রতি এক ধবণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সিংহল যাত্রার কল্পনায় বহু সমুদ্র অতিক্রম করার যে বর্ণনা, তাতে কিছু অলৌকিক রসের অবতারণা আছে। তবে আদিগঙ্গার কূলঘেঁষা দক্ষিণ বাংলার জনবসতিপূর্ণ এলাকার বর্ণনায় কবিকল্পনার রাস আলগা হয়ে গেছে। গঙ্গাবক্ষে মাঝিমাল্লাদের আশঙ্কার কথা বর্ণিত হয়েছে, পর্তুগিজ জলদস্যুদের আকস্মিক আক্রমণের কথা বিবৃত হয়েছে—ফলে কবির কূলপ্লাবী কল্পনা তাঁর বাস্তববোধের গভীরতাকে কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ন করতে পারে নি।

মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবিগণ পুরাণাশ্রিত কাহিনী ও উপকাহিনীর রূপায়ণে আবিষ্ট থাকায় বাংলার সমাজ-জীবনের মূল সূত্রগুলো আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন। তাঁর কাব্যেই প্রথম বাঙালির সমাজ-বিন্যাসের চিত্র জীবন-বাস্তবতার পরিচর্যায় পূর্ণাঙ্গরূপে বিকাশলাভ করে। সমাজের বিভিন্ন বিষয় কবির প্রসারিত দৃষ্টিক্ষেপ থেকে বাদ না পড়ায় সমাজ তার ভালোমন্দ দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মুকুন্দরামের সৃষ্ট চরিত্রগুলো এমন যে জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তার পেছনে আছে বাঙালির সমাজ-জীবন সম্পর্কে কবির বহুব্যাপক অভিজ্ঞতা ও সুস্পষ্ট ধারণা। হয়তো তাঁর ব্যক্তিজীবনও তাতে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে; কিংবা তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষতায় দেখা সমাজ তাঁর লেখায় জীবন্ত সমাজচিত্র অঙ্কনে সহায়তা করে থাকবে। একই কারণে মানুষের সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলো তিনি সোজাসুজি সমাজ থেকে তুলে নিয়েছেন। ফলে আবহমানকালের বাঙালি-জীবন মুকুন্দরামের সমাজচিত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়।

কালকেতু শহর পত্তন করলে সেখানে নতুন বসতি গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতির আনাগোনা শুরু হয়, নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় নতুন জাতপাঁতের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কুলগত অবস্থান, তাদের বৃত্তিগত বিভিন্নতা, সমাজের চূড়া লাভের আশায় মণ্ডলপদে প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, জীবনের নানাক্ষেত্রে বিভেদ,—মানব চিত্তবৃত্তির ইত্যাকার বিষয় প্রকাশের বাইরে অরাজকতার যুগটি যখন স্বৈরতন্ত্রের বাতাস ছড়ায়, তখন ধূর্ত জোতদারদের কায়দা কানুনগুলো সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডের সামিল হয়। জমির জন্য 'পণের কাঠায় কুড়া' মাপার কথা, 'কড়ির কারণে' কোটালের উৎপীড়নের বর্ণনা. প্রজাদের অভাব অনটনের নানাচিত্র,—যখন 'ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে', যখন এক টাকার জিনিস দশ আনায় বিক্রি হয়, গ্রাম ছেড়ে পালাবার পথও যখন অবরুদ্ধ,—সমাজের এই সব মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনায় মুকুন্দরাম যে বাস্তববোধের স্বাক্ষর রেখেছেন, তা মধ্যযুগের কাব্যে মোটেই সুলভ নয় ; বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যেই কেবল তা পরিদৃষ্ট হয। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান, বিভিন্ন জাতির কুলগর্ব, নেতৃত্বস্পৃহা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির বিষয়কে কবি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করে তাবই কৌতুকাবহ চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন কবেছেন তাঁর কাব্যে।

পারিবারিক জীবনচিত্র॥ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব শুরুতে কবি একরূপ একটি চিত্র পাঠককে উপহার দিয়েছেন যে জামাতা শিবেব অশোভন ও অমার্জিত কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হযে দক্ষ তাব যজ্ঞেব সভায ক্ষোভ প্রকাশ কবে বলেন,—

অঙ্গরাগ চিতাধূলি, কান্ধেতে ভাঙেব ঝুলি,
বিষধর উত্তবি বসন।
হেন অমঙ্গল ধাম, শিব থুইলা কেবা নাম,
দেববুদ্ধি কবে কোন জন॥
চাহিতে চাহিতে ভাল, কুল মোর হইল কাল,
মোরে বাম হইল বিধাতা।
ভূষণ হাড়ের মালা, শ্মশানে বিনোদশালা,
হেন জন আমার জামাতা॥

দক্ষের এই ক্ষোভ বাঙালির পাবিবারিক সংঘাতেব সূত্রপাতকে স্মরণ করিযে দেয। জামাতা অকর্মণ্য, তাব আচরণ অশোভন, সঙ্গতকারণেই শ্বশুর মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ। বাঙালির পারিবারিক জীবনের আব একটি স্পর্শকাতর চিত্র,—পিতৃগৃহে মায়ের হাতের বাঁধা ভাত খাওয়ার অভিলাষে শিবের প্রতি সতীর আকুল আবেদনে বাঙালিব ঘরোয়া জীবনেব ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে,—

সুমঙ্গল সূত্র কবে, আইনু তোমার ঘরে,
পূর্ণ বৎসর হইল সাত।
দূর করে অপরাধ, পূরহ মনের সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥

পৌরাণিক জীবনের কথা বলতে গিয়েও কবি বাঙালির পারিবারিক জীবনের কথা বিস্মৃত হন নি। সতী দেহত্যাগ করে পুনর্জন্ম লাভ করে কী নিবিড় স্নেহমমতায় গৌরী বা উমারূপে হিমালয়ের ঘরে প্রতিপালিত হন, তারই একটি মিষ্টিমধুর চিত্র,—

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আনবেশ দিনে দিনে, শোভা অলঙ্কার বিনে,
দেখি সুখী হইল মেনকা॥

চরিত্রসৃষ্টি॥ মুকুন্দরামের অন্যতম কৃতিত্ব তাঁর চরিত্রসৃষ্টি-কুশলতা। মানবচরিত্র সম্পর্কে কবির চমৎকার ধারণা থাকায় মানুষ হিসেবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলো অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে। মুকুন্দরামের মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, কালকেতু, ফুল্লরা, দুর্বলা, —এসব চরিত্র বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ। বেনে মুরারি তার বণিকবৃত্তির কারণেই পাঠক-নন্দিত, ধূর্ত ভাঁড়ু তার আত্মাভিমান-প্রসূত সংলাপের মাধ্যমেই নিজের চরিত্রটি অনায়াসে তুলে ধরেছে, দাসী দুর্বলা কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করে খুল্লনা ও লহনার মধ্যে যে সপত্নীবিদ্বেষ জাগিয়ে দেয় তাতেই সে বিশেষভাবে পরিচিত; ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কুলমর্যাদা নিয়ে বেনেদের মধ্যে যে কলহ, যুদ্ধের ভয়ে কলিঙ্গরাজের সেনাপতি বাক্যবীরের ভীতি, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামির কৌতুককর চিত্র, দক্ষিণার লোভে মধুকরের মতো পুরোহিতদের আগমন, হাতুড়ে কবিরাজদের কুলবৃত্তি পরিচর্যার নিবেদন, —এসব জীবন আর জীবনাচরণের বাস্তবসমৃদ্ধ বর্ণনা আমাদের মনে উপন্যাসের স্বাদ যোগায়। মুকুন্দরামের বাস্তবনিষ্ঠা, কৌতুকচিত্র তৈরিতে দক্ষতা এবং রচনাশৈলীর অভিনবত্ব তৎকালীন গতানুগতিক শিল্পরীতির ক্ষেত্রে তাঁর সৃজনশীলতার চমৎকার পরিচয়।

মুরারি শীল॥ মুকুন্দরামের কাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। কালকেতু অঙ্গুরীয় বিক্রি করতে তার কাছে এসেছে, তখন তার বেনেবৃত্তি চাগিয়ে ওঠে। সবল কালকেতুকে ঠকাবার অভিলাষে তার উক্তি,—

সোনারূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পেতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল॥

এই উক্তিতে কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে।

ভাড়ু দত্ত ॥ নিঃস্ব, কিন্তু ধূর্ত। সংসারের অভাব-অনটন তার চিত্তে যে কালিমা লেপন করে, সেই অসারতার কারণে ভেতরে সে শূন্য; কিন্তু বাইরে তার 'ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ।' কুলগর্বে স্ফীত হয়ে নিজের সম্পর্কে সে বলে,—

কহি যে আপন তত্ত্ব আমল হাঁড়ার দত্ত,
তিন কুলে আমার মিলন।
দুই নারী মোর ধন্যা, ঘোষ বসুর কন্যা,
মিত্রে কৈল কন্যা সমর্পণ।

ধূর্ত ভাঁড়ু মণ্ডলপদ-লাভের আশায় কালকেতুর কাছে নিবেদন করে,—

দেহ মোরে সর্ব্বভার, তাড়বালা আদি হার,
তুমি থাক নিশ্চিন্তে নিশ্চয়।
বহু প্রজা বসাইব, এক ছাইয়া পত্র লব,
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়॥

ভাঁড়ুর দু'মুখো চরিত্রের প্রকাশ ঘটে যখন সে সবলা ফুল্লরার কাছে আত্মগোপনকারী কালকেতুর পলায়ন-বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে তাকে খুঁজে বের করে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে, কিন্তু কালকেতু মুক্ত হলে তাকে বলে,—'খুড়া তুমি হৈলে বন্দী, অনুক্ষণ আমি কান্দি, বহু তোমার নাহি খায় ভাত॥' এই যে চরিত্রায়ণ, মানবচরিত্র সম্পর্কে শাণিত ধারণা না থাকলে তা কখনো সম্ভব হয় না। মুকুন্দরামের সেই ধারণা ছিলো বলেই সমাজের এই খল চরিত্রগুলো তাঁর হাতে জীবন্ত রূপ পায়। কালকেতু নিতান্ত প্রাচীন বাংলার কৌমসমাজের মানবচরিত্রের সহজ সরল জীবনাচরণকে ধারণ করে নিজের জীবিকা-নির্বাহে অভ্যস্ত। আজন্ম ব্যাধ সংস্কারের দ্বারা তাড়িত এক অন্ত্যজ যুবক সে। তার আচরণ কোনো উচ্চতর নীতির মানদণ্ডে পরিমাপ্য নয় বিধায় স্বভাবের অকপট প্রকাশকে সে কখনো দমন করতে পারে না। তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি তাই বলেন,—

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলো তুলে যেন তে-আঁটিয়া তাল॥

ফুল্লরা॥ বাঙালির অভাব-অনটনের সংসারের এক পতিপরায়ণা নারী। কিন্তু পুরুষের দুর্বল প্রবৃত্তিকে তার বিশ্বাস নেই। তাই তার গৃহাঙ্গনে ছদ্মবেশী দেবীর মোহিনীমূর্তি দেখে সে বিচলিত হয়। বিশেষ করে দেবী যখন তার ঘরে কিছুকালের জন্য মেহমান হতে চায় তখন সে দেবীকে উপদেশ দেয়, –

তোরে আমি বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল,
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুনল বিমূঢ়মতি, যদি ছাড় নিজপতি,
কেমনে চাহিবে লোকমুখ॥

চণ্ডী যখন কালকেতুকে একটি অঙ্গুরীয় দান করেন তখন তা দেখে 'লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।' এমন কি দেবী যখন বলেন অঙ্গুরীয়টির মূল্য সাত কোটি টাকা, তখনও 'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা।' আসলে একজন সুন্দরী মহিলা স্বামীকে আংটি দেবে, এই অনুভব ফুল্লরার চিত্তে যে ঈর্ষার দাহ সৃষ্টি করে,—এই বাস্তব সত্যের উপস্থাপনা মুকুন্দরামের শিল্পানুভূতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

মুকুন্দরাম যদিও দুঃখবাদী কবি নন, কিন্তু যথার্থ অর্থে তিনি একজন দুঃখ বর্ণনার কবি। বাঙালি পরিবারের অভাব- অনটনের ছবিগুলো তিনি অন্তর্দৃষ্টি-বলে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই ফুল্লরার মুখ দিয়ে পাঠককে অকৃত্রিমভাবে তা শুনিয়েছেন,—

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘর তাল পাতার ছাওনী॥
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।

ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে॥
বৈশাখে অনল সমান বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥

সবলের কাছে দুর্বল যে কত অসহায়, মুকুন্দরামের দুঃখবর্ণনায় তার পরিচয় আছে। এই বৈষম্য সমাজের সর্বত্র। কালকেতুর মারণযজ্ঞের বিরুদ্ধে চণ্ডীর কাছে পশুদের কাতর প্রার্থনায় সে সম্পর্কে কিছু আঁচ করা যায়। যেমন, হস্তি বলে,—

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলি তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনাব অরি॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোনজন॥

একই অভিযোগে ভালুক বলে,--

উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥

হাস্যরস॥ মানুষের এত দুঃখের কাহিনী যিনি অকপটে ব্যক্ত করতে পারেন, তাঁর মধ্যেও যে হাস্যরসের অফুরন্ত একটি ফোয়ারা বহমান ছিলো, মুকুন্দরাম সেই দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। শিবের মদনমোহন রূপ দেখে নারীগণ নিজ নিজ স্বামীর তুলনা করে পতিনিন্দায় মুখর হয। অংশটি কবির হাস্যবস-সৃষ্টির চমৎকার নিদর্শন। যেমন,—

এক যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোঁয়া-জ্বরের ঔষধ সদা পাব কতি॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক-সুপ-ঘন্টি বিনে না করে ভোজন॥
আর যুবতী বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল।
অন্ধমুনির মত মোর গেল সর্ব্বকাল॥
আর যুবতী বলে সখী মোর কথা বুঝ।
অভাগিয়া পতি মোর পিঠে বড় কুঁজ।
চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুঁজের প্রকারে।
খুঁড়িয়া রেখ্যাছি খন্দ মেঝের ভিতরে॥

মুসলমানদের স্বভাব, ধর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে মুকুন্দরামের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিলো। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে মুসলমানদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটি সকৌতুক বর্ণনা.—

বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি,
দশ গণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় ছয় কড়ি ছয় বুড়ি॥

লোকসমাজ, লোকচরিত্র, পারিবারিক জীবন চিত্রণ ও হাস্যকৌতুক মিশ্রিত বিষয়-ভাবনার উজ্জ্বল প্রকাশ ও বিশিষ্ট রচনাশৈলীর ব্যবহারে মুকুন্দরাম যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই দিকের ইঙ্গিত করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—'দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।'[১৫৩]

মুক্তারাম সেন॥ মুক্তারাম সেন তাঁর কাব্যে একটি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবির পরবর্তী বংশধরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে যে তাঁর পূর্বপুরুষ জনৈক যাদব রায় 'শাকে টের বিযদ্বেদবাণ চন্দ্রামীতে পুরা' অর্থাৎ ১৫৪০ শকাব্দ বা ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে তীর্থ উপলক্ষে চট্টগ্রামে আসেন। পরবর্তীকালে এই বংশের স্থায়ীবসতি হয় চট্টগ্রামে। মুক্তারাম তাঁর আত্মপরিচিতিতে বলেছেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মধুরাম। মুক্তারাম কৌমার্য সাধনা করেছেন এবং সেই সূত্রে চিরকুমার ছিলেন। কুলধর্ম অনুসারেও তিনি তান্ত্রিক বংশের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ যাদব রায় থেকে গণনায় তিনি সম্ভবত পরবর্তী চতুর্থ পুরুষ। যাদব ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান থাকলে আনুমানিক হিসেবে মুক্তারামকে সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের লোক মনে করা যায়। মুক্তারামের কাব্যে 'দেশ অধিকারী' মহাসিংহের নামোল্লেখ আছে। মহাসিংহ ১৭৪১–১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের একজন দেওয়ান ছিলেন। মুক্তারাম মহাসিংহের সমসাময়িক বা সামান্য পরবর্তী একজন ব্যক্তি হলেও তিনি খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শুরুতে বর্তমান ছিলেন। তবে তাঁর কাব্যে কালনির্দেশক একটি পদ আছে,—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

এখানে 'কাল' শব্দের অর্থ 'তিন' ধরলে ১৩৬৯ শকাব্দ বা ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দ হয়। কিন্তু মুক্তারামের পূর্বপুরুষ যাদব রায়ের অবস্থান খ্রিস্টীয় ১৬১৮ সালে। তাতে এই মত টিকে না। কোনো কোনো পণ্ডিত 'কাল' শব্দটিকে 'কায়' ধরে তার অর্থ 'ছয়' মনে করেন। তাতে

১৫৩ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ৪র্থ সং ১৩৬৯), পৃ. ১২

কাব্যের লিপিকাল ১৬৬৯ শকাব্দ বা ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ হয়।[১৫৪] এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কিনা বলা মুশকিল; কেননা 'কাল' শব্দের অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে।।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'মুক্তারামের পুঁথি' প্রকাশিত হয়। পুঁথির নাম 'সারদামঙ্গল' বা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী'। অনুলিখন ১১৭৪ মঘী সন বা ১২৭৮ বঙ্গসন। মুক্তারামের কাব্যটি যে প্রাচীন পাঁচালীর ধারায় লেখা, কাব্যের রচনারীতি থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

মুক্তারাম 'সারদামঙ্গল' কাব্যরচনায় ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে মুকুন্দবামেব কাব্যভাবনা ও বচনাশৈলীতে যে শক্তি বিদ্যমান, মুক্তারামের তা ছিলো না। মুক্তাবামের অদক্ষ শিল্পভাবনায়ও অবশ্য একটি উপাদেয় কাহিনী-বয়ানেব প্রয়াস আছে। কাহিনীর প্রাবম্ভে দেবী কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধ এবং অতঃপর কালকেতু ও ধনপতির আখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে। ধনপতিব বাণিজ্যযাত্রায় তান্ত্রিক বংশোদ্ভূত ও শাক্ত কাব্যের অনুসারী হলেও মুক্তারাম মথুবায় কৃষ্ণযাত্রার অনুরূপ বৈষ্ণবপদের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন,—

মধুপুরী জাএ বাধার বন্ধু হে। না জানি কপালে কিবা আছে।।
পাইয়া যুবতী নব বধু হে। অলি হইয়া বহে কালা আছে।।

চার।। ধর্মমঙ্গল

ধর্মমঙ্গলের বিষয়টি বেশ প্রাচীন। ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর অনার্যদেব পূজ্য এক দেবতা। তাঁর পূজার প্রচলন সম্ভবত খ্রিস্ট্রীয় নবম দশম শতকে। তবে বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন কবে হয়েছিলো তা সঠিকভাবে বলা যায় না। দ্বাদশ কিংবা পঞ্চদশ শতকে হওয়াও সম্ভব।

ধর্মঠাকুর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠী কর্তৃক উপেক্ষিত ছিলেন। তবে বিলম্বে হলেও অনার্যপূজিত এই দেবতা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শে আসেন। ধর্মঠাকুরের পূজা প্রধানত ডোমজাতীয় লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[১৫৫] বৈদিক দেবতা বরুণ, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদির প্রভাব ধর্মঠাকুরের ক্রমবিকাশে সহায়তা করেছে। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মনসা, বাসলী ইত্যাদি আদি লৌকিক দেবীদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। আদি অনার্যপূজিত সূর্যদেবতা ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে ধর্মঠাকুররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গে শিবের সঙ্গে তিনি সাদৃশ্যযুক্ত। ধর্মের গান এসব অঞ্চলে শিবের গাজনে রূপ নেয়। তবে ধর্মঠাকুরের পূজার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমিতে।[১৫৬] এই অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রতীকরূপে একটি পাথরকে পূজা করা হয়। রাঢ়অঞ্চলে ধর্মঠাকুর কালু রায়, বুড়া রায়, কৌতুক রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি নামে পূজিত।

---

১৫৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৫৩৪
১৫৫. পূর্বোক্ত, 'বাঙলা সাহিতের রূপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪
১৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪; পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৫৮৬

বৌদ্ধধর্মে নিরঞ্জন ও সৃষ্টিতত্ত্বের যে কল্পনা করা হয়েছে, ধর্মপূজার মূলে তার প্রভাব আছে। তবে বৌদ্ধধর্মের যে নীতি অহিংসা, ধর্মপূজায় তার দায়বদ্ধতা নেই। সুতরাং ধর্মের পূজায় হাঁস ও কবুতর বলির প্রচলন আছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকায় ধর্মের পূজায় নাথধর্মের আদর্শের ছাপ দেখা যায়। শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' ধর্মপূজায় 'কলিমা জালাল' নামে প্রচার লাভ করে। এর যে উপস্থাপনা, তাতে মুসলমানি প্রভাব আছে। সেই প্রভাবে নিরঞ্জন এখানে একেশ্বরবাদী প্রভুরূপে কীর্তিত।

সামাজিক এবং ধর্মীয় তাৎপর্যের দিক থেকে ধর্মপূজার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। হিন্দু সমাজে তার অবস্থান ভক্তির সম্পর্কে বিবেচিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাসের উপর ধর্মঠাকুরের প্রভাব অবিসংবাদিত। অন্ধের অন্ধত্ব বিমোচন, শ্বেতকুষ্ঠ থেকে আরোগ্য এবং বন্ধ্যার সন্তানলাভের অলৌকিক কর্মকাণ্ডে ধর্মঠাকুর সাধারণের মনে যে বিশ্বাস আনয়ন করতে পেরেছেন, উচ্চবর্ণের কোনো দেবতার পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি। ধর্মের পুরোহিতগণও কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়ে, যেমন অগ্নিতে লাফিয়ে পড়া কিংবা হাত-পা-বুক শূলে বিদ্ধ করা,—এসব কাণ্ড ঘটিয়ে ধর্মঠাকুরের সপক্ষে জনমনে এক ধরনের বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। ধর্মের কৃপায় মৃতের পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হয়, এ জাতীয় বিশ্বাস আনয়নও নির্বিচারে চলে।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলো দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগে আছে ধর্মপূজার নিয়মাবলী ও আনুষঙ্গিক মন্ত্রতন্ত্রের বর্ণনা ; অন্যভাগে রয়েছে ধর্মমঙ্গলের মূল উপাখ্যান। ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যসূচক আখ্যানের তিনটি ভাগ উল্লেখযোগ্য,—১. সৃষ্টিপ্রকরণ ; ২. ধর্মপূজা প্রবর্তনমূলক উপাখ্যান ও ৩. ধর্মপূজার অনুষ্ঠানাদি। এই বিষয়গুলোই একত্রে 'ধর্মপুরাণ' নামে পরিচিত। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের নামটি উল্লেখ করা যায়।

রামাই পণ্ডিত।। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন গালগল্পের সঙ্গে রামাই পণ্ডিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কোন্ সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন সেই সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী ও লাউসেনের পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠা পান। রামাই গৌড়েশ্বর ধর্মপালের পুত্রের সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় ধর্মপাল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে এবং তৎপুত্র দেবপাল খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে গৌড়ের সম্রাট ছিলেন। এতে লাউসেনের সময় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী হলে রামাই পণ্ডিতও উক্ত শতকে বর্তমান ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই মতের সপক্ষে বলেছেন।[১৫৭] লামা তারনাথের তিব্বতি ভাষায় রচিত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে অবলম্বন করে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন লবসেন বা লাউসেন এবং রঞ্জাবতী রামপালের পর খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। রামাই রঞ্জাবতীর গুরু ছিলেন। এসব ধারণার মূল ভিত্তি নেই, অনুমান মাত্র। অনেক সময় রামাই

১৫৭. বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 'শূন্যপুরাণের ভূমিকা', (কলিকাতা, ২য় সং.) পৃ. ৬০

পণ্ডিত সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্পের উপর নির্ভর করেও এমন সব অনুমান করা হয়। প্রায় সর্বত্রই উল্লিখিত হয়েছে রামাই পণ্ডিত ডোমবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বামাই যে সেযুগে একজন সাহিত্যিক ছিলেন তার প্রমাণ তিনি ধর্মঠাকুরের ছড়া-পাঁচালী রচনা কবেছেন।

বামাই পণ্ডিত সম্পর্কে ধর্মপুরাণ গ্রন্থে যে কাহিনী বর্ণিত হযেছে তা হলো,—দ্বারকাধামে ধর্মপূজার সামান্য ক্রটিতে শাপগ্রস্ত বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ দ্বাদশ বৎসর পর বিষ্ণুব প্রসাদে সর্বগুণধর পুত্র বামাইকে লাভ করেন। বামাই বড় হযে ধর্মপূজায় নিবত হন। ধর্মপূজার পদ্ধতি রক্ষার জন্য বৃদ্ধ বয়সে রামাই ধর্মের দক্ষিণ চরণ থেকে প্রসৃত কেশবতীব পাণিগ্রহণ করেন। যথাকালে কেশবতীর গর্ভে বামাইযেব এক পুত্রসন্তান জন্মে। পুত্রের নাম বাখা হয় ধর্মদাস। ধর্মদাস ধর্মের সেবক হযেও কলির প্ররোচনায় মদ্যমাংস আহাব করলে বামাই পুত্রকে অভিশাপ দেন- 'হইবি ডোমের পুবোহিত।' পববর্তীকালে সদা ডোমের পিতৃশ্রাদ্ধাদি কবে ধর্মদাস ভুলক্রমে ডোমের কাছ থেকে তাঁর পৌরহিত্যের দক্ষিণা গ্রহণ করেন। বামাই পুনরায় তাঁকে অভিশাপ দেন,-

করিলি ডোমেব শ্রাদ্ধ বেদেব বিহিত।
দক্ষিণা গ্রহণ করি হলি পুরোহিত॥
তোমাব নাহিক দোয বিধিব লিখন।
কলিতে হইবে তুমি ডোমের ব্রাহ্মণ॥
[ময়ুরভট্টেব 'ধর্মপুবাণ' থেকে উদ্ধৃত]

শেষ পর্যন্ত ধর্মদাস ডোমেব পণ্ডিত হযে সবাইকে তাম্রদীক্ষা ও ধর্মশিলা বিতবণ করতে থাকেন। ধর্মদাসের এই পরিচয পেযে ব্রাহ্মণগণ তাঁকে অপমান কবেন। ফলে সমস্ত ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। পরে তাঁবা ধর্মদাসেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবে বোগমুক্ত হন। তাবপর কলিঙ্গবাজ ধর্মের গাজন গেযে পুত্র লাভ কবেন। ধর্মদাসও মাধব, মধুসূদন, সত্য ও সনাতন নামে চাবপুত্র লাভ কবেন। ডোমপণ্ডিতেব বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডোমদেব পৌবহিত্যের অভাবও ঘোচে।

রামাই পণ্ডিতেব 'শূন্যপুবণ' 'আগমপুরাণ' নামেও পবিচিত। এব অন্তর্গত রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটি হচ্ছে,--

আঁটকুড়ে রাজা হবিশ্চন্দ্র বাণী মদনাসহ সদুঃখে বনে বনে ঘুবে বেড়ান। একদিন ভল্লুকা নদীর তীবে এক সন্ন্যাসী ধর্মের পূজা দিলে তাঁদেব পুত্রসন্তান লাভেব কথা বলেন। একথাও বলেন পুত্রেব নাম যেন লুইচন্দ্র বাখা হয। লুইকে পরে ধর্মের নামে বলি দেওয়ার শর্ত দেওয়া হয। রাজারাণী তা মেনে নিয়ে রাজধানীতে ফিবে আসেন। যথাসমযে বাণীব গর্ভে লুইচন্দ্রেব জন্ম হয়। লুই বড় হলে একদিন বাজপুরীতে সেই সন্ন্যাসীব আবির্ভাব ঘটে। সন্ন্যাসী লুইয়েব মাংস খেতে চাইলে রাজারাণী ধর্মেব উদ্দেশ্যে তাকে বলি দেন। বাণী নিজ হাতে লুইয়ের মাংস বেঁধে সন্ন্যাসীকে খেতে দেন। সন্ন্যাসী তিনটি পাত্রে সেই মাংস বাড়তে বলেন। একপাত্র তাঁর ও অপর দুই পাত্র রাজা ও রাণীর। কিন্তু রাজারাণীর মুখে লুইয়ের মাংস রুচে না। সন্ন্যাসী তখন তাঁদের জানান যে লুইচন্দ্র মরে নি, সে গাজনে বেত হাতে নৃত্য করছে। বাজারাণী লুইকে ফিরে পেয়ে আনন্দে মশগুল হন। তখন থেকে দেশে ধর্মপূজা প্রচলিত হয।

রামাই পণ্ডিত ও শূন্যপুরাণ॥ নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। রামাই পণ্ডিতকেই এ গ্রন্থের রচয়িতারূপে মনে করা হয়। তবে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ধর্মের বিভিন্ন পূজারীই গ্রন্থখানি রচনা করে থাকবেন।[১৫৮] ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানের প্রধান ব্যক্তি লাউসেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁর কাল, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত অনুসারে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ। রামাই পণ্ডিত লাউসেনের সমসাময়িক এক ব্যক্তি।[১৫৯]

রামাই পণ্ডিত নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তিনি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। রামাইয়ের নামে 'ধর্মপূজা বিধান' ও 'শূন্যপুরাণ' এই দুটি পুথি প্রচলিত। শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'কলিমা জালাল' নামক একটি অধ্যায় আছে। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন অধ্যায়টি দিল্লীশ্বর ফিরোজ তুঘলকের উড়িষ্যা অভিযানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে।[১৬০] এর বর্ণিত বিষয় এরকম,--জাজপুরের পূর্বপার্শ্বের ব্রাহ্মণগণ ধর্ম উপাসকদের উপর অত্যাচার শুরু করলে তার প্রতিশোধ-মানসে ধর্মঠাকুর যবনরূপ ধারণ করেন এবং মুসলমান বেশধারী দেবদেবীদের সহায়তায় জাজপুর ধ্বংস করেন। মূল থেকে এই প্রসঙ্গের কিছু অংশ,--

ধর্ম হৈয়া যবনরূপী, শিরে পরে কাল টুপী,
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল ভেস্ত অবতার,
মুখেতে বলয়ে দম্বাদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন,
আনন্দেতে পরিলা ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর,
আদম হৈল শূলপাণি।
গণেশ হৈল কাজী, কার্ত্তিক হৈল গাজী,
ফকীর হৈল যত মুনি॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী, তিপু হৈল ছায়াদেবী
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন,
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙে, কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায়, রামাই পণ্ডিত গায়,
ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥

---

১৫৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৬৯০
১৫৯. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ১ম খণ্ড (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৩৮২), পৃ. ১২৬
১৬০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৩২

শূন্যপুরাণ পুথির অনেক জায়গায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা পাওয়া গেলেও[১৬১] ধর্মের গাজনের প্রয়োজনে হয়তো অনেক পুরোহিত ধর্মবিষয়ক বিচ্ছিন্ন ছড়া রচনা করেছেন। শূন্যপুরাণের উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজার উপাখ্যান ও নিরঞ্জনের 'রুস্মা' বা 'কলিমা জালাল'। ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকেও নিরঞ্জনের রুস্মার মূল্য আছে। বাংলার হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ সম্পর্কের কিছু ইঙ্গিত এতে আছে। শূন্যপুরাণ পুথির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় আছে। পুথির কোনো অংশের ভাষা বেশ পুরোনো, আবার কোনো অংশের ভাষা আধুনিকতার গাঘেঁষা। আসলে এ কাব্য বিভিন্ন পুরোহিত ও ভক্তের মিলিত রচনার এক সংকর সৃষ্টি ; বিক্ষিপ্ত শব্দ ও বাক্যাদির সমন্বয়ে এ কাব্যের এমন একটি রূপ দাঁড়িয়ে গেছে যে একদিকে এর আধুনিক রূপ, অন্যদিকে এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কিছু নিদর্শন,—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাষ।
কখন অন্ন খাএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
ঘরে অন্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥

রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং আশি বছর বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। একশ পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে রামাই পণ্ডিত খ্রিস্টীয় তেরো শতকে বর্তমান ছিলেন, তাহলে বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণ তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব। শূন্যপুরাণে বিবি, তোপ, বাজার, আলম, খাল ইত্যাদি যেসব মুসলমানি শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে, তা মুসলিম শাসনামলের প্রভাবসঞ্জাত বলে অনুমান করা যায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আখ্যান॥ দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন ছিলেন গৌড়াধিপতির অধীন একজন সামন্ত। উত্তর রাঢ়ের ঢেকুর-বাজ ইছাই ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধলে কর্ণসেনের ছয়পুত্র তাঁকে দমন করতে গিয়ে নিহত হয়। পুত্রশোকে রাণীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। বৃদ্ধ কর্ণসেন পরিশেষে গৌড়াধিপতির শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিয়ে করেন। এই বিবাহে ঘোরতর আপত্তি জানায় গৌড়াধিপতির শ্যালক ও মহাপাত্র মন্ত্রী মহাম্মদ। ফলে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা বাধে। ইতিমধ্যে ধর্মের বরে রাণী রঞ্জাবতী এক পুত্রসন্তানের জননী হন। সন্তানের নাম রাখা হয় লাউসেন। মহাম্মদ ক্রোধান্বিত হয়ে লাউসেনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু দেবতার কৃপায় সে লাউসেনের কোনো ক্ষতিই করতে পারলো না। লাউসেন যৌবনে পদার্পণ করে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে একদা গৌড়াধিপতির কাছে যাত্রা করেন। পথে মহাম্মদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু সব বাধা অপসারণ করে লাউসেন গৌড়াধিপতির কাছে পৌছেন। লাউসেনের সমর-নৈপুণ্য দেখে

১৬১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' (কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ম সং ১৯৭০), পৃ. ৬৯০

গৌড়াধিপতি মুগ্ধ হন। ফেরার পথে লাউসেন কালু ডোম ও তৎপত্নীর সঙ্গে পরিচিত হন। গৌড়াধিপতি তখন লাউসেনকে আদেশ দিয়ে একে একে কামরূপ-রাজ ও শিমূলের রাজা হরিপালকে পরাভূত করেন, লাউসেন খড়গাঘাতে লৌহগণ্ডারের মস্তক ছিন্ন করে হরিপালের কন্যা কানড়াকে বিবাহ করেন। গৌড়াধিপতি অতঃপর লাউসেনকে ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী সামন্তরাজা ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। লাউসেন বিষ্ণুর কৃপায় ইছাইকে পরাভূত করেন। এরপব লাউসেনকে আরো কঠোর পরীক্ষাব মুখোমুখি হতে হয়। তিনি তপস্যায় ধর্মকে তুষ্ট করে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় ঘটান এবং বন্দী পিতা-মাতাকে উদ্ধার করেন। এ সময় মহাম্মদ ময়নাগড় আক্রামণ করে। কালু ও তার পুত্র যুদ্ধে মারা যায়। কালুর বউ লখ্যা মহাম্মদকে যুদ্ধে বাধা দেয। পবে অবশ্য মহাম্মদ পরাজিত হয়ে দেশত্যাগ করে। আত্মীয় পবিজনসহ যথাসময়ে লাউসেন স্বর্গারোহণ কবলে তাঁর পুত্র ময়নাগড়ের রাজা হন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের মূল্যায়ন॥ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সাধারণ বাঙালির জীবন যেভাবে নিযন্ত্রিত হযেছে, দেবতাব একরোখা মনোভাবের কাছে যেভাবে তাবা আত্মসমর্পণ কবেছে, দৈবেব আক্রোশ দমনে যেভাবে তাবা দেবতাদেব স্বেচ্ছাচারেব কাছে নিজেদেব বিসর্জন দিযেছে, কখনো কখনো নিজেদের ব্যক্তিসত্তার অপমান করেও দেবতাদেব পদতলে লুণ্ঠিত হযেছে,- সেই অপমানিত মানবতা যেন ধর্মমঙ্গলের কবিদের রচনায় পূর্ণ মর্যাদায় আত্মপ্রতিষ্ঠাব পথ খুঁজে পায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দেবতার অনুগ্রহ লাভ কবেন, কিন্তু তুলনায় অন্যান্য চবিত্র দেবতাদেব সঙ্গে কোনো সম্পর্কেব সূত্রে গাঁথা নয। এবা সবাই প্রায় দেবশক্তিব দ্বাবা পবিচালিত না হযে বাস্তববোধের অনুগামী হয়েছে। কালু ডোম, লখ্যা ডোমনী প্রভৃতি অন্ত্যজ অস্পৃশ্য ব্যক্তি এবং কলিঙ্গা, কানড়া প্রভৃতি অভিজাত নাবী প্রকৃতপক্ষেই বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হযে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে গড়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যেব যেকোনো চবিত্রেব বাস্তব সম্পর্ক আমাদেব মুগ্ধ কবে। মহাম্মদ চরিত্রটি ধূর্ত বাজনীতিসুলভ কূটচক্রান্তের দ্বাবা পবিচালিত। লাউসেনের বিরুদ্ধে তাব যে স্বার্থসিদ্ধিব ভূমিকা, তাতে অলৌকিকতার কিছু সংস্রব থাকলেও রাজনীতিতে সে যে প্রচণ্ড বাস্তবতাব দ্বাবা পবিচালিত হযে কার্যোদ্ধাব করেছে --এটি অবশ্যই ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদেব জীবনরসেব প্রতি আনুগত্যেব পবিচয বহন কবে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে পূজাপ্রার্থী দেবচরিত্রেব তুলনায ধর্মঠাকুব তাঁর ব্যতিক্রমী স্বভাবের চমৎকার প্রকাশেব জন্য পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। যেকোনো অজুহাতে পূজা-আদাযেব প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে নেই। মহাম্মদ স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে তাঁর পূজা-প্রদানের আয়োজন করলে তিনি ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। মঙ্গলকাব্যের অনেক দেবদেবীর পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা সম্ভব হয় নি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল বিষয়ের চেয়ে তার কবি-জীবনীটি যেন এখানে বেশি আকর্ষণীয় হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যধারার রীতি অনুযায়ী কবিদের এসব জীবনী শুধু তাঁদের কুলপঞ্জির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এতে কবিদের জীবনের যে আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তার চিত্তচমৎকারিত্ব পাঠকের অনেক আনন্দের কারণ

হয়েছে। তবে কবিগণ কিছু গতানুগতিক বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন। যেমন,—কাব্য আরম্ভের আগে কবিমাত্রই দৈব স্বপ্নাদেশ পান, পথে ব্রাহ্মণবেশী ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটে, তখন কবির দিশেহারা অবস্থা হয়, কখনো তিনি আকাশে শঙ্খচিল উড়তে দেখেন, ঘরে ফিরে জ্বরের বিকারে পুনরায় স্বপ্নাদেশ পান। এসব বিষয় অবশ্য কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতেই যে বর্ণিত হয়েছে, তা মনে হয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি।। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কালনির্দেশক কিছু মন্তব্য থাকলেও তা থেকে কবিদের সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে অবহিত হওয়া যায় না। আদিকবি হিসেবে ময়ূরভট্টের নামটি উল্লিখিত হয়েছে।

ময়ূরভট্ট।। ধর্মপুরাণের কবি বলে আখ্যায়িত ময়ূরভট্ট এবং তাঁর কাব্য নিয়ে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে পণ্ডিতগণ নিজস্ব ধারায় মতামত দিয়েছেন। ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন কবি ময়ূরভট্টকে উক্ত কাব্যের আদিকবি হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যেমন,—

বন্দিব ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল।।
—মানিক গাঙ্গুলী

ময়ূরভট্ট বান্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।
—ঘনরাম চক্রবর্তী

ময়ূরভট্ট বন্দ দ্বিজ রূপরাম গায়।
—রূপরাম

ময়ূরভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে সীতারাম দাস গায়।
—সীতারাম দাস

ময়ূরভট্ট দ্বিজবরে, বিনয় করিয়া তারে,
পুন রচে শ্রীশ্যাম পণ্ডিত
—শ্যাম পণ্ডিত

আছিল ময়ূরভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদ অনাদ্যের গীত।।
—গোবিন্দরাম

বাংলা ১৩৩৭ সালে ময়ূরভট্ট-বিরচিত 'শ্রীর্ধর্ম্মপুরাণ' কাব্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ময়ূরভট্ট নামে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একজন কবি সূর্যশতক কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা যায়। ডক্টর সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গলের ময়ূরভট্ট ও সূর্যশতকের ময়ূরভট্টকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন।[১৬২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন সূর্যশতকের ময়ূরভট্টের কাল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।[১৬৩] অন্যদিকে কুলপঞ্জিকার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য বিচার করে তিনি ধর্ম্মপুরাণের ময়ূরভট্টের

১৬২ পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৪২

কাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক মনে করেন।[১৬৪] ধর্ম্মপুরাণের ভাষা বিচার করে কেউ কেউ এ কাব্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। অবশ্য এ গ্রন্থে আধুনিকতার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল, ডক্টর সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত মনে করেন ধর্ম্মপুরাণ অষ্টাদশ শতকের ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতা রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের পুথির অনুরূপ। ভণিতায় রামচন্দ্র স্থলে ময়ূরক ছাপা হয়েছে।[১৬৫] পুথির আধুনিকতার দৃষ্টান্ত, যেমন,—

ক. চারিদিকে বৃক্ষলতা গুল্ম নানা জাতি।
আলোক অনিল শূন্য ভয়ঙ্কর অতি॥
খ. এত বলি নারায়ণ খুলে পাঁজি পুথি।
বিচার করিয়া দেখে ভূমে খড়ি পাতি॥

কাব্যের ভাব, ভাষা এবং শব্দ প্রয়োগগত দিক থেকে বিচার করলে এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি ধারাব একটির কাহিনী হচ্ছে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী রঞ্জাবতীর পুত্রকে ধর্মের জন্য বলিদান। এ কাহিনীর আদি রচয়িতা বামাই পণ্ডিত। অপর কাহিনীটি হচ্ছে লাউসেনের কাহিনী এবং এ কাহিনীর আদি রচয়িতা ময়ূরভট্ট। তবে আদি রচযিতা তাঁকে নিঃসংশয়ে তখনই বলা যাবে যখন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাব দ্বারা তাঁর প্রাচীন পুথিব প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় এবং তা স্বমর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হয।

মানিকরাম গাঙ্গুলী॥ মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যে তাঁর কাল সম্পর্কিত একটি শ্লোক আছে। তবে তা লিপিকার কর্তৃক বিকৃত হওয়ায় তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। অবশ্য বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক তা সংশোধিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শ্লোকটি সংশোধন করেছেন এভাবে—'শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে। সিদ্ধাসহ যুগ দক্ষে যোগ তার সনে॥'[১৬৬] পদটি বিশ্লেষণ করে তিনি ১৪৯১ শকাব্দ বা ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ অনুমান কবেন। ড. দীনেশ সেনের মতে কাব্যেব রচনাকাল ১৩৮৯ শকাব্দ বা ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দ।[১৬৭] ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৪৮৯ শকাব্দ বা ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ মনে করেন।[১৬৮] যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ।[১৬৯] নানা মুনির নানা মত দেখে মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যের সঠিক কাল নির্ণয় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আসলে যত বড়ো পণ্ডিতই হোন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য যেহেতু প্রাচীন, সেজন্য প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জট নিরসনে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। মানিক গাঙ্গুলীর দুর্ভাগ্য, লিপিকারের খেয়ালখুশিতে তাঁর মূল শ্লোকটি বিকৃত হওয়ায় তাঁর কাল সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিরুদ্ধ মত সৃষ্টি করার অবকাশ ঘটে।

---

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
১৬৫. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৪২
১৬৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২০২
১৬৭. পূর্বোক্ত, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,' পৃ. ২৬৮
১৬৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭০০
১৬৯. দ্রষ্টব্য, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭০০

মানিক গাঙ্গুলীর আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত তাঁর পিতার নাম গদাধর,—'বাঙ্গলা গাঙ্গুলী গাঁই পিতা গদাধর।' পিতামহ অনন্তরাম এবং মাতা কাত্যায়নী। কবির জন্মস্থান বর্ধমানের বেলডিহা। ধর্মমঙ্গল কাব্যের রীতি অনুসারে কাব্যরচনার আগে পথেঘাটে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে। বাড়ি ফিরে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং সেই সঙ্গে তাঁর জীবনে আরো কিছু ঘটনা ঘটে, পরে কবি কাব্যরচনার আদেশ পান। মানিক গাঙ্গুলী নির্জন এক প্রান্তরে একদা ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান,—'অপূর্ব অদ্ভুত মূর্তি আসা-বাড়ি হাতে।' সেই বৃদ্ধের 'দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব-শরীর।' 'রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঞ্জপুরে তার ধাম।' কবি পদব্রজে রওনা হন। একটি ফুল তুলে 'ধর্মায় নমঃ' বলে তিনি ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে সেই ফুল নিবেদন করেন। বাড়ি ফিরে দুদিন পর তিনি রঞ্জপুর যান। তারাজুলির এক দস্যু তাঁকে আক্রমণ করে। অনেক কষ্টে কবি দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি রঞ্জপুর গেলেন, কিন্তু বিদ্যাপতি বলে কারোর সাক্ষাৎ পেলেন না। তারপর তাঁকে বাড়ি ফিবতে হলো। তাঁর জ্বব হলো। জ্বরের ঘোরে তিনি অনুভব করেন ধর্মঠাকুব যেন তাঁকে আদেশ করে বলেন,—

গীত বচ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া।
নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়া রায় নাম।
না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান॥
সঙ্কট সদয় হব করিলে স্মবণ।
অন্তকালে দিব দুটি অভয় চরণ॥

সাব্যস্ত হলো মানিক গাঙ্গুলী গান লিখবেন, তাঁব চতুর্থ সহোদর সেই গান গাইবেন। কিন্তু ধর্মেব গান সাধারণত নিচু জাতের লোকের গান। সুতরাং কবি বলেন,—'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান।' ধর্ম ঠাকুর তাঁকে অভয় দেন,—'আমি তোর জাতি। তোর অখ্যাতি হলে আমাব অখ্যাতি॥' এরপর আর কবি থেমে রইলেন না। তিনি ধর্মের গান লিখলেন। সমাজজীবনের চমৎকার পরিচয তাতে ধরা পড়ে, তার সঙ্গে তাঁর অনাবিল কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য।

মানিকবাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যরচনায় বাস্তবতার প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কালু ডোমের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনযাত্রার বর্ণনায কবি বাস্তবতার চমৎকার নির্দশন বেখেছেন,—

ম্লান মুখ সদাই শুকর সঙ্গে ফির্‌্যা।
কটিতে কোপীন তার গণ্ডা দশ গির্‌্যা।
তৈল বিনা তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।
কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালেব ডেড়ি॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভাবান কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের বাণীভঙ্গি, অলঙ্কার-প্রকরণ ও ভাষা ব্যবহারের তুলনায় মানিক গাঙ্গুলী ততখানি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে না পারলেও মানিকরাম ছোটখাটো জীবনের ছবি অঙ্কনে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'শীতলামঙ্গল' নামে মানিক গাঙ্গুলীর অপর একটি কাব্যের নাম পাওয়া যায়।

রূপরাম চক্রবর্তী ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা হিসেবে রূপরাম, রামদাস আদক, সীতারাম দাস ও যদুনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মমঙ্গলের আর একজন কবি খেলারামকে অবশ্য রূপরাম প্রমুখের পূর্ববর্তী কবি হিসেবে মনে করা হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আছে। রূপরামের কাব্যের কালজ্ঞাপক একখানি উক্তি,—

শাকে শীমে জড় হইলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারযুগ বেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তারে রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখ্যা কর্‌্যা নেহ॥

এই প্রহেলিকাময় উক্তির বিশ্লেষণ করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪–১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ বলে ধারণা করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন অবশ্য কবির উক্তির অর্থ ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন।[১৭০] রূপরামের একখানি প্রাচীন পুথিতে শাহ্ সুজার উল্লেখ আছে। 'রাজন্যবৃত্তের বিবরণী' থেকে জানা যায় শাহ সুজা ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন। রূপরাম লিখেছেন—'সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।' সুতরাং রূপরামের কাব্যেব কাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ।

মানিক গাঙ্গুলী তাঁর কাব্যে আদি রূপবাম বলে এক রূপরামের কথা উল্লেখ করেছেন,—

বন্দিয়া ময়ূবভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণ গান॥

এতে কেউ কেউ দুজন রূপরামের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। অবশ্য দুই রূপরাম সম্পর্কে প্রামাণিক এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায় না যাতে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়। ময়ূরভট্টের কথা ছেড়ে দিলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি প্রবর্তক হিসেবে রূপরামের নাম করা যায়। লোকজীবনে প্রচলিত লাউসেনেব গালগল্প ও ছড়াপাঁচালীকে রূপরামই প্রথম সার্থকভাবে আখ্যান–কাব্যের মধ্যে রূপদান করেন। তাঁর কাব্যে দেখা যায়, দেবতাব মহিমাকে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না করেও মানুষেব শৌর্যবীর্যকে মহৎ শিল্পের মহিমায় বিবৃত করেছেন।

রূপরামের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে তিনি বর্ধমান জেলার রায়না থানাধীন কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পণ্ডিত পিতা অভিরামের গৃহে প্রায় শতাধিক ছাত্রের বিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিলা। রূপরামসহ অভিরামের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিলো। রূপরামের লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ ছিলো না। তাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা রত্নেশ্বরের কাছে তাঁকে প্রায়ই গঞ্জনা শুনতে হতো। ছোট ভাই রামেশ্বর এবং ছোট দুই বোন সোনা ও হীরাকে রূপরাম খুব ভালোবাসতেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য কবি পাসণ্ডা গ্রামে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের কাছে যান। একদা গুরুব সঙ্গে তর্ক হলে ক্ষুব্ধচিত্ত গুরু তাকে 'ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।' এরপর রূপরাম নবদ্বীপ

১৭০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৫৭

যাত্রা করেন। সেদিন ছিলো শনিবার, সময় মধ্যাহ্ন। কবি পলাশবনের বিলের কাছে 'গোটা দুই আছাড় খাইল গোপাল দীঘির পাড়ে।' কিছু দূরে দু'টা বাঘ দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে। এমতাবস্থায় কিশোর কবি ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পান। শনিবারের সেই দিন কবির 'সম্মুখে দণ্ডাইল ধর্ম্ম গলে চন্দ্রমালা।' সুবর্ণ উপবীত পরিহিত ধর্মঠাকুর রূপরামকে তাঁর গীত রচনা করতে আদেশ দেন। আশ্বাস দিয়ে কবিকে বলেন,—'যে বোল বলিবে তুমি সে হবে গীত। সদাই গাহিবে গুণ আমার চরিত।' কবিকে তিনি মহাবিদ্যার মন্ত্র দিয়ে অদৃশ্য হন। কবির মাতৃচরণ মনে পড়ায় নবদ্বীপ যাওয়ার আগে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বাড়ি যান। রূপরাম বাড়ি ফিরে এলে তাঁর ছোট দুই বোন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,—'রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি-পুথি লয়্যা।' কিন্তু অগ্রজের কোপমূর্তির সামনে পড়ায় রূপরাম পুথিপত্রাদি ফেলে দৌড়ে পলায়ন করেন। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হলো না। এইভাবে অভুক্ত কবি গোপভূমের রাজা ব্রাহ্মণবংশীয় গণেশ রায়ের বাড়ি উপস্থিত হন। গণেশ রায় কবিকে দ্বাদশ পালায় ধর্মের গীত রচনার আদেশ দেন। তখন বাংলার সুবেদার ছিলেন শাহ্ সুজা। কবি ধর্মের গীত রচনা করেন এবং দোহারদের সহযোগিতায় ধর্মের গানও গান।

এই আত্মপরিচয়ে রূপরাম গার্হস্থ-জীবন এবং সামাজিক-জীবনের যে ছবি অঙ্কন করেছেন তাতে তাঁকে মুকুন্দরামের সমধর্মী মনে করা চলে। অবশ্য মুকুন্দরামের বর্ণনা যেমন বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগসূত্রে আবদ্ধ, রূপরামের বর্ণনার অতি-পল্লবিত বিস্তার তেমন কোনো যোগসূত্র তৈরি করতে পারে নি। তবে কোনো কোনো অংশে বর্ণনার আন্তরিকতা সহজেই চোখে পড়ে। যেমন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালার একটি বাৎসল্য-রসের বর্ণনা,—

বাছা বাছা বলিয়া বদনে চুম্ব দেই।
মদনার কোল হতে রাজা কেড়ে নেই॥
কোলে কর‍্যা ভূপতি বদনে চুম্ব খায়।
আনন্দ সাগরে ভাসে হরিশ্চন্দ্র রায়॥

অন্যত্র,—

আচল ধরিঞা লুঞা হাসে খল খল।
মদনা বুকের মাঝে ঝাঁপিয়া আঁচল॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিলা পুত্রের বদনে।
রাজরাণী হরিষ আনন্দ বড় মনে॥

রামদাস আদক॥ রামদাসের ধর্মমঙ্গল[১৭১] কাব্যের রচনাকালগত যে উক্তি আছে তা হলো,—

বেদবসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য পক্ষ্যে আট দিবস তাহার॥

---

১৭১. রামদাসের 'ধর্মমঙ্গল' 'আদিমঙ্গল' নামে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়

এতে ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।[১৭২] কবি তাঁর কাব্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক আত্মবিবৃতি দিয়েছেন। রামদাস হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম রঘুনন্দন, তাঁরা জাতে কৈবর্ত ছিলেন। চাষবাসই ছিলো তাঁদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কবি লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ পান নি। চৈতন্য সামন্ত নামক এক তহশীলদার কর্তৃক কবি একবার কারারুদ্ধ হন। সেখান থেকে কোনো প্রকারে মুক্তি পেয়ে তিনি মাতুলালয়ে পলায়ন করেন। পথে তিনি ঘোড়ায় উপবিষ্ট সিপাহী দেখেন। সিপাহী কবির পিঠে এক গুরুভার মোট চাপিয়ে দেন। ভারার্পিত কবির দুঃখ দেখে স্বয়ং ধর্মঠাকুর সেখানে আবির্ভূত হয়ে কবিকে বলেন,—'ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি।' কিন্তু রামদাস যে মূর্খ। ধর্মকে তিনি সকাতরে বলেন,—

পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া।
গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া॥

তাতে কি আসে যায়? স্বয়ং ধর্মঠাকুর তো তাঁর সহায়ক। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিলেন, 'আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি।' সেই থেকে রামদাস কাব্য রচনায় হাতে দেন এবং ধর্মের গান শেষ করে রাজারাম ও অভিরাম নামক দুইজন দোহাকারের সাহায্যে আসরে ধর্মের গান গেয়ে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হন। ব্রাহ্মণ জমিদার যাদবচন্দ্র রায় রামদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জমিদারীর পদস্থ কর্মচারী করেন।

রামদাসের 'অনাদিমঙ্গল' কাব্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে ভণিতায় রামদাস থাকলেও তাঁর কাব্যের বারো আনাই রূপরামের পুথির বস্তু।[১৭৩] এছাড়া কাব্যের ভাষায় ও বর্ণনায় প্রাচীনত্বের লক্ষণ নেই বললেই চলে। যেমন,-'কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে', 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে', 'চাঁদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় সুখ', 'সজারুর হাতে যেন সিংহের মরণ', 'দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশিকলা' ইত্যাদি।

সীতারাম দাস॥ সম্ভবত ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে সীতারাম দাস তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাতে তাঁকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফেলা যায়। তিনি দক্ষিণ রাঢ়স্থ কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রাম বলে নির্দেশ করেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, 'নিবাস সুখসাযের, মাতুলালয় ইন্দাস।'[১৭৪] আবার কারো কারো মতে সীতারাম দাস বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[১৭৫] তাঁর পিতার নাম দেবীদাস। সভারাম বলে তাঁর এক ভাই ছিলো। যাঁরা তাঁকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন তাঁদের মধ্যে খণ্ডঘোষ নিবাসী অযোধ্যারাম চক্রবর্তী ও নারায়ণ পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য।

---

১৭২. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃ. ১৬২
১৭৩. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ' [পাদটীকা দ্রষ্টব্য], পৃ. ১৬২
১৭৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৬৬
১৭৫. পূর্বোক্ত, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭

সীতারাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে গতানুগতিক ধারায় আমাদের আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন। শ্যাওড়া বনে কাঠ আনতে গিয়ে সীতারাম দেখেন তাঁর মাথার উপর শঙ্খচিল উড়ছে। তামাকু সেবনরত এক লোক তাঁকে জানায় সিপাহী আসছে। কবি ভয় পেয়ে দৌড় দেন। বৈশাখ মাসে কুরচি ফুলের শোভায় বন আলোকিত। কবি মুগ্ধ হয়ে তার বর্ণনা দেন। এদিকে মনে সিপাহীর ভয়। ঘোড়া আসছে ছুটে। সন্ত্রস্ত কবি সিপাহী আসছে মনে করে পড়ি-মবি দৌড় দেন। এমন সময় নিরঞ্জন নিরাকার জটা ঠাকুর তাঁকে সাক্ষাৎ দিয়ে বলেন,—'আমাব মঙ্গল গীত কর গিয়া তুমি।' কিন্তু মূর্খ সীতারাম তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে ঠাকুর বললেন,—'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে।' বাড়ি ফিরে কবি জ্বরে পড়েন। এরপর গজলক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন, ধর্মেব গীত রচনা করো। অবশেষে নারায়ণ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে কবি চল্লিশ দিনে ধর্মের গীত রচনা করেন।

সীতারামেব রচনা কবিত্বেব মাধুর্য থেকে বঞ্চিত। পাণ্ডিত্য প্রকাশেও তাঁর বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই। সীতারামের ভাষাব কিছু নিদর্শন,---

গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খাণ্ডা।
সারি পথ ঘোডাব বসিতে নাঞি দাণ্ডা॥
তারপর বেতগড পটি হাতখানা।
কেয়া বনে দেখি কত পিব্যাসির থানা॥
গুয়াগুড গভীর দেখিয়া প্রাণ উড়ে।
সাত হাত দরিযা পঞ্চাশ হাত আড়ে॥

দশম অধ্যায়

অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য

দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় অংশ (খ্রিস্টীয় ১৭ শতক)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

সপ্তদশ শতক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের শ্রেষ্ঠ বিকাশকাল। এই শতকেই রোসাঙ্গে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের চর্চা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। এই শতকের দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবির গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্য-কীর্তি মুসলিম বাংলার জাতীয় ইতিহাসে পরম বিস্ময়কর অবদান রূপে স্বীকৃতি পায়। প্রণয় গাথার মধ্য দিয়ে জীবনের মাধুর্য তখন ধর্মসম্বন্ধের বাইরে অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে ; সাহিত্যের রূপ ও রস কবিত্বের শাশ্বত সৌন্দর্যের স্পর্শে আরো মধুময় হয়ে ওঠে। তৎকালীন হিন্দু পৌরাণিক আদর্শপুষ্ট সাহিত্যের ধারায় আরবি ফারসি কথাবস্তুর সঙ্গে সর্বভারতীয় বিষয়-ভাবনার চমৎকার সমন্বয়-সাধনের মাধ্যমে বাংলায় তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব হয়, এই বিকাশ-বৈশিষ্ট্যকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমরূপেই চিহ্নিত করা যায়। আলাওল এই শতকের মুসলিম কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, এমন কি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবিরাও পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে ও প্রয়োগদক্ষতায় তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারেন না। সপ্তদশ শতকের আদি মুসলিম কবি হিসেবে মুহম্মদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য।

দুই।। সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি

মুহম্মদ খান।। মুহম্মদ খান তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে পীর বদরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এই পীর বদর কবির পূর্বপুরুষ মাহি আসোয়ারকে চট্টগ্রামে সাদর সমাদরের সঙ্গে বরণ করেন। মাহি আসোয়ার ১৩৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে আসেন বলে অনুমান করা হয়।

মুহম্মদ খানের আত্মজীবনীর গুরুত্ব অনেক। তাঁর পূর্বপুরুষগণ তৎকালীন চট্টগ্রামের প্রায় তিন শ বছরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[১৭৬] মুহম্মদ খানের প্রথম পূর্বপুরুষ মাহি আসোয়ারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পূর্বপুরুষ রাস্তি খান ও তৎপুত্র পরাগল খান এবং পরাগলপুত্র ছুটি খান যথাক্রমে তৎকালীন গৌড়াধিপতি হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) অধীনে ফেনী নদীর দক্ষিণ তীরে সীমান্তরক্ষী বা লস্কর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চট্টগ্রামের পরাগলপুর অঞ্চল পরাগল খানের স্মৃতি বহন করছে। রাস্তি খানের অপর এক পুত্রের নাম মিনা খান। মিনা খানের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পুরুষ ইব্রাহিম বা বিরহিম খান ও তাঁর ভাই মুবারিজ খান। এই মুবারিজ খানের পুত্রই হচ্ছেন কবি মুহম্মদ খান। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কবি মুহম্মদ মুকীম তাঁর 'গুল-ই-বকাউলি' কাব্যে পূর্বসুরি কবি হিসেবে সৈয়দ সুলতান ও তাঁর শিষ্য মুহম্মদ খানের নাম উল্লেখ করেন।

---

১৭৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭

মুহম্মদ খান তাঁর 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' কাব্যে নিজের কালনির্দেশক একটি উক্তি করেছেন, 'দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি। রাত্রি হইয়া গেল সংসার অবধি।' ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রথম বাক্যটির যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—দশ শত=১০০০, বাণ শত=৫০০, বাণ দশ=৫০, দধি=৭ ; অর্থাৎ ১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৫৫৭+৭৮=১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ। 'মক্তুল হুসেন' কাব্যে মুহম্মদ খান কালনির্দেশক আরো একটি পদ লিখেছেন। পদটি হেঁয়ালিময় এবং বেশ দীর্ঘ। যেমন,—

মক্তুল হোসেন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার।
মুছলমানি তারিখের দশ শত ভেল।
শতেব অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল॥
হিন্দুয়ানী তারিখের শুন কহি কত।
বাণ বাহু শত অব্দ আর বাণ শত॥
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া দধি।
পঞ্চলিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি॥

এতে মুসলমানি হিজরি সনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—দশ শত=১০০০ ; শতেব অর্ধেক=৫০ ; ঋতু=৬ ; তদনুযায়ী ১০৫৬ বা ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ।[১৭৭] উপর্যুক্ত তথ্যসূত্রে অনুমান করা যায় কবি মুহম্মদ খান খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের লোক।

মুহম্মদ খানের নামে মোট সাতটি কাব্যের নাম পাওয়া যায়—'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ', 'হানিফার লড়াই', 'আসহাবনামা', 'মক্তুল হুসেন', 'কিয়ামত নামা', 'দজ্জালনামা' ও 'কাসিমের লড়াই'। তবে 'আসহাবনামা' ও 'কিয়ামতনামা' প্রকৃতপক্ষে 'মক্তুল হুসেন' কাব্যেরই অংশবিশেষ।

১ থেকে ৫৫ পাতায় সমাপ্ত রূপকধর্মী কাব্য 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদে' সত্য ও কলির রূপকাবরণে কবি ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পুণ্যের বিশ্লেষণ করেছেন। কলিকে পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের কালরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে প্রায় সবদেশেই এরূপ একটি সাধারণ সংস্কার আছে যে যা কিছু সৎ ও ন্যায়, সত্যযুগেই তা ছিলো। কলিকালে এসে যা কিছু সত্য তার বিলোপ হয়েছে। হিন্দুপুরাণে তার উল্লেখ আছে। তবে সত্য ও কলির দ্বন্দ্বে তত্ত্বঘটিত কোনো বিষয় আরোপ না করে মুহম্মদ খান তাঁর কাব্যের বিষয়ে রোমান্সরস আমদানি করেছেন। মূল কাহিনীর অভ্যন্তরস্থ উপাখ্যানগুলোতে রোমান্সের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। উপাখ্যানগুলোর মধ্যে রয়েছে বেতালপঞ্চবিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান, চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতি উপাখ্যান, সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা উপাখ্যান এবং কিস্মিক রাজার উপাখ্যান। মুহম্মদ খানের শিল্পচেতনায় কবিত্বের দিকগুলো বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ; রচনারীতিতে বৈষ্ণব পদাবলীর ঢং অনুসৃত হয়েছে। যেমন,—

১৭৭. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৮৩ ; পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,' ২য় খণ্ড, পৃ ৫৮৭.

নাচে মধুরস সিন্ধু মাঝে যুতি মাধবী হইল কোড়ে।
পূরব জনমে গৌরী আরাধিলুঁ তেকাজে পাইলুঁ তোরে॥
গাঢ় আলিঙ্গন সঘন চুম্বন চুম্বিয়া কাজল দেশ।
ধরি কুচ ঘন স্থাবর জঙ্গম নখরে ঘাও বিশেষ॥

'গাঢ় আলিঙ্গন সঘন চুম্বন', 'ধরি কুচ ঘন' ইত্যাদি বাক্যে মধ্যযুগের অশ্লীল প্রয়োগকে কবি উপেক্ষা করতে পারেন নি। শিল্পের সুন্দর পরিচর্যা এগুলোতে নেই।

মুহম্মদ খান তাঁব 'মক্তুল হুসেন' কাব্যখানি লিখেছেন তাঁর পীর সৈয়দ সুলতানের নির্দেশে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কবি বলেছেন,—

শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর॥
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান॥
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা।
অবশেযে বচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা॥
তান আজ্ঞা শিবে ধরি মনেতে আকলি।
চারি আসব্বার কথা কৈলুঁ পদাবলী॥

মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হুসেন' জঙ্গনামা জাতীয় কাব্যেব মধ্যে প্রাচীনতম। ডক্টর সুকুমার সেনেব মন্তব্য,-'সবচেয়ে পুবানো জঙ্গনামা বোধ করি কবি মোহাম্মদ খানের 'মুক্তাল-হোসেন (১০৫৬ হিজরী, ১৬৪৬ খ্রীঃ)।'[১৭৮] কবি ফারসি থেকে কাব্যটি ভাবানুবাদ করেছেন। তবে কাব্যের প্রসাধন-পারিপাট্যে কবির মৌলিকতার পরিচয় আছে। হুসেন-নিধনের ঐতিহাসিকতার প্রতি মুহম্মদ খানের অনুরাগ প্রকাশ পায নি। বরং কাব্যরস সঞ্চারণের প্রতিই তাঁব অধিক মনোযোগ লক্ষ্য কবা যায়। 'মক্তুল হুসেনে'ব শ্রেষ্ঠত্ব অন্যভাবে নিরূপিত হতে পারে। কাশীদাসী মহাভারতেব মতো মহাকাব্যোচিত ভাবগাম্ভীর্য অনুধাবন করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'মক্তুল হুসেন'কে মহাভারতেব প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিবেচনা কবেছেন।[১৭৯] এ কাব্যের পরিকল্পনাও যেন মহাভাবতের কথা স্মবণ কবিয়ে দেয়।

মুহম্মদ খান মূলত একজন অনুবাদক ছিলেন। তবে নিজস্বতাব কাবণে তাঁর রচনায় মৌলিকতা-গুণের চমৎকার অভিসিঞ্চন ঘটেছে। ধর্মীয় কাহিনীব উপর বিষয়ানুরূপ ধর্মীয় তত্ত্বের ব্যবহার থাকলেও তিনি তাঁব কাব্যকে সাহিত্যরস থেকে বঞ্চিত না করে তাকে কলাসৌন্দর্যের অভিমুখী কবেছেন। 'মক্তুল হুসেন' কাব্যেব বিষয় অনুযাযী কবি করুণ রস সৃষ্টি কবেছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। 'হুসেন-নিধন' অংশে কবির করুণ রস সৃষ্টির একটি প্রয়াস,—

মুখে জল দিয়াছিল হোসেন সুমতি।
হেনকালে সতি নামে পাপিষ্ঠ দুর্মতি॥
গরল মিশ্রিত বাণ শীঘ্র ছান্দি ছাড়ে।

১৭৮. সুকুমার সেন, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা : ১ম সং. ১৩৫৮), পৃ. ৪৫
১৭৯. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৮৯

হোসেনের গ্রীবা বিন্ধিলেক পাপী শরে॥
অঞ্জলি ভরিয়া জল কহিতে লাগিল।
জল সঙ্গে রুধির ঝলক নিকলিল॥

একজন উৎকৃষ্ট কবির যাবতীয় শিল্পগুণ মুহম্মদ খানের মধ্যে ছিলো। তাঁর কাব্যিক ভাবনায় শিল্পসৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। সখিনার রূপবর্ণনা থেকে তার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হলো,—

ঢাচর চিকুর খোঁপা শোভয় জাদের খোপা।
মুক্তাদামে ছান্দের কবরী॥
মুখচন্দ্র রাহু গিলে দেখি তার বিম্বফলে।
কোপে রাহু কেশে বহে বেড়ি॥
মুখ দেখি কবি দ্বন্দ্ব অলি বলে মকরন্দ
চকোবে বলেন দ্বিজরাজ॥
নিধিয়ে ভাঙ্গিলে দ্বন্দ্ব অর্ধপদ্ম অর্ধচন্দ্র।
ভুরুধনু সীমা দিয়া মাঝ॥
নয়ন নাচন দেখি ধাইল খঞ্জন পাখি।
কটাক্ষে হানিল কামবাণ॥
মৃগমদ পত্রাবলী মৃগাঙ্গ কলঙ্ক বলি।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভমান॥

কবির উপমাপ্রযোগে তেমন অভিনবত্ব না থাকলেও শব্দনির্বাচনে তাঁর শিল্পসচেতনতার পরিচয় আছে।

মুহম্মদ খানের অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'আসহাবনামা' কাব্যটি 'মক্তুল হুসেন' কাব্যেরই একটি পরিপূরক অংশ।

কাববালাব ঐতিহাসিক প্রান্তরে হাসান-পুত্র কাসেম-নিধন ও কাসেমের সদ্যবিবাহিত পত্নী সখিনাব বিলাপেব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'কাসেমের লড়াই' কাব্যে।

'দজ্জালনামা'য় দজ্জালের বীভৎস আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তার নির্মম প্রকৃতি ও অত্যাচাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মুহম্মদ হানিফের শৌর্যবীর্যের কাহিনী অনেক পুথিকারের শিল্পীমানস আন্দোলিত করেছে। 'হানিফার লড়াই'য়ের কবি মুহম্মদ খানও এই বিশেষ কাল্পনিক চরিত্রটির বীর্যবত্তায় প্রভাবিত হয়ে হানিফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীব একটি বিশদ বর্ণনা দেন।

শেষ বিচারের দিনে হজরত তাঁর পাপীতাপী উম্মতদের নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'কেয়ামতনামা'য়।

শেখ মুত্তালিব॥ শেখ মুত্তালিবের পিতা শেখ পরাণও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। শেখ পরাণ ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বে বর্তমান ছিলেন।

শেখ মুত্তালিব তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থে তাঁর পিতা শেখ পরাণের উল্লেখ করে বলেছেন,—

সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন।
তাহান নন্দন হীন মুত্তালিব ভাণ॥

এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে শেখ পরাণ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। সেই সূত্রে শেখ মুত্তালিবকেও সীতাকুণ্ডের অধিবাসী মনে করা যায়।

শেখ মুত্তালিব ছিলেন ইসলাম শাস্ত্রীয় বিষয়ের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' নামক ধর্মীয় গ্রন্থখানি আরবি এবং বাংলা এই দুটি হরফেই লিখিত হয়েছিলো। শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হিসেবে এর জনপ্রিয়তাও ছিলো বিপুল।

শেখ মুত্তালিব তাঁর নিজের কিংবা তাঁর গ্রন্থের কালজ্ঞাপক কোনো সরাসরি বক্তব্য রাখেন নি। তবে আরবি 'আবজাদ রীতি'তে গ্রন্থ-রচনার তারিখ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে দুটি কালনির্দেশক উক্তি এ রকম,—

সর্বলোকে বঙ্গভাষে কহিছে বিচার।
কেহ না কহিছে তারে ভাঙ্গিয়া সে সার॥
ইসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত।
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত॥
সপ্তমে হৈল পুনি এবাদত নাম।
সেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম॥

অন্য উক্তিটি হচ্ছে,—

পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম ।
কিফায়াতুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম॥

কবির এই ইঙ্গিতাত্মক বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন,— 'ইহার দীন, ইসলাম, কিফায়িতুল-মুসল্লিন এবং নাম—এই কয়টি শব্দের অক্ষরের সংখ্যা এইরূপ, দীন—৬৪, ইসলাম—১৩২, কিফায়িৎ—৫১০, আল মুসল্লিন—২৫১ (এখানে নাম দুইটি), মোট ১০৪৮ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।'[১৮০] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমত অনুযায়ী অনুমান করা যায় শেখ মুত্তালিব সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের লোক ছিলেন। তবে সম্ভবত তাঁর জীবনকাল দ্বিতীয়ার্ধেব পরেও বিস্তৃত হয়েছিলো।

শেখ মুত্তালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' পুস্তকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর পিতার কবিখ্যাতি সম্পর্কে জানা যায়। তাই সগর্বে তিনি পিতার কথা উল্লেখ করে নিজেকে 'তাহান নন্দন হীন মুত্তালিব' বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। মুত্তালিব শৈশবেই পিতৃহীন হন। পিতৃহীন অনাথ পুত্র তখন প্রতিপালিত হন রহমতুল্লাহ নামক জনৈক গুণী ব্যক্তি কর্তৃক। রহমতুল্লাহ যথার্থই একজন গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে

---

১৮০. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৯৬-১৯৭

যেমন ধার্মিক ছিলেন, তেমনি তাঁর ধর্মবোধ তথা শাস্ত্রজ্ঞান ছিলো প্রখর। এরূপ একজন গুণী ব্যক্তির সংস্পর্শে শেখ মুত্তালিবও পরবর্তীকালে ধর্মীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত হন। তারই চমৎকার নিদর্শন রক্ষা করেন কবি তাঁর 'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থে। মৌলবী রহমতুল্লা কবির একজন প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষকই শুধু ছিলেন না, তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু ও ধর্মীয় বিষয়ে একজন দীক্ষাগুরুও ছিলেন। শেখ মুত্তালিব অকপটে এসব কথা বিবৃত করেছেন। যেমন,—

মৌলবী রহমতুল্লা আলিম অনুপাম।
দানে দাতা ভয়ে ত্রাতা সর্বগুণধাম॥
অন্নবস্ত্র দিয়া বহু করিয়া যতন।
অনুক্ষণ প্রীতিভাবে করন্ত পালন॥
তাহান নিকটে মোরে সদাই বসাই।
কিতাবের রওয়ায়েত কহন্ত বুঝাই॥
তাহান আদেশ মুঞি শিরেত ধরিয়া।
করযুগে তান দুই চরণ বন্দিয়া॥
ওস্তাদ সকল পদে করম আরতি।
কেফায়তুল মোছল্লিন পুণ্যের ভারতী॥
সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরাণ সুজন।
তাহান নন্দন হীন মোত্তালিব ভাণ॥

শেখ মুত্তালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থে মূলত ধর্মীয় বিষয়কেই গ্রন্থরচনার উপজীব্য করেছেন। ইসলাম ধর্মের পালনীয় বিষয়গুলো জনসাধারণকে জ্ঞাত করা কবি তাঁর কর্তব্য মনে করেন। সেই সূত্রে 'কিফায়তুল মুসল্লিনে'র 'ওয়াজিব কথা বঙ্গভাষে কহে শেখ পরাণ নন্দন'। প্রত্যেকটি মুমিন মুসলমানের জন্য ইসলাম অবশ্য-পালনীয় কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন, ওজু, নামাজ, রোজা, এবাদত ইত্যাদি। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে এসব বিষয়ের অপরিহার্য সম্পর্কও রয়েছে। এবং এসব ধর্মীয় বিধান পালনে মানুষের জীবন যে বহুলভাবে পরিশোধিত হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শেখ মুত্তালিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিনে' ধর্মীয় জীবনের এসব কথা অকপটে বিবৃত হয়েছে।

'কিফায়তুল মুসল্লিন' গ্রন্থটি আরবি হরফে লেখা। এর একটি প্রতিলিপি থেকে কবি বাংলা ভাষায় এ গ্রন্থ লেখেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে দেশী ভাষায় গ্রন্থলেখা অমার্জনীয় শাস্ত্রবহির্ভূত কাজ বলে মনে করা হতো। ধর্মীয় ভীতিই যে তার কারণ সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য সমাজের রোষ নিবারণার্থে কবিকে একটা বড়ো রকমের কৈফিয়তও দিতে হয়েছে। ধর্মীয় ভাষাকে ভেঙ্গে দেশী ভাষায় তার স্থানান্তর করায় পাপ হওয়ার যে সম্ভাবনা, কবি নিজেও সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তবে তাঁর স্বস্তি ছিলো যে ধর্মের পালনীয় বিষয়গুলোকে অন্তত সাধারণের বোধগম্য করার একটা মহান কর্তব্য তিনি পালন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর উক্তি,—

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশি ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানী শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ॥

কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়ে মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে॥
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লাহ পাপ ক্ষেমিবেক॥
এসব জানিয়ে যদি করয়ে রক্ষণ।
তবে সে মোহরে পাপ হইবে মোচন॥

দেশী ভাষায় শাস্ত্রকথা বয়ানে শেখ মুত্তালিবের মনে যে পাপভীতি তাকে তৎকালীন লোকসমাজের অন্ধ সংস্কারের বহিঃপ্রকাশ রূপেই মনে করা যায়। তবে তখনকার অনেক কবিই সমাজের এই বদ্ধ সংস্কারকে মেনে নেন নি ; আর তা মেনে নেন নি বলেই সমাজপতিদের অযৌক্তিক গোঁড়ামির প্রতিবাদ করেছেন। একজন ধর্মভীরু মুসলমানের ভয় ভাবনা সত্ত্বেও শেখ মুত্তালিব তৎকালীন অনেক মুসলিম কবির মতো বাংলা ভাষার প্রতি আজন্ম প্রীতিবশে মুসলিম শরাশরীয়তের বিষয়কে বাংলায় পরিবেশন করার ঝুঁকি নেন ; লেখেন তাঁর বিখ্যাত ধর্মীয় কাব্য 'কিফায়তুল মুসল্লিন'। কবির ভীরু মনের কোণে সমর্থন যুগিয়েছে তাঁর বিশ্বাস। তিনি মনে করেন আরবি ভাষা সম্পর্কে যেসব সাধারণ মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ তারা অন্তত তাঁর বই থেকে উপকৃত হবে এবং তাঁর এই মহৎ বাসনা বাস্তবায়িত হওয়ায় আল্লাহ নিশ্চয় তাঁকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং তিনি মন্তব্য করেন,--

আরবীর ভাযে হএ কর্ম মুসলমানি।
হীন মুত্তালিবে কহে করি বঙ্গবাণী॥

একথা ঠিক যে গ্রামের মানুষ স্বভাবতই খুব ধর্মভীরু, অথচ ধর্মীয় কথা শোনার আগ্রহও তাদের কম নয়। কিন্তু ধর্মীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু ধর্মের অনেক বিষয়ই তারা জানতে পারে না। শেখ মুত্তালিব 'কিফায়তুল মুসল্লিন' কাব্য রচনা করে গ্রামের ধর্মভীরু মুসলমানদের শাস্ত্রকথা বুঝবার সুযোগ দেন।

শেখ মুত্তালিব মনেপ্রাণে একজন শাস্ত্রজ্ঞ কবি হওয়ায় তাঁর 'কায়দানী কিতাব' গ্রন্থখানি একই বিষয়ের উপর লেখা একটি শাস্ত্রীয় কাব্য। এ গ্রন্থটিও তত্ত্বপূর্ণ শরাশরীযত বিষয়ের উপর রচিত। কবির শিক্ষাগুরু মৌলবী রহমতুল্লাহর কাছ থেকে কবি ইসলামি শরীযত সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেন তারই উপর ভিত্তি করে তিনি লেখেন তাঁর অন্যতম ধর্মীয় গ্রন্থ 'কায়দানী কিতাব'। শাস্ত্রজ্ঞ আলেম রহমতুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেন,---

উত্তর দেশেতে ছিল ফাজিল মহাজন।
তান নাম রহমত কহি সর্বজন॥
কিতাব পড়িয়া দেখি বুঝাইল মোরে।
মুই হীন দুর্গতিয়া কহি মুখে করে॥

ভণিতায় কবির উক্তি,—

হীন মোত্তালিব কহে আল্লাকে ভাবিয়া।
কহিমু কায়দানী কিতাব বাংলা রচিয়া॥

আসলে ধর্মীয় বিষয়ই শেখ মুত্তালিবের আকর্ষণের কারণ, সেজন্য তিনি রোমান্টিক গালগল্পের দিকে না ঝুঁকে মানুষের মনে ইসলামের তত্ত্বকথাকে জাগানোর ব্রত গ্রহণ করেন। 'কায়দানী কিতাব' গ্রন্থেও কবি যেসব বয়ান দিয়েছেন তার মধ্যে 'কিফায়তুল মুসল্লিনের'ই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেজন্য বলা যায় কবির ধর্মীয় চিন্তার এক কায়দা 'কিফায়তুল মুসল্লিনে,' আর এক কায়দা 'কায়দানী কিতাবে'। ধর্মকথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—

শরীয়ত কায়দা এই শুনহ বয়ান॥
কহিছি অপর কায়দা কিতাবেতে পাই।
নামাজের কায়দা পুনি কহিবারে চাই॥

'কায়দানী কিতাবে' শেখ মুত্তালিব যে আত্মকথা বিবৃত করেছেন তাতে তৎকালীন কাব্যরীতি অনুযায়ী কিছু অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির এই অভিনব প্রয়াসের কিছু নমুনা,—

ত্রিশ রোজা ত্রিশ নিয়ত কহিলাম পুনি।
একশত ত্রিশ ফর্জ লত্ত জানি গুনি॥
ফাজিলের পদে গিয়া এই কথা শুন।
আহ্মি হোস্তে বাড়া ফাজিল আছে মনে গুণ॥
কি জানি কি বুঝি আমি কিতাব বেওর।
পড়িবার অক্তে বাপ মরি গেল মোর॥
গৃহবাসে বলা আর দুনিয়ার বেভার।
বেড়িল আপদে মোর দরস মাঝার॥
এ জন্য পড়িবারে নারিলুম বিস্তর।
অল্প অল্প জানিলুম শরার খবর॥

মীর মুহম্মদ সফী॥ মীর মুহম্মদ সফী নিজে যেমন মধ্যযুগের একজন কবি, তেমনি তাঁর জন্মও কবি-বংশে। তিনি মধ্যযুগের প্রখ্যাত মুসলিম কবি সৈয়দ সুলতানের পৌত্র।[১৮১] সৈয়দ সুলতান তাঁর যুগে শুধু একজন কবিরূপেই পরিচিত ছিলেন এমন নয়, ধর্মভীরু মুসলমানদের কাছে তাঁর খ্যাতি ছিলো একজন পীর হিসেবে। সেই সূত্রে তাঁর অনেক মুরিদও ছিলো। আলেমী ও পীরালী ছিলো সুলতান পরিবারের একটি বংশগত ধারা। এই বংশগত ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিবারের সদস্যগণের নামের আগে 'মীর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে মীর মুহম্মদ সফী ভক্তির সঙ্গে বলেছেন,—

কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখমতি।
এহলোকে পরলোকে সেই দূরগতি॥
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ॥

সৈয়দ সুলতানের শিষ্যদের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী ছিলেন। তার মধ্যে মধ্যযুগের অন্যতম খ্যাতিমান কবি মুহম্মদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য। মীর মুহম্মদ সফীর পিতামহ সৈয়দ সুলতান সম্পর্কে মুহম্মদ খানের একটি সশ্রদ্ধ মন্তব্য,—

---

১৮১. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫২

শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর॥
নবীবংশে রচিছিলা পুরুষ প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান॥

মীব মুহম্মদ সফীদের বংশের এই পীরালী ঐতিহ্য পরবর্তী প্রজন্মে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এঁরা যেহেতু ঐতিহ্যগতভাবে খানদানী পরিবারের লোক, সুতরাং লোকসমাজে তখন তাঁদের খায়খাতিরও ছিলো বিপুল।

সমালোচক ও গবেষকগণ মীর মুহম্মদ সফীর পরিবাব-জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। ডক্টর আহমদ শরীফেব মতে সফীর পিতাব নাম সৈয়দ হাসান। তবে কবির পিতার নাম যে সাজাহান ছিলো, কবি নিজে সেকথা ব্যক্ত কবেছেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে সফী বলেছেন,--

কহে মোহাম্মদ সফী আমি বড় দুখী॥
ইহালোক পবলোক পরের পীরিতি।
পিতা মোব সাজাহান সহিদ দরবেশ।
কিঞ্চিত জানাইলা মোরে পন্থের উদ্দেশ॥

বর্ণনা অনুযাযী সফীব পিতাও একজন ধর্মানুরাগী দরবেশ ছিলেন। তবে পিতা যে-কোনো লক্ষ্যেই হোক, শহীদ যে হযেছিলেন কবি তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এসব বাক্য অবশ্যই সফীর পবিবাবেব সুনাম বহন করে।

মীব মুহম্মদ সফী তাঁর কাব্যে তৎকালীন পীব-কবিদের সম্পর্কে আরো তথ্য জানিয়েছেন। মধ্যযুগের মাবফতী তত্ত্বেব কবি হাজী মুহম্মদও যে একজন পীর ছিলেন, সফীর কাব্য থেকে তা জানা যায় ; যেমন, মীর মুহম্মদ সফীর 'নূরনামা' কাব্যে কবি হাজী মুহম্মদকে পীররূপে মান্য কবে বলেছেন,--

কহে মোহাম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
যার ঘর্মে সৃষ্টি উতপন।
পীর হাজী মোহাম্মদ শিরে বন্দী তান পদ
পাইতে সে নূরের দরশন॥

হাজী মুহম্মদের সঙ্গে মীর মুহম্মদ সফীব গুরুশিষ্য সম্পর্ক থেকে উভয় কবির ব্যাপারে কিছু ধাবণা কবা যায়। ধাবণাটি এরকম যে হাজী মুহম্মদকে পীররূপে মান্য করায় মীর মুহম্মদ সফীকে তাঁব শিষ্যরূপে মনে করাব কারণ আছে। হাজী মুহম্মদের জীবনকাল যদি ষোড়শ শতকেব মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশকে অনুমান করা যায়, তাহলে হাজী মুহম্মদেব বয়োকনিষ্ঠ ও শিষ্য মীর মুহম্মদ সফীর জীবনকাল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মনে করা সঙ্গত।

অত্যন্ত সম্মানিত এই বংশের অনেকেই কবিরূপে প্রতিষ্ঠা পান। সৈয়দ সুলতানের কথা বাদ দিলেও এই বংশের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লালমোতি সয়ফুলমুলক' কাব্যের কবি শরীফ শাহ।

মীর মুহম্মদ সফীব নামে মোট তিনখানা পুথি পাওয়া গিয়েছে। পুথি তিনটি হচ্ছে,—'নূরনামা', 'নূবকন্দীল' ও 'সায়াৎনামা'। অবশ্য এসব পুথিতে কবির নিজের সন-তারিখগত কোনো উক্তি নেই। তবে পবোক্ষভাবে কবি তাঁর সময়কালীন যেসব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদেব কাল ধবে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও ধারণা করা যায়।

'নূরনামা' ও 'নূরকন্দীল' পুথি দুটি বিষয়বস্তুব বিচারে পৃথক কোনো কাব্য নয়। এ দুটি পুথিব ভাষায়ও তেমন কোনো পার্থক্য নেই ; যেটুকু পার্থক্য ধরা পড়ে, তা নকলকারদের স্বেচ্ছাকৃত প্রবণতার জন্য ঘটতে পাবে। মুহম্মদ এনামুল হকেব নির্দেশ অনুযায়ী দুটি পুথির তুলনামূলক পাঠ নিচে দেওয়া হলো,--'নূরনামার' পাঠ,--

বলি পীর কহি দেঅ আদ্য সমাচার।
কিরূপে হইল নূর আল্লাব দিদাব॥
কোন মতে হৈল স্বর্গ খিতি উতপন।
কিমতে হইল বল জীবেব সৃজন॥

অন্যদিকে 'নূব-কন্দীলে'ব পাঠ নিম্নরূপ,--

প্রভু বলি কহি দেঅ আদ্য সমাচাব।
কিরূপে হইল নূর আল্লাব দিদাব॥
কিরূপে হইল সর্গ খিতি উতপন।
কেমতে হইল সব জীবের জীবন॥

একাধিক পুথিব কোনো কোনোটাতে 'নূব কন্দীল' নামকবণ থাকলেও অধিকাংশ পুথিতেই 'নূবনামা' নামটি আছে। এবকম বিভ্রান্তিসৃষ্টি নকলকাবদের দ্বারা হওয়াই সম্ভব।

মীর মুহম্মদ সফী আধ্যাত্মিক তথ্যাদিব বিববণে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর এই প্রবণতায় প্রভাব বিস্তার কবেন তাঁবই পীব ও কবি হাজী মুহম্মদ। আসলে ধর্মীয় তত্ত্বেব শ্রেষ্ঠ কবি হাজী মুহম্মদ আধ্যাত্মিক ও মাবফতী তত্ত্ব অবলম্বনে সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দেন, কবি মুহম্মদ সফীকে তা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। হাজী মুহম্মদেব পথ অনুসরণ কবে তিনিও কেমন কবে নূব থেকে মুহম্মদ এবং নূবে মুহম্মদ থেকে বেহেশত-দোজখ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব সৃষ্টি হলো, তাবই বিস্তৃত বর্ণনা দিযেছেন।

মাবফতী তত্ত্ব বিষযে তাঁব বর্ণনা,-

নাসিকাত চন্দ্র সূর্য্য জনক জননী।
দুই স্বরে দুই বসে লও তারে মানি॥
দক্ষিণে সুবজ বসে বামে বসে শশী।
অনুদিন বুঝ তারে গগনেত বসি॥
সূর্য্যেব ঘবেত গেলে চন্দ্র ঘবে নিবা।
অনুক্ষণ পিতামাতা কর্মেত বহিবা॥
জনক ডাহিনে বসে বামেত জননী।
অনুদিন তারে চিনি লও পবিমাণি॥

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কবি যে দার্শনিক উক্তি করেছেন তারই পরিপূরকরূপে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর আর একটি প্রশ্নজ্ঞাপক বর্ণনা,—

কিরূপে হইল নূর আল্লার দিদার ॥
কোন মতে হইল স্বর্গ রীতি উতপন।
কিমতে হইল বল জীবের সৃজন॥
আব আতস খাক বাত কোথা হোন্তে হইল।
ভিহিস্ত দোজখ বোল কেমতে হইল॥
চন্দ্র সূর্য্য কিরূপে হইল দুজন।
চারি ফিরিস্তা হইল কেমতে সৃজন॥
সবস্থানে স্থান মাত্র ধর্ম উতপন।
কোন ঘর্মে কোন জীব হইল সৃজন॥

আল্লাহর সৃষ্টি এক অপার রহস্য। এই রহস্য সম্পর্কে অনেকের মনেই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, উত্তর লাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টাও চলে, কিন্তু সরাসরি তার উত্তর কখনো পাওয়া যায় না। হয়তো তার ব্যাখ্যা করা যায় মাত্র। সৃষ্টিতত্ত্বের অজানা রহস্য বিষয়ে কবির মনেও প্রশ্নের উদয় হয়। এবং কবি তার মহিমা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন,—

নূরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল।
সে ঘর্ম উপজিল যথ কুদরতি॥

এই সঙ্গে কবি চন্দ্রসূর্য আদি অন্তের নানা প্রসঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। দোজখ-বেহেস্ত, হুরপরী--এসব বিষয়ের বর্ণনাও আছে। আসলে মীর মুহম্মদ সফীর 'নূরনামা' সৃষ্টিতত্ত্বের নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই রচিত। কবির অনুশীলনের অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্বগত যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তার একটা ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন; তবে তার মধ্যে তাঁর বিশ্বাস আর অনুভবের বিষয়টিই মুখ্য।

মীর মুহম্মদ সফীর 'সায়াৎনামা' একটি ক্ষুদ্রকায় পুথি। এ বইয়েরও মূল বিষয় তত্ত্বীয় প্রসঙ্গ। তবে বইটি সম্ভবত ক্ষুদ্র হওয়ায় কবি এতে তাঁর তত্ত্বীয় বিশ্লেষণকে আড়ম্বরপূর্ণ করতে পারেন নি। আসলে এ বইয়ে কবির প্রবণতা হচ্ছে শুভ এবং অশুভ বিষয়সমূহের সঙ্কেতদান করা।

মুহম্মদ ফসীহ॥ মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের মধ্যে মুহম্মদ ফসীহ হয়তো তেমন পরিচিত নন, কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারায় তাঁর নিরীক্ষামূলক অবদানের জন্য তিনি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর এই নিরীক্ষামূলক কাজটি হচ্ছে তিনি আরবি হরফের বাংলা প্রত্যক্ষরীকরণের কৌশল অবলম্বন করে শাস্ত্রীয় কাব্য রচনা করেছেন। প্রত্যক্ষরীকরণের এই কৌশল প্রকৃতপক্ষে ভাষাতত্ত্বেরই একটি বিষয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ফসীহর এই চেষ্টাকে যথার্থই একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৮২]

---

১৮২. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', ২১৬

আরবি অক্ষর থেকে বাংলা প্রতি-অক্ষর যোজনা করে কবি তাঁর কাব্যের চরণগুলো যেভাবে গঠিত করেছেন তা সমকালীন কাব্যের জগতে তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সেজন্য মুহম্মদ ফসীহ মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবি বলে স্বীকৃত। কবি তাঁর এই অভিনব রীতি অবলম্বন প্রসঙ্গে বলেছেন,—

আরবীব এ ত্রিশ অক্ষরে করি ভার।
মুনাজাত করিবাম গোচরে আল্লার॥
একেক অক্ষর প্রতি চতুর্পদ বন্ধে।
মুহম্মদ ফছিএ কহে পয়ারের ছন্দে॥

মুহম্মদ ফসীহব এ কাব্যেব নাম 'মুনাজাত'। কবি নিজেই আল্লাহর গোচবে মুনাজাত করাব কথা বলেছেন। কাব্যে আরবি থেকে বাংলা প্রত্যক্ষরীকরণের যে রীতি তিনি গ্রহণ করেছেন তাব ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, চার লাইনেব একটি স্তবকে কবি প্রতিটি লাইনের প্রথম শব্দে আরবি অক্ষরের বাংলা প্রতি অক্ষব যোজনা কবে তাঁর বক্তব্য শুরু কবেন। তাতে একটি ভক্তচিত্তের নিবেদনও যথারীতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত হয়েছে। যেমন,—

আলিফে [আ. অ],—

আলিফে আল্লার নাম মনে করি সাব।
আউযাল আখেবে প্রভু তুমি সে নিস্তার॥
অনাদি নিদান প্রভু নিবলীর বল।
অনাথের নাথ তুমি এ মহি মণ্ডল॥

তে-এ[ত],—

তৈয়র শরীর প্রভু তুমি বিনা নাই।
তরাইয়া ভয হস্তে তুমি সেই ঠাই॥
তওবা তওবা মুক্তি করি বারে বার।
ত্যজিলাম পাপকর্ম খিমহ আমার॥

বিষয়ের সঙ্গে কবিভাবনার সামঞ্জস্য রক্ষা করে ফসীহ তাঁর কাব্যে এই যে নতুন রীতি প্রবর্তন করেন, নিঃসন্দেহে তা তাঁব উদ্ভাবনী ও কবিত্বশক্তির পবিচয় বহন করে।

'মুনাজাত' ছাড়া মুহম্মদ ফসীহর দ্বিতীয় কোনো পুথির সন্ধান মেলে না। 'মুনাজাত' ক্ষুদ্র আকারের একটি পুথি। পুথিটি ১৩ পাতার, এর প্রতি পৃষ্ঠায় ১১টি পঙ্‌ক্তি আছে। পুথির অনুলিপির তারিখ বাংলা ১২২২ সনের ২৬শে আষাঢ়। অর্থাৎ ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ। লিপিকারের নাম শেখ আলী রজা। অনুলিপির তারিখটি লিপিকারেরই দেওয়া।

ফসীহর কাল সম্পর্কে গবেষকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশাবদ ফসীর 'মুনাজাত' কাব্যের বচনাকাল ১০৫৭ মঘী বা ১৬৯৫ খিস্টাব্দ বলে মনে করেন। অবশ্য সাহিত্যবিশারদ তাঁর অভিমতের সপক্ষে কোনো যুক্তি দেন নি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাই বলেন, হয়তো তা রচনার তারিখ নয়। ফসীহ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কোথাও উল্লেখ করেন নি। ফলে তাঁর জীবনকাল নির্ণয় অনুমানভিত্তিক হওয়াই

সম্ভব। তবে ফসীর কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় না থাকলেও কবি তাঁর কাব্যে একজন গুরুর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,—

হজরত মীরের পদ কবি সিরতান।
যতেক সাধক মধ্যে সেই প্রধান॥
আওলিয়া আম্বিয়া যত পীর যে ফকির।
প্রণাম সে পদ রাখি মোর শির॥

কে এই পীর? 'কবি সিবতান' বলতে কবি সৈয়দ সুলতানকেও বোঝানো হতে পারে। সৈয়দ সুলতানের পারিবারিক উপাধি যে 'মীব' ছিলো তা-ও জানা যায়, এবং সৈয়দ সুলতান যে অনেকেরই দীক্ষাগুরু ছিলেন, কবি মুহম্মদ খানও তাঁর শিষ্য ছিলেন, তা-ও জানা যায়। সুতরাং ফসীব বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবত ফসীহও তাঁর শিষ্য ছিলেন। এসব প্রসঙ্গ বিবেচনায় এনে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের অভিমতেব সঙ্গে একমত হয়ে অনুমান করা যায়, কবি মুহম্মদ খানের মতো কবি ফসীহও সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কালের একজন পুথিকার।[১৮৩]

'মুনাজাত' কাব্যটি যদিও আকারে খুব ছোট, কিন্তু নানা কাবণে একাব্য গবেষকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। প্রথমত, কাব্যখানি 'চৌতিশা' জাতীয় রচনা। এবং চৌতিশাব কবিরা প্রায় সবাই মৌলিক শিল্পভাবনাব পবিচয দিযেছেন। দ্বিতীয়ত,তাত্ত্বিক ভাবনাব নানা প্রসঙ্গ সত্ত্বেও কবি ফসীহ তাঁব কাব্যে তাঁব শিল্পপ্রতিভাব পরিচয় দিয়েছেন। তবে শিল্পজ্ঞানের উপরে ফসীহব কাব্যেব যে ধর্ম, তা শাস্ত্রীয ধর্মবোধকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। গ্রন্থের শুরুতেই কবি বলেছেন, --

আর এক কথা কহি শুন গুণিগণ।
চিত্ত দিয়া শুন কহি মোব নিবেদন॥
আরবীর এ তিশ অক্ষরে কবি ভাব।
মুনাজাত করিবার গোচরে আল্লার॥
এক এক অক্ষর প্রতি চতুষ্পদ বন্ধে।
মোহাম্মদ ফছিএ কহে পয়ারের ছন্দে॥

আরবি ত্রিশ হরফের প্রত্যক্ষর ব্যবহার করে ফসীহ তাঁব কাব্য সমাপ্ত করেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি হবফের মহিমা কবিকে যেমন অনুপ্রাণিত করে, তেমনি কবি নবীগণেব বন্দনা--সংগীত রচনা কবে তাঁব ধর্মবোধেব প্রকাশ ঘটান। কবি বলেন,—

এবে পুনি প্রণামিএ পয়গম্বরগণ।
আদম প্রভৃতি আব রসুলে চবণ॥
মুখ্য চারি ফিরিস্তা প্রভৃতি যথ আর।
একে একে প্রণামিএ সহস্রেক বাব॥

---

১৮৩. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২১৮

'আলিফে আল্লাহর নাম মনে' করে ফসীহ সর্বশক্তিমানের মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন,--

বারিতালা নাম ধর রত নিরাকার।
বিনি লক্ষ্যে রাখিয়াছ সয়াল সংসার॥
বুদ্ধি করি চাহিলাম গহীন কাননে।
যিনি প্রভু আর কেহ নাহি সেই স্থানে॥

প্রভু নিরঞ্জন যেন কবির হৃদয়ে তাঁর অসীম মহিমা নিয়ে চিরবিরাজমান থাকেন, সেই নিবেদনে কবি বলেন,--

হাহা প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান।
হারাইলে তোমা নাম করাইবা স্মরণ॥
হিন হই না রহিমু যেন পদতল।
হইয়া মানবকুলে জনম বিফল॥

মানুষের অন্তরের ধর্মবোধকে বিপন্ন করে ইবলিশ ও ইবলিশরূপী সেই সব শত্রুরা নিয়ত মানুষের পাশেই থাকে। কবি সেই অদৃশ্য শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে বলেন,-

ইব্লিছ বসাই ফাঁদ রহে রাত্রি দিবা।
ইহার সঙ্কট হস্তে প্রভু উদ্ধারিবা॥
ইয়াদ হানিয়া কবি কহিতে সাক্ষাৎ।
ইতি সমাপ্ত এবে মোর মুনাজাত॥

ফসীহর কাব্যের চরণে চরণে একটি ভক্তচিত্তের আবেদন ও নিবেদনের মর্মস্পর্শী কাতরতা লক্ষ্য করে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'তাঁর কাব্যে ভক্তের আত্মনিবেদন নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ সলিল প্রবাহের মত বেগবান হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই আত্মনিবেদনের প্রতিটি চরণে জ্যোতিষ্মান হীরকখণ্ডের মত ইমানদারী ফুটিয়া উঠিয়াছে।'[১৮৪] কবি ফসীহ এই যে ভক্তি নিবেদনের কাব্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে হিতবাক্য আছে, ধর্মের মর্মকথা আছে আর আছে মানুষের মনে ধর্মবোধ জাগানোর প্রয়াস। কবি এই হিতবাণীকে দেশী ভাষায় রূপ দিয়ে পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে বলেন,--

মোহাম্মদ ফছিএ কহে শুন গুণিগণ।
মুনাজাত করিলাম প্রভুর চরণ॥
কোরানের মধ্যে আছে এ তিশ হরফ।
দেশীভাষে কহিলুং পঞ্চালি স্বরূপ॥
এসব অক্ষর দেখি কোরান মাঝার।
মোল্লা সবে করিলেক কিতাব সঞ্চার॥
ফারছির মধ্যে দেখি পণ্ডিতের গণ।

১৮৪. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২১৮-২১৯

বাঙ্গালার ভাষে তবে করিল রচন॥
যার যেবা ইচ্ছা মতে নানান প্রকারে।
হিতবাক্য বুঝিবারে কহিছি পয়ারে॥

ফসীহর কাব্যের আর একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এই যে, মধ্যযুগের কাব্যে যেমন প্রশংসাব্যঞ্জক 'হামদ' ও 'নাত' কাব্যের শুরুতে থাকে, তাঁর কাব্যে 'হামদ' ও 'নাত' কাব্যসমাপ্তির পরে বিবৃত হয়েছে।

নসরুল্লাহ খান॥ নসরুল্লাহ খান সম্পর্কে তথ্যাদি আছে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রণীত 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থে। আসলে নসরুল্লাহ খান 'খোন্দকার' রূপেও পরিচিত ছিলেন। 'খান' এবং 'খোন্দকার' এই দুটোই মুসলিম অভিজাত সমাজের বংশগত উপাধিরূপে বিবেচিত। কবির জঙ্গনামা পুথিতে 'খান' উপাধির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'শরীয়তনামা' কাব্যে 'খোন্দকার' ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'রহে হীনস্তান নছরোল্লা খোন্দকার', তবে কবি এ কাব্যে শুধু 'নসরুল্লাহ'ও ব্যবহার করেছেন। যেমন, -

রহে হীন নছরোল্লা গুণীগণ ধাম।
শরীয়তনামা বাণী শুন অনুপাম।

ডক্টর আবদুল করিম নসরুল্লাহর 'খান' এবং 'খোন্দকারে'র বিবাদ মেটানো প্রসঙ্গে বলেছেন, --'খান ও খোন্দকার দুইটি ভিন্নপ্রকৃতির উপাধি। খান সাধারণত সামরিক উপাধি, অথচ খোন্দকার নিশ্চিতভাবে পণ্ডিত ও শিক্ষকদের উপাধি। সৈনিক বংশের লোক মসীজীবী হয়ে খোন্দকার উপাধি নেওয়া বা মসীজীবীর বংশধরদের সৈনিক হয়ে খান উপাধি নেওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না।'[১৮৫] খান এবং খোন্দকারের প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা যায় যে কবি নসরুল্লাহ একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। ডক্টর আহমদ শরীফ বলেছেন, 'নসরুল্লাহ খোন্দকারের পিতৃব্য আবদুন নবীর বংশ এখনো জলদী গাঁয়ে বাস করছেন। এঁরা সম্ভ্রান্ত ধনী ও মানী।'[১৮৬]

জানা যায় অনেক কাল আগে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ডুমোরিয়া গ্রামের জনৈক আমীর আলী চৌধুরীর বাড়িতে নসরুল্লাহর 'জঙ্গনামা' পুথি আবিষ্কার করেন। কবির নামে প্রচলিত অন্য তিনটি পুথি হচ্ছে 'মুসার সওয়াল', 'শরীয়তনামা' ও 'হেদায়তুল ইসলাম'।

নসরুল্লাহ খান তাঁর 'জঙ্গনামা' ও 'শরীয়তনামা' কাব্যে দীর্ঘ বংশলতিকা দিয়েছেন। বংশের উল্লেখযোগ্য আদিপুরুষ হিসেবে বিবেচ্য 'ধৈর্য্যবন্ত বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত/পিতামহ হামিদুল্লাহ খান'; [সুতরাং বংশপরম্পরায় বাহিত 'খান'ই বোধ হয় কবির আসল পারিবারিক উপাধি]। হামিদুল্লাহ খানের পরে ক্রমান্বয়ে বোরহানুদ্দিন, ইব্রাহিম খান, সুজাউদ্দিন, বাবু খান, ইসহাক খান এবং 'তানপুত্র শীল ধর্ম্ম, ছৈদানী উদরে জন্ম, সরিফ

মনছুর গুণবান। তান পুত্র অল্প জ্ঞান, হীন নছরোল্লা খান, পাঞ্চালী রচিল শিশু বুদ্ধি॥' 'জঙ্গনামা'র আর একটি অংশে রোসাঙ্গরাজের সঙ্গে কবির পিতামহের সাক্ষাৎ সম্পর্কে কবি বলেছেন,

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেত বিজ্ঞান।
পিতামহ কাজী ইছাহাক গুণবান॥
তানপুত্র সবিফ মনছুর খোন্দকার।
রাম্মুদেশ নরপতি নামে ফতেহ খান।
যাকে মান্য করি বসাইল বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাৎ॥

বোঝা যায় রোসাঙ্গে জ্ঞানীগুণীর কদর সব সময়েই ছিলো। কবির ধর্মভীরু পিতাকেও সবাই সম্মান করতেন।

যাহার মধুর স্বরে খোতবা শুনন্ত।
যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসন্ত॥
তান পুত্র নছরোল্লা আমি হীন জ্ঞান।
পাঞ্চালী পয়ারে কহে গুণীগণ ধ্যান॥

'শরীয়তনামা' কাব্যেও নসরুল্লাহ তাঁর বংশলতিকার একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে এতে তিনি তাঁর সপ্তম পুরুষের একটি ঐতিহাসিক বিবরণ পেশ করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁর কাল সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায়। বিবরণীর কিছুটা অংশ,

ধৈর্য বীর্যবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত,
নামে হামিদুদ্দীন মতিমান।
গৌড়দেশ বাঙ্গালা নাম, বসে কয়ে অনুপাম
সে বৃত্ত পাল উজীর প্রধান॥
তান পুত্র গুণবান অস্ত্রেশাস্ত্রে পূজ্যমান,
জগে ঘোষে বুরানুদ্দীন নাম।
দৈবগতি দেশ ছাড়ি ইষ্ট মিত্র সঙ্গে করি
রোসাঙ্গ দেশেত কৈল ধাম॥
তখনে রোসাঙ্গদেশে কিবা আদ্যে কিবা শেষে
অশ্ব আছোয়ার আছিল।
হয় গজ বহু সঙ্গে দেখি তানে নৃপরঙ্গে
লস্কর উজীর তানে কৈল॥

ডক্টর আহমদ শরীফের 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' ২য় খণ্ডের ৬২৯ পৃষ্ঠায় 'হয় গজ বহু সঙ্গে দেখি তানে নৃপরঙ্গে' এই উদ্ধৃতির পাঠান্তর ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্যে'র ১৬৯ পৃষ্ঠায় 'হয় গজ বুহে সংখ্য দেখি তানে নৃপমুখ্য' এরূপ আছে।

শেষোক্ত উদ্ধৃতি-সূত্রে ডক্টর হক 'নৃপমুখ্য' পাঠান্তরে 'নৃপরঙ্গ' সম্পর্কে বলেন,—'আরাকানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ইনি বর্মা ইতিহাসে নরমিখ্‌লা (Narameikhlo) এবং আরকানী ইতিহাসের মেঙৎ চৌ মৌন ব্যতীত আর কেহ নহেন। এই আরাকান-রাজ নরমিখ্‌ল খ্রীষ্টীয় ১৪০৪ হইতে ১৪৩৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।'[১৮৭] ইতিহাস সূত্রে জানা যায় আরাকান-রাজ নরমিখ্‌ল তখনকার ব্রহ্মরাজ কর্তৃক পরাভূত হয়ে ১৪০৬ খ্রি. থেকে ১৪৩৪ খ্রি. পর্যন্ত তৎকালীন গৌড়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। তবে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে নরমিখ্‌ল তৎকালীন গৌড়াধিপতি জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ কর্তৃক আরাকানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দের এই সময়েই নসরুল্লাহ খানের উর্ধতম সপ্তম পুরুষ বুরহানুদ্দীন খান আরাকানে গিয়ে রাজা নরমিখ্‌লের লস্কর হয়ে থাকতে পারেন। চার পুরুষ একশ' বছর ধরলে নসরুল্লাহ খান প্রায় ১৭৫ বছরের পরবর্তী ব্যক্তি। অর্থাৎ কবি ১৪৩০ + ১৭৫=১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। তবে ডক্টর আহমদ শরীফ কবির জীবনকাল আরো একশ' বছর সামনে এগিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। কবি তাঁর 'শরীয়তনামা' কাব্যে লিখেছেন,--

এবে কহি তুমি সবে শুন মন দিয়া।
পুস্তক আদাম সন লওত গুণিয়া॥
চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস॥

উদ্ধৃতিসূত্রে ডক্টর আহমদ শরীফ এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন,- চন্দ্র=১, ঋতু=৬, সিন্ধু=৭, গগন(সপ্ত আসমান)=৭ অর্থাৎ ১৬৭৭ শক বা ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ।[১৮৮] এই হিসেব অনুযায়ী কবি নসরুল্লাহকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ফেলা হয়।

নসরুল্লাহ খানের প্রথম কাব্য 'জঙ্গনামা'। এ কাব্যে কবি যে উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হন, মধ্যযুগের অন্য কয়েকজন কবির মতো কাফের দলন ও সেই সূত্রে ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনাই তার মূল বিষয়। কাফের রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে হজরত আলীর যুদ্ধবর্ণনার বিষয়টিকে কবি বেশ আড়ম্বর সহকারে বিবৃত করেছেন। যুদ্ধে বিধর্মীদের পরাজয় ও পরে তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিষয়ের বর্ণনায় বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। হয়তো জনমনে রোমান্টিক আমেজ সৃষ্টি করা কবির একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। এই কাব্যে কবির কাব্যপ্রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে মৃদুমধুর ছন্দের হিল্লোল নসরুল্লাহর রচনারীতি ও বর্ণনাকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। যেমন,

মহীপাল এই বোল শুনি সৈন্যগণ।
সাজ্ঞ রণ সর্বজন হৈল ততক্ষণ॥
যত বাদ্য নৃপ বিদ্যা মনে আনাইলা।
এক বারে বাদ্য পরে প্রহার করাইলা॥

---

১৮৭. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৭০
১৮৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', পৃ. ৬৩৪

দপরেত কাঠিঘাত হইলেক যবে।
কম্পমান ত্রিভুবনে হই গেল ভযে।
অশ্ববার পদাতির চৈল সিংহেধ্বনি।
বীরগণ আস্ফালন বিদরে মেদেনী॥

'মুসার সওয়াল' কাব্যে কবি আল্লাহতায়ালার সঙ্গে হজরত মুসার সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। বিষয়টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। মূল ফারসি কিতাব অবলম্বনে কবি তাঁর কাব্যের কাহিনী নির্বাচন করেছেন। 'মুসার সওয়ালে'র একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নামাজের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কবির জ্ঞানদান ও উপদেশ। যেমন,—

বাক্য আলাপিতে যদি চাহ প্রভু সঙ্গে।
হৃদযনন কোবানে পড়হ মনোরঙ্গে॥
পঞ্চগানা নমাজ পড়হ এক মন।
সভা কবি বস নিত্য নমাজীর সন॥
শাস্ত্র বুঝিবাবে বস্তু নমাজীব গুণে।
একে একে কহিলাম শুন গুণিগনে॥

'হেদায়েতুল ইসলাম' ও 'শরীযতনামা' কাব্য দুটি কবির শেষ বয়সের রচনা।

'শরীযতনামা'য ইসলামের বিধান অনুসারে পালনীয় কর্তব্যের পাশাপাশি তার বর্জনীয় বিষয সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কবির বর্ণনা বিশ্লেষণাত্মক ও তত্ত্বপূর্ণ, সম্ভবত বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারেই তা হয়েছে। কিছু নমুনা,—

শরীযতনামা বাণী কর অবধান।
অবশ্য মানিব যেই হয মুছলমান॥
মুছলমান মুছলমানী কর্ম ন করিলে।
মুছলমান নহে হেন শাস্ত্র মাঝে বলে॥
'আমর' আর 'নিহি' যত আছে শরীযতে।
সার সব কহি আনি শুন বঙ্গ চিতে॥
আল্লাব হুকুমে যত 'আমর' বোলয।
মানায়েবে 'নিহি' বলে আরবী ভাষায়॥

হিন্দু এবং বৌদ্ধদের আচরণীয় বিষয়ের তুলনায় ইসলামের পালনীয় বিষয়ের যাথার্থ্য বিচারের বিষয়টি তাঁর বর্ণনায় সুন্দরভাবে রূপ পায়। আসলে স্বধর্মের মহিমা জ্ঞাপনই তাঁর উদ্দেশ্য। এছাড়া শরীযতনামায় মানুষের জন্ম, মৃত্যু, কবর, কাফন, ঘোমটা, পর্দা, রজঃস্বলা নারীর কর্তব্য, ধূমপান ও যৌন অসংযমের কুফল ইত্যাদি সামাজিক ও মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়াদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'হেদায়েতুল ইসলাম' গ্রন্থের বিষয়ও প্রকৃতপক্ষে 'শরীযতনামা'র শাস্ত্রীয় বিষয়েরই অনুসরণ। তাতে কবির ধর্মানুভূতিতে বিধৃত ধর্মতত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে।

আসলে শাস্ত্রঘটিত বিষয়কে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো কবি নসরুল্লাহর উদ্দেশ্য। ইসলাম সেই সূত্রে তাঁর কাব্যে উজ্জ্বলরূপে বিকাশ লাভ করে।

আবদুল হাকিম ॥ মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কবির মতো কবি আবদুল হাকিমও তাঁর পরিচয়-জ্ঞাপক এমন কোনো তথ্য রেখে যান নি। তবে তাঁর কাব্যে দুটি তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য দুটি হলো আবদুল হাকিমের পিতাব নাম আবদুর রাজ্জাক এবং পীরের নাম শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ।

শাহ আবদুর রাজ্জাক পীব ছিলেন বিধায় স্থানীয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।[১৮৯] অনেক গবেষকেব মতে, যেমন আবদুল গফুর সিদ্দিকী, তিনি মনে করেন আবদুল হাকিমের নিবাস ছিলো চট্টগ্রামে। কাবো কারো মতে সন্দ্বীপ। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন বিভাগপূর্ব নোয়াখালির অন্তর্গত সন্দ্বীপেব সুধাবামে কবি জন্মগ্রহণ করেন।[১৯০] আবদুল হাকিম তাঁব 'দুববে মজলিশ' কাব্যেব শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন,- 'আবদুল হাকিম হীন বাবুপুব ঘর। বচি পাঞ্চালি এহি অমৃত লহর।' এই বাবুপুব ফেনী ও বেগমগঞ্জের নিকটস্থ একটি গ্রাম বলে জানা যায। তবে বাবুপুব এককালে ভুলুয়া রাজ্যেব অধীন একটি পরগণা ছিলো। বাবুপুবই আসলে কবি আবদুল হাকিমেব জন্মস্থান। কেননা তাঁব ৩৭টি পাণ্ডুলিপিব কোনোটাতেই সন্দ্বীপ, সুধাকব বা চট্টগ্রামেব উল্লেখ নেই।[১৯১]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে আবদুল হাকিম ১৬২০ থেকে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে জীবন অতিবাহিত কবেন। তবে কবিব 'শিহাবুদ্দীন নামা' কাব্য পরীক্ষা কবে বলা হয হযতো কবি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। তাতে কবি যে সপ্তদশ শতকেব শেষপাদে জীবিত ছিলেন তা অনুমান কবা যায।

কবি আবদুল হাকিমেব পিতা আবদুর বাজ্জাক যে জ্ঞানেগুণে ও কবিত্বশক্তিতে দীপ্তিমান ছিলেন, আবদুল হাকিম তা অসংকোচে ব্যক্ত কবেছেন,—

শাহ বাজ্জাক সুমতি জ্ঞানেতে প্রচণ্ড অতি।
অতি ধীর স্থিব গুণধাম॥

অন্যত্র—

প্রচণ্ড বিদ্বান শাহ রাজ্জাক সুমতি।
সর্বশাস্ত্রে বিশাবদ জ্ঞানে বৃহস্পতি॥

কবি আবদুল হাকিমেব পীর জনৈক শিহাববুদ্দিন বা শাহাবুদ্দীনও 'গুণে অনুপাম' এবং জ্ঞানে 'প্রদীপতুল্য' ব্যক্তি ছিলেন। এরকম গুণবানদের সান্নিধ্যে কবি নিজেও যে একজন গুণবান ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা পাবেন তা মনে কবার কারণ আছে। আবদুল হাকিমেব জীবন তাঁর গুণবান পিতা ও পীবেব জীবনসাধনার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। প্রসঙ্গক্রমে কবির উক্তি,—

এলেম সাগর মধ্যে ডুবে জেহি জন।
সাফল্য জীবন তার সাফল্য মরণ॥

---

১৮৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৫
১৯০. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২০২
১৯১. রাজিয়া সুলতানা, 'আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং. ১৯৮৭), [কবি পরিচিতি], পৃ. ২০

পীরের সান্নিধ্যে কবি হয়তো কিছু আধ্যাত্মিক চিন্তারও অধিকারী হন। তাঁর 'নূরনামা' ও 'দুররে মজলিশে' সেই ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তিগত জীবনে আবদুল হাকিম গুরুবাদী চিশ্তিচেতনায় উদ্দীপ্ত ছিলেন। হয়তো তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে সেই ধারায় উদ্বুদ্ধ করে।

আবদুল হাকিম সমাজে নারীর স্থানকে মর্যাদাদীপ্ত মনে করতেন। তাঁর এই বোধ আধুনিক জীবনচেতনার পরিচয়বাহী। কবি বলেছেন---'জাতিকুল ধিকাধিক নাহি কদাচিত। উত্তম প্রকৃতি মাত্র নারীর উচিত॥'

কবি আবদুল হাকিম মোট আটখানা কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা যায়। এগুলো হলো 'ইউসুফ জুলেখা', 'লালমতি সয়ফুলমুলক', এবং 'শিহাবুদ্দীন নামা', 'নূরনামা' ও 'নসিহতনামা' এই তিনটি কাব্য মিলে একটি গ্রন্থ। লিপিকার গ্রন্থটিকে তিনটি কাব্যে বিন্যস্ত করেছেন। অবশ্য তিনটি অংশের বিষয়বস্তু আলাদা। তাই এগুলো পৃথক নামেই আলোচিত হলো। এছাড়া কবির অন্যান্য কাব্য, -'চার মোকাম ভেদ', 'কারবালা' ও 'শহরনামা'।

বাংলায় যদিও 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্যের আদিকবি শাহ মুহম্মদ সগীর, তবু আবদুল হাকিম সগীরের কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মুল্লা জামীর 'ইউসুফ জুলেখা'কে আদর্শ করে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন, -

মোল্লা জামীর বাক্য শিরেতে ধরিয়া।
আবদুল হাকিমে কহে বাঙ্গলা রচিয়া॥
ইউসুফ জলিখা কিচ্ছা হইল সমাপ্ত।
ফারসী কিতাব ভাঙ্গি বাঙ্গালা পদস্থ॥

ইউসুফ জুলেখার প্রেমকাহিনীটি সর্বজন পরিচিত। রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই প্রণয়কাহিনী ফারসি এবং হিন্দি কবির হাতে নানাভাবে রূপায়িত হয়, কিন্তু মূল প্রণয়চিত্রটির কোনো পরিবর্তন হয় না। কেউ কেউ কাহিনীর রোমান্টিক ভাবকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কেউ প্রেমের বাস্তবতার বিষয়টিকে অধিক তাৎপর্যমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। আবদুল হাকিম জুলেখার নারীহৃদয়ের তীব্রতাকে ভাবের গভীরতা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যেমন,

জলিখা নয়ানে রক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক বয়ান তাহার॥
নয়ানের জলে নিত্য করাঙ্গুলি পুরি।
মুখেতে মাখয়ে যেন কুঙ্কুম কস্তুরী॥

কবি ফারসির একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানকে অবলম্বন করেছেন তাঁর 'লালমতি সয়ফুলমুলক' কাব্যে। এমরান দেশের সম্রাট সিকানদার শাহ। তাঁর পুত্র সয়ফুলমুলক রূপেগুণে ও বীর্যবত্তায় অতুলনীয়। ওদিকে মগ্রিব দেশের রাজকন্যা লালমতির রূপের খ্যাতি সর্বত্র। সয়ফুলমুলকের সঙ্গে লালমতির প্রণয় ঘটে। কবি এই রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যানকেই তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন।

আবদুল হাকিমের কাব্য ফারসি আখ্যান অবলম্বনে রচিত হলেও একাব্যে রচয়িতার মৌলিকতাগুণটি অক্ষুন্ন রয়েছে। কবির রচনারীতি যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি তাঁর ভাষায় রয়েছে কাব্যের ছটা। একটি উদাহরণ,

কুমারে গাথয় পুষ্প অদ্ভুত লক্ষণ।
বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি নন্দন॥
মালিনী গাঁথয় পুষ্প একই প্রকার।
সহস্রেক বর্ণে পুষ্প গাঁথয় কুমার॥
মালিনী রন্ধয় অন্ন পাকশালা মাঝ।
পুষ্পের আখরে পত্র লিখে যুবরাজ॥
রাজনন্দিনী শুন বাণী লিখি তব ঠাই।
আমি তোমার পীরিতের অধীন কানাই॥

আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' পুথিটি ফারসি কাব্য থেকে অনূদিত হয়ে থাকবে। 'নূরনামা' কাব্যে তত্ত্বঘটিত বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। মধ্যযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি হাজী মুহম্মদের 'নূরজামাল' কাব্যের সঙ্গে আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' কাব্যের বিষয়গত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় কাব্যের মূলবিষয় ধর্মীয় তত্ত্বকথার উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় কবি নূরের আসল রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই রহস্যের মূলকথা হচ্ছে, সৃষ্টির আদিপর্বে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা থেকে নূর বা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় এবং সেই জ্যোতি থেকে মুহম্মদের জ্যোতির রেণু ছড়িয়ে পড়ে।

'নূরনামা'র কবি আবদুল হাকিম আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর তা হলো বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর দ্বিধাহীন সমর্থন। মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ধর্মকথা শোনানোর জন্য তৎকালীন কবিদের কৈফিয়ত ও নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার কারণ বাংলা ভাষা তখন জনসমাজে কাফেরী বা বেদীনী জবানরূপে বিবেচিত হতো। সেজন্যই সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, হাজী মুহম্মদ, শেখ মুত্তালিব প্রমুখ কবি তখন মুনাফেক ফতোয়ার ভয়ে শঙ্কিতচিত্তে কলম ধরেছিলেন। সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আজন্ম প্রীতির জন্য বাংলায় কাব্য রচনা করতে গিয়ে যখন সমাজ-নিগ্রহের শিকার হন, তখন তাঁর মনে যে রোষের সঞ্চার হয় তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'নূরনামা' কাব্যের অংশবিশেষে। যেমন,--

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥
মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥

আবদুল হাকিমের 'শিহাবুদ্দীন-নামা' ফারসি ধর্মীয় পুস্তকের সারসংক্ষেপ। যে ভাষায়ই হোক, শাস্ত্রকথা জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে সম্পর্কে কবির উপদেশ,

আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥

আরবী পড়িতে যদি ন পার কদাচিত।
ফারছি পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারছি পড়িতে যদি ন পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥

কবির 'নসিহতনামা' গ্রন্থেও ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কবি হিসেবে আবদুল হাকিম একজন বড়ো মাপের কাব্যবেত্তা তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও যে-কারণে তিনি আমাদের কাছে বড়ো, সেটি হচ্ছে তাঁর অসাধারণ মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষাপ্রীতি।

তিন॥ রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার পটভূমি

যে-কোনো দেশে রাজনীতির সুস্থ পরিবেশে মানুষের জীবনাচরণের নানা বিষয়ের মতোই শিল্পসাহিত্যের চর্চাও নির্বিঘ্ন হয়। চর্যাপদের ইতিহাস থেকেও আমরা তা জানি। রাজনৈতিক অরাজকতায় চর্যার কবিরা এক সময় বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয় নেন। কেননা ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে এদেশে আকস্মিকভাবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হওয়ায় দেশে তখন অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করে। বাংলাদেশে তখন প্রায় দেড়শ' বছর কিছু অপুষ্ট সাহিত্য যেমন লোকায়ত ছড়া, ধর্ম ও চণ্ডীর গান ছাড়া কোনো সুস্থ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। কিন্তু রোসাঙ্গের ইতিহাস ভিন্ন প্রকৃতির। একসময় বার্মা ও বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে বহু রাজনৈতিক বিশৃংখলা ঘটে। কিন্তু বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও রোসাঙ্গে তখন বাংলা সাহিত্যের যে চর্চা হয় তা কখনো থেমে থাকে নি। বলা যায় উন্নত বঙ্গসংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎস-কেন্দ্র তখন রোসাঙ্গ।

রোসাঙ্গ এক সময় বহু রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। ৫৬০ কিলোমিটার বা ৩৫০ মাইলব্যাপী স্থান নিয়ে বিস্তৃত ছিলো রোসাঙ্গের ভৌগোলিক সীমা।[১৯২] চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক থেকে দেখা যায় দক্ষিণ সমুদ্রতীর হতে বার্মার উত্তর পশ্চিম সীমারেখা বরাবর এক বিস্তৃত উচ্চ পর্বতমালা। এই পর্বতমালা দ্বারা ব্রহ্মদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল 'রখইঙ্গ রাজ্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে তা আরাকান হয়েছে। রখইঙ্গ থেকে রোসাঙ্গ এবং রোসাঙ্গ থেকে আরাকান--এভাবে আরাকান নামের উদ্ভব। ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টের জন্মের আগেই হিন্দুরা এই অঞ্চলে বসবাস করতো। প্রবাদ আছে রামাবতীকে রাজধানী করে কাশীরাজের পুত্র আরাকানে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে বৈশালী নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে জানা যায় 'চন্দ্র' উপাধিধারী বহু রাজা এই অঞ্চল শাসন করেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে আরাকান স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পায়, কিন্তু বহু বিদেশী হামলার শিকার হয়। পঞ্চদশ শতকে আরাকান বার্মারাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পার্শ্ববর্তী বঙ্গদেশ তখন শক্তিশালী মুসলিম

---

১৯২. রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায়, ['আরাকান'], ভারতকোষ', ১ম খণ্ড (কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), পৃ. ৩৩৬

সুলতানদের শাসনাধীনে ছিলো। ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে বর্মীরাজ পাইইন সিঙ সউ বা মেঙখামঙের আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হয়ে আরাকানরাজ মেঙসামোন বা নরমিখ্‌লা তৎকালীন গৌড়াধিপতি সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের (১৩৮৯–১৪১০) আশ্রিত হন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহের (১৪১৯–১৪৩২) সহাযতায় রাজা নরমিখ্‌লা তাঁর হৃতরাজ্য-পুনরুদ্ধার করেন।[১৯৩] তবে তখন থেকে রোসাঙ্গ গৌড়ের করদ রাজ্যে পরিগণিত হয়। দুই দেশের জনগণের মধ্যে তখন অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও গমনাগমন শুরু হয়। সেই সূত্রে বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও তৎকালীন আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহং (Mrohaung) বর্তমানে মুরং শহরে বসতি স্থাপন শুরু করে। 'ম্রোহং' শব্দটি পরিবর্তিত উচ্চারণে 'রোসাঙ্গ' হয়। শঙ্খ নদ থেকে টেকনাফ অবধি এলাকার অধিবাসীগণকে এখন 'রোসাঙ্গী' বা 'রোঁয়াই' বলা হয়। গৌড়াধিপতির সহাযতার রোসাঙ্গ রাজ্য পুনরুদ্ধারের একটি পরোক্ষ সুফল হয়েছিলো এই যে অতঃপর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশাগত সূত্রে রোসাঙ্গে বাঙালি মুসলমানের আগমন সুগম হয়, যার প্রভাব ও পরিণতিতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এখানে বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করে।

রাজা নরমিখ্‌লার মৃত্যুর পর রোসাঙ্গ গৌড়ের অধীনতামুক্ত হয়। পরের দুশ' বছর অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের মুসলিম রাজশক্তির সঙ্গে স্বাধীন আরাকানরাজদের কোনো সদ্ভাব ছিলো না। বঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেদেশে আরাকানিদের আক্রমণ শুরু হয়। খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ অবধি অঞ্চল আরাকান-রাজ্যভুক্ত ছিলো। আর শঙ্খ নদ থেকে টেকনাফ অবধি ভূভাগ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোসাঙ্গ অধিকারে ছিলো। মাঝখানে সামান্যকালের জন্য গৌড়ের সুলতান ও ত্রিপুরার রাজা চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে তখনকার আরাকানাধিপতি থিরি-থু-ধম্মা (১৬২২-১৬৩৮ খ্রিঃ) জলপথে ঢাকা আক্রমণ করেন এবং পরে শহরটি জ্বালিয়ে দেন।[১৯৪] এছাড়া চট্টগ্রামের নিকট কাঠগড় নামক স্থানে আরাকানবাহিনীর সঙ্গে মুঘলবাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। জানা যায় এই যুদ্ধে আরাকানরাজ চার লক্ষ পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী, বিপুল পরিমাণ রণহস্তী ও এক হাজারের বেশি রণতরী ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধে মুঘল সৈন্যদের পরাজয় হয়।

মুসলিম সুলতানদের সঙ্গে আরাকানরাজের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম কালচার এদেশে বিপুলভাবে আদৃত হয় এবং আরাকানরাজের প্রতিপোষণ পায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে মুসলমানদের কৃষ্টি ও সভ্যতা এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রনীতি ও আচার ব্যবহার তুলনামূলকভাবে আরাকানিদের তৎকালীন সামাজিক সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক কালচার থেকে অনেক উন্নত ছিলো। সুতরাং আরাকানিরা কোনোক্রমেই বঙ্গের মুসলিম প্রভাব থেকে বেরিয়ে

আসতে পারে নি। এবং এই প্রভাব ও সম্মোহনের কারণেই আরাকানের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী, অমাত্য, সমরসচিব ও কাজী বা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারকগণ ছিলেন মুসলিম। আর রাজাদের প্রধান উপদেষ্টাও ছিলেন তাঁরাই। অভিষেক অনুষ্ঠানাদিও তাঁদের দ্বারাই প্রতিপালিত হতো। আর যেহেতু এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চট্টগ্রাম ও সিলেটের অধিবাসী ছিলেন, সুতরাং রাজসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করার কারণে সারা রোসাঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে তাঁরা ব্যাপক সুবিধাদি পান। নিজেদের উন্নত সংস্কৃতি, শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্যের চর্চা ও প্রচারে এইসব গুণী মুসলিম আরাকান রাজাদের কাছ থেকে কোনো রকম বাধা তো পানই নি, বরং আশাতীত প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টায় একসময় রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার পথ সুগম হয়। তার সুফল আজ আমরা সহজেই উপলব্ধি করি।

সুতরাং খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চা সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যায়। রোসাঙ্গের পঞ্চপ্রদীপ তখন পাঁচ বাঙালি কবি দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল আর আবদুল করিম খোন্দকার। বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় কবি আলাওল রাজ প্রতিপোষণ পেয়ে রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চার যে সুযোগ পান, তাতে বাংলার সঙ্গে আরবি, ফারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার মিলনসেতু গড়ে তুলে তিনি তাঁর অনন্য প্রতিভার বিকাশ ঘটান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বার্মা পুনরায় আরাকান দখল করে নেয়।[১৯৫] আরাকানের রাজশক্তি ছিলো তখন অনেক দুর্বল। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে বার্মার যে যুদ্ধ হয় তাতে আরাকান আবার বৃটিশ ভারতের অধিকারে আসে।

রোসাঙ্গের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে সেদেশে বাঙালি মুসলমানের আগমন, সেখানে তাঁদের বসতি স্থাপন, আরাকানের বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির পারস্পারিক আঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার সাফল্যের কারণ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্র ধরে আরাকানের বাঙালি মুসলমানের অধিবাস এবং তাঁদের এই অধিবাসের সূত্র ধরে রোসাঙ্গে একটি প্রবাসী বাঙালি সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা একসময় অনুভূত হয় এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হলে আরাকানে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, যার সুদূরপ্রসারী সাফল্য আনেন আলাওল প্রমুখ কবিরা।

এ কথা ঠিক যে আরাকানে যে বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার স্থান অনেক উপরে। তবে নিশ্চয় এই সাহিত্যচর্চার যে ফসল তা রাজসভার সাহিত্য নয়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের দেওয়া 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামটি তাই ডক্টর আহমদ শরীফের মতে বিভ্রান্তিমূলক। এ ব্যাপারে ডক্টর শরীফের অভিমত যথেষ্ট তাৎপর্যবহ এই কারণে যে রাজধানী রোসাঙ্গে যে-সব কবি তখন বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁরা কেউ রাজসভার কবি ছিলেন না। কিংবা

---

১৯৫. পূর্বোক্ত, 'ভারতকোষ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

কৃত্তিবাস, মালাধব বসু বা ভারতচন্দ্রের মতো তাঁরা প্রত্যক্ষ রাজছত্রছায়ায়ও সাহিত্য-সৃষ্টি করেন নি। রোসাঙ্গে আলাওল প্রমুখ কবি রাজাদের নয়, রাজমন্ত্রীদের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় ও প্রতিপোষণে বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছেন। এবং সেই মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীগণও তাঁদের প্রতিপোষিত কবিদের মতোই আরাকানে প্রবাসী বাঙালি ছিলেন। তবে এ কথাও ঠিক যে রোসাঙ্গে বাঙালি কবিরা এবং তাঁদের প্রতিপোষকেরা রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও প্রধানত রাজধানী রোসাঙ্গের রাজসভা থেকেই তাঁদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যচর্চার একটি অনুকূল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এসব বিভ্রান্তিকর তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ডক্টর আহমদ শরীফের ভাষায় বলা যায় 'কাজী দৌলত, আলাওল প্রমুখ প্রণয়োপাখ্যান অনুবাদ করে এবং মাগন ঠাকুর দেশী রূপকথার কাব্যায়নে সতেরো শতকের রোসাঙ্গ শহরে বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিলেন।'[১৯৬]

চার॥ আরাকানের বাঙালি মুসলিম কবি

দৌলত কাজী॥ একথা ঠিক যে তৎকালীন বঙ্গদেশের রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যে চর্চা হয়, মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যে সৃজনশীলতার দিক থেকে তার তুলনা মেলা ভার। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে রোসাঙ্গ রাজগণের অনুকূল সাহচর্য ও বাঙালি রাজ অমাত্যগণের পৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী, আলাওল প্রমুখ কবি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় স্বাধীনভাবে বাংলা সাহিত্য রচনার সুযোগ পান, যার ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যের পুরোনো ধারায় নবতরভাবে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আর সেই সূত্রে প্রথম আমরা স্মরণ করি দৌলত কাজীকে, যিনি কাজী দৌলতরূপেও পরিচিত।

দৌলত কাজী জনৈক আশরাফ খানকে স্মরণ করে বলেছেন,

ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান।
হানাফি মজ্জাব ধরে চিশতি খান্দান॥

এই আশরাফ খান ছিলেন কবি দৌলত কাজীর পৃষ্ঠপোষক , যাঁর প্রতিপোষণে কবি তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' রচনা করেন। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের সে সময়টা ছিলো মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ও শাহজাহানের রাজত্বের শুরু। তখন রোসাঙ্গের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজা থিরি-থু-ধম্মা বা শ্রীসুধর্মা (১৬২২-১৬৩৮)। আশরাফ খান ছিলেন শ্রীসুধর্মার প্রধান অমাত্য ও সমর-সচিব। শ্রীসুধর্মা সম্পর্কে দৌলত কাজী বলেছেন,—

মহারাজা আয়ু শেষ জানি শুদ্ধমন।
তান হস্তে রাজনীতি কৈল সমর্পণ॥

এইচ. জি. হার্বের ইতিহাস সূত্রে জানা যায় এক গণক ভবিষ্যৎবাণী করেন যে সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যে রাজা শ্রীসুধর্মার মৃত্যু হবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর সূত্র ধরে রাজা ও

১৯৬. পূর্বোক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,' পৃ. ১৩৫ ও 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০

রাণীর ইচ্ছায় মহামাত্য আশরাফ খান রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব নেন।[১৯৭] অসাধারণ দক্ষতায় আশরাফ খান রাজ্যপরিচালনা করেন। রাজ্যশাসনের বাইরে তাঁর সংস্কৃতি-লালিত মন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। আশরাফ খানের সাহিত্যপ্রীতির বিষয়টিকে কবি দৌলত কাজী এভাবে ব্যক্ত করেছেন,--

শ্রীযুক্ত আশরাফ খান অমাত্য প্রধান।
ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান॥
নীতিবিদ্যা কাব্যশাস্ত্র নানা রসচয়।
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়॥

হিন্দি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষার উপাখ্যান আশরাফ খানকে আকর্ষণ করতো। সেই প্রবণতায় দৌলত কাজীকে তিনি দেশী ভাষায় পাঞ্চালী রচনার হুকুম দেন। কবিও তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে বাংলা ভাষায় 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' উপাখ্যান রচনা শুরু করেন। পশ্চিমা অবধি, ভোজপুরি ইত্যাদি ভাষায় চৌপাই দোহা ছন্দে আশরাফ খান যেসব কাহিনী শুনেছেন, তার মধ্যে কবি সাধন রচিত 'সতীময়না লোরচন্দ্রানী' তাঁকে বেশি আকর্ষণ করে।[১৯৮] আশরাফ খান দৌলত কাজীর কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে বলেন, --

ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দে॥

তদনুসারে 'কাজী দৌলত বুঝিয়া যে আরতি। পাঞ্চালির ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥'

আশরাফ খান ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পরিচালনার আদেশ পান। তদনুযায়ী 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী'র রচনাকাল ১৬৩৫-১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ধরা যায়।[১৯৯]

দৌলত কাজীর পৃষ্ঠপোষক আশরাফ খান হানাফী মজহাবী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।[২০০] সেই সূত্রে হয়তো দৌলত কাজীও সুফীভাবে ভাবিত ছিলেন। কবি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি বলেছেন,--

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতরী॥

কর্ণফুলীর উল্লেখ থেকে দৌলত কাজীর জন্মস্থান এই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী রাউজান থানাধীন সুলতানপুর বলে গবেষকগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

দৌলত কাজীর 'সতীময়না-লোরচন্দ্রানী' মিয়াঁ সাধন রচিত পূর্বভারতের হিন্দি লোকগাথা 'মৈনাসত' নামক কাব্যের বিষয় অনুসারে লেখা কবির স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা অনুবাদ।

---

১৯৭. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫
১৯৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩২৩
১৯৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫
২০০. পূর্বোক্ত, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৫

বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের আহীর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন জনপ্রিয় লোকগাথার নাম 'লোরিকমল্লের গীত'। দৌলত কাজীব লোরচন্দ্রানীর গল্পাংশে তার প্রভাব বিদ্যমান। মূলগাথার সংগ্রাহক জর্জ গ্রিয়ার্সন, হান্টার, এল্যুইন প্রমুখ প্রাব্রজ্যা পণ্ডিত।[২০১] বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের নানা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গাথার সঙ্গে লোরিকমল্লের গাথা সংগৃহীত হয়েছে। লোরচন্দ্রানীর জনপ্রিয় কাহিনীর উপর ভিত্তি করে অনেক চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। জৈন--পারসিক মিশ্র রীতিতে আঁকা চব্বিশখানা চিত্র লাহোর মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে বলে ডক্টর সুকুমার সেন জানিয়েছেন।[২০২] বিভিন্ন পণ্ডিতের গবেষণা থেকে মনে হয় সতীময়নাব কাহিনীটি এক সময় সর্বভাবতীয় রূপ লাভ করে এবং তার জনপ্রিয়তা বাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীর প্রায কাছাকাছি পৌছায়।

সাহিত্য- বসজ্ঞ আশরাফ খান মূল কাহিনীটি পাঠ কবে কিংবা শুনে আনন্দ পান। সেজন্য তিনি সাধাবণ বাঙালির চিত্তে এ কাহিনীর সুধা ঢেলে দেওয়াব জন্য দেশী ভাষায় কাব্যেব কাহিনী পবিবেশন করতে কবি দৌলত কাজীকে আদেশ দেন। দৌলত কাজী আশরাফ খানের আদেশ শিরোধার্য কবে কাব্যরচনায হাত দেন, তবে কাব্য সম্পূর্ণ কবাব আগেই তাঁব মৃত্যু ঘটে। 'সতী ময়না'ব বাকি অংশ 'বতনকলিকা আনন্দবর্মা' নামে কবি আলাওল বচনা কবেন।

দৌলত কাজী বচিত অংশেব কাহিনীটি এবকম। গোহাবি বাজ্যেব বাজকুমাব লোর ও তাঁব পত্নী ময়না। সন্ন্যাসীব প্রভাবে মোহবাদেশেব বাজকন্যা চন্দ্রানীর সঙ্গে তাঁব সাক্ষাৎ হয়। উভযে উভযেব প্রতি প্রেমাসক্ত হয। চন্দ্রানী কিন্তু বিবাহিতা ছিলো। তবে নপুংসক স্বামীব প্রতি চন্দ্রানীব কোনো আকর্ষণ ছিলো না। লোব চন্দ্রানীব প্রেমের বিষযটি কেন্দ্র কবে অতঃপর লোরের সঙ্গে চন্দ্রানীব বামন স্বামীর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে বামন নিহত হয। এক সময় চন্দ্রানী সর্পদংশনে অচেতন হয। এক সন্ন্যাসীব ঔষধে তার জ্ঞান ফিবে আসে। বৃদ্ধ গোহারিরাজ সেখানে এসে লোব ও চন্দ্রানীব বিযে অনুমোদন করেন এবং লোরকে বাজ্যেব কর্তৃত্ব গ্রহণেব আদেশ দেন। লোব অতঃপব তাঁব পূর্বপত্নী ময়নাব কথা বিস্মৃত হয়।

দ্বিতীয কাহিনীটি এবকম। সতী ময়না স্বামীব কল্যাণ- কামনায হবগৌবীর পূজায় নিজেকে নিযোজিত কবে। এব মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যেব রাজপুত্র ছাতন ময়নাব রূপে আকৃষ্ট হযে তাঁর প্রণয়প্রার্থনা কবে। ময়না প্রলোভন দমন কবে। ইতিমধ্যে এক দূতি বত্না মালিনী বাবমাস্যা বর্ণনায ময়নাব মাঠায। ন ফেবাতে চেষ্টা কবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষ অংশ বর্ণনাব আগেই দৌলত কাজীব মৃত্যু ঘটে। অতঃপব আলাওল তা সমাপ্ত কবেন।

সংক্ষেপে আলাওলেব কাহিনীটি হচ্ছে,---সখীব পবামর্শে ময়না তাঁব স্বামীর কাছে এক ব্রাহ্মণের হাতে শুকসাবী পসারীব মুখনিঃসৃত বাক্যে লোবেব মনে পূর্বস্মৃতি জাগে। লোর তখন চন্দ্রানীর গর্ভজাত পুত্র প্রচণ্ড-তপনকে মোহবা বাজ্যে অভিষিক্ত করে চন্দ্রানীসহ স্বদেশ ফিবে আসে। আলাওলের রচিত এই অংশে একটি বোমান্টিক উপাখ্যানেব পরিচয থাকলেও এতে আলাওল-প্রতিভার তেমন কোনো স্বাক্ষব নেই।

---

২০১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী হিন্দী পটভূমি', পরিশিষ্ট পৃ. ৪১৯-৪২৪
২০২ পূর্বোক্ত, ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩২৩

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দৌলত কাজীর কাব্যভাবনা ও শিল্পপ্রকরণগত বিশিষ্টত, তাকে উচু আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। উপাখ্যান পরিকল্পনায় তিনি হিন্দি প্রণয়োপাখ্যানের উপর নির্ভর করলেও বাংলায় তার কাব্যরূপ দিতে গিয়ে 'সতী ময়না'র কাহিনীকে সংস্কৃতের কাব্যাদর্শে গড়ে তুলেছেন। লোরের প্রিয়া-সন্দর্শনে যাত্রার অনুষঙ্গটিকে বিদ্যার জন্য সুন্দরের প্রণযাভিসারের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

নারী চরিত্রের রূপায়ণে দৌলত কাজীর শিল্পদৃষ্টি বাস্তব জীবনবোধের প্রতি গভীরভাবে নিবদ্ধ। রমণীচরিত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শনেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ত্যাগ ও ভোগের দুই মেরুতে গড়ে ওঠা ময়না ও চন্দ্রানী মানবজীবনের দুটি দিকের পরিচয় নিরূপণ করে।

বাংলা কাব্যকলার ভুবনে দৌলত কাজীর কবিকৃতির চমৎকার পরিচয় বিদ্যমান। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে কবি নায়িকার বিরহের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে উচ্চাঙ্গের কাব্যভাবনার পরিচয় মেলে। যেমন,—

শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেও
রাধার কোলে কানাই॥
কহেন্ত দৌলত সতী সৎপথ
না ত্যজে যাতে প্রাণ।
লস্কর নায়ক রস-বাণিজ্যর
শ্রীযুত আশরাফ খান॥

ময়নার সতীত্বের প্রকাশকল্পে তার সংলাপে বৈষ্ণব-ভাবনার কাব্যরসাশ্রিত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়; যেমন,

মালিনী বোলসি অনুচিত বাণী।
ধরম ন ছোঅতি তেজিআ সৎমতি
লোরপ্রেম করাঅসি হানি॥
মোহোর সুনাঅব গুণের সাযব
মধুর মূরতি বেশ।
সো মধু তেজিয়ে কৌছে বিখ পানাও
ভাল ধাত্রি কহ উপদেশ॥
তুমি বড় পাপিনী পাপ শুনাঅসি
ধরম করাঅসি বাম।
পাতক ঘাতক সম ধাত্রি মোর চিন্তসি
জাতিকুল করহ নির্ণাব॥
দুরন্ত দুর্মতি দূতীপনা দূর কর
চিন্তহ মোহোর কল্যাণ।
কাজী দৌলত ভণে, দাতা মনোভাব মনে
শ্রীযুত আশরাফ খান॥

মেঘনার রূপবর্ণনায় দৌলত কাজী যে উপমা-রূপকের ব্যবহার করেছেন তাতেও কবির যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ॥
কাঞ্চন-কমল মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে॥
মদন মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ॥
পুষ্পশর জিনি নাসা শোভে দিব্যমান।
লজ্জা এড়ি অন্তগত রহে কামবাণ॥

কবি দৌলতের মননশীলতার সঙ্গে তাঁর সৃজনশীলতার চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই বর্ণনায়।

রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ায় দৌলত কাজী যে রাজনৈতিক তথা সমাজ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তারই বাস্তবসমৃদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করি ভারতচন্দ্রীয় রীতিতে পরিব্যক্ত নিচের প্রশস্তিমূলক প্রবাদবাক্যসুলভ অংশটিতে,

মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
রাজভয়ে মাতঙ্গ না যায় তারে ঠেলি॥
বিপরা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
ভীমসম বলীও না করে বলাৎকার॥
সীতাসম সুন্দরী যদি রহে সে বনে।
রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে॥

এই সূত্রে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য যথেষ্ট অর্থবহ—'কাজী দৌলতের রচনায় যে স্মরণীয় সুভাষিতাবলীর প্রাচুর্য লক্ষিত হয় তাহা একদিকে তাঁহার সমাজ অভিজ্ঞতা ও মননের উৎকর্ষ, অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার কবিপ্রতিভার সাম্যের পরিচয় বহন করে।'[১০৩]

মরদন॥ মরদন ছিলেন রোসাঙ্গের অন্যতম মুসলিম কবি। তিনি আরাকান রাজ থিরি-থু ধম্মা বা শ্রীসুধর্মার সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীসুধর্মার রাজত্বকাল ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মরদন 'নসীবানামা' নামে একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু তিনি রাজপ্রতিপোষণ পেয়েছিলেন। মরদন নিজেও আরাকান রাজের যথাবিহিত প্রশংসা করেছেন তাঁর কাব্যে। যেমন,—

১০৩ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা আদি: মধ্য: আধুনিক যুগ [একত্রে] (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, বর্ধিত সং. ১৯৬৩), [প্রথম অংশ], পৃ. ১৩৫

ভোবন বিখ্যাত আছে রোসাঙ্গ নগর।
শ্রি শ্রি সুধর্ম্ম সাহা তথাত ঈশ্বর॥
ছত্র অ ধবল গজ্র লোক অধিপতি।
বিঅস্পতি সম বুদ্ধি, দানে কর্ণসম।

কবিব এই প্রশংসা থেকে অনুমিত হয তিনি রোসাঙ্গরাজেব অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। সরাসরি শ্রীসুধর্মার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ না করলেও তিনি রাজার কোনো অমাত্যেব যে সহযোগিতা ও সাহায্য পেযে থাকবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রোসাঙ্গেব সব কবিই আসলে অমাত্য বা তৎস্থানীয ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা যায। তবে ডক্টব আহমদ শরীফ মনে করেন, মরদন কোনো অমাত্যেব প্রতিপোষণ পান নি। অন্যদিকে ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হকের বিশ্বাস কবি সরাসরি রাজপ্রতিপোষণ পেযে থাকবেন।

মরদনের পূর্ববর্তী কবি দৌলত কাজীও রাজা শ্রীসুধর্মার সময আবির্ভূত হযেছিলেন। তদনুযাযী মরদনকে দৌলত কাজীর সমসামযিক[২০৪] বা ঈষৎ পরবর্তী কবি মনে করা যায়। মরদনের কাব্যে তাঁর নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলা হয নি। তবে তিনি কাঞ্চি নামক একটি জাযগার নাম উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখ থেকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কাঞ্চিকে রোসাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত একটি জাযগা মনে করেন। তবে ডক্টর আহমদ শরীফ কাঞ্চিকে রোসাঙ্গের নয, তৎকালে রোসাঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামের একটি গ্রাম বা প্রশাসন কেন্দ্র বলে মনে করেন।[২০৫] মরদনের সঠিক জন্মস্থান সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত বিশ্লেষণ নেই। তবে কাঞ্চির উল্লেখ থেকে তাঁকে সেই অঞ্চলের অধিবাসী বলে মনে করা যায। মরদনের ব্যক্তিজীবনের তথ্যাদিও নেই। গবেষক ও পণ্ডিতগণও এ বিষযে তেমন কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তবে কবি জনৈক 'ইব্রাহিম খলিল'কে পীররূপে সম্বোধন করে বলেছেন,

ইব্রাহিম খলিল পীর রূপে পঞ্চবান।
হীন মর্দ্দনে কহে কামাল বাখান॥

মধ্যযুগের প্রায় সব মুসলিম কবিই পীরের প্রশস্তি গাথা কীর্তন করে তাঁদের পীরভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাতে মনে হয, পীরের মুরিদ হওযা তাঁদের জন্য একটা গৌরবের ব্যাপার ছিলো। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য মরদন কবিরও 'ইব্রাহিম খলিল' নামে একজন পীর ছিলেন।

মরদনের নামে যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিযেছে সেটি আসলে খণ্ডিত আকারে প্রাপ্ত একখানি পুথি। পুথিখানার নাম যে 'নছিবানামা' ছিলো, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তার স্বপক্ষে অভিমত দেন। ডক্টর আহমদ শরীফ অবশ্য পুথিখানির নাম 'নসিবনামা' বা 'নিয়তিকথা' অথবা 'বিধিলিপি' বলেছেন। পুথির বিষয়ের বিশ্লেষণে সম্ভবত তাঁর এরূপ মনে হযে থাকবে।

২০৪. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক, 'আরকান রাজসভায বাঙ্গালা সাহিত্য' (কলিকাতা: ১৯৩৫), পৃ. ৬৯
২০৫. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৯

বাংলাদেশের প্রচলিত গালগল্পগুলোই কবি মরদনকে আকর্ষণ করে। 'নছিবানামা' কাব্যের কাহিনীটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। দুই সওদাগরের কিস্‌সার উপর ভিত্তি করে এ কাব্যের কাহিনীটি কবি তাঁর স্বভাবগত রোমান্টিক চেতনায় বিবৃত করেছেন। কাহিনীটি এরকম,—

রাজা নূরুদ্দীনের 'আসি' নামক রাজ্যের দুই বিত্তবান বণিক আবদুল করিম ও আবদুন নবী। এরা ছিলো পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সময় তাদের পত্নীরা অন্তঃসত্ত্বা হয়। দুই বন্ধু তখন পরস্পরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে তাদের মধ্যে একজন পুত্রসন্তান, অন্যজন কন্যাসন্তান লাভ করলে তারা পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিয়ে দিয়ে পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করবে। নির্দিষ্ট সময়ে অবদুল করিমের স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। কন্যার নাম রাখা হয় নছিরাবিবি। অনুরূপভাবে আবদুন নবী এক পুত্রসন্তান লাভ করে, ছেলের নাম রাখা হয় আবদুস ছবীর। কালক্রমে ছেলেমেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়। ইতিমধ্যে আবদুল করিম তার ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান দেয়। প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে আবদুল করিম। তার এই নিঃস্বতা তাকে বন্ধু আবদুন নবীর কাছে হেয় করে তোলে। জেনেশুনে কে তার ছেলেকে এক নিঃস্ব ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেবে? অতএব আবদুন নবী তার বন্ধু আবদুল করিমের কন্যা নছিরাবিবির সঙ্গে পুত্র আবদুস ছবিরের বিয়ে দিতে অস্বীকার করে। প্রতিশ্রুতির বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে আবদুন নবী এক বিত্তশালী সওদাগর আবদুল গনির কন্যার সঙ্গে আবদুস ছবীরের বিয়ে পাকাপাকি করে ফেলে। বন্ধুর প্রতিশ্রুতিভঙ্গে আবদুল করিম অন্তরে দারুণ আঘাত পায়। সে তখন স্ত্রীর কাছে সব কথা খুলে বলে। স্ত্রী করিমকে তার বন্ধুর প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে আর একবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দেয়। কিন্তু আবদুন নবী তার বিত্তসম্পত্তির প্রভাবে এতই অহংকারী হয়ে ওঠে যে সে বন্ধুকে একরকম গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। স্বভাবতই আবদুল করিম বন্ধুর এই নির্মম ব্যবহারে দ্বিতীয় বার আঘাত পায়।

মানুষের জীবনদর্শন সম্পর্কে আবদুল করিমের স্ত্রীর জ্ঞান ছিলো। সে স্বামীর অদৃষ্টের প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে কয়েকটি গল্প শোনায়। তদনুযায়ী আসামের সওদাগর বাজু খানের চার পুত্রের ভাগ্যলিপির ইতিহাস বিবৃত হয়। বাজু খানের চারপুত্র মুসা খান, ঈসা খান, ইসমাইল খান ও এবাদত খান। পুত্র চতুষ্টয়কে বাজু খান উপদেশ দেয় যেন তারা পিতৃধনে নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের অর্জিত অর্থে জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তোলে। বাজু খানের এই উপদেশের কথা জানিয়ে করিমপত্নী অতঃপর স্বামীর কাছে অন্য একটি প্রসঙ্গের কথা বিবৃত করে। বলা যায় এ কাহিনীর মূল প্রসঙ্গই সেটি। আর তা হচ্ছে প্রকৃত বন্ধুত্বের উদাহরণ। যেমন, –

পূর্বে যে মিসির দেশে দুই মিত্র ছিল।
মিত্রের কারণে মিত্র মরণ ইচ্ছিল॥

মিসরের সওদাগর পেরু খানের কন্যা খাণ্ডাবতী। খাণ্ডাবতীর প্রেমিকরূপে কবি জামালকে দাঁড় করান। খাণ্ডাবতী ও জামাল ছিলো পরস্পর সতীর্থ। সেই সূত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। কিন্তু সওদাগরের কন্যার সঙ্গে নামগোত্রহীন এক ছেলের প্রেম, তা-ও আবার সম্ভোগপূর্ণ প্রেম! ভাগ্যদোষে জামাল ধরা পড়ে। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়।

কিন্তু কাহিনীর নায়ক তো অত সহজে মরতে পারে না। সুতরাং তাকে বাঁচানোর জন্যই সম্ভবত কবি মরদন জামালের প্রিয়বন্ধু কামালকে উপস্থাপিত করেন। তাছাড়া প্রকৃত বন্ধুত্বের নজির স্থাপন করাও কবির উদ্দেশ্য। সুতরাং বন্ধুর প্রতি গভীর মমতাবশত কামাল তার বন্ধু জামালের সব অপরাধ নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে এরকম আত্মস্বীকৃতি দেয় যে অপরাধী জামাল নয়, সে নিজে। জামালকে বাঁচাতে কামালের এ মিথ্যাচারে জামাল বিস্মিত হয়। সে নিজের দোষ বন্ধুর ঘাড়ে তুলে দিতে অস্বীকার করে। সে-ই যে প্রকৃত অপরাধী এই কথাটি জামাল অকপটে স্বীকার করে।

তারপর কাহিনীর পটপরিবর্তন হয়। কবি এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসেন। 'আসি' রাজ্যের সজ্জন রাজা নূরুদ্দীন। বাগদাদের বাদশাহ হারুন উর রশীদের মতো তিনি নিশীথরাতে ছদ্মাবরণে ঘুরে বেড়াতেন। এ অবস্থায় একদিন রাজা আবদুল করিমের সাক্ষাৎ পান। ছদ্মবেশী রাজাকে আবদুল করিম তার জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনীটি শোনায়। তখন ফকিরবেশি রাজা নূরুদ্দীন আবদুল করিমকে পাল্টা আর একটি কাহিনী শোনান। এই কাহিনীটি অদৃষ্টবাদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। কাহিনীটি এরকম, – গরীব হোসেন নামক এক ব্যক্তি মিসর-রাজ সোলায়মানকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধারের জন্য পথনির্দেশের অনুরোধ জানায়। সোলায়মান তাকে প্রভাতে যার মুখ দর্শন করবে, এরকম একজনের সঙ্গে তার কন্যাদানের সুপারিশ করেন। পরের দিন সকালবেলা গরীব হোসেন এক বাঘের সাক্ষাৎ পায়। দরবেশের নির্দেশ অনুযায়ী বাঘকেই সে কন্যাদান করে। পরে আরো অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত হয়। তার মধ্যে হজরত মুসা ও তিন নিঃস্ব ব্যক্তির কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। নিঃস্ব ব্যক্তিত্রয় বস্ত্রাভাবে গর্তে বাস করে। মুসা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যেন তারা তিনজন তিনটি বস্ত্র পায়। এই ঘটনার সূত্র ধরে আরো অনেক ঘটনা বিবৃত হয়েছে। রাজা নূরুদ্দীন এরপর আবদুল করিমকে কিছু অর্থ সাহায্য করেন। সেই অর্থ ব্যবসায় খাটিয়ে অবদুল করিম তার হৃতসম্পদ পুনরুদ্ধার করে। আবদুল করিম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই ফকিরকেই তার কন্যাদান করে। একদিন নছিবাবিবি আবদুন নবীর পুত্র আবদুস ছবীরের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পায়। নছিবার স্বামী নছিবাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার অনুমতি দেয়। নছিরা তার সখীসহ বিয়ে বাড়ি রওনা হয়। তারপর পুথি খণ্ডিত।

মরদনের কাব্যে উপকাহিনীর ভিড় এত বেশি এসেছে যে সেই ভিড়ের মধ্য থেকে মূল কাহিনীটি খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। তারপর অদৃষ্টবাদের পরিণতি দেখানোর প্রতি কবির উৎসাহ অক্লান্তকর। তাতে মূল কাহিনীসহ উপকাহিনীগুলো সবই প্রায় ভারাক্রান্ত। ফলে সঙ্গতকারণেই মনে হতে পারে যে মরদন কবির ঘাড়ে যে নিয়তিবাদের ভূত চেপে বসেছিলো তা থেকে কোনোক্রমেই তাঁর মুক্তি ঘটে নি। তবে কাব্যের কাহিনী উপকাহিনীগুলোতে কবি যে রোমাঞ্চের বারিধারা সিঞ্চন করেছেন সেটা শুধু তাঁর কাব্যপ্রীতিরই পরিচায়ক নয়, বলা যায় পাঠককে সম্মোহিত করার প্রয়াস তার মাধ্যমেই বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করা হয়েছে।

তাছাড়া কবি মরদন তাঁর এই কাব্যে লোকশ্রুতির বিষয়কে যেভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন তাতে লোকসাহিত্য-বিষয়ক গালগল্পের প্রতি তাঁর যেমন অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তার দ্বারা সমকালীন মানুষকে নীতিশিক্ষা দানের বিষয়টিও অবহিত হওয়া যায়।

আলাওল॥ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি আলাওল ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শুধু সাহিত্যেই নয়, ভাষাবিদ্ হিসেবেও তিনি অসাধারণ এক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। সঙ্গতকারণেই শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁর পূর্বকালে কিংবা তাঁর সমকালে এক বিরলপ্রজ কবি-ব্যক্তিত্ব হিসেবে মর্যাদা পায়। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলাওলকে আমরা কিংবদন্তির সব্যসাচী লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি।

জ্ঞানসাধনায় আলাওল কবি বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করেছেন।[২০৬] বিদ্যাপতির শাস্ত্রজ্ঞান সংস্কৃত, অবহট্ট ও মৈথিলি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, কিন্তু আলাওলের পাণ্ডিত্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানসীমা অতিক্রম শেষে হিন্দু ও ইসলাম সম্পর্কিত শাস্ত্রজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে মণি-মাণিক্য আহরণ করেছে, তার তুলনা নেই।

ভাষাবিজ্ঞান ছাড়াও আলাওল-প্রতিভা সঙ্গীতে, নৃত্যশাস্ত্রে ও দর্শনে পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছে ; তেমনি সুফী প্রেমভাবনা ও রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রণয়তত্ত্বেও বহুমুখী জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছে।[২০৭]

আলাওলের প্রথম জীবন ভাগ্যচক্রের এক নির্মম অভিঘাতের সম্মুখীন হয়। এই অভিঘাতের পেছনে যে-কারণ ছিলো তা হলো তাঁর জীবন যেমন বৈচিত্র্যমুখর ছিলো, তেমনি ছিলো রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক। আলাওল তাঁর আত্মপরিচিতিমূলক একটি অংশে তাঁর ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের প্রসঙ্গে কিছু উক্তি করেছেন। এছাড়া তাঁর পিতৃপরিচয়ের কিছু প্রসঙ্গও আছে। তবে তাঁর জন্মভূমির কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় তাতে নেই। কবি বলেছেন,---

মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়তে প্রধান।
তাহাতে জালালপুর অতি পুণ্যস্থান॥

ফতেয়াবাদের উল্লেখ থেকে পণ্ডিতগণ কবির জন্মস্থান নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিতে পড়েন। যেমন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফতেয়াবাদকে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা বলে উল্লেখ করেন।[২০৮] অন্যদিকে, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, আলাওল ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মসলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র ছিলেন। এই ফতেয়াবাদকে ডক্টর এনামুল হক ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদ মানতে রাজি নন। আলাওলের পূর্ববর্তী কবি দৌলত উজির বাহরামের কাব্যে ফতেয়াবাদের উল্লেখ আছে এবং ফতেয়াবাদ যে-জেলায় অবস্থিত তার নামও উল্লিখিত হয়েছে। 'নগর ফতেয়াবাদ দেখিতে পুরয়ে সাধ, চাটিগ্রামে সুনাম প্রকাশ।' এই সূত্র ধরে মুহম্মদ এনামুল হক আলাওল-উল্লিখিত ফতেয়াবাদকে চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদ বলে মনে করেন।[২০৯] আলাওলের জন্মস্থান হিসেবে ডক্টর এনামুল হক

---

২০৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, আদি-মধ্য আধুনিক', [প্রথম অংশ], পৃ. ১২৮-১২৯

২০৭. গোপাল হালদার, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড (কলিকাতা : এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ৩য় সং ১৩৭০), পৃ. ১৬৬

২০৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯

২০৯. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৪২

চট্টগ্রামের হাটহাজারি থানার অন্তর্গত জোবরা গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। এই গ্রামে আলাওলের দীঘির পাড়ে কবির মসজিদ ও কবর এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করে টিকে আছে। তবে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, আলাওলের আত্মবিবরণীতে কবি নিজেকে অমাত্যের সন্তান এবং ফতেয়াবাদের উল্লেখ করেন নি। কবি তাঁর প্রথম জীবন ফতেয়াবাদে কাটিয়েছিলেন এবং শেষজীবন আরাকানে কাটান।[২১০] এমন কি আলাওলের নামে যে দীঘি আছে সেটিও আলাওলের কীর্তি নয়। কেননা, আলাওল মসজিদ, হাট, দীঘি এসব কীর্তি স্থাপনের বিরোধী ছিলেন। 'দারা সেকেন্দারনামা'য় কবি বলেছেন,—'হীন জাতি নানা দুঃখে উপার্জয়কালে, মসজিদ পুষ্কর্ণী দেয় কতক জাঙ্গাল।'

মসজিদ, পুকুরের চেয়ে কবি গ্রন্থকথা রচনাকে স্থায়ীকীর্তি মনে করে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন,-

মসজেদ পুস্কর্ণী নাম নিজ দেশে বহে।
গ্রন্থকথা যথাতথা উক্তি ভাবে কহে॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্ত হয় মন।
নাম স্মরি মহিমা করয় সর্বজন॥

এছাড়া জোবরা গ্রামে আলাওলের নামে যে একটি মসজিদের অস্তিত্ব রয়েছে সেই মসজিদে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি সম্পর্কে—"The journal of Bihar and Orissa Research society" Vol. IV, 1918-এ মন্তব্য আছে যে মসজিদটি আলাওলের জন্মের অনেক আগে তৈরি হয়েছিলো। যেমন, 'It is stated by the attendants that the masjid was built by the well known Bengali poet Alwal Khan... The inscription itself does not mention Alwal Khan, but record the creation of a mosque by the majlis Ala Rasti Khan on the 5th day of Ramzan 875 AH-1473 A. D. during the reign of Rukn-din Barbak Shah, son of Mohamud Shah [page. 181]। এই উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ আলী আহসান অভিমত দেন যে প্রমাণাভাবে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে জনৈক আলাওল বসবাস করে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি আলাওল নন। তবে কবি আলাওল যে ফতেয়াবাদে কিছুকাল কাটিয়েছেন একথা সত্য, কিন্তু সেই ফতেয়াবাদ ফরিদপুরের, যেখানে কবির পিতার কর্মস্থল ছিলো বলে ধারণা করা যায়। পরে কবি আরাকানে কাটান এবং জীবনের কর্মকাণ্ড শেষ করে সম্ভবত চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। কেননা চট্টগ্রামের কিছু অংশ ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকানরাজ্যভুক্ত ছিলো ; পরে আরো কিছু অংশ ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত আরাকান-অধিকারে থাকে। তখন রাজধানী 'রোসাঙ্গে'র নামে গোটা আরাকানকে রোসাঙ্গ বলা হতো।

আলাওলের প্রথম জীবন এক রোমাঞ্চকর অভিঘাতের সম্মুখীন হয়। রাজ-অমাত্যের পুত্র আলাওল পিতার সঙ্গে একদা জলপথে যাওয়ার সময় দুর্ধর্ষ হার্মাদ জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। রণবিদ্যায় পারদর্শী পিতা দুর্জয় তেজে ঝাঁপিয়ে পড়েন জলদস্যুদের উপর।

---

২১০. সৈয়দ আলী আহসান, ['আলাওলের জন্মস্থান ও পিতৃভূমি'], 'মাহে নও', ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যা (ঢাকা : আগস্ট, ১৯৫২), পৃ. ২৭

কিন্তু নির্মম ভাগ্য তাঁর। হার্মাদদের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে তিনি শহীদ হন। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাগীরথী কিশোর আলাওল সেদিন সম্ভবত এক অলৌকিক উপায়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। এবং সেই সুবাদেই অতঃপর ভাবীকালের বাঙালি মহাকবি আলাওলের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রণীত হয় বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ স্মারকের এক রমণীয় অধ্যায়। রোসাঙ্গের বাংলা সাহিত্যের গগনমণ্ডল তখন নতুন এক সাহিত্য- তারকার জন্ম-সম্ভাবনায় উৎফুল্ল। কিন্তু তার আগে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত আলাওলকে আশ্রয় নিতে হয় রোসাঙ্গের রাজদরবারে। ভাগ্যলাঞ্ছিত অপরিচিত সেই বালক-পথিক ভাগ্যক্রমেই সেদিন 'রোসাঙ্গে আসিয়া হৈনু রাজ আসোয়ার'। অর্থাৎ আরাকান-রাজ সাদ উমাদারের (১৬৪৫-১৬৫২) Royal Body Guard বা রাজদেহরক্ষী অশ্বারোহী দলে ভর্তি হন।[২১১] সেখানে বহু জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ পান তিনি,-

বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত।
সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত॥

সেই গুণী-সমাজে কবি নিজেও অন্তর্ভুক্ত হন। প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক, সঙ্গতকারণেই তাঁর সভামণ্ডপ ঘিরে 'গুণীজনে গীত-নাট্য-যন্ত্রবাদ্যে রঙ্গ ঢঙ্গ করে সর্বক্ষণ।' আলাওলের কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে সবাই তাঁরা মুগ্ধ। কবির পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা সমাদরের কোনো অভাব হয় না। আলাওল বলেন,

তালিব আলিম বুলি মুঞি ফকিরেরে।
অন্নবস্ত্র দিয়া সবে পোষন্ত আদরে॥

অতঃপর আলাওলের কর্মজীবন শুরু হয় একজন সৈনিকরূপে, কিন্তু সৈনিক-জীবন ছাপিয়ে তাঁর কবিখ্যাতি তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, যেমনটা ঘটেছিলো তিন শতক পরে সৈনিকরূপী কবি নজরুলের জীবনে। কবি আলাওল অতঃপর রাজ অমাত্যের আগ্রহে একের পর এক কাব্য রচনা শুরু করেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত বাংলা রোমান্টিক কাব্যের প্রবাহ তখন কবির হাতের স্পর্শ পেয়ে প্রাণচঞ্চল সৃজনশীলতায় ভরে ওঠে।

প্রশ্ন উঠতে পারে কবি আলাওল চট্টগ্রাম আসেন কী করে? তাছাড়া আরাকান রাজের সেনাদলের রাজ-আসোয়ার অর্থাৎ একজন প্রথম শ্রেণীর সেনাহিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনই বা কী করে? এসব প্রশ্নের সূত্র ধরে শুধু এটুকু বলা যায় যে পর্তুগীজ জলদস্যুরা হয়তো তখন নিতান্ত অল্পবয়সের আলাওলকে বন্দী-অবস্থায় চট্টগ্রাম নিয়ে আসে এবং সেখানে তাঁকে একজন দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়, যা সেসময় অনেকের ভাগ্যেই ঘটতো। কালক্রমে কবি যোগ্যতাবলে রাজ-আসোয়ারের পদটি পান। এই পদটি পাওয়ার পেছনে আলাওলের পিতার সামরিক খ্যাতিও হয়তো কাজ করে থাকবে।

নতুন দেশে একজন অপরিচিত লোকের জন্য একজন ভালো গাইড এবং একজন আশ্রয়দাতার প্রয়োজন হয়। কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন মহাকবি আলাওলের সেরকম

---

২১১. পূর্বোক্ত, ' মুসলিম বাংলা সাহিত্য', প. ১৪১

একজন গাইড ও আশ্রয়দাতা। মাগন ঠাকুর আরাকান-রাজ 'সাদ উমাদার' বা 'থদোমিন্তা'র প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই আলাওল তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'পদ্মাবতী' এবং পরে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' রচনা করেন।

মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর আলাওলের জীবনের দ্বিতীয় ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব কর্তৃক পরাজিত হয়ে শাহ সুজা আরাকানের মগরাজা সন্দযুধম্মের (১৬৫২ ১৬৮৪) আশ্রয় নেন (মে ১২, ১৬৬০ খ্রিঃ)। ১৬৬১ সালের জানুয়ারি মাসে সুজা আরাকান-রাজ কর্তৃক নিহত হন। 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্যে সুজার জীবনের করুণ অধ্যায় সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে।[২১২] সম্ভবত সেকারণেই আলাওলের ভাগ্যেও বিপর্যয় নেমে আসে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,--

দৈবযোগে আইনু আমি রোসাঙ্গ শহর।
তা পরে আইল তেথা শুজা নৃপবর॥
রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে হৈল বিসংবাদ।
পরাজয় ঘটিল তান পাই অবসাদ॥
যত লোক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল।
রোসাঙ্গ-নাথের হাতে সব লোক মৈল॥
মৃজা নামে কর্মচারী রোসাঙ্গেতে ছিল।
রাজাকর্ণে মোর তরে বিদ্রোহী শুনাল॥

মিরজার প্ররোচনায় অতএব আরাকান রাজ নির্বিচারে, কবি আলাওল বলেন,-- 'কারাগারে দিল মোরে ক্রোধান্বিত হইয়া।' নির্দোষ কবিকে 'পঞ্চদশ দিবস গর্ভবাস প্রায়' যন্ত্রণার শিকার হয়ে শ্রীঘরে কাটাতে হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজার বিবেচনায় কবি কারামুক্ত হন। এ বিপর্যয়ের পরেও কবিকে বেশ কয়েক বছর অর্থদৈন্যে কাটাতে হয়। তখন তাঁর বৃদ্ধকাল। তাই দেখা যায় কবি আলাওলের ভাগ্যে রাজপ্রতিপোষণ যেমন ঘটেছে, তেমনি রাজ-দুঃখযন্ত্রণার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তাঁর ভাগ্য-বিপর্যয় তাঁকে ধ্বংস করতে পারে নি, কেননা বাণীর বরপুত্র আলাওল ছিলেন জীবন-সংগ্রামের এক অপরাজেয় সৈনিক ; এবং জীবনভর সম্পূর্ণত তিনি ছিলেন আপন গৌরবেই গৌরবান্বিত।

কবি আলাওলের রচনা বৈচিত্র্যের দিক থেকে 'পদ্মাবতী' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম। এই কাব্যে কবি তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সবটুকু নির্যাস উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তবে 'পদ্মাবতী' আলাওলের মৌলিক সৃষ্টি নয়। হিন্দিভাষী কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুসরণে কবি এ কাব্য রচনা করেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও ডক্টর আহমদ শরীফের মতে পদ্মাবতীর রচনাকাল ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে হওয়া সম্ভব।[২১৩] তখন আরাকানের মগরাজা সাদ মেঙদার বা সাদ উমেদারের রাজত্বকাল (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রিঃ)। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের হিন্দিভাষী কবি মালিক মুহম্মদ

জায়সী সম্পর্কে জানা যায় তিনি শের শাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর মানস-প্রকৃতি ছিলো সুফীভাবে আচ্ছন্ন। জায়সীর জন্ম ভারতের আমেথিতে, তাঁর মাতৃভাষা আওধ।

রাজ-অমাত্য মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। তখন কবি চল্লিশোর্ধ্ব এক মাঝবয়েসী ব্যক্তি। পদ্মাবতীর রচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—

আজ্ঞা পাই রচিলুঁ পুস্তক পদ্মাবতী।
যথেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি॥
বৃদ্ধকালে হৈল এবে শক্তি টুটি আসে।
যৌবন কালের সম মন না উল্লাসে॥

পদ্মাবতী যে আলাওলেব মৌলিক সৃষ্টি নয়, এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে সসঙ্কোচে কবি বলেছেন,—

এই সূত্রে কবি মোহাম্মদে করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিল নিজ মন উক্তি॥

জাযসীর কাব্যভাবনায় মুগ্ধ কবি আলাওল নির্দ্বিধায় তাই পদ্মাবতীব বঙ্গীয় রূপায়ণে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তিব অপরূপ বিকাশ ঘটান। হযতো বাঙালি জীবনের কোমলতা ও সুধাভরা দিকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে কবি তাঁর নিজস্বতায় পদ্মাবতীব মতো একটি কাব্যসৌধ নির্মাণে উৎফুল্ল হন। এবং তাঁর সেই নিজস্বতাই যে পদ্মাবতী কাব্যে কবির মৌলিক ভাবনাব অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেকথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ডক্টর সুকুমার সেন যে-কারণে বলেছেন, আলাওলের অনুবাদ যেন মূলের অতিরিক্ত মূল্য পেয়েছে।[২১৪]

কাব্যভাবনা ও শিল্পপ্রকরণের দিক থেকে জায়সী ও আলাওল উভয়েই ছিলেন যথাক্রমে হিন্দি ও বাংলা সাহিত্যের প্রায় অদ্বিতীয় সম্রাট। সেকারণেই জাযসীর মৌলিক ভাবনা তাঁর 'পদুমাবত'কে যতখানি গৌরবান্বিত করেছে, আলাওলের অনুবাদ ঠিক ততখানিই তাঁর 'পদ্মাবতী'কে শৈল্পিক সিদ্ধি দিয়েছে। উপরন্তু কবি আলাওলেব পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান তাঁব কাব্যের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে মর্যাদা পেযেছে। কবি আলাওল সংস্কৃতেব লালিত্য ও সৌন্দর্য তাঁব কাব্যে বিশেষ শিল্পকুশলতাব সঙ্গে প্রযোগ করেছেন। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনায তিনি যে কবিতাব স্তবক রচনা কবেছেন তার দুটি অংশ,

ক. সুরঙ্গ কপোল বর্ণ চারু সুললিত।
জিনিয়া কমলপত্র অতি সুশোভিত॥
তার বাম পাশে এক তিল মনোহর।
পুতুলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর॥

খ. প্রভারুণ বর্ণ-আঁখি সুচারু নির্ম্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্মিনীৎপল॥
কাননে কুরঙ্গ জল সফরী লুকিত।
অঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত॥

---

২১৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৩৪

কবির ব্যবহৃত এসব পঙ্‌ক্তিতে ভাষার সঙ্গে ভাবের যে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য নিষিক্ত হয়েছে তাতে কবিতার গৌরব যেমন আপনা আপনি বিকাশলাভ করার সুযোগ পায়, তেমনি আলাওলের বর্ণনাগুণে পদ্মাবতীর রূপও যেন বিকচ-শোভিত পুষ্পের মতো অবলীলায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। অনুরূপ অনুষঙ্গের আর একটি পঙ্‌ক্তি,—

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোঁপা খসাইয়া কেশ মুকুলিত॥
সুগন্ধ শ্যামল ভার ধরণী ছুঁইল।
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল॥

তবে যেহেতু আলাওল রূপকথাপ্রবণ কবি ছিলেন, সুতরাং তাঁর কাব্যে বাস্তবতা-বিরোধী অলৌকিকতার সমাবেশ কিছু বেশি থাকায় বিষয় পরিবেশনে ভাবনির্ভরতা প্রাধান্য বিস্তার করেছে ও বস্তুনির্ভরতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। ভাবকে কল্পনার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে কবি ব্যাপকভাবে অলঙ্কার প্রকরণের উপর জোর দিয়েছেন।

আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' রচনায় হাত দেন, কিন্তু মাগনের আকস্মিক মৃত্যুতে কবি কাব্যটি অসমাপ্ত রাখেন। সুতরাং 'পদ্মাবতী'র পর কবির দ্বিতীয় কাব্য হিসেবে 'রতনকলিকা আনন্দবর্মাকে' ধরা যায়।

'রতনকলিকা' কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়না লোরচন্দ্রানী'র পরিশিষ্ট। থিরি সুধম্মা বা শ্রীচন্দ্রসুধর্মার (১৬৫২ - ১৬৮৪) প্রধান অমাত্য শ্রীমন্ত সোলায়মান ছিলেন কবির এ কাব্য রচনার উৎসাহ দাতা। পণ্ডিতদের মতে কাব্যটি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে থাকবে। ধর্মবতীপুরের রাজা উপেন্দ্রদেবের চার রাণীর মধ্যে প্রধান যিনি, তাঁর নাম রতনকলিকা। আনন্দবর্মা হচ্ছে এই রাণীর সন্তান। ঘটনাবিপর্যয়ে রাজার সঙ্গে রাণী ও সন্তানের বিচ্ছেদ এবং পরিশেষে মিলন, এই হচ্ছে একাব্যের কাহিনী। তবে সম্ভবত রাজ-অমাত্যের আদেশকে সম্মান দেখানোর জন্য কবি প্রাণের তাগিদ ছাড়াই এ কাব্য রচনা করায় এতে কবির স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পচেতনার বিকাশ তেমন নেই।

(অতঃপর আলাওল আরাকান-রাজের প্রধান সমর-সচিব সৈয়দ মহম্মদের আদেশে পারস্য-কবি নিজামী গঞ্জাবীর 'হপ্তপয়কর' অবলম্বনে বাংলায় 'সপ্তপয়কর' কাব্য রচনা করেন। আরবের অধিপতি বাহরামের সাত রাণী রাজাকে পর পর সাতটি কাহিনী শোনান। এই সাতটি কাহিনীই সপ্তপয়করের বিষয়বস্তু)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ খণ্ডিত আকারে 'তোহফা'র তিনটি পুথি আবিষ্কার করেন। 'তোহফা'র মূলকবি দিল্লীনিবাসী গদা শেখ ইউসুফ দেহলভী। আলাওল রাজ-অমাত্য শ্রীমন্ত সোলায়মান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এ কাব্য রচনা করেন। 'তোহফা'য় আলাওলের ধর্মানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় বিধি বিধানগুলো অনুসরণ করার যে প্রায়োজনীয়তা রয়েছে, 'তোহাফা'র পঁয়তাল্লিশটি 'বাব' বা অধ্যায়ে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, হয়তো কিছুটা উপদেশের মাধ্যমেই তার বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। তবে ধর্মতত্ত্ব বর্ণনার মধ্যেও আলাওলের স্বভাবসিদ্ধ বাকপটুতার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। যেমন,--

একভাগ শৈশবতা যায় খেলারসে।
আর ভাগ যৌবনতা মত্ত কামরসে॥
শেষকালে জরা ব্যাধি ধরিব আসিয়া।
কোন্‌কালে পুণ্য হৈব বুঝহ ভাবিয়া॥
ক্ষেণে শিরঃপীড়া ক্ষেণে জ্বরাক্রম বায়ু।
যার অঙ্গে রোগ হয় তিক্ত লাগে আয়ু॥

মহামহিম সৃষ্টিকর্তার প্রতি কবির কাতর ফরিয়াদ,--

কাতরের কাকুতি শুনহ করতার।
দোষ ক্ষমি কৃপা কর, সেবক তোম্মার॥

কোরেশী মাগন ঠাকুরের আদেশে আলাওল ফারসি 'আলিফ লায়লা'র চিত্তাকর্ষক কাহিনী অবলম্বনে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামালে'র প্রথম অংশ রচনা করেন। মাগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির রচনায় ছেদ পড়ে। পরে পরবর্তী রাজ- অমাত্য সৈয়দ মুসার আদেশে আলাওল 'সয়ফুলমুলকে'র বাকি অংশ সমাপ্ত করেন। তখন কবির বার্ধক্যাবস্থা,---

বৃদ্ধকালে গ্রন্থকার্য না হয় উচিত॥
রচিল পুস্তক [আমি] নানা আলাজ্বালা।
বৃদ্ধকালে ঈশ্বরভাবেতে রৈলে ভালা॥

'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য বাংলার আরো কয়েকজন কবি রচনা করেন। তার মধ্যে দোনাগাজী ও মালে মোহাম্মদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই রোমান্টিক কাহিনীর বিষয়টি হচ্ছে,--- মানবসন্তান সয়ফুলমুলকের সঙ্গে পরীরাজ শাহাবাল--রাজকন্যা বদিউজ্জামালের প্রণয় ও পরিণয় এবং সায়েদের সঙ্গে সরন্দ্বীপ--রাজকন্যা মালেকার বিবাহ। রোমান্টিক প্রেমকে সার্থক করার জন্য নায়ক নায়িকাকে বহু ভাগ্যবিড়ম্বিত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। সব বাধা অপসারিত হয়ে শেষপর্যন্ত নায়ক-নায়িকার মিলন সংঘটিত হয়। এই কাহিনীতে দেও দৈত্য, রাক্ষস-খোক্কস, গন্ধর্ব-কিন্নর ইত্যাদির বর্ণনা প্রাধান্য পাওয়ায় বাস্তবতার উপর কল্পনাসর্বস্ব রোমান্টিক ভাবকল্পকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

'সেকেন্দরনামা' আলাওলের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। তৎকালীন আরাকান-রাজসভার অমাত্য নবরাজ মসলিসের আদেশে লিখিত এ কাব্য কবি নিজামীর ফারসি কাব্য 'ইসকন্দরনামা'র বঙ্গানুবাদ। ইরানে প্রচলিত মহাবীর আলেকজান্ডারের বিজয়ের কাহিনী এর উপজীব্য। কবির তখন বৃদ্ধাবস্থা। সুতরাং এ কাব্যে আলাওলের কবিত্বের সৌরভ বহুলাংশে হাল্‌কা হয়ে আসে। তবু কোথাও কোথাও তাঁর সহজাত শিল্পভাবনার দীপ্তি চমক আনে। নারীদেহের রূপবর্ণনায় যথারীতি অলঙ্কারের ঐশ্বর্য ঝলসে ওঠে,--

অতি দীর্ঘ শ্যামকেশ জিনি ঘন মালা।
স্বরূপা সীমন্ত যেন সুধীর সবলা॥
চন্দ্রবান জিনি ভাল গৃধিনী শ্রবণ।
কামের কোদণ্ড ভুরু কমল লোচন॥
শুকচঞ্চু নাসিকা অধর বিম্বজিৎ।

দশন মুকুতা হাস্য উজ্জ্বল তড়িৎ॥
শারদ পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বয়ান।
কুম্ভ-কণ্ঠ নীলকণ্ঠ জিনি সিমটান॥
নারাঙ্গি জিনিয়া কুচ শোভে মত্ত হার।
ভাগীরথী উমাপতি শিরে বহে ধার॥
কোটি সিংহে জিনি ভুজ কনক মৃণাল।
চম্পক কলিকা অঙ্গ করতলে লাল।

কবি আলাওল কিছু রাগ ও পদাবলী রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য ও মাধুর্যকে অধিগত করে কবি নিজস্ব রীতিতে তার রূপ নির্মাণ করেছেন। তাতে কাব্যময়তার সঙ্গে ছন্দের যে ঝংকার, অনুরাগের বিষয়কে তা অপরূপ ভাবমাধুর্যে নিষিক্ত করেছে। যেমন,—

ঘরের ঘরণী, জগৎমোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষে, নিশি পরবেশে, কিসে বিলম্ব করিলি॥
প্রত্যূষে বিহনে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুং।
বেলা উদানে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুং॥

এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কবি বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাও নিজস্ব রীতিতে গড়ে তুলে কাব্যে তার জুতসই ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

অরুণ বরুণ যুগল নয়ন কাজল লজ্জিত ভেল।
কনক কমল উপরে ভ্রমর খঞ্জন করএ খেল॥
সর্ব অঙ্গ হেন গজেন্দ্রগমন করী-অরি জিনি মাঝ।
কেয়ূর কঙ্কণ কিঙ্কিনী নূপুর সঘনে করএ সাজ।
হেন কামিনীর হইব কিঙ্কর শুন সব মতিমান।
নওল যৌবন কামিনী মোহন শ্রীআলাওলে ভাণ॥

আলাওল সংস্কৃত শাস্ত্রানুমোদিত কাব্যভাবনার সহায়তায় ফারসি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানকে বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা কাব্যের যে অমরাবতী নির্মাণ করেছেন, তাতে যথার্থই তিনি 'বাঙলার জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি-স্থাপয়িতা'[২১৫] হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন।

কোরেশী মাগন ঠাকুর॥ কোরেশী মাগন ঠাকুর ছিলেন চট্টগ্রামের চক্রশালার অধিবাসী। চট্টগ্রাম তখন আরাকান-রাজ্যভুক্ত ছিলো। ডক্টর সুকুমার সেন অবশ্য মাগনকে একজন মগ রাজপুত্র মনে করেন।[২১৬] কিন্তু ডক্টর সেনের এরূপ ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, আবদুল হক চৌধুরী প্রমুখ গবেষকের অভিমত অনুযায়ী মাগন ঠাকুরের প্রপিতামহ আরবের কোরেশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি আরব থেকে চট্টগ্রামে এসে চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন। মাগনের পিতা রোসাঙ্গের রাজকর্মচারী ছিলেন। সেই

২১৫. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড, পৃ ১৭২-১৭৩
২১৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৪৪

সূত্রে তিনি তাঁর পরিবার রোসাঙ্গে নিয়ে আসেন। রাজকর্মচারীর পুত্র বলে মাগন শৈশবেই রোসাঙ্গে রাজপরিবারের সান্নিধ্যে আসেন। এরূপ অনুমান করা হয় যে, রোসাঙ্গের তৎকালীন রাজা নরপতিগীর (রাজত্বকাল আনু. ১৬৩৮-১৬৪৫ খ্রিঃ) মন্ত্রী ছিলেন বড় ঠাকুর নামে জনৈক মুসলমান ব্যক্তি। বড় ঠাকুরকে মাগনের পিতা মনে করে অনুমান করা হয় পিতার মৃত্যুর পর মাগন নরপতিগীর অমাত্য বা মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন।

ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন মাগন অমুসলিম ছিলেন। কারণ মাগনের পদবী ছিলো 'ঠাকুর'। এই ঠাকুর পদবী অনেক মুসলমানের থাকে। শোনা যায় অনেকদিন নিঃসন্তান অবস্থায় থেকে আল্লাহর কাছে মাগিয়া সন্তান লাভ করায় মাগনের এই নাম হয়। ডক্টর সুকুমার সেন যে বলেছেন মাগন রাজবংশোদ্ভূত বলে তাঁর উপাধি ঠাকুর, ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই। 'ঠাকুর' খেতাবও হতে পারে। বহুগুণে গুণান্বিত মাগন হয়তো রাজা নরপতিগী কর্তৃক এই উপাধি অর্জন করতে পাবেন। তাছাড়া মাগনের পিতার উপাধি ঠাকুর ছিলো বলে জানা যায়।

রাজা নবপতিগীর রাজত্বকাল ১৬৩৮ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে। অতএব তাঁর প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুর সেই কাল অনুযায়ী সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। ডক্টর আহমদ শরীফ জানিযেছেন মাগনেব ভাই ভিকনের এক বংশধব চট্টগ্রামের রাউজান থানার অর্ন্তগত নোয়াজিশপুবের বর্তমান এক বাসিন্দা।

মাগন ঠাকুব 'চন্দ্রাবতী' কাব্যেব রচযিতা। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গে প্রবাসী-কবি আলাওলের আশ্রয়দাতা। তবে কবি আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর ও কবি মাগন ঠাকুর এক ও অভিন্ন কিনা এ ব্যাপাবে প্রশ্ন ওঠে।

একথা ঠিক যে, কবি আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর কাব্যরসিক এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আলাওলের আত্মকথনমূলক বিভিন্ন পঙ্ক্তিতে একথা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন আলাওল বলেছেন,—

আরবী ফারসী আর মঘী হিন্দুয়ানী।
নানা শাস্ত্রে পারগ সঙ্গীতজ্ঞাতা গুণী॥
কাব্য অলঙ্কাব জ্ঞাতা যন্ত্রম নাটিকা।
শিল্পগুণ মহৌষধি নানাবিধ শিক্ষা॥

এরকম বিভিন্ন বিষয়ে গুণান্বিত ব্যক্তিটি যে একজন কবি হিসেবেও খ্যাতিমান হতে পাবেন তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। সুতরাং তিনি যে আলাওলের আশ্রয়দাতা ও 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের রচয়িতা কবি মাগন ঠাকুর সে বিষয়ে ধারণা করা যেতে পারে বিধায় ডক্টর আহমদ শরীফ যে বলেছেন 'এত বিদ্যা যাঁব এবং যিনি আলাওলের সংগীত ও কাব্যশিষ্য তাঁর পক্ষেই সম্ভব চন্দ্রাবতী কাব্য বচনা' , একথাটি সত্য।

মাগন ঠাকুর কবি হলেও বাজ-অমাত্য হিসেবে নরপতিগীর পরিবারের বিশ্বস্ততা অর্জন কবেছিলেন। বাজপরিবাবের যাবতীয় কাজে তাঁর পরামর্শ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হতো। এমন কি মৃত্যুকালে রাজা নরপতিগী নিজের একমাত্র অবিবাহিতা কন্যাব তত্ত্বাবধানের দাযিত্ব তাঁর হাতে সঁপে দেন। ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরপতিগীর মৃত্যুর পর রাজপরিবারের

শুভাকাঙ্ক্ষী মাগন রাজার বংশরক্ষার জন্য রাজকুমারীর সঙ্গে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র সাদউ মেঙদারের বিয়ে দিয়ে রাজা-রাণী হিসেবে তাঁদের অভিষেক করেন। রাজদম্পতি কৃতজ্ঞচিত্তে মাগন ঠাকুরকে মহামাত্য বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন।

আসলে মাগন ঠাকুর কবি হিসেবে যতখানি বড়ো ছিলেন, রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলো। মাগন তাঁর দীর্ঘজীবনে রাজা নরপতিগীর পরিবারের অনেকের মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। সাদউ মেঙদারও মাগনের জীবিতকালেই ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। রাণী তাঁর পাত্রমিত্রদের পরামর্শে তখন মাগনের অভিভাবকত্বে শিশু রাজপুত্র থিরি-সান্দ-থুধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রিঃ) নামে রাজ্য শাসন করেন।[২১৭] এভাবেই মাগন আরাকানের বেশ কয়েকজন রাজার জীবননাট্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে রাজপরিবারের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনার সাক্ষী হন। কবি আলাওলের আত্মবিবরণীমূলক কবিতায় এসব কথা বিবৃত হয়েছে।

মাগন ঠাকুরের মৃত্যু সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগন জীবিত ছিলেন।[২১৮] ডক্টর আহমদ শরীফ মনে করেন ১৬৫৮ অথবা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাগন ঠাকুর আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন।[২১৯] আবদুল হক চৌধুরী বলেন, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুজা যখন আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন তার আগেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয়।[২২০] এই কারণে শ্রীচন্দ্রসুধর্মা কর্তৃক শাহ সুজার হত্যার ঘটনাটি মাগন প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি।

মাগন ঠাকুরের চরিত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্র পরিচালনায়ও যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিলো, আরাকানের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সূত্রটি একথা প্রমাণ করে। দ্বিতীয়ত, আরাকানের প্রধান অমাত্য হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেও তিনি জ্ঞানসাধনায় নিয়ত নিরত থাকতেন। তৃতীয়ত, তিনি যেমন কাব্যরসিক ছিলেন তেমনি কবি ও কাব্যের প্রতিপোষণ করতেন। তাঁর সভায় বহু জ্ঞানীগুণী ও কবির সমাবেশ ঘটতো। কবি আলাওল উচ্ছ্বসিতভাবে একথা বলেছেন, --

> গুণিগণ থাকন্ত তাহান সভা ভরি।
> গীত-নাট্য-যন্ত্রবাদ্যে রঙ্গ-ঢঙ্গ করি॥

মাগনের কাব্যচর্চার নিদর্শন তাঁর 'চন্দ্রাবতী' কাব্য। ১৯৩৩ সালে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত আকারে পুথিটি মাগনের ভাই ভিকনের বংশধর রইসউদ্দীনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন।

---

২১৭. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১; আবদুল হক চৌধুরী, 'চট্টগ্রামের সমাজ

২১৮. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৪০

২১৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫০

২২০. পূর্বোক্ত, 'চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা', পৃ. ১৩৩

মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' পুথিটি একখানি উল্লেখযোগ্য কবিকর্ম হলেও কবি তাঁর জীবৎকালে কখন কোথায় এ পুথি রচনা করেছেন সে সম্পর্কে কিছুই পাঠককে জানান নি। কবি আলাওলের কাব্যে তাঁর আশ্রয়দাতা মাগনের কাব্যপ্রীতির নানা প্রসঙ্গ আছে, তবে 'চন্দ্রাবতী' সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। ধারণা করা যায় মাগন ঠাকুরের স্বভাব-সঙ্কোচ ও প্রচার-বিমুখতাই এর পেছনে কাজ করেছে।

মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' একখানি রোমান্টিক প্রণযোপাখ্যান। একাব্যের নায়কের নাম বীরভান। তিনি ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র। নায়িকা সরুদ্বীপের রাজা সুরপালের কন্যা চন্দ্রাবতী। নায়কের বন্ধু হচ্ছে চন্দ্রসেনের মন্ত্রী সঞ্জয়ের পুত্র সুত। নায়িকা নায়কের শৌর্যবীর্যের কথা শুনে তার প্রতি অনুরক্ত হয়। ওদিকে নায়িকার অসাধারণ রূপের কথা শুনে নায়ক পাগল হয়। উভয়ের মধ্যে প্রেমের গভীরতা বাড়ে। চন্দ্রাবতীকে পাওয়ার জন্য বীরভান অতঃপর অভিযান শুরু করে। সহস্র নৌকার বহর সাজিযে সে পাত্রমিত্রসহ সমুদ্রপথে সরুদ্বীপ যাত্রা করে। রাজপুত্রকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, নাগ-বাঘ ও যক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়ার পরই কেবল নায়িকার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তার আগে বীরভান যখন শুনতে পায় চন্দ্রাবতীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তখন সে খবর তার বুকে শেলের আঘাত হানে। এ অবস্থায় বন্ধু সুত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, --

> যদি বা থাকয়ে মোর কণ্ঠেতে জীবন।
> চন্দ্রাবতী আনি দিমু তোমা বিদ্যমান॥

অনেক সঙ্কট সমাধানের পর অবশেষে বীরভান-চন্দ্রাবতীর মিলন হয়। পুথিটি খণ্ডিত হলেও কাহিনীর মিলনের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

'চন্দ্রাবতী' রোমান্টিক কাব্য বলেই সম্ভবত এতে রোমান্সের সঙ্গে রূপকথার চিত্তমধুর বিষযের মিলন ঘটেছে। তবে এ হলো বযস্কের রূপকথা। কেননা নায়ক-নায়িকার প্রেমের চিত্র এই কাহিনীতে যেরূপ আড়ম্বর সহকারে অঙ্কিত হযেছে তাতে নর-নারীর সকাম প্রেমই যে এখানে মুখ্য, তা সহজেই বোঝা যায়। নায়িকার রূপের মোহে নায়কের ভাবোন্মত্ততা এবং অনেকগুলো বাধা অতিক্রম করে নায়িকার সাক্ষাতে নায়কের চিত্তদাহের উপশম, এ বিষয়টি বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করা যায়।

মাগন ঠাকুর খুব উঁচুমানের কবি না হলেও গল্প বলার কৌশল তাঁর অধিগত ছিলো। আর সেজন্য তাঁর গল্পের বাঁধুনী বেশ মজবুত। তিনি যখন বলেন, -'প্রতিদিন চন্দ্রাবতী কন্যা সুচরিতা। কুমারের রূপধ্যান করে গুণযুক্তা,' তখন বোঝা যায় গল্প বলাই কবির আসল উদ্দেশ্য। তবে গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কবিমনের পরিচয়টিও দুর্লভ নয়। সেখানে কথাবস্তুর আড়ম্বরের সঙ্গে কবিত্বের বিকাশ সমভাবে বিদ্যমান। রাজপুত্রের পোশাক-আশাকের একটি বর্ণনা,---

> গাযেত কবচ গলে মানিক্যের হার।
> শিরেত ফোটকা দিল অতি শোভাকার॥
> কোমরে পোটকা গজ-মুক্তার ঝরকা।
> কর্ণেত কুণ্ডল যেন চান্দে দিল দেখা॥

হস্তেত বলয় শোভে অতি মনোহর।
শয্যা বিছাইয়া বৈসে রাজার কুমার॥
মহা দীপ্তিমান রূপ অধিক উজ্জিল।
স্বর্গ হন্তে ইন্দ্র যেন ভূমিতে নামিল॥

আবদুল করিম খোন্দকার॥ আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্যে পাঁচজন কবিকে রোসাঙ্গের পঞ্চপ্রদীপ বলে অভিহিত করা হয়। এই পাঁচজন কবি হচ্ছেন যথাক্রমে দৌলত কাজী, মরদন, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও আবদুল করিম খোন্দকার।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে আরাকান রাজসভার সমর্থনপুষ্ট অমাত্যদেব পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ হয়। শুধু রাজ-অমাত্য নন, রাজসভাব অন্য অনেক কর্মচারীও হয়তো পরোক্ষভাবে তখন বাঙালি কবিদের উৎসাহ দিয়ে থাকবেন। এরকম একজন রাজকর্মচারী আতিবর। তিনি আরাকান-রাজসভায় রাজ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আবদুল করিম খোন্দকার আতিবরেব উৎসাহ ও অনুপ্রেবণায় তাঁর 'দুল্লা মজলিস' কাব্য রচনা কবেন। রাজসভার যেসব গুণীজ্ঞানী তৎকালীন বাঙালি কবিদের কাব্যরচনায় উৎসাহ ও প্রেরণা যোগিয়েছিলেন, কবিরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের নাম কাব্যে উল্লেখ করেছেন। এজন্যই হয়তো অনেক মান্যবর ব্যক্তি তখন বাঙালি কবিকে কাব্যরচনায় উৎসাহ দিতে নিজেরাও বিপুলভাবে উৎসাহিত হতেন। যে-কোনো গ্রন্থে এই নাম উল্লেখের ইচ্ছেটা যে সার্বজনীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লেখার ক্ষমতা নেই অথচ অন্যের লেখায় নামটি উল্লেখ থাক, এটা তো যে-কোনো অলেখকেরই মনের কথা। তবে আতিবর সেরকম ব্যক্তি ছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা কবি আবদুল করিম খোন্দকাব তাঁর প্রশংসা করেছেন। এবং যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর সেই মান্যবর ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন,—

আতিবর বুলে জারে প্রভুর প্রসাদ।
নামের প্রসাদে তার খণ্ডএ প্রমাদ॥
একদিন আমারে ডাকিয়া সেই জন।
পড়াইয়া শুনিলেন্ত কিতাব কথন॥
দুল্লা মজলিস নামে কিতাব প্রধান।
হরষিত হৈল মন শুনিয়া তাহান॥

মধ্যযুগেব কবিদের অনেকেই সুযোগ বুঝে বেশ ফলাও কবে নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহ বোধ করতেন। কথাটি কবি আবদুল করিম খোন্দকার সম্পর্কেও খাটে। 'দুল্লা মজলিসে' কবি তাঁর বংশের পরিচয়-সূত্রে তাঁর পিতামহ রমসুল মিয়া, তৎপুত্র মছম আলী, মছম আলীর পুত্র আলী আকব্বর এবং আলী আকব্বরের পুত্র কবি আবদুল করিম খোন্দকারের কথাও শুনিয়েছেন। 'খোন্দকার' উপাধিটি কবি কেন গ্রহণ করেছেন তার সঠিক কোনো কারণ জানা যায় না, তবে 'খোন্দকার' সম্ভবত কবির বৃত্তিসূত্রে পাওয়া একটি উপাধি। কবিব আত্মকথন থেকে জানা যায় তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকেই রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে রাজানুগ্রহও তাঁরা লাভ করেছিলেন। এতদ্‌সংক্রান্ত আত্মবিবরণীর অংশটি নিম্নরূপ,—

রমসুল মিয়া নামে প্রপিতা আমার।
বিবয় পদবী পাইল প্রসাদে রাজার॥
ডিঙ্গার হাসিল যত তাহার কারণ।
লইয়া ভেটএ সব নৃপের চরণ॥
তানপুত্র মছন আলী ডিঙ্গার দোভাষী।
দিব্যবস্তু হৈলে নৃপস্থানে দেঅ আসি॥
রোসাঙ্গেত যত সদাগর আইস যাএ।
নৃপের সমুখে নিয়া বচন ফিরাএ॥
তানপুত্র আলী আকব্বরে ধরে নাম।
শুদ্ধমতি মহাজন সর্বগুণধাম॥
আমি তানপুত্র আবদুল করিম খোন্দকার।
আশা কৈলুঁ এ কিতাব রচিতে পয়ার॥

কবির বিবরণ অনুযায়ী ধারণা করা যায় যে তাঁর প্রপিতামহ রমসুল মিয়া আরাকান-রাজ কর্তৃক পদবীপ্রাপ্ত হয়ে রাজার এলাকায় সমুদ্রপথে বাণিজ্যতরীর হাসিল আদায়কারী হিসেবে নিযোগ পান। ইংরেজিতে এই হাসিল আদায়কাবীকেই বলা হয় ট্যাক্স কালেক্টব, যা উচ্চতম সরকারি পদের নির্দেশ-জ্ঞাপক। রমসুল মিয়ার পুত্র মছন আলী সমুদ্র ডিঙ্গার দোভাষীর দায়িত্ব পান। দুই ভাষার বক্তব্য পরিবেশনে মছন আলী নিশ্চয় কৃতির অধিকারী ছিলেন । সুতরাং বাজার সঙ্গে বিদেশী বণিকদের আলাপ-আলোচনায় তিনি দোভাষী ইন্টারপ্রেটরের ভূমিকা পালন করেন। কবি আবদুল করিম খোন্দকার পিতা পিতামহের শিক্ষা-সংস্কৃতির পথ অনুসরণ করে রাজশাসনের উচ্চতম কোনো বৃত্তি ধারণ করতে না পারলেও স্মরণীয় যে পথে তিনি অগ্রসর হন, সেপথ আরো মহৎ বলেই তা যথারীতি রাজ-স্বীকৃতি পায়। কবির সেই পথপরিক্রমার সফল পরিণতি 'তমিম আনসারী', 'হাজার মসায়েল' ও 'দুল্লা মজলিস' শীর্ষক ত্রয়ীকাব্য।

আবদুল করিম 'দুল্লা মজলিস' কাব্যে যে দীর্ঘ আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা থেকে আরো জানা যায়, কবির পৃষ্ঠপোষক আতিবরের সঙ্গে বহু জ্ঞানীগুণী, আলেম-ফকিব ও দরবেশ-মওলানার সম্পর্ক ছিলো। রাজ-পার্ষদ হিসেবে আতিবরেরও যথেষ্ট সুনাম ছিলো। তিনি রোসাঙ্গ-বাজ কর্তৃক 'সাদিউক নানা' উপাধি লাভ করেন। রাজ-টাকশালেব অন্যতম দায়িত্ব ছিলো তাঁর। 'শ্যামল সুন্দর তনু'র অধিকারী আতিবর রাজকীয কাজে 'প্রতিদিন চলি যায় নৃপের সদন'। রাজশাসনের দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত থেকেও আতিবর গুণীজনকে শিল্পসাহিত্য-চর্চায় উৎসাহিত করতেন। সেই উৎসাহ-দাতা কর্তৃক দেশী ভাষায় কাব্যরচনার আদেশ পেয়ে কবি আবদুল করিম খোন্দকার 'দুল্লা মজলিস' কাব্য প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন । প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে কবি বলেন,–

দুল্লা মজলিস নামে কিতাব প্রধান।
হরষিত হৈল মন শুনিয়া তাহান॥
বুলিলা ফারসী ভাষা না বুঝে সকলে।
কেহ বুঝে কেহ লোকে শুনিয়া বিকলে॥

সজ্জন শিষ্য যেমন গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করে অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হয়, আবদুল করিমও তেমনি তাঁর প্রতিপোষক ও উপদেষ্টা আতিবরের উপদেশকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন,--

তাতে মহাজন আজ্ঞা না যাএ লঙ্ঘন।
অঙ্গীকার কৈলুঁ তান মানিলুঁ বচন॥

'দুল্লা মজলিস' সামান্য খণ্ডিত আকারে প্রাপ্ত একটি পুথি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে কাব্যটি ১০৬০ মঘী সন বা ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে থাকবে।[২২১] কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কবির যে উক্তি, --

এবে শুন মুসলমানি সঙ্কেত কথন।
এক সহস্র দুইশত আরব্যাহ সন॥

অন্য এক জায়গায় কবি বলেছেন--'সহস্রেক সাইট শতেক সাইট অব্দ আর॥' এর একটি শুদ্ধপাঠ--'সহস্রেক ষাট শতেক সাত অব্দ আর।' কবির উল্লিখিত এই তারিখ মঘীসন। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে ১১৬৭ মঘীতে ১৮০৫ এবং ১১০৭ মঘীতে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ হয়।[২২২]

'দুল্লা মজলিস' কাব্যটি ফারসি কাব্যের ভাবানুবাদ। কাব্যখানি তেত্রিশ ভাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এ কাব্যের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হজরত আদম, হজরত ইব্রাহীম, লুত, মুসা প্রমুখ নবীগণের জীবনের নানাপর্বের কাহিনী। এসব কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে হাসান বাসোরী, হাসান কোরাইশী প্রমুখ সাধকদের জীবনের নানাদিক। রোজা, নামাজ, বেহেস্ত,-- এসব বিষয়ের বর্ণনায় কবির ধর্মানুভূতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রানুরাগ ও নীতিবোধের বিষয়টি তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। নীতিকথা প্রচারে কবির উৎসাহও বিপুল।

আবদুল করিম তাঁর 'হাজার মসাইল' শীর্ষক একটি কাব্যে ফিকাহ শাস্ত্রের সার সংকলন করেছেন। কাব্যটি রচনায় কবি মূল ফারসিকেই আদর্শ করে থাকবেন।

আবদুল করিম খোন্দকার 'নূরনামা' শীর্ষক কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হাজী মুহম্মদ প্রমুখ মধ্যযুগের মুসলিম কবিরাও এ বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। 'নূরনামা' কাব্যের তাৎপর্য এই যে এতে সৃষ্টিকর্তার পরম রহস্যময় সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে স্রষ্টার যে মাহাত্ম্যের প্রকাশ, তার একটি তাত্ত্বিক উপলব্ধি। নূর থেকে সৃষ্টির যে বিকাশ, সেই নূর আসলে স্রষ্টার স্পর্শধন্য হয়ে মহানবীর মধ্যে প্রবেশ করে ; নূরের সুতীব্র ধারা অতঃপর সকল সৃষ্টির মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই নূরের সঙ্গে সৃষ্টির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তাত্ত্বিক অর্থে এই নূর প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির নিবিড় সম্পর্ক যোজনার মাধ্যম।

আবদুল করিম খোন্দকার 'তমিম আনসারী ' নামক আর একটি কাব্য রচনা করেন।

---

২২১. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৪৬
২২২. পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২৩

রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চায় দৌলত কাজী, মরদন, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর প্রমুখ যে চারজন কবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, আবদুল করিম খোন্দকার তাঁর নিজস্ব কৃতি অনুসারেই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। তাঁর কবিপ্রতিভার গুণেই তিনি রোসাঙ্গের রাজ-প্রতিপোষণও পেয়েছিলেন।

রোসাঙ্গকে বাংলা সাহিত্যের আশীর্বাদ বলা চলে। তৎকালীন মুসলিম বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় গতি সঞ্চার করার ষোল আনা কৃতিত্ব রোসাঙ্গের পঞ্চপ্রদীপ দৌলত কাজী, মরদন, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর ও আবদুল করিম খোন্দকার--এই পাঁচজন বিশিষ্ট মুসলিম কবির। এঁরা ধর্মীয় কাব্য লিখেছেন, লিখেছেন ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক মানবীয় প্রণয়োপাখ্যান। এক ভাষার বিষয়কে অন্য ভাষায় স্থানান্তর করার যে জ্ঞান ও কৌশল, এঁদের তা জানা ছিলো, ফলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বঙ্গ রূপায়ণে তাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্ব সহকারে সফল হয়েছেন।

পাঁচ॥ সপ্তদশ শতকের অন্যান্য মুসলিম কবি

সৈয়দ মর্তুজা॥ অনুমান করা হয় সৈয়দ মর্তুজার জীবনকাল ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। কবির পিতার নাম সৈয়দ হাসান। উত্তর প্রদেশের বেরেলীতে তাঁর নিবাস ছিলো। বেরেলী থেকে পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরের নিকটবর্তী বালিয়াঘাটা নামক গ্রামে সৈয়দ মর্তুজার জন্ম হয়। সৈয়দ মর্তুজা দরবেশ কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। রাজমহলে থাকাকালীন তিনি বহু অলৌকিক কেরামতি দেখিয়ে তাঁর ফকিরি খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। এছাড়া তৌহিদ সম্বন্ধীয় বিবিধ গান গেয়ে তিনি লোকের প্রশংসা অর্জন করেন। জানা যায় আনন্দময়ী নামে তাঁর একজন সাধনসঙ্গিনী ছিলো। এছাড়া নিজে আনন্দ উল্লাসে মশগুল থাকতেন বলে তিনি লোকসমাজে সৈয়দ মর্তুজা আনন্দ্ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। এসব ধারণার অবশ্য কোনো যুক্তি ও ভিত্তি নেই।

'যোগ-কালন্দর' নামে সৈয়দ মর্তুজার একখানি কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে তিনি পদকর্তা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যূন ২৮টি পদ তাঁর ভণিতায় পাওয়া গিয়েছে। ফারসি ভাষায় তিনি কিছু গজল রচনা করেছেন। সৈয়দ মর্তুজার 'যোগ-কালন্দর' গ্রন্থখানি সুফী-শাস্ত্রীয় মারফতী তত্ত্বকথার সঙ্গে হিন্দুর যোগ-শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদির সমন্বয়ে সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেছে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে এ গ্রন্থে। 'যোগ-কালন্দর' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো,--

নাছুত মোকাম জ্ঞান এ তিন টিহরী।
আজরাইল ফিরিস্তা আছে তথায় প্রহরী॥
সে সব ঘটাল জ্ঞান আনলের স্থান।
সদায় আনল জ্বলে নাহিক নির্বাণ॥

মুহম্মদ আকবর, সৈয়দ॥ মুহম্মদ আকবর তাঁর 'জেবুলমুলক শামারোখ' কাব্য-রচনার কালপ্রসঙ্গে লিখেছেন,--

লিখন সমাপ্ত হৈল কাকে ভিন্ন দিল।
আরবী আনাছের মধ্যে ভাস্কর ভাসিল॥

এতে কাব্যের রচনাকাল ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দ হয়। অতএব তিনি সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে সৈয়দ মুহম্মদ আকবর ত্রিপুরা জেলার বাসিন্দা ছিলেন।[২২৩] মুহম্মদ আকবরের 'জেবুলমুলক শামারোখ' একটি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানমূলক কাব্য। মৃগয়া করতে গিয়ে শাহা সুলতানের পুত্র জেবুলমুলক গন্ধর্বকুমারী শামারোখের রূপে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযান শেষে শামারোখকে লাভ করে।

শেখ শেরবাজ চৌধুরী॥ শেখ শেরবাজ চৌধুরী সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। তিনি তৎকালীন ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর তিনখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কাব্য তিনখানি হচ্ছে— 'ফক্করনামা' বা 'মল্লিকার হাজার সওয়াল,' 'কাসেমের লড়াই' ও 'ফাতিমার সুরতনামা'। ফারসি ফক্কবনামা থেকে 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' কাব্যখানি অনূদিত হয়েছে। রোমের অনূঢ়া রাণীর হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তুরস্কের এক ফকির আবদুল্লাহ তাকে লাভ করেন ও রাজা হন। কাব্যের কাহিনীটি রোমান্টিক কাব্যভাবনায় নিষিক্ত হলেও প্রশ্নগুলো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও হেঁয়ালিতে পূর্ণ। 'কাসেমের লড়াইয়ে'র মূলবিষয় কাসেম ও সখিনার বিবাহপ্রসঙ্গ এবং কারবালার প্রান্তরে কাসেমের লড়াই ও তাঁর শহীদ হওয়ার কাহিনী।

হিতকথা ও তত্ত্ববাণীর প্রচারক হিসেবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে শেখ শেরবাজ চৌধুরীর একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাঁর ভাষা-ব্যবহারে কাব্যরসের ছাপও আছে। যেমন, —

রূপে মনোহর বালা গুণে অনুপাম।
বাছি বাছি রাখিয়াছে সখী সবনাম॥
হিরাধার চম্পাছরী কমল নয়নী।
কাজল রেখা যে আর মুকুতা দশনী॥
প্রভাবতী মৃগ আঁখি কমল মঞ্জরী।
এসকল সখী থাকে কুমারীকে ঘেরি॥

আবদুন নবী॥ তিনি সপ্তদশ শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। কবি চট্টগ্রাম জেলার ছিলপুর নামক গ্রামে সিদ্দিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন তাঁর নিবাস ছিলো সমুদ্রের পূর্বতীরে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের পূর্বকূলে, সাধারণ অর্থে যা চট্টগ্রামকে বোঝায়। আবদুন নবীর একমাত্র কাব্য 'আমীর হামজা' ৮০ পর্বে বিভক্ত। কাব্যের রচনাকাল ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এই বিপুলাকৃতির কাব্যটি সম্পর্কে কবির নিজস্ব অভিমত 'থাকুক লেখিব কেহ পড়িতে লাগে ডর'। কাব্যটির বিশালত্বের জন্য এটি কেউ পড়বে কিনা সে সম্পর্কে কবির দুর্বলতা ধরা পড়েছে। কাব্যখানির অবলম্বন ছিলো ফারসি কাব্য 'দাস্তান-ই-আমীর হামজা'। পুথিকার হিসেবে আবদুন নবীর বিশেষত্ব এই যে বাংলা সাহিত্যে আমীর হামজার কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনার ধারা তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন।

---

২২৩. পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৫২

জয়নুল আবেদীন।। জয়নুল আবেদীন সপ্তদশ শতকের শেষপাদের লোক। কবির জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। দাক্ষিণাত্যের বাদশাহ আবদুল্লাহ কুতুব শাহের সভাকবি আমীন বচিত 'আবু শাহামার কিস্‌সা' অনুসরণে জয়নুল আবেদীন 'আবুসামার পুথি' লেখেন। এই পুথির কাহিনীটি হচ্ছে, হজবত ওমরেব মদ্যপ ছেলে আবু সামা একদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো এক কুমারী কন্যার দেহসম্ভোগ করেন। অতঃপর একদিন সেই কন্যা এক নবজাত শিশুকে নিযে হজরত ওমরেব দববারে গিযে খলিফাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। খলিফা স্বহস্তে আবু সামাকে ব্যভিচারেব শাস্তি দেন এবং তাতে আবু সামার মৃত্যু ঘটে। পুথির কাহিনীটির তাৎপর্য হচ্ছে হজরত ওমরের ন্যায়বিচাবের দৃষ্টান্ত সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধবা। কাব্যেব ভাব অনাবশ্যক আববি-ফাবসি শব্দের ব্যবহারে কণ্টকিত।

মোহাম্মদ রফীউদ্দীন।। মোহাম্মদ রফীউদ্দীন সপ্তদশ শতকেব শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ অবধি জীবিত ছিলেন। কুমিল্লা জেলার নারানঞা গ্রামে বফীউদ্দীন জন্মগ্রহণ কবেন। কবিব পিতাব নাম আশরাফ। তাঁর কাব্যেব নাম 'জেবুলমুল্‌ক শামাবোখ'। সপ্তদশ শতকের অন্যতম কবি মুহম্মদ আকবব একই নামেব কাব্যগ্রন্থের রচযিতা। কাব্যের কাহিনীটি বোমান্টিক। দৈত্যদানোব সঙ্গে যুদ্ধ কবে জেবুলমুলক ও শামারোখের মিলনেব মধুব কাহিনী এতে বিবৃত।

একাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি

(খ্রিস্টীয় ১৮শতক)

ধর্মমঙ্গল কথা

অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, নরসিংহ বসু, রামকান্ত প্রমুখ। ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবমাহাত্ম্য কীর্তনের অন্তরালে যে মানবজীবনের কথা বর্ণনার প্রয়াস দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের কবিদের কাব্যে তার প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে।

ঘনরাম চক্রবর্তী॥ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে আত্মকাহিনী বর্ণনার যে আড়ম্বর দেখা যায়, ঘনরামের কাব্যে তার কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। কাব্যসমাপ্তির তারিখ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি,–

শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দণ্ডে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি॥

এই বাক্য বিশ্লেষণ করে সমালোচকগণ ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১খ্রিস্টাব্দ পান। বাংলা মাসের অগ্রহায়ণের পহেলা শুক্রবার দিনে কবির কাব্য শেষ হয়।[২২৪]

ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমানের কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতা সীতা। ঘনরাম চার পুত্রের জনক,– রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ।[২২৫] ঘনরাম কেবল কবি হিসেবেই খ্যাত ছিলেন এমন নয়, তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরূপেও পরিচিত ছিলেন।

বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন কবি। তিনি বলেছেন, –

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

ধর্মমঙ্গল ছাড়াও ঘনরাম সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন।

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে যে বর্ণনা দেখা যায়, তাতে অতিরঞ্জন নেই, জীবন-বাস্তবতার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাতে চমৎকার স্ফূর্তি পেয়েছে। তাছাড়া কবির বর্ণনায় অলঙ্কার-অনুপ্রাসে গড়ে তোলা ভাষার মাধুর্যও অনুভূত হয়। প্রাঞ্জল রচনারীতির নমুনাস্বরূপ ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রার কিছুটা অংশ,–

ত্বরিত জড়িত যেন জলধর জ্যোতি।
হীরামণি হার গলে কানে গজমতি॥

---

২২৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭১৮
২২৫. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭১৯

ধনুক কদুক বুকে আচ্ছাদিল ঢাল।
বাজিল দেবীর বাণ মূর্তিমান কাল॥
বর্ণশিঙ্গা কাড়াপড়া ঢনক টেমাই।
শ্যামারূপা পদ ভাবি চলিল ইছাই॥
ঘাঘর ঘুঙুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে কানে কত রব শুনি॥
ঢাল মুড়ে মালট মারিছে লাফে লাফে ।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥

বিষয়ের বাস্তবনিপুণ উপস্থাপনা ছাড়াও ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে চরিত্রসৃষ্টিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লখ্যা ও হরিহর বাইতির চরিত্রের বর্ণনায় ঘনরামের বাস্তবানুগামিতার ছাপটি বেশ প্রশংসনীয়। চরিত্রানুযায়ী সংলাপ সৃষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। এ ব্যাপারে তাঁর শিল্পদৃষ্টি ভারতচন্দ্রের শিল্পভাবনার বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, -

হরিহর বলে শুন বাইতির ঝি।
বসে কর বিলাস তোমার লাগে কী॥
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাব তোকে॥
অধর্মের বাধ্য বসু ধর্মের অকায।
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥

অনুপ্রাস ঝংকৃত ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাক্যরচনায়ও কবি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। উদাহরণ নিম্নরূপ,

করপুটে এ সঙ্কটে কাতরে কিঙ্কর রটে
 উর ঘটে পুর অভিলায॥
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা-মায়া।
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যায়া।
গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায়॥
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে॥
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা॥

ঘনরাম তাঁর রচনায় অনেক আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

রামকান্ত রায়॥ রামকান্ত সপ্তদশ শতকের শেষপাদের কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের লোক। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত সেহারা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন তিনি।[২২৬] রামকান্ত নিজেই একথা বলেছেন, -

---

২২৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৯৯

নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুল বিস্তর।
সামিল সমরশাহি পরগণা ভিতর॥
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর।
শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর॥

তিনি কায়স্থকুলের সন্তান ছিলেন। গ্রামের বাবলাতলায় ধর্মঠাকুরের আস্তানা। আস্তানার অবস্থান ছিলো বাঞ্ছারাম ঠাকুরের ভদ্রাসনের অদূরে। রামকান্তের পরিবার এই বাঞ্ছারামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত ছিলো। কবির পিতামহের নাম শোভারাম এবং পিতার নাম মহেন্দ্ররাম, পিতামহী সুরধনী এবং মাতা শিবানী। চার ভাইয়ের মধ্যে রামকান্ত ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ।

রামকান্তের ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ। কবি তাঁর কাব্যে আত্মীয় স্বজনদের বিরাট তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। দেববন্দনা-শেষে তাঁদের প্রতি ঠাকুরের অনুগ্রহের কথাও বলেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভাববিহবল, মনগড়া ও রোমান্টিক ধারা অনুসরণ করে রামকান্ত ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত একটি গল্প পেশ করেছেন। রামকান্ত ছিলেন চাষীঘরের সন্তান এবং বেকার। বেকারত্বের জ্বালায় কবির মানসিক অবস্থা কেমন ছিলো, তার কিছু বর্ণনা,-

দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন।
প্রবৃত্তি না দেয় কিসে বিচলিত মন॥
ধরফড করে প্রাণ অন্তর বিকল।
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল॥

মানসিক যন্ত্রণার এই পরিস্থিতিতে রামকান্ত জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়ে পড়েন। তাই,- -

কাহারে না বলি কিছু অন্তর গুমরে।
সারাদিন বেড়াগ সভার ঘরে ঘরে॥
বহুদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে।
ইচ্ছা নাই বচন কহিতে কার কাছে॥
নিদ্রা নাই শয়নে শর্বরী জাগরণে।
উষ্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে॥

তৎকালীন সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেকারজীবনের এই বর্ণনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বাবলা গাছে শঙ্খচিল দেখে কবির মনে কোনো কিছু উপস্থিতির ধারণা হয়। তাঁর তৃষ্ণা পায়, পুকুর থেকে অঞ্জলি ভরে তিনি পানি দেন চোখে-মুখে : এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে,— 'হেনকালে দেখি এক অদ্ভুত ব্রাহ্মণ', যাঁর 'অর্ধচন্দ্র পরিধান কানেতে জবা ফুল। মাথায় লম্বিত জটা সর্প সমতুল॥'

রামকান্তের রচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য জড়িত থাকায় পাঠকচিত্তে তার আবেদন বেশি। যাই হোক, বুড়া রায় তাঁকে ধর্মের গান রচনার নির্দেশ দেন। দিন সাতেকে একুশ পৃষ্ঠা রচনা করে কবি ক্ষান্ত দেন, ধর্মঠাকুর পুনরায় তাঁকে দেখা দেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী রামকান্ত মোট বাষট্টি দিনে ধর্মের গান রচনা সমাপ্ত করেন।

রামকান্তের 'ধর্মমঙ্গলে' দক্ষিণ রাঢ়ের চাষীঘরের ছবি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিজীবনের বেকারত্বের জ্বালার বর্ণনায় কিছু নতুনত্ব আছে। হয়তো জীবন-বাস্তবতার পরিবেশন-গুণেই তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা ও রচনারীতির বিশিষ্টতা কিছু কম নয়। রামকান্তের রচনারীতি ও ভাষার কিছু নিদর্শন,—

শুনিয়া চলিনু আমি তেল না মাখিয়া।
বাড়িল মনেতে কোপ জলপান লয়্যা॥
বাড়ি হত্যে বেরায়্যা বাহির হনু বেগে।
হেনকালে মঙ্গল দেখিনু অতি আগে॥
নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাথায়।
শেত্ত্য বনি পূর্ণকুম্ভ বামে লয়্যা যায়॥
মঙ্গল দেখিয়া আমি হরষিত মনে।
দৃষ্টি হল প্রভুর বাবলা গাছ পানে॥
শঙ্খচিল বস্যা ডাকে গাছের উপরে।
অধিক আনন্দ মোর বাড়িল অন্তরে॥
করজোড়ে প্রণাম করিয়া করপুটে।
ধাওয়াধাই জলপান দিতে যাই মাঠে॥

নরসিংহ বসু॥ তিনি বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক। কীর্তিচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। নরসিংহ বসু তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে রচনা করেন। কবির নিবাস বর্ধমান জেলার শাঁখারী নামক গ্রাম। কায়স্থ-পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতামহীর যত্নে তিনি অক্ষরজ্ঞান লাভ করেন। পিতামহীর কাছে 'বাঙালা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী।' রাজকোষের খাজনা শোধ করে তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন পথে জটলা ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কবিকে ধর্মের গান লিখতে বলে তিনি অন্তর্ধান করেন। সেই হেতু কবি ধর্মের গান রচনা করেন। কবির ভাষা রসসমৃদ্ধ। খানিকটা অংশ,—

এত শুনি মহারাজ সেন পানে চান।
হাত ধর্যা বচন বলেন বিদ্যমান॥
অনেক কর্যাছ কার্য প্রাণধন বাপ।
এবার ঘুচাইয়া লহ মোর এই পাপ॥
অস্তাচলে যাইয়া দেহ পশ্চিমে উদয়।
তোমা বিনে একার্য অন্যের সাধ্য নয়॥

ভাষা শিক্ষায় কবির উপর পিতামহীর দান অশেষ। কবি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন,—

অল্পকাল পিতার হইল পরলোক।
পিতামহী ঠাকুরাণী পাইল বড় শোক॥
পিতৃ ব্যবহার পালিল যত্ন করি।
বাঙ্গালী পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী॥

রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে॥ রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন। যেমন,—

মল্লভূমে নিবাস মল্লের লিখি শক।
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক॥

পাঠান্তর,—

মল্লরাজ্যে বাস করি মল্লের লেখি শক।
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক॥[২২৭]

অর্থাৎ ১০৩৮ মল্লাব্দ বা ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছে। তখন মল্লভূমের রাজা ছিলেন গোপাল সিংহ। রামচন্দ্র বাড়ুজ্জে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত চামট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। রামচন্দ্রের ব্যবহৃত একাবলী ছন্দ বেশ প্রশংসা লাভ করেছে। যেমন,—

ধর্মের সেবক আখড়া মালে।
মাল কোথা গেল ডাকিয়া বলে॥
বিপরীত গণি সারেঙ্গ বল।
সাজন করেছে যেমন কাল॥
বীরধড়া পড়ে আপন বেশে।
মাথা চৌতলা পটুকা কষে ॥
রাঙা ধুলা সবে মাখিয়া অঙ্গে।
সাত মাল সাজে সমরে রঙ্গে।

রামচন্দ্র একখানি 'ধর্মপুরাণ' লিখেছিলেন বলে জানা যায়।[২২৮]

হৃদয়রাম সাউ॥ হৃদয়রাম সাউর ধর্মমঙ্গল কাব্য ১১৫৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।[২২৯] অতএব তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি। তাঁর নিবাস ছিলো বর্ধমানের খুরুল গ্রামে। মাতুলদের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে যান, তখন ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হয়ে কবিকে নিদিয়াদহ বিল থেকে শিলামূর্তি উদ্ধার করে পূজার ব্যবস্থা করতে বলেন। কবি সেই মূর্তি উদ্ধার করে বীরভূমের উচকরণ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখানে সেই শিলামূর্তি স্থাপন করে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় হাত দেন। কবির পিতা গোবিন্দ ছিলেন শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত।

হৃদয়রাম সাউ পরিচ্ছন্ন রচনারীতির অধিকারী ছিলেন। খানিকটা অংশ,—

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নির্ম্মাণ
কামাল জিনিয়া ভুরুখানি।
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন মুকুতার দাম
অক্ষ পসি যেন পদ্মমণি॥

২২৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০
২২৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ১৮৪
২২৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭৩০

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ মঙ্গলকাব্য

(খ্রিস্টীয় ১৭-১৮ শতক)

শিবমঙ্গল

শিব হিন্দুপুরাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেবচরিত্র। শিবকে অবলম্বন করে যে হরপার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন, বাংলা মঙ্গলকাব্যে তার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের বিষয় হিসেবে শিবকে তাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। শিব সংসারত্যাগী আত্মভোলা চরিত্র, সঙ্গত অসঙ্গত কোনো ব্যাপারকেই তিনি তোয়াক্কা করেন না ; তবে সংসারত্যাগী হয়েও সংসারের সঙ্গে নিবিড় সংশ্লেষ রয়েছে তাঁর। তিনি পরম বিজ্ঞজনও বটে। তিনি রুদ্র, ভয়ঙ্করের দেবতা ; ধ্বংসযজ্ঞেও তার জুড়ি নেই, অথচ বাঙালির সংসারে কল্যাণের অধিষ্ঠাতা হিসেবেও তিনি অতুলনীয়। বাঙালি হিন্দুর অন্তঃকরণে তাই তিনি অবলীলায় নিজের আসনখানি প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। বাঙালির ঘরের মানুষরূপে আপন হওয়ার গৌরব একমাত্র তাঁরই।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে একজন কৃষকরূপী দেবচরিত্র হিসেবেও শিবের একটা ভূমিকা আছে। পুরাণের দেবতা শিব অনায়াসে কৃষকের দেবতা হয়ে যান। তখন প্রাকৃত জীবনাদর্শে তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। শিব-পত্নী পার্বতীও তখন কৃষকের ঘরের গৃহিণীরূপে গড়ে ওঠেন। বাংলাদেশের অনেক সংস্কার এই শিব চরিত্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এদিকে কৃষকরূপী শিবের সংসারে অভাব ও অনটনের অন্ত নেই, কেননা ঘরের কর্তা শিব বড়ো অলস, কৃষিকার্যে তাঁর দারুণ ঔদাসীন্য। স্বভাবটি তাঁর কর্মবিমুখতাকেই সায় দেয়। ফলে কখনো কখনো তাঁকে ভিক্ষার ঝুলিটিও কাঁধে নিতে হয়। তাতে তাঁর এতটুকু লজ্জা নেই। এই নিরাসক্ত শিবঠাকুরটি অতি সহজেই ভিক্ষুক শিবরূপে বাঙালির অভাবের সংসারে নিজেকে স্থাপন করেছেন।

পার্বতী শিবের এই নিত্য অনটনের সংসারের গৃহিণী। স্বামী সন্তানকে তিনি সযত্নে খাওয়ান,—

> তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
> দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
> (রামেশ্বরের কাব্য থেকে)

কিন্তু অভাবের সংসারে খাবারটি কোথা থেকে আসে, সে বিষয়ে জানার আগ্রহ শিবঠাকুরের নেই। সুতরাং সঙ্গতকারণেই মনে করা যায় শিবমঙ্গল কাব্যের এই শিব পুরাণের মহেশ্বর নন, পার্বতীও তেমনি মহিষমর্দিনী কোনো দেবী নন। তিনি নিতান্তই বাঙালির সংসারে আত্মভোলা শিবের সহধর্মিণী। ঘরসংসারের খবর শিব কখনো রাখেন না, কেননা তিনি আত্মভোলা ও কর্মবিমুখ। সংসারের খরচ মেটানোর জন্য তাঁর কোনো চিন্তা নেই। এই নিয়ে স্বামীপ্রবর শিবঠাকুরের সঙ্গে পার্বতীর মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। পতির আহার-বিহারের প্রতি স্ত্রী উদাসীন নন, কিন্তু শিবপত্নীর দুঃখ এই যে নামীদামী স্বামী তাঁর একজোড়া শাখাও তাঁকে কিনে দিতে পারেন না। এই নিয়ে একদিন স্বামীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়, পার্বতী রাগ

করে বাপের বাড়ি চলে যান। বাঙালি ঘরের ছোটখাটো সংঘাতগুলোর যেভাবে মীমাংসা হয়, হরপার্বতীর ঝগড়াও সেভাবে মিটমাট হয়। শিবমঙ্গলে এরূপ একটি কাহিনীই কবিদের শিল্পদক্ষতা অনুযায়ী রূপায়িত হয়েছে। কাহিনী থেকে বোঝা যায় শিব এখানে পুরোপুরি বাঙালি, তাঁর স্ত্রী পার্বতী বাঙালি ঘরের স্নেহমমতা ও মান অভিমানে নির্মিত এক সংসারী নারীচরিত্র। একদিকে ইনি বাঙালি ঘরের কন্যা, অন্যদিকে বাঙালি ঘরের গৃহিণী। বাঙালির জীবন ও জীবনাচরণের যাবতীয় পরিচয় ফুটে উঠেছে হর-পার্বতীর এই মান-অভিমান আর মায়া-মমতাভরা দাম্পত্য জীবনের মধ্যে।

দুই ॥ শিবায়নের কবি

রামকৃষ্ণ রায় ॥ সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে রচিত শিবায়নের আদিকবি। তবে তাঁর কাব্যে কেন্দ্রসংহতি নেই। বাঙালির বৈশিষ্ট্যও তাতে ফুটে ওঠে নি। অবশ্য পৌরাণিক শিবের মহিমা-কীর্তনে তিনি বেশ উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায় সংযমের যথেষ্ট অভাব ; রচনারীতিতেও দ্বন্দ্ব বৈচিত্র্য নেই।

দ্বিজ রতিদেব ॥ পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিজ রতিদেবের নাম করা যায়। তাঁর 'মৃগলুব্ধ' কাব্যখানি ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। দ্বিজ রতিদেব আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন 'পিতা গোপীনাথ মাতা নাম মধুমতী। জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥' এতে মনে হয় কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যটি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়েছে এবং মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

রতিদেবের কাব্যের মূল বিষয়টি হচ্ছে মৃগ এবং লুব্ধ বা ব্যাধের কাহিনী। প্রসঙ্গক্রমে সম্ভবত হিন্দুধর্মের প্রতি আসক্তির কারণে রতিদেবের কাব্যে শিব-চতুর্দশীর মাহাত্ম্যকীর্তন, হরিনামের মাহাত্ম্যবর্ণনা ও রামের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে।

রামরাজা ॥ রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' শীর্ষক একটি কাব্য চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মনে করেন, রামরাজা জাতিতে মগ ছিলেন। রতিদেব ও রামরাজার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, রতিদেবের রচনা প্রায় সরল বিশুদ্ধ, রামরাজার রচনা অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য/চক্রবর্তী ॥ রামেশ্বরের কাল মুকুন্দরামের দেড়শত বৎসর পরে এবং ভারতচন্দ্রের অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে অনুমান করা যায়। ডক্টর পঞ্চানন চক্রবর্তী মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীর নিকট রামেশ্বরের গুরুবংশের একটি রোজনামচা দেখেন, সেই রোজনামচা থেকে পঞ্চানন চক্রবর্তী রামেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু তথ্য আবিষ্কার করেন। তাতে তিনি মনে করেন রামেশ্বর ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।[২৩০] রামেশ্বর চক্রবর্তীর জন্মস্থান মেদিনীপুর

---

২৩০. পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রামেশ্বরের রচনাবলী' (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), ভূমিকা পৃ. ৫৬, ৬৩

জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগণার যদুপুর নামক গ্রাম। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কবি দেহত্যাগ করেন অনুভবে উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণ প্রতি বৎসর ঐ তিথিতে এক বটবৃক্ষতলে হরিসংকীর্তন করে থাকে। তাতে রামেশ্বরের জনপ্রিয়তা সম্পর্কেও কিছু ধারণা করা যায়। রামেশ্বরেব পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতা লক্ষ্মণ যজন-যাজন প্রক্রিয়া গ্রহণ কবে ভট্টাচার্য পদবী পান। রামেশ্বরের মাতা রূপবতী এবং দুই পত্নী সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। কবি সম্ভবত নিঃসন্তান ছিলেন। রামেশ্বরের উক্তি অনুসারে জানা যায় তিনি নিজ গ্রাম যদুপুর ত্যাগ কবে কর্ণগড়ের জমিদারের সভায় পুরাণপাঠক নিযুক্ত হন। হেমন্তসিংহ নামক কোনো সামন্ত জমিদার তাঁর ঘরদোর ভেঙে দিলে তিনি মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রাজা রামসিংহ ও তৎপুত্র যশোমন্ত সিংহের আশ্রয় লাভ করেন। রামসিংহের মৃত্যুব পব যশোমন্ত সিংহ কবিকে সভাকবিব পদ দেন এবং তাঁকে শিবসংকীর্তন রচনায় অনুপ্রাণিত করেন। এর আগে যদুপুরে অবস্থানকালে রামেশ্বর সত্যপীরের পাঁচালী লেখেন। কবি কর্ণগড়েব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পবিচিত ছিলেন। কর্ণগড়ের সেনাপতি পরমানন্দ তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বরেব মৃত্যুব পর কর্ণগড়ের মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি নির্মিত হয়। আজও সেখানে তাঁর সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

রামেশ্বরেব নামে 'শিবসংকীর্তন' ও 'সত্যপীবেব ব্রতকথা' এই দুখানি কাব্যই প্রচলিত আছে। তবে ডক্টব পঞ্চানন চক্রবর্তী রামেশ্বরেব ভণিতাযুক্ত 'শীতলামঙ্গল', 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা' ইত্যাদি রচনাবও সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য প্রামাণিকতাব দিক দেখে শিবসংকীর্তন ও সত্যপীবেব ব্রতকথাই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতকে হিন্দু মুসলমানেব মিলিত ধর্মমত থেকে উদ্ভূত দেবতাব নাম সত্যপীর। হিন্দুর গৃহে তিনি নারায়ণ বা সত্যনারায়ণ নামে পূজিত। সত্যপীর লৌকিক এবং অর্বাচীনকালের দেবতা। কিন্তু স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও তিনি যথারীতি উল্লিখিত হয়েছেন। তবে রামেশ্বরের সত্যপীরের কাহিনী অর্বাচীন পুরাণের গল্প অবলম্বনেই রচিত। রামেশ্বরেব সত্যপীরেব কাহিনীটি হচ্ছে,—দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক কৃষ্ণভক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁব দুঃখকষ্ট লাঘবেব উদ্দেশ্যে ফকিরের বেশে একদিন ব্রাহ্মণের ঘরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। ফকির ব্রাহ্মণকে সত্যপীরের পূজা ও শিরনি দিতে বলেন। ব্রাহ্মণ হয়ে যবনেব আচাব কি করে গ্রহণ করবেন-- এই অনুভবে ব্রাহ্মণ চিন্তিত হলে পীরের বেশধারী কৃষ্ণ তাঁকে নিজ পবিচয দেন,—

বিধি মোর বড ভাই মহেশ অনুজ।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী চতুর্ভুজ॥
কংস কেশী মথনে কেশব মোর নাম॥
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম॥

এবং,—

ফকির হইয়া আমি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ॥

ব্রাহ্মণ তখন সত্যপীরের পূজা ও শিরনি দিলেন এবং মর্ত্যভূমে পীরমাহাত্ম্য গাথা প্রচারের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যও ঘুচলো। এটি হলো রামেশ্বরের

মনে করা হয় যে তিনি উক্ত জেলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গঙ্গারাম, উপাধি বিদ্যাভূষণ। কবি কাব্যোৎপত্তির কারণ হিসেবে বলেছেন, তাঁর কন্যা একদা গুরুতরভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে ষষ্ঠীদেবী তাঁকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তাঁর মাহাত্ম্যমূলক একখানি কাব্য রচনা করেন। তারই ফল রুদ্ররামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য।

রুদ্ররামের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু সংস্কৃত পুরাণ থেকে আহরণ করা হয়েছে ; লৌকিক ধারার সঙ্গে এর সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। কাব্যখানি ত্রয়োদশ পালায় বিভক্ত। পালাসমূহে মোট তিনটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাহিনী পৌরাণিক চরিত্র কার্ত্তিকেয়কে নিয়ে রচিত, দ্বিতীয় কাহিনী ষষ্ঠীদেবীর বরে ক্ষেত্রমিশ্র নামে রাজার পুত্রলাভ এবং তৃতীয় কাহিনীটি কলাবতীর উপাখ্যান। রুদ্ররামের কাহিনীগুলো পুরাণাশ্রিত হওয়ায় বঙ্গদেশে প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কবির বর্ণনায় ঘটা আছে, তবে তাঁর যে পরিমাণ পাণ্ডিত্য ছিলো সেই পরিমাণ কবিত্ব নেই। কিছু নমুনা, -

নিশি শেষ চৈত্রমাস বুধবার দিনে।
গীত রচিলেন দেবী কহিলা স্বপনে॥
সেকথা অনুসারে করিলাম বর্ণনা।
দেবলীলা রসশাস্ত্র কাব্য প্রবর্ত্তনা॥
ব্যাধি সঙ্কটেতে মোর তনয়া পীড়িত।
তার রক্ষা হেতু মোর করাইলে গীত॥
ত্রয়োদশ পালা গীত কহিলা রচিতে।
আজ্ঞা প্রমাণে গীত রচিনু সেই মতে॥
তনয়া রক্ষিলে মোর দিয়া পদছায়া।
এমনি রাখিবা আমা শুন মহামায়া॥

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ॥ অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের কবি দুর্গাদাসের কাব্যের নাম 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী'। কবির পত্নী হরিপ্রিয়া গঙ্গা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হলে কবি তাঁর কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। দুর্গাদাসের কাব্য আসলে অষ্টমঙ্গলা জাতীয় পাঁচালী বিশেষ। এতে যে পদ আছে তার সংখ্যা ১৫৬। কৌতুকপ্রিয় কবি দুর্গাদাসের রচনার খানিকটা নিদর্শন,—

কহিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নীচু, দেশভাষা কন কতগুলি।
যখন বলেন শুন, শুনিতে শুনায় হুন, বালকের নাম পোলাপুলি॥
তুম্বা আঁচলা ঝুলাঝুলি, পোলাপুলি কতগুলি, লইয়া আসেন সেইখানে।
গুরুক তামাকু কৌটা, কারো সঙ্গে ডাবা দুটা, গল্প কত হয় টানে টানে॥

জসীমউদ্‌দীনের 'পল্লীবর্ষা' কবিতায় প্রতিফলিত পল্লীবাসীদের বিনোদনের চিত্র যেন রুদ্ররামের বর্ণনার এই শেষ লাইনে প্রত্যক্ষ করি।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী॥ মুসলমানদের এদেশে আগমনের আগে বাংলাদেশে নাথ সিদ্ধাচার্যগণের ধর্ম ও আচার- আচরণের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ে। পীর ফকিরগণ নিজেদের কেরামতি দেখিয়ে নাথসিদ্ধা গুরুদের আসন দখল করেন। মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ধর্মেই

পীর ফকিরদের ধর্ম ও অলৌকিক জীবনের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও নিদর্শন 'সত্যপীর' বা 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের কাহিনীতে সুফী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই ধারার কাব্যের কবিরা হচ্ছেন ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, শিবায়নের কবি রামেশ্বর চক্রবর্তী, রায়মঙ্গলের ফকীররাম দাস কবিভূষণ এবং অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। দুজন মুসলমান কবি আরিফ ও ফৈজুল্লাও সত্যপীরের পাঁচালী লিখেছেন।

চার॥ কালিকামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

কালিকামঙ্গলের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যের নাম 'অন্নদামঙ্গল'। এ কাব্য মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত, তবে অন্নদামঙ্গলে কবির নিজস্বতার প্রকাশ এবং কাব্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের চমকপ্রদ প্রয়োগ-দক্ষতার জন্য একাব্য মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক রীতিপদ্ধতির ধারায় এক অভিনব সাহিত্য-প্রয়াস রূপে বিবেচিত।

কাব্য আলোচনার আগে ভারতচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেওয়া যায়।

ভরদ্বাজ গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মুখুজ্জে বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতৃপুরুষের বসতি ছিলো হাওড়া জেলার ভুরশুট পরগণার পেড়ো বসন্তপুরে। ভারতচন্দ্র ১৭০৭ মতান্তরে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ এবং মাতা ভবানী দেবী। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ বাধায় ভারতচন্দ্রের পিতা সর্বস্ব হারান। ভারতচন্দ্র তখন মাতুলালয়ে চলে আসেন। এরকম দুর্ভাগ্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জীবনেও ঘটেছিলো। কীর্তিচন্দ্রের কুকীর্তি সম্পর্কে 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে ভারতচন্দ্রের মন্তব্য, 'রাজবল্লভের কার্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।' অনুমান করা হয় এই রাজবল্লভ ছিলেন ভারতচন্দ্রের পিতৃব্য, যিনি কীর্তিচন্দ্রের কুকর্মের সহায়ক ছিলেন। মাতুলালয় গাজীপুরে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন। খুব অল্পবয়সে কবি সারদাগ্রামের কেশরকুনি আচার্যের বালিকাকন্যা রাধা দেবীকে বিয়ে করেন। হুগলীর দেবানন্দপুরে ভারতচন্দ্র অতঃপর ফারসি ভাষা শিখেন, কারণ ফারসি ভাষার প্রভাব তখন দেশের সর্বত্র। এরপর বিষয়কর্ম দেখাশোনার জন্য তাঁকে বর্ধমানে ফিরে আসতে হয়। ভারতচন্দ্র পিতৃসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে তাঁকে আমলাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয় এবং কিছুকাল কারাগারে কাটাতে হয়। কারাগার থেকে বেরিয়ে ভারতচন্দ্রের মনে বৈরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কটক ও পুরী ভ্রমণ করেন। জানা যায় ভারতচন্দ্র এসময় বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে এসে তাদের অনুগামী হন।[১৩৩] পরে শ্বশুরকুলের অনুরোধে দেশে ফিরে ফরাশডাঙ্গার ইন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশক্রমে ভারতচন্দ্র অতঃপর রাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার ও তাঁর রাজবংশের প্রশস্তিমূলক কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা শুরু করেন এবং কাব্যখানি

---

১৩৩. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৮১

১৭৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। অন্নদামঙ্গলে 'বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল' ও 'মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল' নামক দুটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের সমাবেশ রয়েছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়াও কবি সত্যপীরের পাচালী, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক, অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটক ও ক্ষুদ্রকায় কিছু বিবিধ কবিতা রচনা করেন। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

অন্নদামঙ্গল॥ ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মঙ্গলকাব্যের বহিরঙ্গের বিষয়টুকু গ্রহণ করে তাতে নিজস্বতার যে প্রয়োগ করেছেন, তার মধ্যে মধ্যযুগের অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির প্রাবল্য নেই ; ফলে সাধারণ মানুষের মনে দেব-নির্ভরতার প্রবণতা জাগানোর প্রয়াস তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। তবে দেবতার প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে। এই দেবতা চণ্ডী নন, বরং চণ্ডী ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নপূর্ণায় রূপান্তরিত হন। এই অন্নদা একদা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতির বিশ্বাস ও ভক্তির রাজ্যে অনায়াসে বিচরণ করেন, দীর্ঘকাল পরে ভারতচন্দ্রের হাতে তিনি সাধারণ মানুষের পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণময়ী অধিষ্ঠাত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে ভারতচন্দ্র বলেছেন,

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

উক্তিটি বিশ্লেষণ করে ১৬৭৪ শকাব্দ বা ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।[১৩৪] অন্নদামঙ্গল যদিও দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য, কিন্তু তার মূলে আছে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের প্রশস্তি-গাথা রচনার ফরমায়েশী প্রয়াস। সেজন্য এর বিশেষত্বের দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যাবে দেবতার মহিমাকীর্তনের অন্তরালে এখানে আসলে কীর্তন করা হয়েছে মানুষের মহিমা। ভারতচন্দ্রের রচনারীতিতে ভক্তিরস আছে, কিন্তু ভক্তিপ্রকাশের প্রাবল্য নেই। রূপ ও রসের দিক থেকে তার যে সাহিত্যিক কলাকৌশল, ভারতচন্দ্রের শিল্পচেতনার অভিনবত্বকেই তা প্রকাশ করে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে আছে 'শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল'। এই ভাগের প্রথমে আছে অন্নপূর্ণাবন্দনা পরে সতীর দেহত্যাগ, উমার জন্ম, হরিহরের প্রতি দেবীর করুণা, অতঃপর তাঁকে ছেড়ে দেবীর ভবানন্দ মজুমদারের ঘরে গমন। এসব বিষয়ের বিবৃতিতে ভারতচন্দ্র চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মুকুন্দরাম ও শিবায়নের রামেশ্বরের দ্বারা প্রভাবিত। এর আকৃতি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তোলা হলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে এই অংশে ভারতচন্দ্রের শিল্প নির্মাণের অভিনবত্বের চমৎকার প্রকাশই লক্ষ্য করা যায়। দেবদেবীদের নিয়ে রঙ্গরসিকতা, ভয়ভক্তির বদলে তাঁদেরকে নিয়ে কৌতুক করা তৎকালীন সাহিত্যের দৃষ্টিতে যথেষ্ট অভিনব। এবং এসবের মধ্যে বাঙালির জীবনধারার বিশেষত্ব কবি বিস্মৃত হন নি।

---

১৩৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৮১

দ্বিতীয় ভাগ 'বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল' এবং তৃতীয় ভাগ 'মানসিংহ অন্নপূর্ণামঙ্গল'। দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে তৃতীয় ভাগের সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে এভাবে,—বঙ্গে রাজা মানসিংহের আগমন, মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটি শোনেন। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের শিল্পীমানস সৃজনশীলতার চমৎকার অভিব্যঞ্জনা ঘটায়। বিদ্যাসুন্দরের সরস কাহিনীর বর্ণনায় দেবীর মাহাত্ম্য গৌণ হয়ে যায়। এবং এখানেই ভারতচন্দ্রের আসল কৃতিত্ব।

বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের রূপসী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে কাঞ্চির রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পণ্ডিতপুত্র সুন্দরের প্রণয়কাহিনী 'বিদ্যাসুন্দরে'র উপজীব্য। সুন্দরের অসাধারণ রূপ দেখে নাগরীগণ মুগ্ধ হয়ে বিলাপ শুরু করে,—

আহা মরে যাই, লইয়া বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে।
যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া, যাই পলাইয়া সাগরপারে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র মালিনী, বাংলা সাহিত্যে যার খ্যাতি বিপুল। মালিনী বিদ্যা এবং সুন্দরের প্রণয়কর্মে দৌত্যকর্ম করে। উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের বীজবপনে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। কুটনী-চরিত্র মালিনী বালবিধবা এবং প্রগল্‌ভা। ভারতচন্দ্র সংযত বাক্যে মালিনীর চরিত্র পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন,

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়াবাঁধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে॥

তবে চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্র কখনো কখনো মুকুন্দরামের শিল্পবিন্যাসকে অনুসরণ করেছেন। যেমন,—

মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু, আমি হাট বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন, কেও মোরে তখনি আনিব॥
কড়ি ফটকা চিড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া, কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥
এ তোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম নাই ছাপা, আকাশ পাতাল ভূমগুলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরি দিতে পারি চাঁদ, কুলের কামিনী আনি ছলে॥

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নীতিবাগীশদের কাছে অশ্লীলতার অপবাদে দোষনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু একথা আমাদের মানতেই হবে যে সাহিত্য নীতিবাদের আখড়া নয়' তাই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ রচনাকৌশলের মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে নীতিবাদীগণ হয়তো তাঁদের শিল্পজ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে বিদ্যাসুন্দর যেমন শিল্পরসের সাগর, তার

তটভূমিও কখনো স্পর্শ করতে পারেন নি। আসলে জীবনেব স্বভাবগত আচরণের উপর ভারতচন্দ্র তাঁর শিল্পবোধকে অনায়াসে স্থাপন করেছেন বলে কবির এই উপস্থাপনার বিষয়টি সম্পূর্ণত সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত। তাতে ভারতচন্দ্র অবশ্যই একজন উচুমানের শিল্পরসিকরূপে বিবেচিত হবেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম ভাগে বিদ্যার ঘরে সুন্দরের আগমন, গন্ধর্বমতে উভয়ের বিবাহ, রতিক্রিয়া এবং গর্ভধারণ,—এই ঘটনাগুলোই কাহিনীর মূল বিষয়। পরের ভাগে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে এই কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীটিই ভারতচন্দ্রেব রচনাগৌরব বাড়িয়েছে। তাব মূল বিষয় অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হলেও কাব্যকলার দিক থেকে এর তুলনা নেই। বাস্তব যৌনসম্ভোগ ও ঐহিক প্রণয়চিত্র অঙ্কনে ভারতচন্দ্র আধুনিক মানবসম্বন্ধকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সম্ভোগের চিত্র উপস্থাপনাব একটা কৃত্রিম মূল্য ছিলো। ভারতচন্দ্র রাজসভার এই কৃত্রিম মূল্যবোধকে তাঁর অনন্য শিল্পকর্মে বিধৃত করেছেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতচন্দ্রেব কাব্যে একদিকে যেমন শব্দেব জৌলুস, ছন্দের ঝংকার এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসরসিকতার পরিচয় আছে, তেমনি অন্যদিকে বৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধির ছটা রয়েছে। এবং কোথাও কোথাও বিকার-বিলাসিতার মধ্যেও শিল্পরসের যে ধারাটি কবি প্রবহমান রেখেছেন, তা তাঁর অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচায়ক।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় ভাগে ইতিহাসের বিষয়কে বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে কবি মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের বর্ণনা বেশ সালঙ্কারে পেশ করেছেন। তবে একটি বাস্তব সত্য তার পরিপ্রেক্ষিত রচনা করলেও ভারতচন্দ্রের কল্পনা তাতে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন হয় নি। দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশও তাতে আছে। যুদ্ধ শেষ করে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সঙ্গে দিল্লীশ্বরের কাছে যান। সম্রাট জাহাঙ্গীর মজুমদারের কাছে বাংলার বৃত্তান্ত এবং অন্নদার মাহাত্ম্যকথা শোনেন। সম্রাট দেবীর প্রশংসা শুনে ক্ষুব্ধ হন এবং দেবীর নিন্দা করেন। ভবানন্দ মজুমদার তাতে আপত্তি জানালে তাঁকে শ্রীঘরে পাঠানো হয়। কারাগারে মজুমদার অন্নদার স্তব করেন। ভূত প্রেত নিয়ে অন্নদা দিল্লী নগরীতে অনাসৃষ্টির বন্যা বইয়ে দেন। সম্রাট তখন দেবীর প্রতি ভক্তি আনেন এবং মজুমদারকে বাদশাহী ফরমান দেন। মজুমদার দেশে ফিরে দুই স্ত্রী নিয়ে সুখে কালাতিপাত করেন এবং একসময় স্বর্গারোহণ করেন। এখানে ভারতচন্দ্রের মধ্যে হিন্দুর সংস্কার কাজ করেছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পবৈশিষ্ট্য॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে যদিও জীবনের স্ফূর্তি কম, কিন্তু কবির শিল্পচৈতন্যের অনন্য প্রকাশের জন্য কাব্যখানি শিল্পকলার চমৎকার নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়। বলা যায় অন্নদামঙ্গলের কবির এক ধরনের বিকার বিলাসিতার মধ্যেও তাঁর কাব্যের সর্বত্র রসের ধারা নিয়ত প্রবহমান। ভারতচন্দ্রের বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, শব্দের জৌলুস ও ছন্দের ঝংকার এবং বাক্যপ্রয়োগের চাতুর্য ও হাস্যরস সৃষ্টির নৈপুণ্য সুধীসমাজে তাঁকে মধ্যযুগের একজন ব্যতিক্রমী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বাংলা ছন্দের বিচিত্রতাকে কবি খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলীতে যে ছন্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালে তা বিরল হয়ে পড়ে। ভারতচন্দ্র তাঁর অসাধারণ শিল্পজ্ঞানে পদাবলীর সেই ছন্দকে বাংলা কাব্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারতচন্দ্রের ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ধ্বন্যাত্মক শব্দের কলানিপুণ ব্যবহার থেকে তাঁর ভাষার অভিনবত্ব বোঝা যায়। কেবল সুরসাল ও ললিতমধুর কাব্যিক মাধুর্যের স্পর্শ থেকে ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষার রূপবৈচিত্র্য অনুভব করা যাবে না। বৈচিত্র্যহীন পয়ার ও ত্রিপদীর যুগে কবির শব্দপ্রয়োগগত বিশিষ্টতা তাঁর সৃজনশীলতার চমৎকার পরিচয় বহন করে। শব্দপ্রয়োগের এই বিরল বৈশিষ্ট্য দিয়েই কবি বিষয়ের এক একটি সুন্দর চিত্রকল্প তৈরি করেন। যেমন,--

ধুধুধুধু নৌবত বাজে॥
ঘন ভোডঙ্গ ভম্ ভম্ দামামা দম্ দম্ ঝনর ঝম্ ঝম্ বাজে।
কত নিশান ফর্ ফর্ নিনাদ ধর্ ধর্ কামান গর্ গর্ গাজে॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগকুশলতা বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য। কবি যে আরবি ফারসি ছাড়াও হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ ছিলেন, তাও বোঝা যায়। 'মানসিংহ' কাব্যে এ সম্পর্কে কবি বলেছেন,-

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিসাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥

ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদগুণ তাঁর কাব্যের বিষয়গৌরব বিপুলভাবে বাড়িয়েছে। কবি সহজেই বাংলা ভাষায় মৃদুমধুর স্বাচ্ছন্দ্য এনে স্পর্শকাতর পাঠকচিত্তে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ছদ্মবেশধারিণী দেবী অন্নদা ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাত্রাকালে পথে এক জায়গায় খেয়া নৌকায় নদী পার হচ্ছেন। ভাষার স্নিগ্ধকোমল ব্যবহারে এমন একটি অনবদ্য চিত্রকল্প কবি আমাদের এখানে উপহার দিয়েছেন যার বর্ণনাগুণে মাতা ও সন্তানের স্নেহনিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চিরন্তন বাংলাদেশ ও বাঙালি জীবনের একটি অনুপম ছবি পাঠকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। যেমন,

বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হৈয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।

আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিলা অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥

ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলীতে ব্যাজস্তুতির ব্যবহার বিশেষ কলাকুশলতার সঙ্গে সাধিত হয়েছে। ঈশ্বরী পাটুনীর কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে দেবী নিন্দা-ছলে স্বামী মহাদেবের যে প্রশংসাব্যঞ্জক পরিচয় তুলে ধরেন, ব্যাজস্তুতির এমন সুন্দর নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে বিরল। যেমন,

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে যে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥

কাব্যকলায় বুদ্ধির ছটা ভারতচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্যের বিষয়বস্তু তাতে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত হওয়ার অবকাশ পায়। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার একটি বর্ণনা, -

চন্দ্র সবে যোলকলা হ্রাসবৃদ্ধি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রে হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁর বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তাঁর ব্যবহৃত কতকগুলো বাক্য প্রায় প্রবাদের মতো গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত। যেমন,—

১. একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥

২. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

৩. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

৪. নীচ যদি উচ্চভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।
৫. হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৬. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
৭. মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে।
৮. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

হাস্যরস॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও পরিহাসরসিকতার চমৎকার প্রয়োগ দেখা যায়। সমকালীন সমাজ, সমাজব্যবস্থা, মানুষ ও মানুষের জীবনাচরণ সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের গভীর জ্ঞান ছিলো। সমাজের মানুষ ও তাদের জীবনচরণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাঁর চৈতন্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করতো বলে সামাজিক অসঙ্গতিগুলো তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না। বাঙালি পুরনারীদের নিয়ে তিনি কৌতুকাবহ সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন। দুই সতীনের ঝগড়া ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে কবি হাস্যরসের উৎসারণ ঘটিয়েছেন। শিবের আচার-আচরণকে নিয়ে তাঁর হাস্যরস সৃষ্টির অন্ত নেই। এই দেবচরিত্রটির স্বভাবে যে অসঙ্গতি, ভারতচন্দ্রের প্রাণোজ্জ্বল শিল্পীমানসে তার রসোচ্ছল প্রলেপ পড়ায় তিনি মহাদেবকে নিয়ে মধুর ব্যঙ্গরস করেছেন। আত্মভোলা শিবের আচরণের অসঙ্গতিকে কবি এভাবে প্রকাশ করেছেন,—

বাঘছাল খসিয়া উলঙ্গ হইলা হর।
এয়োগণ বলে এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙটা।
নিবাযে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
নাকে হাত এযোগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই॥
দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়।
শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥

নতুন জামাইয়ের এই হায়াহীন, পর্দাহীন জঘন্য আচরণ ঘরের নারীদের ভালো ঠেকে না,—'আইমা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে। কেমনে উলঙ্গ হইল শাশুড়ীর কাছে।' তখন শিব তাঁর মোহনরূপ প্রকাশ করলে পুরনারীদের তা মন কেড়ে নেয়। তুলনায় নিজ নিজ পতির কুরূপ আর স্থূল আচার আচরণের কথা স্মরণ করে নারীগণের যে পতিনিন্দা ও খেদোক্তি, দারুণ উপভোগ্য হযে তা কৌতুকরসের প্রস্রবণধারা সৃষ্টি করেছে। যেমন, —

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হইল হত॥
লুকাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে॥
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥

তারপর শিবের ঘর-গেরস্থালি শুরু হয় গৌরীর সঙ্গে। শিবের আত্মভোলা আচরণ আর স্বভাবের নিদারুণ অসঙ্গতিগুলো গৌরীর অন্তরে ক্ষোভের সঙ্গে রোষের সঞ্চার করে। গৌরী কোমর বেঁধে সংসারনির্লিপ্ত স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ায় নামেন। পার্বতীর রসনার ক্ষুরের ধার। শিবের সামান্য কথায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে তিনি অনর্গল গরলবাণী বর্ষণ করে যান,–

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব, বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥

আসলে মহাদেবের আত্মভোলা রূপটি পার্বতীকে ক্ষুব্ধ করে। ওদিকে অকালপক্ক বালকদের তা কৌতুকে মাতায়; দেবাদিদেবকে নিয়ে বালখিল্যদের রঙ্গরসিকতা তখন চরমে পৌঁছে,

কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে দেখি কপালে অনল॥

মৌলিক বিষয়-ভাবনা ও ভাব-গভীরতার অভাব॥ ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁর শিল্পচৈতন্যের এতসব মহার্ঘ ছাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ আছে, ভাবগভীরতা ও মৌলিক কোনো বিষয়ভাবনা নেই। সুতরাং তাঁর কাব্যের ভাববিচার না করে[২৩৫] শিল্পের অন্যান্য দিক আলোচনা করাই উত্তম। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারায় হিন্দুপুরাণের বিষয়কে তাঁর কাব্যের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এমন কি তাঁর বিদ্যাসুন্দরও পূর্ববর্তী কবিদের বিষয়ভাবনা থেকে ধার করে নেওয়া। আসলে কাব্যের বহিরঙ্গের দিকেই তাঁর মনোযোগ, ফলে বিষয়ের অন্তর্লোকে প্রবেশ করার প্রতি তাঁর কোনো উদ্যম নেই। ফলে দেবচরিত্রগুলো তাঁর হাতে কেবল কৌতুক রসসৃষ্টির কারণ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র রাজসভায় আনন্দ বিনোদনের জন্য রাজাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী বিষয়ের যে উপস্থাপন করেছেন তা স্থূলরুচি রাজসভাসদদের মনোরঞ্জন করেছে, কিন্তু বিষয়গৌরবে তাঁর সেই উপস্থাপনা আভিজাত্য লাভ করে নি। কেবল তাঁর অসাধারণ শিল্পরসের দক্ষপ্রয়োগের কারণে বিষয়ের স্থূলতাকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন।

---

২৩৫. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ৩৩৬

পাঁচ॥ ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি

ভারতচন্দ্রের পরেও কালিকামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কিরীটিমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যের কতিপয় কবির নাম জানা যায়।

দ্বিজ রাধাকান্ত দেব॥ দ্বিজ রাধাকান্ত দেব সম্ভবত ভারতচন্দ্রের (১৭১৩---১৭৬০) অল্প সময়ের পরবর্তী কবি। কাব্যে তাঁর নিজের কোনো পরিচয় কিংবা কাব্যোৎপত্তির কালনির্দেশক কোনো পদ নেই। 'কন্বমুণির পারণাভঙ্গ' নামে তাঁর একটি পুথি চট্টগ্রাম জেলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেজন্য তাঁকে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসী মনে করা হয়। দ্বিজ রাধাকান্তের কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ভারতচন্দ্রের খানিকটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী পর্যায়ের কবি বলে দ্বিজ রাধাকান্তের ভাষায় আধুনিকতার ছাপ পড়েছে। যেমন,

এমনি কতেক দিন করিয়া ভ্রমণ।
সমুখে ভীষণ ঘোর গহন কানন॥
প্রবেশে পরমা পাদপদ্ম অনুবলে।
সম্মুখে শার্দূল সিংহ শত শত চলে॥
তর্জন করিয়া তারে মারিবারে খায়।
অসিধারী শ্যামা বামা দেখিয়া পালায়॥
লোভ সম্বরিতে নারে আইসে পুনর্বার।
কি করিতে পারযে পারতী সখা যার॥
পথেতে প্রদোষ হৈল অন্ধকার নিশি।
নির্ণয় না হয় দিক হারাইল দিশি॥

অকিঞ্চন চক্রবর্তী॥ অকিঞ্চনের কাব্যে বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের নামের উল্লেখ আছে। তেজচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭৭০-১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ। কবির জন্মস্থান মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বেঙ্গবাল গ্রাম। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, অকিঞ্চন চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের শেষ কবি।[২৩৬] তবে তাঁর নামে শীতলামঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুখানি কাব্য আছে। অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গল থেকে কিছু অংশ,

কন্যার গমনে রাণী করে হায় হায়।
ধৈরয না ধরে ধরে ধনপতির পায়॥
বৈবাহিক হৈলে তুমি বিধির ঘটনা।
পাইলে পাগণ্ড হৈতে প্রচুর যন্ত্রণা॥
যত কাল জীব প্রাণে যাবে নাহিঞ খেদ।
কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন কন্যার বিচ্ছেদ॥
রাখিল ঝিয়ের খোটা রাজা দুরাচার।

২৩৬. পূর্বোক্ত 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ ৫৫০

মোর কন্যা হবে হৈলে তনয়া তোমার॥
কন্যাভাবে কহিবে নাঞ্চি কিছু।
মোর ঝিয়ে আগে ডাক্য নিজ ঝিয়ে পাছু॥
রাণীর রোদনে কাঁদে ধনপতি সাধু।
আনার চক্ষের তারা ওই পুত্রবধূ॥

বাঙালির ঘরসংসারের রীতি অনুযায়ী অকিঞ্চনের রচনায় করুণরস সৃষ্টির প্রয়াস আছে।

দ্বিজ কালিদাস॥ দ্বিজ কালিদাস অষ্টাদশ শতকের কবি। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁর কাব্যের নাম 'কালিকাবিলাস'। কালিদাস রচিত কুমারসম্ভব ও সংস্কৃত পুরাণের কিছু অংশ অনুবাদ করে তিনি তাঁর কাব্যে তা গ্রহণ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দ্বিজ কালিদাসের রচিত 'সূর্যমঙ্গল' বা 'সূর্যের পাঁচালী'র উল্লেখ করেছেন।[২৩৭]

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়॥ দুর্গাপ্রসাদ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি। তাঁর পিতা আত্মারাম এবং মাতা অরুন্ধতী। কবির পত্নী হরিপ্রিয়া ছিলেন ভূকৈলাসের গোকুলচন্দ্র ঘোষালের দুহিতা। দুর্গাপ্রসাদের কাব্যের নাম 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। কাব্যরচনার উৎস হিসেবে বলা হয়েছে, কবির পত্নী হরিপ্রিয়া গঙ্গাদেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হলে দুর্গাপ্রসাদ তাঁর কাব্য রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ। পদসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৫৬। কাব্যখানি অষ্টমঙ্গলা পাঁচালির ছাঁচে রচিত। কলকাতা অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন হয়েছিলো।

গঙ্গাধর দাস॥ গঙ্গাধর অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিলো উত্তর রাঢ়ের প্রান্তবর্তী বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটিকানার অন্তর্গত ঝিনাইপুর নামক গ্রাম। গঙ্গাধর দাস স্থানীয় অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেবী কিরীটিশ্বরীর মাহাত্ম্যগাথা অবলম্বনে তাঁর 'কিরিটিমঙ্গল' কাব্যখানি লেখেন। কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৪/৬৫ খ্রিস্টাব্দ। গঙ্গাধর বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর কাব্যেও বৈষ্ণবোচিত ভাবমাধুর্য বিদ্যমান। যেমন,—

চল মন বৃন্দাবন সঙ্গে লইল সাধুজন।
দেখ গিয়া মদনমোহন॥

'কিরীটিমঙ্গল' থেকে,

ভক্তগণে পাইলা শক্তি নাচে গায় হরি।
না জানয়ে কোন জন জানবে মুরারি॥
শক্তিহীন ভক্তগণ শক্তি পাইল তায়।
শক্তিপুর হৈল গ্রাম মহাপ্রভু কয়॥
কিরীটিমঙ্গলগীত অমৃত সমান।
ভগবতী আজ্ঞা দিল গঙ্গাধর গান॥

---

২৩৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, ১৪৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা অপ্রধান কবি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য-সন্ধানী কবিকৃতি

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক অপ্রধান কবি মঙ্গলকাব্য, পুরাণ, দেবদেবী- মাহাত্ম্য, কৃষ্ণকথা, পদাবলী, ভাগবত ও মহাভারতের অনুবাদ, এবং তাঁদের সীমাবদ্ধ কবিকল্পনায় আরো অনেক বিচিত্র বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। একজন কবি এক বা একাধিক বিষয় নিয়ে লিখেছেন। মধ্যযুগের এই সব কবি কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে অথবা একাধিক বিষয়ে যে নিজেদের সাহিত্যকর্মের পরিচয় রেখেছেন ও নিজেরা যে কবি ছিলেন এবং নানা বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, যার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চমকপ্রদ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপুষ্ট ও অপরিণত, - তা তাঁদের শিল্পীমানস ও সৃষ্টি থেকে অবগত হওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, যদিও একটি বিশেষ অধ্যায়ে শতাব্দী অনুসারে এই সব কবিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের কবি ও তাঁদের কাব্যের একেবারে সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। পণ্ডিতদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয় বটে, কিন্তু কোনো পণ্ডিতই যে এ ব্যাপারে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেন, একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তাই এই অধ্যায়ের কবিদের তাঁদের আবির্ভাবকালের আনুমানিক শতকের বলয়ে বিন্যস্ত করা হলেও একই শতকের কোনো কোনো কবি হয়তো দশক অনুযায়ী কিছু আগে কিংবা কিছু পরেও বিন্যস্ত হয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয় বিন্যাসের কারণেও এটা করা হয়েছে।

দুই।। ষোড়শ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি

খেলারাম।। খেলারামের রচনার কাল সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাতে কবিকে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদের লোক বলে অনুমান করা যায়। কবির ব্যক্তিজীবনের তেমন কোনো পরিচয় জানা যায় না। খেলারামের 'ধর্মমঙ্গল' বেশ প্রাচীন পুথি। কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে কবি যে বক্তব্য দিয়েছেন,-

ভুবন শকে বায়ুমাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন।।
হে ধর্ম এ দাসের পুরাও মনস্কাম।
গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম।।

তাতে পুথির রচনাকাল, —ভুবন = চতুর্দশ, বায়ু = উনপঞ্চাশ অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দ বা ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ হয়।

দ্বিজ অভিরাম।। কবি তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবের যে বন্দনাগীতি গেয়েছেন তাতে তাঁকে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের লোক বলে মনে করা যায়। দ্বিজ অভিরাম জৈমিনী- মহাভারত অবলম্বনে সম্ভবত ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। তাঁর কাব্যের ভাষা ধ্বনিগাম্ভীর্যময়। যেমন,—

ইন্দুকুন্দ জিনি বর্ণ, পীত পুচ্ছ শ্যামকর্ণ, পবন চিনিঞা মন্দগতি॥
রাতা চারি খুর শোভা, তাম্র অধর আভা, নীলকটি নয়ন চঞ্চল।
সুরাসুর বিদ্যাধরে, তরঙ্গ বাধিতে নারে, বেগবায় কাঁপে ভূমণ্ডল॥

দীন ভবানন্দ॥ ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন দীন ভবানন্দের 'হরিবংশ' কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যগুলোর মধ্যে অত্যন্ত অভিনব।[২৩৮] তিনি সম্ভবত ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। সিলেট জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কাব্যের ব্যাপক প্রচলন দেখে ভবানন্দের জন্মস্থান সিলেট জেলা বলে মনে করা হয়। তাঁর হরিবংশ কাব্যখানি সতীশচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। কবি দেবী সারদার বরে কাব্যরচনার অনুপ্রেরণা পান। এ কাব্যের অবলম্বন হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এবং এর আদর্শ ছিলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঢংগে রচিত কতকটা অংশ উদ্ধৃত হলো,

কাজল বরণ আমাকে দেখিয়া তুমি যদি নোকে নিন্দ।
তবে কেন তুমি কালিয়া কাজল ভুরুর উপরে পিন্ধ॥
কালা কালা বলি হের বিনোদিনী নিরবধি গালি দেস।
আমার অধিক বরণ কাজল তোমার মাথার কেশ॥
কালা বিনে গোরা উজ্জল না হয় কালা সে আঁখির জ্যোতি।
কালারে নিন্দিয়া গলায় পিন্ধত কাজল বরণ পুঁতি॥

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য॥ রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের একটিমাত্র কাব্য 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ। তাতে কবির জীবনকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হয়। রঘুনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। তবে এটুকু জানা যায় যে তাঁর গুরু ছিলেন পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর। ভাগবত অবলম্বনে রচিত 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ। রঘুনাথ তাঁর গুরুর প্রতি প্রবল ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন,

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥
বৈকুণ্ঠ নায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য মূরতি।
তাঁহার অভিন্ন তত্ত্ব সহজ শকতি॥

রামচন্দ্র খান॥ রামচন্দ্র খান ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান রাঢ় অঞ্চলের দণ্ডসিমলিয়া ডাঙ্গা। তিনি কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

রাঢ়দেশে বসতি আছয়ে পুণ্য স্থানে।
দণ্ড সিমলিয়া ডাঙ্গা সর্বলোকে জানে॥
কায়েত কুলেত জন্ম দণ্ডত পদ্ধতি।
কাশীনাথ জনক জননী পুণ্যবতী॥

---

২৩৮. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৭০

তাঁর পিতা কাশীনাথ এবং মাতা পুণ্যবতী। রামচন্দ্র জৈমিনি-ভারতকে আদর্শ করে অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করেন।

রঘুনাথ।। তিনি ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের রাজসভায় সেই কাব্য পঠিত হতো। জৈমিনি ভারতের অনুসরণে তিনি অশ্বমেধ-পর্ব রচনা করেন।

কবিবল্লভ।। কবিবল্লভ সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থান সমীপে আরোড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে সম্ভবত ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে তার 'রসকদম্ব' কাব্যখানি রচিত হয়।

গোবিন্দদাস।। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যায়। আলোচ্য গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের শেষপাদের কবি। তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম। গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যখানি ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।[২৩৯] কবির কাব্যের ভাববিষয় কিছুটা ব্যঞ্জনাধর্মী বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত হয়। এছাড়া আছে কিছু ভক্তিরসের পরিচয় এবং কিছুটা পাণ্ডিত্য।

নিত্যানন্দ ঘোষ।। নিত্যানন্দ ষোড়শ শতকের শেষপাদ কিংবা সপ্তদশ শতকের প্রথমপাদের লোক। তিনি মহাভারতের কবি। অবশ্য তাঁর মহাভারতের পুরো অংশ পাওয়া যায় নি। তিনি জৈমিনি-মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন। বর্ণনা গতানুগতিক হলেও রচনায় পারিপাট্য আছে।

নিত্যানন্দ দাস।। নিত্যানন্দ দাস ষোড়শ শতকের শেষ বা সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি। তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। তাঁর নিবাস ছিলো শ্রীখণ্ড। কবির অপর নাম বলরাম দাস। তাঁর পিতা আত্মারাম দাস এবং মাতা সৌদামিনী। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কাব্যখানি মোট ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এ গ্রন্থ প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাস ও বৈষ্ণব ধর্মের আকর। তবে গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়।

কৃষ্ণদাস।। অনুমান করা হয় তিনি ষোড়শ শতকের শেষপাদের কবি। তাঁর নিবাস জাহ্নবীর পশ্চিমকূল। কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। কাব্যের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ছাড়া অন্যান্য অংশ ভাগবতের অনুসরণ। কবির কাব্যে কাব্যরসের অভাব নেই। যেমন,

ফুল গাঁথি দিল তথি কবরী বেড়িয়া।
তাহে অলি করে কেলি পড়িছে ঘুরিয়া।।

তাঁর পিতা মাধবানন্দ এবং মাতা পদ্মাবতী। আচার্য গোসাঞি নামক ব্যক্তির গৃহে কবি ভৃত্যের কাজ করেন। কৃষ্ণদাস মাধবাচার্যের (ষোড়শ শতক) সমসাময়িক ছিলেন বলেও অনুমান করা হয়।

---

২৩৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১১১

গোবিন্দ আচার্য॥ কাব্যের নাম 'কৃষ্ণমঙ্গল'। এতে ভাগবতের প্রথম থেকে দ্বাদশ স্কন্দের অনুসরণ আছে। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডেরও উল্লেখ আছে।

রঘুপণ্ডিত॥ ভাগবতের মূল অনুসরণে রচিত তাঁর কাব্যের নাম 'কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী'। চৈতন্য সমকালীন কবি তিনি। গৌড় থেকে নীলাচল যাত্রাকালে চৈতন্যদেব তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন বলে বলা হয়। রঘু পণ্ডিতের নিবাস ছিলো কলকাতার উত্তরে বরানগর নামক স্থান।

দুঃখী শ্যামদাস॥ মেদিনীপুরের নিকট হরিহরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি তিনি। কাব্যের নাম 'গোবিন্দমঙ্গল'। কাব্যের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বাদে অন্যান্য অংশ ভাগবতের অনুসরণ।

ঘনশ্যাম দাস॥ ষোড়শ শতকের শেষভাগের কবি। কাব্যের নাম 'কৃষ্ণবিলাস'। কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন হরিবংশ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ॥ কবি ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে বর্তমান ছিলেন। কবির পিতার নাম সুষেণ পণ্ডিত, ফুলিয়া বংশে তাঁর জন্ম। অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাবপুষ্ট দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের 'রামলীলা' কাব্য কবিত্বগুণে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আত্মপরিচয় ছলে কবি বলেছেন,

ফুলিয়া বংশের মণি সুষেণ পণ্ডিত।
তাঁহার সন্তান দ্বিজ রচিল সঙ্গীত॥

অদ্ভুতাচার্য॥ কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। তাঁর জন্মস্থান সোনাবাজু পরগণার করতোয়া কূলে অমৃতকুণ্ডা নামক গ্রাম। এই স্থানটি প্রাক্তন পাবনা জেলার অন্তর্গত। কবি সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষভাগের লোক। কবির পিতামহ মার্কণ্ড, পিতা শ্রীনিবাস এবং মাতা মেনকা। ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম।

কবির আত্মপরিচয় অনুসারে, স্বয়ং রামচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। রামচন্দ্রের অনুগ্রহে কবি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই কারণে তিনি অদ্ভুতাচার্য নামে পরিচিত এবং তাঁর কাব্যের নামও হয় 'অদ্ভুত রামায়ণ'। কবি বাঙালি প্রাণের ধারাকে কাব্যরসে সিঞ্চিত করে কাব্যের বিষয়বস্তু গড়ে তুলেছেন।

চন্দ্রাবতী॥ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে তিনজন মহিলা কবির মধ্যে চন্দ্রাবতী অন্যতম। অপর দুজন হলেন চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী রামতারা বা রামী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপাত্রী মাধবী। চন্দ্রাবতী ছিলেন মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি বংশীদাসের কন্যা। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রাবতীর জন্ম।[১৪০] সেই হিসেবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ-কাহিনী

---

১৪০. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ.১৮১

ষোড়শ শতকের শেষভাগে লিখিত হয়ে থাকবে। 'ময়মনসিংহগীতিকা'র প্রথম খণ্ডের ২য় ভাগের অন্তর্গত 'জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতী' উপাখ্যানের নায়িকারূপে কবি চন্দ্রাবতী অমর। ফুলেশ্বরী নদীতে প্রিয়তম জয়চন্দ্র প্রাণ বিসর্জন দিলে চন্দ্রাবতী হৃদয়ে যে আঘাত পান সেই বেদনা উপশমের জন্য তিনি পিতার ইচ্ছানুযায়ী রামায়ণ রচনায় হাত দেন। অবশ্য কাব্য শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'র ৪র্থ খণ্ডের ২য় ভাগে স্থান পেয়েছে। চন্দ্রাবতীর অন্য রচনা পদ্মাপুরাণের কিছু অংশ। একটি পদে তাঁর ভণিতা পাওয়া যায়, –'জগৎ গৌরীর চরণ শিরে করি বন্দন, লাচাড়ী চন্দ্রাবতী গায়। অষ্টনাগের মা, জয়দেবী মনসা, সেবকের সেও সহায়।' এছাড়া দ্বিজবংশী-সুতা এই ভণিতায় তিনি 'দস্যু কেনারামের পালা' রচনা করেন।

দ্বিজ কবিচন্দ্র ॥ কবির আসল নাম শঙ্কর। তাঁর জন্ম ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে। এবং মৃত্যু ১১৬ বৎসর বয়সে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বাঁকুড়া জেলার পাতুলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সময়ে উল্লিখিত চারজন নৃপতি বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, রঘুনাথ সিংহ, বীরসিংহ ও গোপালসিংহ। প্রধানত তিনি রামায়ণের কবি। তদুপরি তাঁর রচিত মহাভারত, ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল ও শিবায়ন উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া শঙ্কর, গুণরাজ খান, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ ভবানীদাস, দ্বিজ লক্ষ্মণ, রামশঙ্কর, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ ঘোষ, জগৎরাম রায়, রামপ্রসাদ রায়, রঘুনন্দন, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কমললোচন দত্ত, কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্র নারায়ণ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই সব কবি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন।

ষষ্ঠীবর সেন ॥ ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাস তাঁর অশ্বমেধ-পর্বের রচনাকাল প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন তাতে তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ হয়। এই হিসেবে ষষ্ঠীবরের কাব্য সম্ভবত উক্ত শতকের ২০/২৫ বৎসর আগে রচিত হয়ে থাকবে। তাতে ষষ্ঠীবরের জীবনকাল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে হওয়াই সম্ভব। নিবাস ছিলো ঢাকা জেলার মহেশ্বরী পরগণার অন্তর্গত দিনদিপ বা জিনারদি নামক গ্রাম। তাঁরা বণিক বংশীয় ছিলেন। জগদানন্দ নামক কোনো ব্যক্তি ষষ্ঠীবর সেনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ষষ্ঠীবর সেন মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। তিনি পদ্মাপুরাণ কাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর ভাষার নিদর্শন,

> অমৃত লহরী ছন্দ, পুণ্য ভারতের বন্ধ, কৃষ্ণের চরিত শেষ পর্বে।
> শ্রীযুক্ত জগদানন্দ, অহর্নিশ হরি হরি বন্দে, কহি ষষ্ঠীবর কহে সবে॥

গঙ্গাদাস সেন ॥ গঙ্গাদাস সেনের কাব্যোৎপত্তির কালনির্দেশক যে পদটি পাওয়া গিয়েছে তাতে তাঁর কাব্যের রচনা কাল ১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ বলে অনুমান করা যায়। কবির জন্মস্থান ঢাকা জেলার মহেশ্বরী পরগণার অন্তর্গত দিনদীপ গ্রাম। এই দিনদীপ সম্ভবত বর্তমান জিনারদি গ্রাম। গ্রামটি বহু বণিকের বাসভূমি। সেই হিসেবে তাঁকে বণিক বংশীয়

অনুমান করা যায়। কবির পিতা ষষ্ঠীবর সেনও যে একজন কবি ছিলেন তা আলোচনা করা হয়েছে। নিজের পরিবার সম্পর্কে গঙ্গাদাসের উক্তি,--

পিতামহ নৃপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যাহার কীর্তি ঘোষে দেশ দেশান্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সত্যবান নানা বুদ্ধিমন্ত।
নানা শাস্ত্রে বিশারদ গুণের নাহি অন্ত॥
গঙ্গাদাস সেন কহে অনুজ তাহার।
অশ্বমেধ পুণ্যকথা রচিল পয়ার।

তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেছেন বলেও জানা যায়। তবে তাঁর এই কাব্য আংশিকভাবে পাওয়া যায়।

তিন॥ সপ্তদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি

যশশ্চন্দ্র॥ তিনি সপ্তদশ শতকের প্রথমপাদের লোক। তাঁর আসল নাম হরিদাস, উপাধি যশশ্চন্দ্র। তিনি ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্যের শিষ্য। যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস' কাব্যখানির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথমপাদ।

যদুনন্দন দাস॥ যদুনন্দন দাস সপ্তদশ শতকের লোক। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় জানা যায় না ; তবে পদাবলী সাহিত্যে তাঁর দান উপেক্ষণীয় নয়। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে বিল্বমঙ্গলের নামে প্রচারিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যখানি বাংলায় নিয়ে আসেন। একাব্যে বৈষ্ণব প্রেমভক্তিরসের ধারাটি উচ্ছলিত হয়েছে। যদুনন্দন দাস কৃষ্ণকর্ণামৃত অনুবাদ করেন। তিনি 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামক গ্রন্থও অনুবাদ করেন। রূপগোস্বামীর সংস্কৃতগ্রন্থ 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের অনুবাদ করে যদুনন্দন বাংলায় তার নাম দেন 'রসকদম্ব'। তাঁর অন্য দুটি অনুবাদগ্রন্থ বাংলায় 'দানলীলা চন্দ্রামৃত' নামে রূপগোস্বামীর 'দানকেলি-কৌমুদীর' অনুবাদ এবং 'গোবিন্দবিলাস' নামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃতে'র কাব্যানুবাদ। বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে এই সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে তিনি সুললিত ভাষায় রূপদান করেন।

রাজবল্লভ॥ তিনি সপ্তদশ শতকের কবি। রাজবল্লভ সম্পর্কে এটুকু জানা যায় যে চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন বংশীবদন চট্ট এবং বংশীবদনের প্রপৌত্র রাজবল্লভ। এই বংশীবদন চট্টের জীবনকথা অবলম্বনে রাজবল্লভ তাঁর 'বংশীবিলাস' কাব্য রচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের কথাও কিছু আলোচিত হয়েছে।

রামশঙ্কর দত্তরায়॥ রামশঙ্কর সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। তাঁর নিবাস ছিলো ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জের খোলাপাড়া গ্রাম। তিনি সম্ভবত বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। কেননা আত্মপরিচয় ছলে তাঁর উক্তি---'পদবন্দ করি কহে ভিষক শঙ্কর।' কবি অধ্যাত্ম-রামায়ণের অনুসরণে সম্ভবত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রামায়ণ কাব্য

রচনা করেন। কাহিনী-অংশে 'বাল্মীকি যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ও 'অদ্ভুত-রামায়ণে'র কিছু প্রভাব আছে। কাব্যের গঠনপ্রণালী সংহত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তাঁর কৃতিত্ব আছে। কিছু উদাহরণ,—

তরণী উপরে বসিলা রাঘব জানকী লক্ষ্মণ সাথে।
নাবিকি তরণী বাহিয়া উপারে রাখিলা কমলানাথে॥
ভাবিয়া রাঘব চরণ-কমল শ্রীরামশঙ্করে ভাবে।
নাবিকে আশীষ করিয়া গমন করিলা মুনির বাসে॥

রূপনারায়ণ॥ রূপনারায়ণের 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য ময়মনসিংহের আদাজান গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রামের একটি ঘোষ পরিবার কবির উত্তরপুরুষ হিসেবে নিজেদের দাবি করেন। এঁদের কুলপঞ্জি অনুসারে রূপনারায়ণ ছিলেন তাঁদের অষ্টম পুরুষ পূর্ববর্তী। প্রতি একশত বৎসরে তিন পুরুষ ধরা হলে কবির কাল হয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। 'কায়স্থ বংশাবলী' নামক কুলজী গ্রন্থ থেকে জানা যায় রূপনারায়ণের পিতার নাম জগন্নাথ ঘোষ।

রূপনারায়ণের 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে রচিত। কাব্যখানি পাঁচালীর ধারায় সৃষ্ট। কবির সংস্কৃত, হিন্দি ও ব্রজবুলিতে বেশ দখল ছিলো বলতে হবে। তাঁর কাব্যে করহস্তি, করুকা, বলোঁ, মাঙ্গিলা ইত্যাদি পুরোনো ও আঞ্চলিক শব্দপ্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর ভাষায় আধুনিক শব্দ-সংযোজনই বেশি। রচনায় আলঙ্কারিক শব্দপ্রয়োগ ও ছন্দঝঙ্কার শোনা যায়। যেমন,—

পাবক তপন কিরণ দেহ।
চিকুর নিকর সজল মেহ॥
পীযূষসদন বদন ইন্দু।
তরল কমল শম্ভু সিন্ধু॥

এবং,

কৌমোদকী চারু চক্র। মোতে বৈরী নাশে দক্ষ॥
অসংখ্য বিপক্ষে কক্ষ, সর্বভক্ষ ঈক্ষিণী।
ইন্দ্রচন্দ্র দেববৃন্দ। পূজতি পদারবিন্দ॥
বাহন নৃগেন্দ্র ইন্দ্র, ব্রহ্মবন্দ বন্দিনী॥

প্রাণরাম চক্রবর্তী॥ প্রাণরাম চক্রবর্তী তাঁর কালিকামঙ্গল কাব্য রচনার কালনির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন,—

বসুদ্বয় রামচন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকা-মঙ্গল গীত হৈল সমাপন॥

এতে ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ হয়। কবি তাঁর কাব্যে এক ভাবগান উল্লেখ করেছেন—'মুকুন্দ নন্দন ভণে, নৃপ বৈশ্য দুইজনে, চলিল মুনির সন্নিধান।' অবশ্য এ মুকুন্দ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম নন। কেননা মুকুন্দরামের পুত্রের নাম প্রাণরাম নয়, শিবরাম। তাছাড়া মুকুন্দরামের পুত্র হলে প্রাণরামের জীবনকাল ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হবে। কিন্তু কবির কাব্যোৎপত্তির কালনির্দেশক পদটি বিশ্লেষণ করে কবিকে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফেলতে হয়।

পরশুরাম চক্রবর্তী॥ কবি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। পরশুরাম শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন বলে মনে করা হয়।[২৪১] তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসরণে কাব্যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনা আছে। অন্যান্য পুরাণ কাহিনীর বর্ণনাও আছে। পরশুরামের কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ।

দৈবকীনন্দন সিংহ॥ তাঁর উপাধি ছিলো কবিশেখর। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে আলোচিত 'রায়শেখর' দ্রষ্টব্য। তিনি ষোড়শ সপ্তদশ শতকের সন্ধি যুগের কবি।[২৪২] কবির পিতা চতুর্ভুজ এবং মাতা হীরাবতী। দৈবকীনন্দন সিংহের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আছে। সেগুলো হলো 'গোপালচরিত', 'গোপালের কীর্তনামৃত', 'গোপীনাথ বিজয় নাটক' ও 'গোপালবিজয়'। দৈবকীনন্দনের রচনায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় আছে। 'গোপালবিজয়' কাব্যে 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ডে'র যে বর্ণনা মিলে, তা আদিরসাত্মক।

তাঁর ভাষার নিদর্শন,

শিখণ্ডমণ্ডল উড়ে চূড়ার উপরে।
ইন্দ্রধনু উঠে যেন নবজলধরে॥
ললাটে চন্দন রেখা অতি সে উজ্জালী।
নবজলধরে যেন ধবল বিজুলী॥
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি দেখি মনোহরে।
মধুলোভে কমল বেড়িল মধুকরে॥

দ্বিজ রামদেব॥ কবির কাব্যে কালনির্দেশক যে পদটি আছে তা হলো 'ইন্দুবাণ ঋষিবাণ শক নিয়োজিত। রচিলেক রামদেব সারদাচরিত॥' তাঁর অভয়ামঙ্গল কাব্যখানি ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে থাকবে।[২৪৩] দ্বিজ রামদেবের কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। সেজন্য তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী মনে করা হয়। তাঁর কাব্যে মগ ফিরিঙ্গিদের কথাও আছে,

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টাঙ্গি গোলন্দাজ তার সঙ্গী
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাট।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদা ভাবিয়া মনে
নগর পত্তন গুজরাট॥

দ্বিজ রামদেবের কবিমানস দ্বিজ মাধবের শিল্পভাবনার দ্বারা আচ্ছন্ন। 'সারদাচরিতে'র অন্যতম কবি দ্বিজ মাধবও তাঁর কাব্যের জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিখ্যাত। দ্বিজ মাধবের তুলনায় দ্বিজ রামদেব উক্ত অঞ্চলে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেন নি, তার কারণ অধিকতর কাব্যগুণসমৃদ্ধ দ্বিজ মাধবের 'সারদাচরিত' কাব্যখানি বহু পূর্ব হতেই ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ

---

২৪১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৬
২৪২. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৫
২৪৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৫২৩

করেছিলো। সেই তুলনায় দ্বিজ মাধবের মৌলিক কাব্যভাবনার কাছে রামদেবের প্রতিভা ম্লান হয়ে গেছে।

দ্বিজ লক্ষ্মণ।। দ্বিজ লক্ষণ সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। তাঁর 'শিবরামের যুদ্ধ' পালা-জাতীয় কাব্যগ্রন্থ। শিবরামের যুদ্ধ-পালার একটি পুথির কাল হচ্ছে ১০৬১ বঙ্গাব্দ বা ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ। কবি সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনীর সংমিশ্রণে একখানি পরিপূর্ণ রামায়ণ রচনা করেছেন। কবি অবশ্য তাঁর নিজস্ব রামায়ণ রচনায় উক্ত দুই রামায়ণের হুবহু অনুকরণ না করে নিজের কল্পনাপ্রসূত দুই একটি আখ্যায়িকা তাতে যোগ করেন।

দ্বিজ লক্ষ্মণের ভাষায় প্রাঞ্জলতা আছে,

শ্রীবাম বলেন মিতা তুমি প্রাণাধিক।
তোমা হেন বন্ধু মোর নাহিক অধিক।।
পিতৃ বোলে প্রভুরাম তুলিলেন তাবে।
বিদায় হইল গুহ প্রণমি সভাবে।।

ভবানীদাস, ভবানীনাথ।। ভবানীদাস সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কালের লোক। ভবানীদাসের কাব্যের নাম 'রামের স্বর্গারোহণ'। কাব্যের প্রারম্ভে কবি সংক্ষেপে পরিচিতি দিয়েছেন। 'রামের স্বর্গারোহণ' পালাটি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়ে থাকবে। কাব্য রচনায় বাল্মীকির 'উত্তর কাণ্ড' ও কোনো কোনো অংশে 'অদ্ভুত-রামায়ণ'কে অনুসরণ করা হয়েছে। ভাষা এবং রচনারীতি গতানুগতিক। যেমন,

রাজা বিনে সোভা নাহি প্রিথিবির ভিতর।
বিষ্ণু বিনে শূন্য দেখি অমরা নগর।।
বিষ্ণু বিনে দেবগণের গতি নাহি আর।
হেন পদ না দেখিয়া করে হাহাকার।।

ভবানীনাথ ভণিতায় 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' ও 'শত্রুঘ্ন দিগ্বিজয়' পালা দুটি পাওয়া গিয়েছে। পালাগান দুটিতে ভাগবতের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। ভণিতার পার্থক্যে ভবানীনাথকে অনেকে ভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। তবে বাংলা সাহিত্যে একাধিক ভবানীদাস আছে।

বৈদ্য কবিকর্ণপুর, বৈদ্য জগন্নাথ, বৈদ্য হরিদাস।। উত্তরবঙ্গে তথা তৎকালীন সমগ্র পূর্ববাংলায় মনসার পূজা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। তাই মনসার গীতও বেশ ব্যাপকভাবে রচিত হতে থাকে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ধারার কাব্য-রচনা অব্যাহত থাকে। তবে অনেক উৎকৃষ্ট কবির রচনা গায়েনদের খামখেয়ালীর দরুণ কিছু খ্যাতি, কিছু অখ্যাতির কারণ হয়। মনসামঙ্গলের পদসংগ্রহকে 'বাইশা', 'বাইশ কবি মনসা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই তথাকথিত বাইশ কবি মনসায় বা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন বৈদ্য কবিকর্ণপুর, বৈদ্য জগন্নাথ, বৈদ্য হরিদাস ইত্যাদি।

এঁদের মধ্যে বৈদ্য জগন্নাথ ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে তাঁর পুথির কিছু অংশ ঢুকে যায়। এসব কবি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কালেরও হতে পারেন।

ভবানীপ্রসাদ রায়॥ সপ্তদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদধর্মী একপ্রকার মঙ্গলকাব্য-জাতীয় ও দেবী-মাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচিত হয়, তাকেই 'দুর্গামঙ্গল' বলা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর কাব্যে চণ্ডীদেবীর মহিমারই প্রকাশ ঘটেছে। এই কাহিনী রচনায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতীর আখ্যানটি অনুসরণ করা হয়। সপ্তদশ শতকে এই জাতীয় কাব্যের দুইজন কবি—একজন হচ্ছেন 'চণ্ডিকা-বিজয়ে'র কবি দ্বিজ কমললোচন, অপরজন 'দুর্গামঙ্গলে'র কবি ভবানীপ্রসাদ রায়। ভবানীপ্রসাদের কাব্যের শেষে ১০৭১ বলে একটি তারিখ আছে, এই তারিখ বঙ্গাব্দ হলে কবির পুথি ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত হয়ে থাকবে। কবি সম্ভবত তার কিছু পূর্বে জীবিত ছিলেন।[২৪৪] ভবানীপ্রসাদ তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন সেই অংশটি হচ্ছে,-

নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত।
দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ॥
জন্মকাল হৈতে কালী কবিত দুঃখিত।
চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥

টাঙ্গাইল জেলার আটিয়া পরগণার কাঁটালিয়া নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। কবি ছিলেন জন্মান্ধ। তিনি শৈশবেই পিতামাতাকে হারান। অন্ধকবি জ্ঞাতি ভ্রাতাদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন—'জ্ঞাতি ভ্রাতা আছে আমার নাম কাশীনাথ। তাহার তনয় দুই কি কহিব সম্বাদ।' জন্মগত কবিপ্রতিভা-বলে কবি বাল্যকালে মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন। হয়তো বিজ্ঞজনের মুখে হিন্দুপুরাণের কাহিনীও শুনে থাকবেন, যা অন্য কোনো লিপিকারের মাধ্যমে তাঁকে লিখতে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। ভবানীপ্রসাদ তাঁর 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনায় মার্কণ্ডেয়-পুরাণকে অনুসরণ করেছেন। অনুবাদমূলক কাব্য হলেও ভবানীপ্রসাদ কোনো কোনো স্থলে কেবল মূলের ভাবটুকু গ্রহণ করেছেন। তবে কবির ভাষা মৌলিক সৃষ্টিশীলতার দাবিদার। ভাষায় কোনোরূপ আড়ষ্টতা বা জড়তা নেই। একটি অংশ,-

যেরূপে হৈল পূজা অকালে আশ্বিনে।
মন দিয়া সেহি কথা শুন সর্বজনে॥
যেমতে আসিলা দেবী বাপের নিবাস।
ই তিন ভুবনে হৈল পূজার প্রকাশ॥
সৃষ্টির পত্তন মধুকৈটভ বিনাশ।
মৈষাসুর বধ দেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ॥

বীভৎসরসের বর্ণনায়ও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,—

শিবাগণে মরা মাংশ টানি টানি খায়।
রুধির খাইয়া অস্থি অপরে চাবায়॥
রুধির করিছে পান ভৈরবী যোগিনী।
সুধাপানে মত্ত হৈলা আপনি ভবানী॥

অভিরাম দত্ত॥ কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক। তিনি দত্তকুলোদ্ভব হলেও বৈষ্ণবোচিত বিনয় করে নিজেকে দাসরূপে পরিচিত করেছেন। কবির কাব্যের নাম 'গোবিন্দবিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী।

দ্বিজ পরশুরাম॥ কবির পরিচয় অজ্ঞাত। তবে তিনি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা যায় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে তিনি যেসব পালা রচনা করেছেন সেগুলো হলো 'অক্রুরাগমন', 'কালীয়দমন', 'গুরুদক্ষিণা', 'দানখণ্ড', 'পারিজাতহরণ', 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান' ও 'সুধামার দারিদ্র্যভঞ্জন'। সর্বশেষ পালার রচনাকাল ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ। পরশুরামের ভাষার খানিকটা নিদর্শন,--

সুবর্ণের কলস শোভে চালের উপর।
ভ্রমর ভ্রমরি সব করে কলরব॥
ঐশ্বর্যের সীমা নাই দাস দাসীগণ।
হস্তী ঘোড়া দেখি যেন ইন্দ্রের ভুবন॥

ষষ্ঠীবর দত্ত॥ ষষ্ঠীবর দত্ত সপ্তদশ শতকের শেষ দশকের লোক।[২৪৫] তিনি ছিলেন সিলেট জেলার মৌলভীবাজারের অন্তর্গত গয়গড় গ্রামের অধিবাসী।[২৪৬] তাঁর পিতা ভুবনানন্দ এবং বড় এক ভাই হৃদয়ানন্দ। সম্ভবত তিনি কোনো সামন্ত কর্তৃক 'গুণরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন।

ষষ্ঠীবর দত্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যখানি সিলেট অঞ্চলেই প্রচলিত ছিলো। অধিক প্রচারের জন্য তাঁর কাব্যের ভাষা আধুনিকতার স্পর্শ লাভ করেছে। কাব্যের কালনির্দেশক কোনো উক্তি নেই তবে কবির জন্মভূমির পরিচয় আছে,--'শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম, হয় ষষ্ঠীর ধাম, মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা॥' তাঁর 'পদ্মাপুরাণ' দেবখণ্ড, বাণিজ্যখণ্ড ও স্বর্গারোহণ-খণ্ডে বিভক্ত। শেষোক্ত খণ্ডটি করুণরসে অভিষিক্ত। ষষ্ঠীবরের ভাষার কিছু নিদর্শন,—

লখাই বিপুলার রূপ দেখিয়া সুন্দরী।
উচ্ছাসি উচ্ছাসি কান্দে ঝিউ ঝিউ করি॥
যোগিস্থানে কমলায় বিনয়ে জিজ্ঞাসে।
কহ কহ যোগী তোরা বৈস কোন দেশে॥

---

২৪৫. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ ১৮১
২৪৬. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ.১৮২-১৮৩

যোগী বলে মোদের বসতি স্থিতি নাই।
হইয়া বৈরাগী নানা দেশেতে বেড়াই॥

দুর্লভনন্দন॥ কবি দুর্লভনন্দন সপ্তদশ শতকের শেষপাদের ব্যক্তি। কবির পুথির কালনির্দেশক পদে এ তথ্য জানা যায়। অবশ্য কবির অন্যান্য পরিচয় অনুপস্থিত। দুর্লভনন্দন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ থেকে শেষ স্কন্ধ পর্যন্ত সবগুলো স্কন্ধেরই অনুবাদ করেন। কবির পুথির লিপিকাল ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

সনাতন বিদ্যাবাগীশ॥ তাঁর জীবনকাল সপ্তদশ শতকের শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি। তিনি ছিলেন কলকাতার ঘোষাল বংশোদ্ভূত। তাঁর কাব্যখানা তিনি অবশ্য কটকে বসে লিখেছেন। ভাগবত অনুসরণ না করেও তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন।

বিষ্ণুপাল॥ বিষ্ণুপালের মোট তিনখানি পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে একখানি পূর্ণাঙ্গ এবং বাকি দুখানি খণ্ডিত। বিষ্ণুপালের পুথিতে কবির কোনো পরিচয় কিংবা কাব্যরচনার কালনির্দেশক কোনো উক্তি নেই। তবে পণ্ডিতগণ মনে করেন কবির মনসামঙ্গল কাব্য সপ্তদশ 'অষ্টাদশ শতকের কোনো এক দশকে রচিত হয়ে থাকবে।[২৪৭] সে সময় রাঢ় অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পাশাপাশি মনসার মাহাত্ম্যমূলক কাব্যও রচিত হতে থাকে। তাই বিষ্ণুপালের কাব্য ঐ সময়ে রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া বিষ্ণুপালের কাব্যে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপালের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় অনুল্লেখ থাকলেও বীরভূম অঞ্চলের জনপ্রবাদ থেকে জানা যায় কবির নিবাস ছিলো রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী সেরগড় পরগণার কোনোও গ্রাম।[২৪৮] বিষ্ণুপাল জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন। তাঁর 'অষ্টমূলা মনসার গান' চণ্ডীমঙ্গল রচনার আদর্শে পরিকল্পিত। বিষ্ণুপালের ভাষায় আধুনিকতার ছাপ আছে, কিন্তু কবিত্বের সম্মোহিনী শক্তির পরিচয় নেই; ছন্দ প্রকরণও শিথিল, তবে কোথাও কোথাও স্বরবৃত্তের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

ভালই কল্লাম সুবেশ কল্লাম এসেছিলাম জলে।
জলে এসে ভালই কল্লাম স্বামী পেলাম কোলে॥
গৌরী পূজা করেছিলাম জন্ম জন্মান্তরে।
মৃত পতি পাইলাম মা মানস সরোবরে॥

নারদের চরিত্র চিত্রণে কবি কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন, তবে তাতে কবিত্বের নিয়মনীতি মানার কোনো পরিচয় নেই। যেমন, -

ঢেঁকির সাজন করিতে নারদের গমন।
মুড়া ঝাঁটা বান্ধ্যে দিল বলিঞা লেঙ্গুর॥

---

২৪৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,' ও 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৩৯৬ ও ১৮৪

২৪৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩৯৬

পুরাণ তালাই দিল পালান ভিডিঞা।
নেআলির দড়ি দিল কর‍্যানি বলিঞা॥
শামুকের খুলি দিল ঘুঙ্গুর বলিঞা।
পানা বিরমূল নিল শ্বেতচামর বলিঞা।
দুদিকে দুখানি কুলা দিল রে বান্ধিঞা।
পক্ষবাত্র ঘোড়া যাবে উধায় করিঞা॥

বেহুলার বিলাপ বর্ণনায় কবি যে করুণরস পরিবেশন করেছেন তাতে তাঁর ভাষায় দীনতা ও ছন্দের ত্রুটিই অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন, -

আমি মর্যে গেলে প্রভুর ঢের দাসী হব।
প্রভু মর্যে গেলে আমি অনাথিনী হব॥
তরুতে লতাতে দুটি রহিল বেড়িঞা।
দুমুখে রহিল রামা এক মুখ হঞা॥

বিষ্ণুপালের ভাষায় আঞ্চলিকতা ও গ্রাম্যতার প্রভাব বেশি, তবে বাস্তবরস পরিবেশনে কবির দক্ষতা আছে।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র॥ কবি বগুড়ার করতোয়া নদীর তীরবর্তী লাহিনীপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে তাঁর জন্ম। কবির পিতার নাম অনন্ত, মাতা স্বর্ণমালা ও পত্নী ব্রজেশ্বরী। 'কবিভূষণ' তাঁর উপাধি। কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'মহাপৃষ্ঠে শশী দিয়া, বাণ বিধু সমর্পিয়া বুঝহ সনের পরিমাণ।' এতে ১১৫২ বঙ্গাব্দ বা ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ হয়।[২৪৯] তাঁর কাব্য দেবখণ্ড বা পুরাণখণ্ড এবং বণিকখণ্ড, এই দুই ভাগে বিভক্ত। দেবখণ্ডে মনসার আবির্ভাব সংক্রান্ত পুরাণ কাহিনী এবং বণিকখণ্ডে চাঁদ ও লখিন্দর বেহুলার কাহিনী কাব্যের বিবৃত বিষয়। জীবনকৃষ্ণের কাব্যে বিষয়ের জোড়জোর আছে, তবে কবিত্ব কম। যেমন, -

সাধু বলে তুমি ভগ্নি সোহাগিনী মাও।
নির্দয় নিষ্ঠুর হৈয়া কোন দেশে যাও॥
বাপ বড় দুরন্ত জানিনু এতদিনে।
তার কারণে জলে ভাসে দয়ার বাহিনে॥
কি দণ্ড লাগিল পিতার কোন দুঃখে মনে।
কি দোষিয়া বিভা দিল সর্প খাউকার সনে॥
একখানি ভগিনী ছয় ভায়ের দুলালী।
শূন্য কৈল ঘর মায়ের কোল কৈল খালি॥

বর্ণনা ও বিবরণীতে যেন 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র সুর শোনা যায়। লোক সাহিত্যের এই সুর কবির সমকালের দৃষ্টিতে যথেষ্ট অভিনব।

'উষাহরণ' নামে তাঁর আরো একটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

---

২৪৯. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩৯২

মনসামঙ্গলের অন্তিমপর্বে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন যেমন বৈদ্য জগন্নাথ, দ্বিজ রসিক, রাজসিংহ, জানকীনাথ, গোপালচন্দ্র মজুমদার, জগমোহন মিত্র, দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, বৈদ্যনাথ, রাধানাথ রায়চৌধুরী প্রমুখের কাব্যের দৈবলাঞ্ছিত মানবজীবনের কাহিনী অনেক অতিরঞ্জনমুক্ত, মানবজীবনের সহজ সরল রূপটি তাতে বাস্তবতার সঙ্গে মিশে আরো স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয়েছে।

দ্বিজ শ্রীনাথ॥ দ্বিজ শ্রীনাথ সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কবি। শ্রীনাথের কাব্যে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৬২৫-১৬৬৫) উল্লেখ আছে। কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানা যায় দ্বিজ শ্রীনাথের মতো তাঁর পিতা এবং ভ্রাতারাও কাব্যশক্তির অধিকারী ছিলেন। দ্বিজ শ্রীনাথ সম্ভবত সমগ্র মহাভারতই অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যের বিরাট, ভীষ্ম ও দ্রোণপর্বই কেবল পাওয়া যায়। কবির মৌলিকতা-গুণটিও কাব্যের অংশ-বিশেষে লক্ষ্য করা যায়।

দ্বৈপায়ন দাস॥ দ্বৈপায়ন দাস সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। কবি নিজেকে 'কাশীর নন্দন' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বৈপায়ন দাসের 'বনপর্ব', 'গদাপর্ব' ও 'স্বর্গারোহণপর্বে'র পুঁথি পাওয়া যায়।[২৫০] পিতা কাশীরাম দাসের কাব্যকেই আদর্শ করে তিনি তাঁর মহাভারত রচনা করেছেন। কখনো কখনো পিতাপুত্রের রচনা এক হয়ে গেছে। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে দ্বৈপায়ন দাসের একটি উক্তি,

> কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
> অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

দ্বিজ প্রভুরাম॥ প্রভুরাম সম্ভবত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। কবির পরিচয়জ্ঞাপক একটি পদ,-

> মল্লভূমে বাটি, ফুল্যার মুখটি,
> শ্রীযুত জানকীরাম।
> তস্যসুত গায়, সখা ক্ষুদিরায়,
> নায়কে পুরহ কাম॥

এ থেকে বোঝা যায় কবির বাড়ি মল্লভূমে। তাঁর পিতা ফুল্যার মুখটি শ্রীযুক্ত জানকীরাম। ক্ষুদিরায় নামক কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। কবির কাব্য 'ধর্মমঙ্গল' ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তবে তার অনুলিখন আনুমানিক '১১১৭ সাল বা ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ।'[২৫১]

দ্বিজ মুকুন্দ, কবিভূষণ॥ এক দ্বিজ মুকুন্দ ষোড়শ শতকে 'বাসুলীমঙ্গল' নামক কাব্য রচনা করেছেন। আলোচ্য কবি সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে কিংবা অষ্টাদশ শতকের প্রথম

২৫০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ.৪১৯
২৫১. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ.৭১৭

দশকে জন্মগ্রহণ করে থাকবেন। তবে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন, তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ অথবা ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দ।[১৫২] কবির পিতা বিশ্বেশ্বর এবং মাতা চন্দ্রমুখী। দ্বিজ মুকুন্দ ব্রাহ্মণ-বংশজাত। এছাড়া তিনি চামুণ্ডার ভক্ত ছিলেন। পালধি গ্রামবাসী শ্রীরাম তর্কবাগীশের অনুরোধক্রমে মুকুন্দ কবিভূষণ একখানি দেবী প্রশস্তিমূলক কাব্য লেখেন। কবির কাব্যের নাম 'মাধবচরিত'। কবি যে চামুণ্ডার ভক্ত সেই পরিচয়,—

চামুণ্ডার পাদপদ্ম মকরন্দময়।
মধুলোভে মত্ত ভৃঙ্গ শ্রীমুকুন্দ কয়॥

নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে,—

মুখ্যবংশ অবতংসে, নারায়ণ ওঝাবংশে,
বিশ্বমুখ ঈশ্বর নন্দন।
চন্দ্রমুখী জন্মক্ষিতি, প্রণমিঞা বসুমতি,
বিরচিল শ্রীকবিভূষণ।

এবং

দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হৈতে মাধবচরিত।
সমাপ্ত হইল পঞ্চ দিবসের গীত॥
দেবীর সেবক শুন হৈয়া সাবধান।
অতঃপর শুন চন্দ্রকেতু উপাখ্যান॥

ভৈরবচন্দ্র ঘটক॥ ভৈরবচন্দ্র ঘটক সপ্তদশ শতকের শেষপাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ অবধি জীবিত ছিলেন। কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। ভৈরবচন্দ্র সত্যপীরের পাঁচালী অবলম্বনে তাঁর পুথি রচনা করেন। তাঁর কাব্য রচনার কাল ১৭০০/০১ খ্রিস্টাব্দ।

শ্যামপণ্ডিত॥ শ্যামপণ্ডিতের কাব্যের কাল থেকে অনুমান করা হয় তিনি সপ্তদশ শতকের শেষপাদে জন্মগ্রহণ করে অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর পণ্ডিত উপাধি থেকে অনুমান করা হয় তিনি সম্ভবত ডোমপণ্ডিত বংশোদ্ভূত ধর্মপূজারী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। তবে বীরভূম অঞ্চলের জনশ্রুতিকে তিনি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। এজন্য তাঁকে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীরূপে চিহ্নিত করা হয়। তিনি নিজেকে ধর্মদাস বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্যামপণ্ডিত তাঁর কাব্যকে 'ধর্মমঙ্গল' না বলে 'নিরঞ্জনমঙ্গল' নামে অভিহিত করেছেন। কাব্যের রচনাকাল ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে।[১৫৩] 'নিরঞ্জনমঙ্গল' কাব্যে দেবতাই কবির মূল লক্ষ্য,—মানুষ নয়। শ্যামপণ্ডিতের ভাষার কাব্যশক্তিও তেমন উচ্চাঙ্গের নয়। যেমন,

নিরঞ্জন মঙ্গলের অপূর্ব বন্দনা।
আদর করিয়া ভাই শুন সর্বজনা॥

---

১৫২. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৬৮
১৫৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭০৯

বলরাম দাস ।। ইনি পদাবলীর বলরাম দাস নন। বলরাম দাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্যখানি ১৭০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে। এতে তাঁর জীবনকাল সপ্তদশ শতকের শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে হয়। বলরাম দাস কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য-রচনায় ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকে অবলম্বন করেছেন।[২৫৪] দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের মথুরাগমন ও গোপীদের খেদ-বর্ণনা কাব্যের আকর্ষণীয় বিষয়। রচনার কাল-নির্দেশক পদটি হচ্ছে,

অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনীসহায়।
এই পরিমাণে শকাদিত্য শক যায়।।

পদটি বিশ্লেষণ করলে অজমুখ = ৪, ভুজ = ২, অঙ্গ = ৬, অশ্বিনীসহায় অর্থাৎ সূর্য = ১; সব মিলে ১৬২৪ শকাব্দ + ৭৮ অর্থাৎ ১৭০২ খ্রিস্টাব্দ। বলরামের ভাষা সহজ ও স্বচ্ছন্দ। খানিকটা অংশ,

তারা বড় ভাগ্যবতী, পুণ্যশীলা মহামতি,
গোপকুলে যার উপাদান।
নিবাস পঞ্চাল দেশে, যাহার কৃপার লেশে,
বলরাম দাস রস গান।।

রামানন্দ ঘোষ ।। কবি তাঁর রামায়ণের এক জায়গায় লিখেছেন 'বলেতে হাম্বির হৈলা কর্ণেতে কন্দর্প।' কবির উল্লিখিত হাম্বির অনেকের মতে বিষ্ণুপুরের দস্যুরাজা বীর হাম্বীর। তাতে কবির জীবনকাল সপ্তদশ শতকের শেষপাদে পড়ে। রামানন্দ কখনো নিজেকে শূদ্র, কখনো দ্বিজ বলেছেন। তিনি একবার উড়িষ্যা গিয়েছিলেন। ম্লেচ্ছের অত্যাচারে দেশের জনসাধারণ যখন দুর্বিপাকে পড়েছেন, তখন তার শান্তি বিধানের জন্য পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে এই অনুভবে রামানন্দ ঘোষ নিজেকে বুদ্ধের অবতারকণে দাবি করেছেন।[২৫৫] যেমন,

শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।
বুদ্ধবেশ ধরি এবে তত্ত্ব লিখে গেল।।

রামানন্দের 'রামায়ণ' কাব্য কাহিনীগত দিক থেকে কিংবা রচনারীতির দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দাবি করে না, তবে তাঁর বর্ণনার ভঙ্গিটি অকৃত্রিম ও সত্যসন্ধ। কিছু নিদর্শন,

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর।
না হৈল চর্মচক্ষের গোচর।।
ধনীতে বাঞ্ছয়ে ধন স্থলে বাঞ্ছে জল।
নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল।।
ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানী।
মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস রজনী।।

---

২৫৪. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৫৫
২৫৫. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ.৫০৩

দ্বিজ হরিরাম।। দ্বিজ হরিরামের ব্যক্তিগত পরিচয় অজ্ঞাত। কবি শোভাসিংহ নামে জনৈক ব্যক্তির নামে চণ্ডিকার প্রসাদ চেয়েছেন। শোভাসিংহ মেদিনীপুরের চিতুয়া ও বরদাবাটী পরগণার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিজ হরিরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যায়ে কবি তাঁর কাব্য রচনা করে থাকবেন। কবির কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের ছাপ আছে।

চার।। অষ্টাদশ শতকের এক বা একাধিক বিষয়ের রচয়িতা কতিপয় অপ্রধান কবি

সহদেব চক্রবর্তী।। সহদেব চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অনিলপুরাণ'। কাব্যখানি ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত হয়ে থাকবে। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। সহদেব চক্রবর্তীর জন্মস্থান হুগলী জেলার বাধানগর গ্রাম। তাঁর 'অনিলপুরাণ' কাব্যে লাউসেনের কাহিনী নেই, তবে নাথসাহিত্যের বিভিন্ন সিদ্ধাচার্যের কথা আছে।

দ্বিজ রসিক/রসিক মিশ্র।। অষ্টাদশ শতকের মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি দ্বিজ রসিক। তিনি নিজের বংশ পরিচয় ছলে বলেছেন তার পিতা প্রসাদ, পিতামহ মহেশ ও প্রপিতামহ কালিদাস। তিনি কবিবল্লভ নামেও পরিচিত, 'আখড়া শালেতে থানা। শ্রীকবিবল্লভ বানা।।'

দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ।। কবির জীবনকাল অষ্টাদশ শতক। কবি মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতা যুগলকিশোর। তাদের পদবী ছিলো ব্রহ্মচারী। দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণ 'জয়দেব প্রসাদাবলী' নামক গ্রন্থের অনুবাদক। পরিচয় ছলে কবি যেকথা বলেছেন তার কিছু অংশ,

বক্রনাথ তার মুখে হইয়া উদয়।
কৃপা করি মোরে শুনাইল মহাশয়।।
সাকিন মুকশুদাবাদ হয় গঙ্গাতীর।
যোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর বাহির।।
তেলিয়া নিবাসী উদ্ভবাংশে বেগবতী।
যোজন পরাণ হয় না হয় সঙ্গতি।।

বিকল চট্ট।। বিকল চট্ট সপ্তদশ শতকের শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কবির পিতা বারাণসী এবং পিতামহ রমানাথ। বিকল চট্টের 'সত্যপীরের পাচালী'র প্রচলন বীরভূম অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য কবিকে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসী বলে মনে করা হয়। কবির কাব্যের রচনাকাল ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ। রচনাকাল প্রসঙ্গে কবির এই উক্তি, -

বেদ পূর্ব নেত্র দিহ, তাহার পূর্বে বস।
তার পূর্বে চন্দ্র আলা কৈল দিগদশ।।

নরহরি চক্রবর্তী।। নরহরি চক্রবর্তীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর' অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিলো। অতএব কবি উক্ত সময়ে জীবিত ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র গ্রন্থানুবাদ প্রসঙ্গে কবি নিজের খানিকটা পরিচিতি দিয়েছেন। অংশটি হচ্ছে,—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে হ্মানে সর্ব্বজনে।।
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ।।

নরহরির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী তৎকালীন বৈষ্ণবদর্শন-তত্ত্বজ্ঞ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। কবি নরহরি মনের বৈরাগ্য ভাববশত গৃহাশ্রম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দিরে পাচকেব কাজে নিযুক্ত হন এবং রাধানাথজীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। নরহরি সংস্কৃত সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন। কবির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'। এ গ্রন্থ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড় ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজ, ধর্ম, দর্শন ও তত্ত্ব-বিষয়ক একখানি অতুলনীয় ইতিহাস। ভক্তিরত্নাকব ছাড়া নবহরিব অপব দু'খানি গ্রন্থ 'নরোত্তম-বিলাস' ও 'শ্রীনিবাস-চরিত্র'। কবিব দু'খানি পদসংগ্রহ 'চন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্র-চিন্তামণি'।

কবীন্দ্র ।। কবীন্দ্র অষ্টাদশ শতকেব প্রথমপাদের ব্যক্তি। তাঁব আসল নাম মধুসূদন চক্রবর্তী। কবীন্দ্র উপাধি। কবীন্দ্রেব পিতা ঘটক চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বামচন্দ্র এবং পুত্র বামধন। বিদ্যাসুন্দব কাহিনীর অনুসবণে বচিত কবীন্দ্রের 'কালিকামঙ্গল' একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্য।

গিরিধর দাস।। গিরিধর দাস অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদেব লোক। কবিব নিবাস বড়াকর নদীব পূর্বতীরবর্তী হাতনল নামক গ্রাম। গিবিধব দাস জয়দেবেব গীতগোবিন্দেব অনুবাদ কবেন। এছাড়া তিনি 'মনঃশিক্ষা' ও 'নন্দোৎসব' নামক গ্রন্থরচনা করেন।

কালিদাস।। কালিদাসের কাব্যে বর্ধমান ও বীবভূম জেলার উল্লেখ আছে।[২৫৬] কালিদাসের নামে দুটি কাব্য আছে,— 'মনসামঙ্গল' ও 'শনিব পাঁচালী'। মনসামঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্পার্কে কবির উক্তি,--

গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকেব গণনা।
এই শকে এই কাব্য কবিল রচনা।

অর্থাৎ কাব্যখানি বচিত হয় ১৬১৯ শকাব্দ বা ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে। কার্তিক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁকে এই কাব্য রচনায় প্রেবণা দেন। কালিদাসের কাব্যে করুণবসের সুন্দর প্রকাশ আছে। যেমন, লখিন্দরের মৃত্যুতে শোককাতরা বেহুলাব চিত্রায়ণে কবিব বর্ণনা,—

কান্দে বালিয়া করিয়া বিলাপ।
ললাটে হানিয়া কর, অঙ্গ এড়ি অনাদর,

২৫৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৫৪

উপজিল বিষম সন্তাপ॥
পড়িয়া ভূমির তলে, ভাসিল নয়ান জলে,
ধৌত হইল উজ্জ্বল কাজল।
পড়িছে আনন মাঝে, জেন দেখি দ্বিজ রাজে,
শোভিত করয়ে কলেবর॥

অষ্টাদশ শতকের অন্য এক **দ্বিজ কালিদাস** 'কালিকাবিলাস', 'সূর্যের পাঁচালী' ও 'সূর্যমঙ্গল' কাব্য লিখেছেন।

জগজ্জীবন ঘোষাল॥ সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের কবি। কবি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কোচআমোরা বা কুড়িয়ামোরা, অথবা কুচিয়ামারা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দিনাজপুবের রাজা প্রাণনাথ তাঁব সমসাময়িক ছিলেন। প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন।[২৫৭] জগজ্জীবনেব মাতাব নাম রেবতী,—'জগৎজীবন গায় রেবতী-নন্দন'।

জগজ্জীবনের গ্রন্থটির সম্পাদক ডক্টর আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এবং প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কবির 'মনসামঙ্গল' দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড, এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর কাব্যে চাঁদ সদাগর মাতুলানীর সঙ্গে যে নীতিগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়, তাতে এই চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে কবি শূন্যপুরাণ ও নাথপন্থীয় ধারায় যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন, তার আয়োজন বেশ আড়ম্বরপূর্ণ,—

প্রথমে সৃজিবা তুমি যত চরাচর।
স্বর্গমর্ত্য সৃজিবা সৃজিবা দেবনগর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃজিবা তবে শূলপাণি।
অবশেষে সৃজিবা মনসা কন্যাখানি॥
মনসাব রূপ দেখি হবে অচেতন।
বিভা করি মনসাকে দিবে আলিঙ্গন॥

বাণেশ্বর রায়, দ্বিজ॥ বাণেশ্বর রায় তাঁব 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কালনির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন,—

মনসা-মঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে
ষোল শ এক চল্লিশে।
ভাবিয়া ভবানী হর ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল-প্রকাশে॥

অর্থাৎ কবি ১৬৪১ শকাব্দ বা ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্যখানা রচনা করেন। কবি আত্মপরিচয়-ছলে জানিয়েছেন তাঁব পিতার নাম হরিনারায়ণ এবং 'নিবাস চম্পকপুরী জন্ম বায়পুবে।' বাণেশ্বব তাঁব মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাব চরিত্র পরিকল্পনায় যথেষ্ট বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন, কোনো কাল্পনিক ভাবাদর্শকে সরাসরি প্রশ্রয় দেন নি। স্বামীর মৃত্যুতে

২৫৭. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৩৪৭

বেহুলা ভেলায় না ভেসে জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। বাণেশ্বরের ভাষাও অনাড়ম্বর, ভাবটিকে সহজে আয়ত্ত করবার মতো হৃদয়গ্রাহী। যেমন,—

কান্দিতে কান্দিতে কন বেহুলা যুবতী।
ভুবনে আমার সম নাঞি ভাগ্যবতী॥
বিবাহ করিয়া নাথ লয়্যা আইল মোরে।
প্রভুর সঙ্গেতে ছিলাম লোহার বাসরে॥
জন্মে জন্মে কত আমি ভগব্রত করি।
তাহাতে কুপিত কিবা দেবী বিষহরী॥
না জানি তাহার ঠাঞি হইল কোন পাপে।
যামিনীতে মোর নাথে বিনাশিল সাপে॥

শঙ্কর চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র॥ শঙ্কর চক্রবর্তী মল্লভূমের রাজা রঘুনাথ সিংহদেব (১৭০২-১৭১২) ও গোপাল সিংহদেবের (১৭১২-১৭৪৮) সভাকবি ছিলেন। শঙ্কর চক্রবর্তীর পিতা মুনিরাম চক্রবর্তী। তাঁর পুত্রের নাম কুঞ্জবিহারী। কবির নিবাস ছিলো লেগোর দক্ষিণে পানুয়া গ্রাম। তাঁর রাজদত্ত উপাধি কবিচন্দ্র।

শঙ্কর চক্রবর্তী যেসব কাব্য রচনা করেছেন সেগুলো হলো - 'ধর্মমঙ্গল', 'অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঁচালী', 'ভারত পাঁচালী', 'কৃষ্ণমঙ্গল' এবং 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি বিভাগে রক্ষিত শঙ্করের 'মর্চ্ছধবা পালা' নামক একখানি শিবায়ন জাতীয় পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য হরপার্বতীর লোকপ্রচলিত কাহিনীটিই এর উপজীব্য। বাগদিনীবেশী পার্বতীর বর্ণনা বাস্তব চিত্রকল্পের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন,—

শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে দুইকানে সোনা।
কপালে সিঁদুর বিন্দু নাকে নাকচনা॥
বাগদিনি বেশ করি উভ করি খোঁপা।
ফুলমালা তাতে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা॥
কান্ধেতে ঘুনসি জাল ইসাদের কড়ি।
পরিপাটি কান্ধে সাজে মছের চুপড়ি॥
ঠমক করি দাণ্ডাইল শিব পড়ে ভোলে।
সই সই বলি প্রভু করিলেন কোলে॥

শঙ্কর চক্রবর্তীর 'রামায়ণ পাঁচালী' দক্ষিণ রাঢ়অঞ্চলে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে পরিচিত। রাজা গোপাল সিংহের আদেশে তিনি লেখেন 'ভারতপাঁচালী' কাব্য ও 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যখানা প্রহলাদ-চরিত্র, দাতাকর্ণ, গুরু-দক্ষিণা, কপিলামঙ্গল ইত্যাদি খণ্ডে বিভক্ত। কবির অপর কাব্য 'ভাগবতামৃত' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' ভবিষ্যপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

শঙ্কর॥ তিনি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কালের কবি। তাঁর 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যখানি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে গীত হতো। কাজেই এই অঞ্চলেই শঙ্করের নিবাস

ছিলো বলে অনুমান করা যায়। তাঁর ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় ১৭৫৯ অব্দ। শঙ্করের রচনায় মুকুন্দরামের প্রভাব বেশি। ভোজ্যবস্তুর রসনাতৃপ্ত বর্ণনায় তিনি বাঙালির জিভ লালাসিক্ত করাতে বেশ পটু,—

বাথুয়া টলটলি তৈলেতে পাক।
ডগডগি ভাজা ছোলার শাক॥
চুনার চড়চড়ি কুমড়ার বড়ি।
সরল সফরি ভাজা চিঙ্গুড়ি॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলে চিনি কিছু মিশায়ে খই॥
পাকা চাঁপা কলা করিব জড়।
খেতে মনে সাধ করেছে বড়॥

এবং,—

থোড় ডম্বুর যে ইলিশ মাছে।
পাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়া ধকধকি অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক॥
দুধে তিলে গুড়ে মিলায়ে লাউ।
দধির সহিত ক্ষুদের জাউ॥
চিনি চাঁপা কলা দুধের সব।
কহ বড় দিদি শুন গো আর॥

নিধিরাম আচার্য॥ নিধিরাম তাঁর 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থোৎপত্তির কালনির্দেশ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর রচনার কাল ১৬৭৬ শকাব্দ বা ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। অতএব তিনি ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। কবির পিতা দুর্লভ আচার্য এবং মাতা লক্ষ্মী। গ্রন্থে কবি আলী আকবর নামে এক ব্যক্তির নামোল্লেখ করেছেন। তিনি সম্ভবত কবির পৃষ্ঠপোষক। নিধিরামের উপাধি কবিরত্ন। তাঁর পুথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে, সেই হেতু তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কাব্যরচনায় তিনি চট্টগ্রামের জনশ্রুতিকেই অবলম্বন করেছেন।

জনার্দন॥ জনার্দনের কাল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। হয়তো অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের কবি তিনি। জনার্দনের নামে 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা'য় একটিতে জনার্দন, একটিতে দ্বিজ জনার্দন এবং অন্য একটি পুথিতে জনার্দন সেন ভণিতা পাওয়া যায়। জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডীতে কবির কাব্যভাবনার অভিনবত্ব এই যে ধনপতির দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনের চক্রান্তে অপরজন বনে বনে ছাগল চড়ায়। এমনি করে খুল্লনা একদিন বনে ব্রাহ্মণদের মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় নিরত দেখতে পায়। তাদের উপদেশে খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে নিযুক্ত হয়। জনার্দনের রচনায় সহজ স্বচ্ছন্দ গতি আছে, তবে কাব্যকলার মাধুর্য নেই। যেমন,—

মৃগয়া না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণ গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবে ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥

কাব্যের ভাষায় আধুনিকতার যে ছাপ আছে, তা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের হওয়াই সম্ভব।

জয়নারায়ণ॥ জয়নারায়ণ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। কবি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের জপসা নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা রামপ্রসাদ এবং মাতা সুমতি। জয়নারায়ণের দু'খানি কাব্য--'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'হরিলীলা'। কবির হরিলীলা কাব্যখানি ১৬৯৪ শকাব্দ বা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়।[২৫৮] চণ্ডীমঙ্গল সম্ভবত তার পূর্বে রচিত। চণ্ডীমঙ্গলে কবি 'মাধব সুলোচনা' নামে দু'টি উপাখ্যান যোগ করেছেন।

নিত্যানন্দ (চক্রবর্তী)॥ নিত্যানন্দ তাঁর কাব্যে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের নামোল্লেখ করেছেন। যেমন, -

কাশীজোড়া সৃষ্টিপাড়া অতি বিচক্ষণ।
রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥
নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ তাহার সভাসদ।
শীতলামঙ্গল রচে পান সুধানৃত॥

এ থেকে এও বোঝা যায় কবি রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরের একজন পরাক্রমশালী রাজা। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। তাঁর সভায় ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মবৈবর্ত- পুরাণের অংশবিশেষ অনুলিখিত হয়। নিত্যানন্দ সম্ভবত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই রাজনারায়ণেরই সভাসদ ছিলেন। কবি কাঁটাদিয়ার ডিঙিসাহী গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব মিশ্র। নিত্যানন্দের 'শীতলামঙ্গল' কাব্যখানি আঠারো শতকের সাতের দশকে রচিত হয়ে থাকবে।[২৫৯] কবির ভাষা সহজ ও সাবলীল গতিসম্পন্ন। যেমন,—

বাল্যবেশে ব্রজপুরে বিহরে গোপাল।
শ্রীদামের অংশকলা দ্বাদশ রাখাল॥
ষোড়শ সহস্র গোপী স্বয়ং আদ্যা রাধা।
কলাবতী কেবল কৃষ্ণ অঙ্গ আধা॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি ত্যজি স্বর্গশালা।
ত্রিসন্ধ্যা গোকুলে আসি দেখে কৃষ্ণলীলা॥

---

২৫৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯
২৫৯. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৪৭

ত্রিসর্গপ্রিয়া গঙ্গা কাশী বাণারস।
এসব এখন নয় গোকুল সদৃশ॥
এমন গোকুলে মাতা পূজা নেয় যদি।
ত্রিভুবনে যশ হয় জন্ম হয় ক্ষিতি॥

রামানন্দ যতী॥ রামানন্দ যতী ভণিতায় দুজন রামানন্দের নাম পাওয়া যায়। উভয়েই ব্রাহ্মণত্বের দাবি করেছেন। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষপাদে রামানন্দ ঘোষ নামে যে একজন রামানন্দের নাম পাওয়া যায়, রামানন্দ যতী এবং তিনি পরিব্রাজক হিসেবে উড়িষ্যা ভ্রমণ করেছেন বলে শোনা যায়। দুজনেই ছিলেন কালীভক্ত ; তাই ডক্টর সুকুমার সেন এই দুই কবি অভিন্ন কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[২৬০] তবে তাঁদের পার্থক্যের সপক্ষেও যুক্তি আছে। উভয়ের পদবীর পার্থক্য ও দুজনের নামে দুখানি রামায়ণের অস্তিত্ব আছে। রামানন্দ যতীকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক মনে করতে পারি। তিনি সংস্কৃতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। রামানন্দ যতীর সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল, কিছু সংস্কৃত পুস্তকের টীকাটিপ্পনী ও সারসংগ্রহ যথা অদ্বৈত রহস্য, অধ্যাত্মসার, কুণ্ডতত্ত্ব প্রকাশিকা, জ্ঞানবৈভবতন্ত্র, জ্ঞানাবলী, তন্ত্রসার, যোগসারাবলী, ভাগবতাশয়, সঙ্গীতশাস্ত্র, গীতার টীকা, গায়ত্রীর টীকা, মোহমুদ্গরের টীকা, শান্তি শতকের টীকা ইত্যাদি।

১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে রচিত রামানন্দ যতীর 'রামায়ণে'র নাম 'রামতত্ত্ব'। কাব্যখানি মূলত ভক্তিরসপ্রধান গীতিকাব্য। সম্ভবত ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ যতী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভুলত্রুটি দেখানো ছিলো তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন,- -

মুকুন্দের বিরচন, ইন্দ্রপুরে কাটালন,
ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল॥
নিমাইচরণ রায়, প্রতিপদে দোষ গায়,
পুস্তকের সমদোষ নাশ।
অষ্টাহের গান হয়, এত দোষ ধর্যা কয়,
তাহে পাবে দোসের প্রকাশ॥
পার্বতী যে পঞ্চশর, পুরেন প্রভুর পর,
সেই শর শিশুর উপর।
কালীদহে পুরে কালী, মাকে এত দেয় গালি,
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবর॥

অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে রচিত রামানন্দ যতীর 'রামতত্ত্বে' তাঁর কাব্যগুণ তত উচ্চাঙ্গের নয়। কিছু নমুনা,—

রামপদ মন, নামে কাঁপে যম,
চিদানন্দ অবতার।

২৬০. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৯৮-৫০৫

দেবমুনি ভয়, শাসিত হৃদয়,
প্রভু চাইলা গুণাপার॥

গঙ্গারাম দত্ত॥ গঙ্গারাম অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের কবি। তাঁর নিবাস ছিলো ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার ধারীশ্বর নামক গ্রাম। তিনি ঈশা খাঁর বংশধর জঙ্গলবাড়ির দেওয়ানদের অধীনে নায়েবের কাজ করেছেন। মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে গঙ্গারাম তাঁর আখ্যায়িকা কাব্য 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যের অংশবিশেষ গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট।

গোকুলানন্দ সেন/বৈষ্ণবদাস॥ তিনি বৈষ্ণবদাস নামেও পরিচিত। তাঁর নিবাস ছিলো কাটোযার নিকটবর্তী টেঞা বৈদ্যপুর নামক গ্রাম। গোকুলানন্দের গুরুর নাম রাধামোহন ঠাকুর। কবি সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। কীর্তন-গায়ক হিসেবে গোকুলানন্দের নাম ছিলো। কিছু পদও তিনি লিখেছেন, তবে পদকর্তা হিসেবে উল্লেখযোগ্য নন, কেননা তাঁর পদসমূহ গতানুগতিক ধারায় সৃষ্ট। অন্য একটি কারণে তাঁর নাম বিখ্যাত। তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর সংগ্রাহক। কবি তাঁর সংগ্রহের নাম দিয়েছেন 'গীত-কল্পতরু' ; তবে পরবর্তীকালে সে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'পদকল্পতরু'তে পরিণত হয়েছে।[২৬১] 'পদকল্পতরু'তে প্রায় ১৩০ জন কবিসহ তিন সহস্রাধিক পদ সংগৃহীত হয়েছে।

স্বরূপচরণ গোস্বামী॥ তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। স্বরূপচরণ ছিলেন খড়দহনিবাসী নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতার নাম নবকিশোর। পিতামহ নিত্যানন্দ। স্বরূপচরণের কাব্যের নাম 'প্রেমকদম্ব'। কাব্যের রচনাকাল ১৭৮৭—১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যখানি তাঁর অগ্রজ জগন্নাথের আদেশে তিনি রচনা করেন। স্বরূপচরণের ভাষার কিছু নিদর্শন,-

ললিতমাধব নাটক বিলক্ষণ।
শ্রীরূপ গোস্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন॥
সংস্কৃত গদ্যপদ্য নাট্য ভাষায় তায়।
অনায়াসে সর্ব্ব অর্থ বুঝা নাহি যায়॥
অতএব গৌড় ভাষা কবিবার তরে।
বৈষ্ণব সকল যত্নে আদেশিলা মোরে॥

ভবানীদাস ॥ ১৩২১ বঙ্গাব্দে ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ থেকে ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত। ভবানীদাসের ময়নামতীর গানে উল্লা, আলিম, মিরাশ, গেলাপ, দিনদুনিয়া, দখল ইত্যাদি বেশ কিছু মুসলমানি শব্দ আছে। তাই অনুমান করা হয় এই কাব্যে হয়তোবা কোনো মুসলমান

২৬১. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬

গায়েন হাত চালিয়েছেন।[২৬২] মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ভবানীদাসের পুথি চট্টগ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন। তাই কবি সম্ভবত চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভবানীদাসের কাব্য লোকসাহিত্য এবং ছড়াপাঁচালীর ধারায় রচিত। কাহিনীর শেষাংশে গোপীচাঁদ সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করে পুনরায় সংসারে ফিরে আসেন। রচনারীতি, চরিত্রসৃষ্টি কিংবা ভাষাগত দিক থেকে এ কাব্যের মূল্য খুব বেশি নয়।

বলরাম চক্রবর্তী, কবিশেখর।। বলরাম ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবি। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষপাদে তিনি জীবিত ছিলেন। বলরামের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ থেকে তাঁকে বর্ধমান অঞ্চলের অধিবাসী মনে করা হয়।[২৬৩] বলরামের আত্মপরিচিতিমূলক বর্ণনা,-

পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চন নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পুরিল যার আশ।।

বলরামের উপাধি ছিলো কবিশেখর। বলরাম তাঁর কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনী যতটুকু বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে বেশি বর্ণনা করেছেন কালিকার মাহাত্ম্য। বলরামের ভাষা সহজ ও সাবলীল কিন্তু কাব্যকলামণ্ডিত নয়। যেমন,-

দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফল বেচে।
পুষ্প না বিকায় সেই একাকিনী আছে।।
ধীরে ধীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে।
কৌতুক মালিনী মাল্য দিল তার গলে।।

বল্লভ।। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের অন্যতম কবি। এই কবি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।[২৬৪] তিনি তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কিছু বলেন নি, তবে তাঁর ভাষা বিচারে তাঁর কাল সম্পর্কে অনুমান করা যায়। আত্মপরিচয় ছলে তিনি বলেছেন, --

পিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশ্বর নাম,
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমারে।
তস্য সুত শ্রীশ্যাম, সকল গুণের ধাম,
কতকাল হস্তিনা নগরে।।
তস্য সুত শ্রীগোপাল, মান্দারণে কতকাল,
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে।

২৬২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'ময়নামতীর গান'। ভূমিকা, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যাবিনোদ
২৬৩. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৭৭৮
২৬৪. পূর্বোক্ত, 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', পৃ. ৮০১

শ্রীবল্লভ তাহার সুত, গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে॥

বল্লভ তাঁর 'শীতলামঙ্গল' কাব্যে বসন্তরোগ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন তাতে তাঁকে বসন্তরোগের একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হিসেবে মনে করা হয়। কাঁটাল্যা, মসূরিয়া, শিখর্‌য়া, মগর্‌য়া, গজশুড়া, আমবোয়া ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের বসন্তরোগের কথা শুনিয়েছেন তিনি। বল্লভের ভাষায় জড়তা নেই, স্বচ্ছন্দ ও সহজ গতিসম্পন্ন। যেমন,—

সুখের হাটে দাগা বিধি দিলা এত দিনে॥
কেবা কার পুত্র বধূ কেবা কার পিতা।
মরিলে সম্বন্ধ নাই শুন এই কথা॥

দয়ারাম দাস॥ দযারাম অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি। মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহের নাম পরীক্ষিৎ এবং পিতার নাম জগন্নাথ। দয়ারামেব কাব্যেব নাম 'সাবদাচবিত'।

ভবানীশঙ্কর দাস॥ ভবানীশঙ্কব অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি। 'ঢাকুর কুলজী' গ্রন্থ থেকে জানা যায় ভবানীশঙ্কব আত্রেয় গোত্রের জনৈক নবদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুলীন কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ্ কবেন। নবদাসের বংশধব কৃষ্ণ হৃদযানন্দ। চট্টগ্রাম জেলাব অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্তী বটতলী গ্রামে কবির পূর্বপুরুষ বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী বংশধর মধুসূদন সেখান থেকে চক্রশালাব অন্তর্গত ছনহারা গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। মধুসূদনের পুত্র শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তেব পুত্র নযন রায় এবং তৎপুত্র কবি ভবানীশঙ্কর রায়। ভবানীশঙ্করের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কব। কবি ভবানীশঙ্কর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শুচি এবং সংযত ভাব রক্ষা করার জন্য তিনি নিজেব বসতবাড়ির সম্মুখস্থ দীঘিব জলে টঙ্গী তৈরি কবে লেখাপড়া করতেন।[২৬৫] ভবানীশঙ্কবেব কাব্যেব নাম 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা'। তবে ঢাকুব গ্রন্থে এবং স্থানীয় সমাজে কাব্যটিকে জাগবণ বা শঙ্কর বিশ্বাসের জাগবণ বলা হযেছে। চট্টগ্রামবাসী রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামক জনৈক বৃদ্ধেব কাছ থেকে এই পুথি সংগ্রহ করেন এবং তা 'মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয। ভবানীশঙ্কর তাঁব কাব্যেব কালনির্দেশক একটি পদ দিয়াছেন,—

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

এতে কাব্যের রচনাকাল ১৭০১ শকাব্দ বা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ হয়। ভবানীশঙ্করের রচনায় সংস্কৃত শব্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও অলঙ্কারের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। ভারাক্রান্ত অলঙ্কার-প্রকরণের জন্য অনেক সময় তাঁর রচনার গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পারে নি। অবশ্য রাধার রূপ বর্ণনায় কবির রচনা মনোরম হয়েছে। যেমন,—

২৬৫. ঢাকুর গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ.২

বোলয়ে বড়াই কে চলিছে যমুনা কূলে।
কাহার সুন্দরী নারী, গোপীগণ সঙ্গে করি,
চলিয়াছে মনকুতূহলে॥
রক্তে নিন্দিয়াছে ইন্দু, কপালে সিন্দুর বিন্দু,
কটিমাঝে পূর্ণকুম্ভ সাজে।
হেরিতে ওরূপ খানি, হরি নিল মোর প্রাণী,
জিজ্ঞাসা না কৈলুম মুই লাজে॥

ভৈরবচন্দ্র দাস ॥ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কবি তিনি। যশোর জেলার পলুয়া গ্রাম ছিলো তাঁর নিবাসস্থল। কবির পিতা দেবীপ্রসাদ এবং জ্যেষ্ঠ দুই ভাই শম্ভুচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র। এঁরা উগ্র ক্ষত্রিয় বংশজাত। ভৈরবচন্দ্রের কাব্য 'ঊষাসাগর', রচনাকাল ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যখানি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। দ্বিজ পঞ্চাননের আদেশক্রমে মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে কবি এই অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। যেমন,

দ্বিজ পঞ্চানন মোরে করিলে আদেশ।
অনায়াসে হবে গ্রন্থ না পাইবে ক্লেশ॥
সমস্কৃত ভাঙ্গি তুমি করহ পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
তাঁর পদরজ শিরে বন্দিয়া ভৈরব।
আরম্ভিল আদ্যখণ্ড ঊষার সাগর॥

এবং -'পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম যবে। মোর শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার গাথল॥' পরে কবি তাঁর কাব্যের বর্ধিত আকার দেন।

জগৎরাম রায় ॥ জগৎরাম অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের কবি। জগৎরামের নিবাস ছিলো দামোদরের দক্ষিণ তীরে পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ নারায়ণের অধিকারভুক্ত ভুলুই গ্রামে। কবির পিতা রঘুনাথ এবং মাতা শোভাবতী। জগৎরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদও কবি ছিলেন। তারই সহায়তায় কবি 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' এই দুটি কাব্য রচনা করেন। জগৎরামের রামায়ণ রচনা শেষ হয় ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য এই তারিখ তাঁর পুত্র রামপ্রসাদের রচনাসমাপ্তির তারিখ।[২৬৬] বৈষ্ণবতত্ত্ব নিয়ে লেখা জগৎরামের অপর একটি কাব্য 'আত্মবোধ'।

মুক্তারাম দাস ॥ মুক্তারাম অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। তাঁকে আসাম অঞ্চলের অধিবাসী বলেও মনে করা হয়। তাঁর পিতা গঙ্গারাম এবং পিতামহ রাজারাম। মুক্তারামের কাব্যের নাম 'সত্যনারায়ণের বিবরণ'। কাব্যের রচনাকাল প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,-

সন নিরূপণ লিখি শুন সাবধানে।
রুদ্রাক্ষরে পৃষ্ঠে বসু লিখিবে যতনে॥

---

২৬৬. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ ৪১২

পরেতে সমুদ্র লিখি সন হৈল সায়।
শকের নির্ণয় লিখি শুনহ সভায়॥
চন্দ্রাঙ্করে মুণি দিয়া পুষ্প দিবে তায়।
শেষে পক্ষাঙ্কর দিয়া হৈল সায়॥

রঘুনন্দন॥ রঘুনন্দনের কাব্য 'শ্রীরামরসায়ন' অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রচিত হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশজাত। তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি বর্ধমান জেলার মাড়ো গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী। তিনি 'শ্রীরাধা মাধবোদয়' নামে একখানি রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যও লেখেন।

রামনিধি গুপ্ত/নিধুবাবু॥ রামনিধি গুপ্ত ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে মাতুলালয়ে চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। রামনিধি গুপ্তের পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ। কলকাতার কুমারটুলিতে তাঁদের বাসস্থান ছিলো। দশশালী বন্দোবস্তের সময় রামনিধি ছাপরা গিয়ে হিন্দুস্তানি সংগীত শিখেন। পরিণত বয়সে তিনি হিন্দিগানকে ভেঙে বাংলায় রূপ দেন। বাংলায় হিন্দিগানের এই বিশেষ রূপটিই টপ্পা নামে পরিচিত। রামনিধি 'নিধুবাবু' রূপেও পরিচিত ছিলেন।

'রসিক মনোরঞ্জন' নামে রামনিধির জীবৎকালেই একটি গীতিসঙ্কলন বেরিয়েছিলো।[২৬৭] নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত আকারের গানগুলো প্রণয়-বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত। গানের ভাব কখনো কখনো অধ্যাত্মসুরের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে ; এই সুর বিরহের দহনে মর্মান্তিক অভিব্যক্তি পায়। যেমন,-

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে।
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে॥
যে ছিল অন্তরে মোর বাহ্যে দেখি তারে।
নয়ন অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে॥

মাতৃভাষার প্রতি প্রবল প্রীতিবশে রচিত কবির সেই বিখ্যাত উক্তি,—

নানান দেশের নানা ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর।
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

পাঁচ॥ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কতিপয় অপ্রধান বৈষ্ণব মহাজন ও পদকার

মনোহর দাস॥ বৈষ্ণব সাহিত্য-সমাজে তিনজন মনোহর দাসের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন—'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' উল্লিখিত নিত্যানন্দ-অনুচর মনোহর। অন্যজন জাহ্নবীদেবীর শিষ্য মনোহর দাস আউলিয়া, তিনি চৈতন্যদাস নামেও চিহ্নিত এবং অপরজন

---

২৬৭. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৬০১

বৈষ্ণব-পদকর্তা মনোহর দাস। তিনি সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। তিনি শ্রীনিবাস সম্প্রদায়ের দলভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'অনুরাগবল্লী'। তিনি তাঁর শেষজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। মধুর ধ্বনিযুক্ত তাঁর একটি পদ,--

বরিখে রিমিঝিমি, সঘনে যামিনী,
দামিনী ঝটকাই রে।
রাগে অভিসরি, সঙ্গে সহচরি,
চলল সুন্দরী রাই রে।।
চলিতে অহিকুল, চরণে বেঢ়ল,
অঙ্ঘ্রি পিছলিত পন্থবে।
গিবত শত বেবি, উঠিয়া ধাওত
ভেটিতে গোকুলচন্দ্র রে।।

জগদানন্দ।। 'শ্রীজগদানন্দ পদাবলী' নামে জগদানন্দেব পদাবলী সংগ্রহ করেছেন কালিদাস নাথ। এতে জগদানন্দেব জীবনী-সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কালিদাস নাথ অবশ্য দুইজন জগদানন্দেব কথা বলেছেন। ডক্টব সুকুমাব সেনও জগদানন্দ নামে সপ্তদশ শতকেব মধ্যভাগে একজন এবং অষ্টাদশ শতকেব শেষভাগে একজনের কথা উল্লেখ কবেছেন।[২৬৮] বৈষ্ণব সমাজে অবশ্য একাধিক জগদানন্দেব নাম উল্লিখিত হযেছে। আলোচ্য জগদানন্দেব মৃত্যু ১৭০৪ শকাব্দ বা ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভবত এই শতকেব প্রথমার্ধে তিনি জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। কবিব পিতাব নাম নিত্যানন্দ। তাঁব নিবাস ছিলো সেনভূমেব জোফলাই নামক গ্রামে। তিনি শ্রীখণ্ডেব বঘুনন্দনেব বংশধব। জগদানন্দ পদকর্তা হিসেবেই পরিচিত। তিনি 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে একটি শব্দকোষ জাতীয় পদাবলী-পুস্তক রচনা কবেছিলেন, অবশ্য তা সম্পূর্ণ হয নি। জযদেবেব গীতগোবিন্দ এবং গোবিন্দদাস কবিবাজের প্রভাব তাঁব বচনায সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। যেমন,---

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জবগতিগঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী-ফুল মালে বঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনযনী খঞ্জনগতিহারী।।
কাঞ্চনরুচিরুচিব অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভুরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কবকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহাবী।।
নাচত যুগ ভুরু ভুজঙ্গ কালিযদমনদমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব বঙ্গে পহিবে রঙ্গিল নীল শাডী।।

চম্পতি।। 'পদকল্পতরু'তে চম্পতি ভণিতাযুক্ত ৯টি পদ পাওয়া গিয়েছে। একটির ভণিতায---'বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।' এতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কবিকে বিদ্যাপতি বলে মনে করেন। পদামৃতের সঙ্কলক বাধামোহন ঠাকুর চম্পতিকে উড়িষ্যার অধিবাসী মনে করেন।

---

২৬৮. পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপাবর্ণ, পৃ. ৩৮৪, ৪০২

চম্পতি উৎকলবাসী হলেও বিদ্যাপতি নন। বিদ্যাপতি তাঁর উপাধি হতে পারে। চম্পতি সপ্তদশ শতকের শেষপাদের পদাবলী-রচয়িতা। কবির একটি ব্রজবুলি মিশ্রিত পদের অংশ,-

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন দীঘল বইয়ে শ্বাস।
দীপ করে লই লুবধ মাধব আওল হামারি পাশ॥

রায়শেখর, কবিশেখর, চন্দ্রশেখর-শশিশেখর ॥ সপ্তদশ শতকে বিবিধ শেখর ভণিতাযুক্ত কিছু কবির আবির্ভাব ঘটে। এঁদের পদাবলীর আস্বাদন নতুনত্বের দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, গতানুগতিক ভাবপ্লাবনেই এইসব কবি তাঁদের রচনারীতির ধারা ক্ষরিত করেছেন। সেই সূত্রে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের আদর্শেই এঁরা পদ রচনার অনুশীলন করেছেন। কেউ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হতে পারেন নি।

রায়শেখর পদ রচনায় বিভিন্ন ভণিতা ব্যবহার করেছেন। যেমন -রায়শেখর, কবিশেখর রায়, শেখর, শেখর দাস ইত্যাদি। 'পদকল্পতরু'তে এইসব ভণিতায় বেশ কিছু পদ সংকলিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে শেখর ভণিতাযুক্ত কবি পদরচনায় খানিকটা খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনেকে মনে করেন রায়শেখর ও শশিশেখর চন্দ্রশেখর অভিন্ন ব্যক্তি।[২৬৯] কবিশেখর নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত এবং শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের ভাবশিষ্য। যেমন, -

শ্রীরঘুনন্দন চরণ করি সার।
কহে কবিশেখরের গতি নাহি আর॥

'পদকল্পতরু'তে সংকলিত তিনটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে চন্দ্রশেখরের ভণিতাযুক্ত পুরা নাম পাওয়া যায়। অতএব রায়শেখর ভিন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। শেখর ভণিতাযুক্ত পদসমূহ হয়তো রায়শেখরের রচনা। শেখর ভণিতাযুক্ত আরো অনেক নাম পাওয়া যায় ; যেমন,— দুখিয়া শেখর রায়, পাপীয় শেখর, নব কবিশেখর, শেখর দাস ইত্যাদি। তবে শব্দ ও রচনাভঙ্গি থেকে এইসব ভণিতা যে একই ব্যক্তির তা মনে করা হয়।[২৭০] সেই ব্যক্তি রায়শেখরও হতে পারেন। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়ের মতে রায়শেখর গোবিন্দদাসের পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র জগদ্বন্ধু ভদ্রের অভিমত রায়শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্তী কবি। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন কবিশেখর ভণিতাযুক্ত সব পদই বিদ্যাপতির এবং 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির ভণিতা। এসব মতামতের অবশ্য তেমন জোরালো যুক্তি নেই। রায়শেখরের পদে বর্ষা রজনীর ছন্দঃঝংকৃত বর্ণনা গোবিন্দদাসের পদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,

গগনে অবঘন মেহ দারুণ সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন পবন খরতর বলগই॥

তবে গোবিন্দদাসের কাব্যপ্রতিভা তাঁর ছিলো না, তাই অনুকরণের মোহ থাকলেও শিল্পের মহিমা তাঁর রচনায় তুলনামূলকভাবে কম।

---

২৬৯. সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'পদকল্পতরু', ৫ম সং, পৃ. ৩৩৬
২৭০. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও হারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য সম্পাদিত 'রায়শেখরের পদাবলী' (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫), ভূমিকা, পৃ. ঘ

প্রসঙ্গক্রমে কবিশেখরের কথা ওঠে। তিনি ভাগবত অনুসরণ করে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 'গোপাল-বিজয়' নামক কাব্য রচনা করেন। এই কবিশেখর এবং রায়শেখর-কবিশেখর স্বতন্ত্র ব্যক্তি। 'গোপাল-বিজয়ে'র কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি কবিশেখর। পদাবলীর রায়শেখর 'কবিশেখর' ভণিতা ব্যবহার করলেও কোথাও দৈবকীনন্দন উল্লেখ করেন নি। 'গোপাল-বিজয়ে'র কবির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অনেকটা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ন্যায়। কাজেই তিনি রায়শেখরের পূর্ববর্তী কোনো কবি হবেন। 'গোপাল বিজয়ে'র কবিশেখর বিস্তারিতভাবে যে নিজের বংশপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবির পিতা চতুর্ভুজ এবং মাতা হীরাবতী। কবির পরিচিতিমূলক একটি উক্তি,

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন॥

অনেকে মনে করেন চন্দ্রশেখর শশিশেখর দুই ভাই এবং তাঁদের নিবাস ছিলো বর্ধমান জেলার কাঁদড়ায়। কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন বলেন চন্দ্রশেখর শশিশেখর মূলত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।[২৭১] তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। যদি দুই ভাই হন তবে চন্দ্রশেখর শশিশেখর বেশ কিছু বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন। তাঁদের পদ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'নায়িকা রত্নমালা'য় পাওয়া যায়। চন্দ্রশেখর শশিশেখরের মান অভিমানের পদগুলো কীর্তনীয়া আসরে বেশ সাদরে গৃহীত হয়। 'নায়িকা রত্নমালা'য় চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের ৬৪টি পদ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখরের মোট ৪৫টি। 'নায়িকা রত্নমালা'র এই শেখর ভ্রাতাদ্বয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেখরের ব্রজবুলি মিশ্রিত পদ বেশ প্রশংসার দাবি করে। যেমন,

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে বাধে।
মেরু সমান করি উলটি ফেরি
বৈঠলি নাহ রব চরণ ধরি সাধে॥

ছন্দ ঝংকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শশিশেখরের পদ বেশ মাধুর্যময়। যেমন,

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা॥

চন্দ্রশেখর শশিশেখরের একজন রায়শেখর হতে পারেন বলে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন।[২৭২]

পরাণ দাস॥ পরাণ দাস অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের কবি। তাঁর অন্য নাম প্রাণবল্লভ। তিনি বনবিষ্ণুপুরের দস্যুরাজা বীর হাম্বীরের সভাপণ্ডিত ব্যাস আচার্যের বংশধর অথবা শিষ্য-বংশীয় ছিলেন। ব্রজলীলার বিষয়কে অবলম্বন করে পরাণ দাস তাঁর 'রসমাধুরী' রচনা

---

২৭১. পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪০০
২৭২. পূর্বোক্ত, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', পৃ. ১৮৭

করেন। রচনাকাল ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ। জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস ও ঘনশ্যাম দাসের পদ এতে উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণলীলার অন্তরালে চৈতন্যলীলার পদও 'রসমাধুরী'তে স্থান পেয়েছে। কবির ভাষার খানিকটা নিদর্শন,—

কাতর নয়ন বয়ন করি সুন্দরী বোলত মধুরম বাণী।
কি করি উপায় কহত প্রিয় সহচরী বেদন ছেদন জানি॥

কিছু অংশ বাদ দিবে,—

নয়নক নিন্দ গেয়ল অতি দূরে সঞে শ্রবণ শব্দ পথে লাগ।
কিযে বর মোহন কাহা সঞে আয়ল প্রাণ ঢোরায়ল মোর॥
দাস পরাণ কহত ধনি সুন্দরী কহি চিত উতরোল॥

প্রেমদাস/পুরুষোত্তম দাস (মিশ্র)॥ প্রেমদাসের আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, গুরুপ্রদত্ত নাম প্রেমদাস এবং উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। গোবিন্দরাম ও রাধাচরণ নামে তাঁর দুই বড়ো ভাই ছিলেন। কবির পিতা গঙ্গাদাস এবং পিতামহ মুকুন্দানন্দ। এই পরিবার কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলো। কথিত আছে, মনে প্রবল বৈরাগ্যবশত প্রেমদাস ষোল বছর বয়সে ঘর ছেড়ে মথুরা বৃন্দাবন চলে যান। কেউ কেউ বলেন গোবিন্দদেবের মন্দিরে তিনি পাচক নিযুক্ত হন, আবার 'পদকল্পতরু'তে উল্লিখিত হয়েছে উক্ত মন্দিরে প্রেমদাস পূজারী নিযুক্ত হন।

প্রেমদাসের প্রথম গ্রন্থ 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' কবি কর্ণপুরের সংস্কৃত রূপক নাটক 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে'র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদের তারিখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

চৌদ্দশত সাত শকে, নবদ্বীপে নবলোকে,
গৌরহরি আবির্ভাব হৈল।
চৌদ্দশত চোরনই, শক যবে গ্রন্থ এই,
মোর মুখে পকট হৈল॥
কর্ণপুর ইহা বলি, শ্রীচৈতন্য নমস্কারী,
নাটক করিল সমাপন।
ষোলশত চৌত্রিশ শকে, লৌকিক ভাষাতে সুখে,
প্রেমদাস করিল লিখন॥

এ থেকে বোঝা যায় ১৬৩৪ শক বা ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে প্রেমদাস ১৪৯৪ শক বা ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে রচিত কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে'র বঙ্গানুবাদ করেন। প্রেমদাসের অন্য আর একটি কাব্য হচ্ছে, 'বংশীশিক্ষা'। এছাড়া কিছু বৈষ্ণবনিবন্ধ, 'গৌরাঙ্গকড়চা', 'নিত্যানন্দকড়চা', 'ভক্তিরসকৌমুদী', 'রসোল্লাসতত্ত্ব' ও 'রঘুনাথদাসের পদাবলী'। 'বংশীশিক্ষা' ১৭১৬ ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। এতে মোট চার উল্লাস বা পরিচ্ছেদ আছে। তিনটি উল্লাসে বর্ণিত বিষয় শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বংশীবদনকে তত্ত্বকথা শিক্ষা। শেষ উল্লাসে বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ। প্রেমদাসের ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল। 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো। অংশটি চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে শচীমাতার বিলাপ প্রসঙ্গ,—

মোর কোল শূন্য করি, কোথা গেল গৌরহরি,
আর নাহি পাব দরশন।
তপ্ত মোর বক্ষস্থল, কে করিবে সুশীতল,
কার মুখে করিব চুম্বন॥
বড় অভাগিনী আমি, যদি না জানিতুঁ তুমি,
ছাড়ি যাবে অনাথ করিয়া।
বুক ভরি কোলে নিতুঁ, চাঁদমুখে চুম্ব দিতুঁ,
নিরাখতুঁ নয়ন ভরিয়া॥

তাঁর পদাবলীর নিদর্শন,-

বয়সে নবীন, গলিত কাঞ্চন,
জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বোলায়ে সঘন,
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কখন হাসন, কখন রোদন,
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা, শিমূলের কাঁটা,
ঐছন সোনার গায়॥

দীনবন্ধু॥ দীনবন্ধু অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের কবি। তিনি শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছিলেন একজন পদকর্তা। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি 'সংকীর্তন পদাবলী' নামে পদাবলীর সংকলন। প্রায় চল্লিশজন পদকর্তার চারশ একানব্বইটি পদ এতে সংকলিত হয়েছে।

নটবর দাস ॥ তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের লোক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্যান্য পরিচয় জানা যায় নি। পদকর্তা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'রসকলিকা' নামে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য পদসংকলন আছে। সংকলনে তাঁর নিজের পদ ও অন্যান্য কয়েকজনের পদ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর পদাবলীর নিদর্শন,

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আস্যে যায়।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন কদমতলা পানে চায়॥
রাধে এমন কেন বা হল্যো।
গুরু দুরু জন ভয় না মানহ কোথা বা কি দেব পাল্যো॥
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি ভূষণ খসাঞা পর॥
বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী তাতে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলায বাড়ায়ে লালস না বুঝি তোমার ছলা॥
তোমার চরিতে হেন বাস চিতে হাথ বাড়াইলে ছান্দে।
এ নটবর দাসের অনুভব ঠেকিলে কালার ফান্দে॥

ছয়।। সপ্তদশ শতকের উল্লেখযোগ্য মহাভারতকার

কাশীরাম দাস।। ইন্দ্রাণী পরগণার সিদ্ধি বা সিঙ্গি গ্রামের অধিবাসী কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি। তাঁর বড়ো ভাই কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্য লেখেন, ছোট ভাই গদাধর লেখেন 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্য, কাশীরাম এবং তাঁর পুত্র দ্বৈপায়ন দাস লেখেন 'মহাভারত'। কাশীদাসী মহাভারতের রচনা-কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে--'চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু' অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দ বা ১৬০৪/১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ।

কাশীদাসী মহাভারত।। বেদব্যাসের সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বনে কাশীদাসী মহাভারত রচিত। কাশীরাম মূল মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের কিছু অংশ লেখেন। তবে তাঁর অনুবাদ আক্ষরিক নয়, কিন্তু রচনা সরল, সহজ ও সুখপাঠ্য। পরবর্তীকালে কাশীদাসী মহাভারতের নানা সংস্করণ হয়েছে, মূলঅংশ তাতে প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ১৮৩৬ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার এবং পরে মধুসূদন শীল, গৌরীশঙ্কর প্রমুখ পণ্ডিত কাশীদাসীর সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এতসব সংস্করণ সত্ত্বেও বাংলা মহাভারতগুলোর মধ্যে কাশীদাসী মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। সঙ্গতকারণেই বলা হয়,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

কেননা কাশীরামের রচনায় বিশুদ্ধতা, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্যের অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। সুললিত মধুর ছন্দের লীলাময় ভঙ্গিটিও অপূর্ব। যেমন,-

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।।
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত।।
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত।

ললিত মধুর ছন্দের নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গিতে কাহিনীকে সহজ, সরল ও অকপটে প্রকাশ করে জনমনে বোধগম্যতা আনতে কাশীদাসের জুড়ি ছিলো না। ঘটনাবিন্যাসে কোথাও কোথাও তিনি যে নাটকীয় কলাকৌশল সৃষ্টি করেছেন তাও তাঁর প্রশংসনীয় শিল্পভাবনার পরিচায়ক। যেমন -'অর্জুনের লক্ষ্যভেদ' অংশে,--

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি।।

হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥

কাশীদাসের কাব্যে এই ছান্দসিকতা ও অলঙ্কারপ্রয়োগ-কুশলতার বাইরে আছে ক্ষাত্র জীবনাদর্শের ঐশ্বর্যময় দিকের বর্ণনা ও জীবনলীলার নানামুখি প্রকাশের মধ্য দিয়া বাঙালির মনে আদর্শবাদ ও নীতিবোধ জাগানোর প্রয়াস। তবে, যেহেতু মহাভারতে যুদ্ধকোলাহলের দাপট বেশি, সেজন্য, কবির সেই আদর্শবাদে বাঙালির ভাববাদ কিংবা তার স্পর্শকাতরতা প্রশ্রয় পায় নি ; এবং তা পায় নি বলেই তাঁর যুদ্ধবর্ণনায় রণক্ষেত্রের কোলাহল-মুখরতার শাব্দিক অনুরণন বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

কাশীরাম তাঁর রচনায় ধর্মশাসিত জীবনব্যবস্থাকে মুক্তি দিয়েছেন বৃহত্তর জীবনবেদের উন্মুক্ত প্রান্তরে। সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠকের মনে এরূপ একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে মহাভারতের কাহিনী শুনতে তুর্ক রাজশক্তির এত আগ্রহের কারণ কি? কারণটি হচ্ছে একাব্যে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ঐতিহাসিক ঘটনার চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। ষোড়শ শতকের সঞ্জয়-কবীন্দ্র থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকের কাশীরাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে মহাভারত কাহিনী তাই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মনন মানসে বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করে।

কাশীদাসী মহাভারতে ভক্তিভাবেরও অকপট প্রকাশ আছে, সেই সঙ্গে আছে করুণরসের নিষিক্ততা ; তবে ভক্তিরস ও করুণরসের প্রাবল্য থাকলেও বাস্তবতার সম্পর্কটি মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নি। মানবমনের উচ্চ নিচ বৃত্তিগুলো, তার হিংসা-দ্বেষ-কলহ-অধিকারস্পৃহা ও ন্যায় অন্যায় বোধের বিকাশ এখানে এমন সঙ্গতিপূর্ণভাবে সাধিত হয়েছে যে পুরাণের নানা অলৌকিকতার মধ্যেও বস্তুরসের স্বাভাবিক প্রবাহ তাতে তার অধিকার-বহালতা হারায় নি। চরিত্র হিসেবে দ্রৌপদী সময় সময় রোদনশীলা বটে, কিন্তু তার তেজস্বিতা সে সম্পূর্ণত বজায় রেখেছে। সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তী, গান্ধারী সবাই বহুরূপী বৈচিত্র্যের অধিকারী, কখনো কখনো ব্যক্তিত্বে প্রখরা। ধৃতরাষ্ট্রও উন্নত ভাবাদর্শে পরিকল্পিত। কাশীদাস অবশ্য মূল মহাভারতের আশ্রয়ে বাংলা কাব্যে তাঁর স্বভাবগত স্বতঃস্ফূর্ততা যথারীতি রক্ষা করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য তাঁর নিজস্বতাগুণে উজ্জ্বল।

চন্দনদাস দত্ত॥ কবি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। তাহলে তিনি কাশীরাম দাসের সমসাময়িক। চন্দনদাসের পরিচিতিজ্ঞাপক পদ থেকে জানা যায় যে তিনি আকুরোল নামক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই আকুরোল কোন্ পরগণা বা কোন্ জেলায় অবস্থিত তা পরিষ্কার নয়। চন্দনের পিতামহ নারায়ণ দত্ত এবং পিতা পুরুষোত্তম দত্ত। পরিচয়জ্ঞাপক অংশটি হচ্ছে,—

আগরিকূলেতে জন্ম নিবেদন করি।
পিতামহ নারায়ণ দত্ত কহি হে গোচরি॥
পিতা পুরুষোত্তম দত্ত করি নিবেদন।
আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সর্বজন॥

চন্দনদাস জৈমিনি ভারতকে অনুসরণ করে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে অশ্বমেধ-পর্বের অনুবাদ করে মহাভারত রচনা শেষ করেন।

অনন্ত মিশ্র॥ কবি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণানন্দ বসু এবং মাতা সন্ধ্যা। জৈমিনি ভারতকে আদর্শ করে কবি মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন।

নন্দরাম দাস॥ নন্দরাম দাস সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি। দামোদরের একটি পদে উল্লিখিত হয়েছে যে নন্দরাম ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মহাভারতকার কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবেও উল্লিখিত হয়েছেন। বলা হয় কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের কিছু অংশ লিখে স্বর্গে যান, তখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লিখে শেষ করেন। তিনি মহাভারতের দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য

দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় অংশ (খ্রিস্টীয় ১৮ শতক)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান

অষ্টাদশ শতকের মুসলিম সাহিত্যের পটভূমি॥ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের ইতিহাসে সপ্তদশ শতক নিঃসন্দেহে এক বিরল সাহিত্যযুগ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এই যুগের সাহিত্যধারায় যে উর্মিমুখর প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়, অষ্টাদশ শতকে এসে তা অনেকটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। আলাওল- দৌলত কাজীর মতো কবির আবির্ভাব তখন আর ঘটে নি ; রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর মতো জমকালো সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যে কবি-প্রতিভার দরকার, তার আবির্ভাবও সম্ভব হয় নি। এবং সেই ধারার সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যে পরিবেশ প্রয়োজন, নানাকারণে তার অভাবও তখন দেখা দেয়। ইংরেজ কর্তৃক ভারতে আধিপত্য বিস্তারের অশুভক্ষণে যুদ্ধের যে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়, তার প্রতিক্রিয়ায় তখন সাহিত্য কিংবা সাহিত্যের প্রতিভার হয়তো আতুড় ঘরেই শেষ হয়ে যাওয়ার অবস্থা ঘটে। ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের সূচনা হয় তখন বাংলায় ; বিশেষ করে কলকাতা থেকেই তার প্রাদুর্ভাব। এই রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়। তথাপি মুসলিম সাহিত্যের ধারাটি তখন নদীর শুষ্ক তটরেখা স্পর্শ করলেও তার ঐতিহ্যের পদচিহ্ন সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। সেই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে এমন একটি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ তখন গড়ে ওঠে, যে-সমাজে মুসলিম সাহিত্যের ধারাটি দোভাষী রীতির সাহিত্যের ধারায় রূপায়িত হওয়ার অবকাশ পায়। আবার অন্যদিকে বিকৃত নাগরিক রুচির গীত ও কবিগানেরও উদ্ভব ঘটে।

একথা ঠিক যে তখনকার মুসলিম বাংলা সাহিত্যে দোভাষী পুথিই তার বহুবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয় সাহিত্যের ধারাটিকে প্রবহমান রাখে। এই ধারায় তখন যেসব মুসলিম কবি স্ফূর্তি আনয়ন করতে অপারগ হন, তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী কবিগণের ইসলামি তত্ত্ব ও রোমান্টিক ধারার কাব্যের অনুসরণে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পান বটে, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।

দুই॥ অষ্টাদশ শতকের মুসলিম পুথিকার

হেয়াত মাহমুদ॥ হেয়াত মাহমুদ মুঘল আমলের শেষদিকের ও ভারতে বৃটিশ-প্রভুত্বের কিছুকাল আগের কবি। তিনি চারখানা পুথি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে 'জঙ্গনামা' তাঁর প্রথম কাব্য। অন্য তিনটি কাব্য হচ্ছে 'চিত্ত-উত্থান' বা 'সর্বভেদবাণী' এবং 'হিতজ্ঞানবাণী' ও 'আম্বিয়াবাণী'। হেয়াত মাহমুদের 'জঙ্গনামা'য় কাব্যের কালজ্ঞাপক একটি উক্তি পাওয়া যায়। যেমন,—'শকাব্দ পরগণাতি, যাহে বিরচিনু পুথি, সন এগারশ তিরিশ সালে। হেয়াত মামুদ বলে, মুহম্মদের পদতলে, মোকে দয়া কর সর্বকালে॥' ডক্টর মুহম্মদ

শহীদুল্লাহ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'সন এগার শ তিরিশ সাল'কে বঙ্গাব্দ রূপেই বিবেচনা করেছেন।[২৭৩] ডক্টর আহমদ শরীফ 'পরগণাতি ১১৩০ সালে'র ব্যাপারটি রহস্যাবৃত মনে করলেও তাঁর বিবেচনায় কবি হেয়াত মাহমুদের কাব্যগুলো ১৭২০-৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই রচিত হয়ে থাকবে।[২৭৪] পরগণাতি রীতিতে হেয়াত মাহমুদ 'সর্বভেদবাণী' ও 'হিতজ্ঞানবাণী' পুথি দুটির কালও নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। যেমন, 'সর্বভেদবাণী' সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য,- 'সর্বভেদ নামে পুথি, শ্রম করি দিবারাতি, বিরচিনু ছাড়িয়া আলিস। কহি সে সালের কথা, যাতে বিরচিনু পোথা, সন এগার শও উনচল্লিশ॥' অর্থাৎ ১১৩৯ বা ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে পুথিখানি রচিত হয়ে থাকবে। 'হিতজ্ঞানবাণী' কাব্যে কবির উক্তি,—'বৃদ্ধ যোগে ভাবি অতি, বিরচিনু এই পুথি, সন এগার শও ষাট সালে। পড়িয়া শুনিয়া সবে, আশীর্বাদ করে যবে। মোর গতি হয় অনন্তকালে॥' অর্থাৎ 'হিতজ্ঞানবাণী'র রচনাকাল ১১৬০ বা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ। 'আম্বিয়া বাণী' সম্পর্কে কবি বলেছেন,--'সন এগার শও পয়ষট্টি বৎসর। রচিনু আম্বিয়া বাণী এত সনান্তর॥' অর্থাৎ ১১৬৫ বা ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ। ডক্টর মযহারুল ইসলাম তাঁর গবেষণায় বলেন, 'কবি হেয়াত মামুদ সম্ভবতঃ ১৬৮০ হইতে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।'[২৭৫]এই সব উক্তি থেকে মনে হয় হেয়াত মাহমুদ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ পর্যায়ের কিংবা দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকের কবি। এই সময়কাল দোভাষী পুথিকার গরীবুল্লাহর জীবনকালের কিঞ্চিদধিক আগে-পরের।

কবি হেয়াত মাহমুদ তাঁর 'জঙ্গনামা' কাব্যে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় তিনি রংপুরের 'ঝাড়-বিশিলা' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ঝাড়-বিশিলা ঘোড়াঘাট সরকারের অধীন সুলুঙ্গার বাগদান পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

হেয়াত মাহমুদ প্রধানত যে কারণে খ্যাতির অধিকারী, সে হচ্ছে তাঁর 'জঙ্গনামা' কাব্যের জনপ্রিয়তা। দৌলত উজির বাহরাম খানের অপ্রকাশিত কাব্য 'ইমাম বিজয়' ও মোহাম্মদ খানের 'মক্তুল হুসেন' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আদি জঙ্গনামা। তারই জের চলে খন্দকার নসরুল্লাহ খান ও হেয়াত মাহমুদের জঙ্গনামা এবং পরে গরীবুল্লাহর জঙ্গনামা পর্যন্ত। জঙ্গনামা কাব্যে যুদ্ধের ডামাডোল বেশি, সেই সঙ্গে বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ঘটা। আসলে আদি ইমামদের ইরান বিজয় ও আত্মকলহের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে জঙ্গনামা কাব্য।

কারবালার বিষাদময় কাহিনীটি মুসলিম সমাজে কারুণ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করে বিধায় মুসলমানগণ এই কাব্যের কাহিনীর বিষয়গত তাৎপর্যকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। জিবরাইল একদা হজরতকে জানান তাঁর প্রিয় দৌহিত্র হাসান-হুসেন রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে শাহাদাৎ বরণ করবেন। এই সূত্র ধরেই বিষপ্রয়োগে হাসান-হত্যার পরিকল্পনা, কারবালার শুষ্ক মরুপ্রান্তরে তৃষ্ণাকাতর হুসেনের নির্মম হত্যাকাণ্ড, হুসেন-তনয় কাসেম-হত্যা ও কাসেম-বধূ সখিনার অকাল বৈধব্যের ঘটনা,--এসব কাহিনীই হেয়াত মাহমুদের

২৭৩ পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯১; পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২২৬
২৭৪ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯
২৭৫ মযহারুল ইসলাম, 'হেয়াত মামুদ' (ঢাকা : ১ম সং ১৯৬১), [কবি-জীবনী], পৃ.২

কাব্যের উপজীব্য বিষয়। যে হৃদয়বিদারক ঘটনা সারা মুসলিম জাহানকে শোকে মুহ্যমান করে, হেয়াত মাহমুদের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনায় তা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে।

হেয়াত মাহমুদ জঙ্গনামা রচনায় মূল ফারসিকে আদর্শ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর উক্তি,—

শোন ভাই সর্বজন মিনতি আমার।
সকলের তরে মুই কর পরিহার॥
পড়িনু শুনিনু ভাই আরবী ফারসী।
এমামের কথা শুনি দুঃখ মনে বাসী॥

কবি বিষ্ণুশর্মা রচিত সংস্কৃত হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রের ফারসি অনুবাদকে আদর্শ করে হেয়াত মাহমুদ তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'চিত্ত-উত্থান' বা 'সর্বভেদবাণী'র বিষয় পরিকল্পনা করেন। সংস্কৃত হিতোপদেশের কথা কবির ভালো করেই জানা ছিলো। সেই অপূর্ব কথামালাকে তিনি বঙ্গভাষায় রূপায়ণ করতে গিয়ে বলেছেন,—

বিষ্ণুরাম বিরচিত, ছিল পুথি নাগরিত, হিত উপদেশ নাম যার।
চারিখণ্ড সেই পুথি, বিরচিল দ্বিজপতি, প্রতি খণ্ডে নানা জ্ঞান তার॥
একখণ্ডে কত খণ্ড, এই মতে প্রতি খণ্ড, কথা মধ্যে কথার পত্তন।
শতফুল মালা যেন, হারগাছি গাঁথি তেন, সেহি মতে কইল শোভন॥

সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের সেই অমৃতধারা তাঁকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে, যার ফসল তাঁর 'চিত্ত উত্থান' বা 'সর্বভেদবাণী' কাব্য। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,—

তেন সে পুস্তকের বাণী, মস্তফা খেয়ান শুনি, ফারসী করিতে আদেশিল।
তাহার আদেশ ক্রমে, তাজুল মুলুক নামে, ফারসীতে কেতাব রচিল।
রাখিল কেতাবের নাম, অতি বড় অনুপাম, মফরেগুল কুলুব যে নামে।
আমি সে কেতাব দেখি, বাঙ্গালাতে সাইর লিখি, পুস্তক রচিনু বহু শ্রমে॥

কবির এই বইটি নীতিকথামূলক। নীতিকথার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপদেশ। সব মিলে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপদেশের সমন্বয়।

ইসলামের তত্ত্বকথা ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে 'হিতজ্ঞানবাণী' কাব্যে। ওজু, গোসল, নমাজ, রোজা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। মুসলমানদের জীবনের এই পবিত্র বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে 'হিতজ্ঞানবাণী'তে বিবৃত হয়েছে। এছাড়া হিতকথা প্রচারের উদ্দেশ্যে এতে আছে ওয়াজ নসিহতের বয়ান, ফরজ নমাজের বয়ান আর আছে কেয়ামতের সময়কালীন ধ্বংসপর্বের কথা। হজরতের প্রতি অশেষ ভক্তিপ্রকাশে কবি সুফীভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন,—

আহাদ হইতে আল্লা কৈল আহমদ।
মিমাধিক্যে পূর্ণ সেই কৈল মহম্মদ॥
আহাদ আহমদ দুই এক করি জ্ঞান।
মিমে মহম্মদ শেষে কৈল উৎপাদন॥

হেয়াত মাহমুদ 'হিতজ্ঞানবাণী'তে কোথাও কোথাও হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন। তাত্ত্বিক উপস্থাপনার দিক থেকে এরূপ হেঁয়ালির প্রয়োগ যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে। তাছাড়া হেয়াত মাহমুদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলা ভাষার চলতি রীতির প্রবহমানতাকে ধরে রেখেছেন। যেমন,—

এক সারি নয়, এক তার বাঞ্ছা।
সাত বৃক্ষে সাত ফুল আছে পাঞ্জা পাঞ্জা॥
একযোগে সব ফুল এক সারি ফুটে।
সে যদি ফুটিল তবে আর সব টুটে॥
সাত ফুল লয়া তাব সংসারে আনন্দ।
হেযাৎ মামুদ কহে ছিঞালির ছন্দ॥

ভাষার এই আধুনিক রূপ দেখে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য করেছেন,—'স্পষ্ট বোধ হইবে এ ভাষা পুথির ভাষা নয়।'

অষ্টাদশ শতকের পুথিসাহিত্যেব যে ভাষাবৈশিষ্ট্য, তাতে আববি-ফারসি-উর্দুর বেপরোয়া ব্যবহার অর্থাৎ 'তেবে', 'মেরে', 'মুঝে', 'তুঝে' ইত্যাদি শব্দেব প্রয়োগ এত বেশি যে তাতে পাঠকের রসানুভূতিতে হয়তো কিছু বিরক্তি উৎপাদন হয়। হেয়াত মাহমুদ অষ্টাদশ শতকের কবি, কিন্তু তাঁব ভাষায় এই মিশ্রণদোষ নেই। এই ভাষাবৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে কবি খাঁটি বাংলা ভাষা-প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন।

হেয়াত মাহমুদের 'আম্বিয়াবাণী' নবীপরম্পরার কাহিনী। এতে হজরত আদম, হজরত সিস, হজরত ইদ্রিস, হজরত নূহ, হজরত হুদ, হজরত সালেহ, হজরত ইব্রাহীম এবং হজরত মুহম্মদ মুস্তফার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তবে পুথির অর্ধেকেব বেশি শেষনবীর জীবনবৃত্তান্ত, বাকী অর্ধেক অন্য নবীদের জীবনকাহিনী।

'আম্বিয়াবাণী'তে হেযাত মাহমুদ যে পীরবন্দনা কবেছেন তা, ডক্টর সুকুমার সেনেব মতে 'যতদূর সম্ভব মঙ্গলকাব্যেব ছাঁদে-গড়া।'[২৭৬] তাছাড়া তাঁর গুরুবন্দনায় বৈচিত্র্য আছে। যেমন,—'একে একে গুবু বন্দো চবণ আরাধি। পাটগুবু হাটগুবু বাটগুবু আদি॥'

ধর্মীয় বিষয়- ভাবনা সত্ত্বেও হেয়াত মাহমুদেব কাব্যে তাত্ত্বিক বাড়াবাড়ি নেই। বরং বলা যায় কাব্যের সর্বত্র সুষমা ও সৌবভ মৃদুমন্দে বহমান। নিরঞ্জনেব বর্ণনার একটি অংশ, -

নাহি রূপ অঙ্গ অপূর্ব অভঙ্গ যেমন পুষ্পের গন্ধ।
কহে বিনা মুখে চক্ষে নাহি দেখে যত কবে ভালমন্দ॥
কে দেখে তাহাকে কৃপা করে যাকে আছে হয়া সর্বময়।
মহম্মদ হেযাৎ কহে শুন বাত সে বনে সকলি নয়॥

এই বর্ণনায় মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুসৃত হয়েছে ; তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈষ্ণব-পদাবলীর ঢং। হেয়াতের আম্বিযাবাণীর পীরবন্দনায় আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে কবি এতে এক পীরে সীমাবদ্ধ না থেকে বহুপীবেব বন্দনা কবেছেন ; এটিও মঙ্গলকাব্যের দিগ্‌বন্দনার অনুরূপ। যেমন,—

২৭৬ পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৫০৮

পূর্বেতে বন্দিব পীর আবদুল গফফার।
পশ্চিমে বন্দিব পীর আবদুল সাত্তার॥
উত্তরে বন্দিব পীর আবদুল করিম।
দক্ষিণে বন্দিব পীর আবদুল রহিম॥

আসলে মুগল আমলের শেষ কবি হেয়াত মাহমুদের মধ্যে শিল্পীসুলভ চমৎকার বৈশিষ্ট্য ছিলো।

তিন॥ দোভাষী পুথির ইতিবৃত্ত

ভাষাগত দিক থেকে দোভাষী পুথি আসলে মিশ্র ভাষারীতির পুথি[২৭৭]; কিন্তু কিছু পণ্ডিত একে দোভাষী রীতির সাহিত্যের ধারারূপেই অভিহিত করেন। তবে একথাও ঠিক যে বাংলার সঙ্গে একাধিক ভাষার সংমিশ্রণেই এর সৃষ্টি। শায়েরগণ এ ধারার পুথি রচনায় অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত আরবি উর্দু-হিন্দি তুর্কি ভাষার শব্দাবলী। কাজেই বিচিত্র স্বাদের এই সৃষ্টি তখন আর দোভাষী হয়ে থাকে নি। কিন্তু দোভাষী না হয়ে থাকলেও একে মিশ্ররীতির সাহিত্যধারার পরিবর্তে 'দোভাষী' রীতির সাহিত্য বলার পেছনে একটি যুক্তি কাজ করেছে। ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে ফারসির মিলনে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু; এবং উর্দুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে হিন্দি। ফারসির নির্যাস নিয়ে গড়ে ওঠা উর্দু ও হিন্দি অভিন্ন সূত্রে 'হিন্দুস্তানি' নামে বিদিত। এই 'হিন্দুস্তানি' ভারতে মুসলিম রাজত্বকালে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' নামে চালু ছিলো। বাংলার সঙ্গে এই হিন্দুস্তানি ভাষার মিলনে রচিত হওয়ায় এই ধারার সাহিত্য-প্রয়াসকে তাই অনেক পণ্ডিত মিশ্ররীতির সাহিত্য না বলে দোভাষী রীতির পুথি বলেন।[২৭৮]

দোভাষী পুথির উদ্ভব এমন এক সময়ে যখন ভারতে মুসলিম আমল শেষ হতে চলেছে, অন্যদিকে ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয় ঘটছে; এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হচ্ছে। তবে দোভাষী পুথি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ আসার আগেই সৃষ্টি হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন- 'দোভাষী বাংলা বা মুসলমানী বাংলা ইংরেজ আমলের সৃষ্টি';[২৭৯] কথাটি ঠিক নয় এই কারণে যে আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে অর্থাৎ ভারতে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার ৩৭ বছর আগেই দোভাষী পুথির সৃষ্টি হয়েছিলো। এই ধারার পুথির প্রথম রচয়িতা ফকির গরীবুল্লাহ তাঁর 'সোনাভান' কাব্য রচনা করেন ১১২৭ সালে বা ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে। এবং ভারতে ইংরেজ রাজত্বের শুরু ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর। সুতরাং বলা যায় মুঘল যুগের শেষ ও ইংরেজ আমলের শুরু— এই দুই কালের মিলনস্থলে দোভাষী পুথির জন্ম।

---

২৭৭ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সং. ১৯৬৪), পৃ. ১১৬-১১৭

২৭৮ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭৫-৮৭৬

২৭৯ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৭৪

উর্দুর চমৎকার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অভিনব বাংলা ভাষা ও কাব্যের নির্দশন এই দোভাষী পুথির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। তুর্কীদের আগমনের পর থেকেই মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশে ফারসি দরবারি ভাষার মর্যাদা পায়। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এদেশে মুঘল রাজত্বের শুরু। তখন মুঘলদের আধিপত্যের কারণে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবির প্রাধান্য সূচিত হয়। সেই সূত্রে রাজকার্যে এবং ব্যবহারিক জীবনে ফারসি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। প্রাত্যহিক জীবনের নানা কাজেও ফারসির আধিপত্য সূচিত হয়। তৎকালীন অনেক কবিকেও তা প্রভাবিত করে। যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যেও আমরা কতিপয় ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি।

বঙ্গদেশে মানুষের মুখের ভাষায় উর্দুর প্রভাব শুরু হয় মুগল রাজত্বের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে। তখন মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মসূত্রে ও বাণিজ্যিক কারণে বহু হিন্দুস্থানী ও উর্দু ভাষাভাষীর লোক তৎকালীন বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া- হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আগমন করে। ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে জীবনের নানাক্ষেত্রে বিবিধ আদান-প্রদানের ফলে বাংলা ভাষায় হিন্দুস্থানি ও উর্দুর প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে। এই প্রভাব বাংলা ভাষাভাষীদের মুখের বুলি থেকে ক্রমে তাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে। হিন্দি উর্দুর এই সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করে পাদ্রী লং সাহেব মন্তব্য করেন -'এই ভাষা নগরের অধিবাসী ও মাঝি মাল্লাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।'[২৮০]

দোভাষী রীতির পরিচর্যা কলকাতা, হাওড়া ও হুগলীর বন্দর এলাকায় প্রথমে শুরু হয়। পরে সমগ্র বঙ্গদেশে অল্পবিস্তর তা ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় ঢাকা শহরে তার ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। ঢাকার বংশাল এলাকায় এখনো এই মিশ্র ভাষার ব্যবহার এখানকার কুট্টিদের মধ্যে দেখা যায়।

দোভাষী পুথির যে বিষয় ভাবনা তাতে ইসলাম ধর্মের নানা অনুষঙ্গ অনিবার্য কারণেই এসেছে। ফলে এই ধারার কাব্যে আরবি ফারসি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গতকারণেই তাকে 'মুসলমানি বাংলা' বলে অভিহিত করা হয়।

তবে দোভাষী পুথিতে শায়েরগণ প্রায়শই বিস্মৃত হয়েছেন যে পুথিগুলো মূলত বাংলা ভাষার সৃষ্টি। তাঁদের বিস্মৃতির কারণটি এভাবে সত্যায়ন করা যায়, দোভাষী পুথিতে সহজবোধ্য বাংলা শব্দ-প্রয়োগের চেয়ে দুর্বোধ্য আরবি ফারসি শব্দ-প্রয়োগের প্রতি শায়েরগণ বেশি প্রবণতা দেখিয়েছেন। ফলে এ জাতীয় পুথিকে বাংলা বলতে দ্বিধা আসাই স্বাভাবিক। অবশ্য তার মূলে যে কারণ বিদ্যমান, তা হচ্ছে দোভাষী পুথির অধিকাংশই ফারসি কিংবা উর্দু থেকে সরাসরি অনুবাদ। এরূপ অনুবাদে অনুবাদযোগ্য প্রতিশব্দ সৃষ্টি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারে পুথিকারগণ তেমন দক্ষতাও দেখাতে পারেন নি। অবশ্য দোভাষী পুথিতে প্রচলিত

---

২৮০ জেমস লং, 'A Descriptive Catalogue of Bengali Works, (Calcutta, 1855) : দ্রষ্টব্য গোলাম সাকলায়েন রচিত 'ফকির গরীবুল্লাহ' 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ,কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৮), পৃ. ১২

আরবি-ফারসি ও উর্দু-হিন্দি ভাষার শব্দ ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সমকালীন মুসলিম-সমাজের মোটামুটি পরিচয় ছিলো। মুসলিম শায়েরদের রচিত পুথি-পাঠ করে সেই সমাজ তার ধর্মীয় চিন্তা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আরো ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই দিক থেকে যদিও দোভাষী পুথির ঐতিহ্যিক অবদান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু একথাও মানতে হবে যে প্রচলিত উর্দু-হিন্দির সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় বাংলা ভাষা তার স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে এসব পুথিতে এমন এক জগাখিচুড়ি ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে যে এই মিশ্র ভাষাকে উর্দু, না বাংলা, কোন্‌টা বলা সমীচীন সে সম্পর্কে দ্বিধা আসে। তাছাড়া এগুলোর শিল্পমূল্যও উচুঁমানের নয়।

তবে মুসলিম-সমাজে দোভাষী পুথির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একরূপ অনুমান করা যায় যে এই ধারার পুথিতে ব্যবহৃত তেরা, মেরা, তুঝে, মুঝে, যেয়ছা, তেয়ছা এসব শব্দ বাংলা ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করেও মুসলিম ঐতিহ্য ও তার চালচলনকে ফুটিয়ে তুলতে যে ভূমিকা পালন করেছে তাতেই সম্ভবত এগুলো অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মুসলমানদের কাছে এত প্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রামবাংলায় আজো এসব পুথি বিপুল উৎসাহে পাঠ করা হয়। এই অভিনব স্বাদের পুথিগুলোকে তাই মুসলিম সাহিত্যের ধারায় সাদরেই গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কারণে এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

বিষয়ভেদে দোভাষী পুথি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান-মূলক পুথিগুলো হচ্ছে ইউসুফ জোলেখা, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল, মধুমালতী, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রভানু, মৃগাবতী-যামিনীভান, লায়লী মজনু, গোলে বকাউলী, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই, গহরবাদশা বা নেছাসুন্দরী ইত্যাদি। এসব পুথিতে রোমান্টিক প্রেমভাবনার প্রকাশকল্পে কবিগণ বাস্তবতার সম্পর্ক প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। কবির কল্পনা যেন বল্‌গাহীন ঘোড়ার মতোই ছুটে চলে, তাতে বিশ্বাসের অবস্থান খুব বিপন্ন হয়। তবে মানুষ কল্পনার জগতে বিহার করতে কখনো কখনো বেশি আনন্দ পায়, দোভাষী পুথির কবিরা মানবপ্রবৃত্তির সেই সুযোগ গ্রহণ করে নানারকম আজগুবি কাহিনী রচনা করেছেন এবং সেসব কাহিনীতে যে গল্পরসের যোগান দিয়েছেন তাতে এদেশের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতরা বিপুলভাবে উল্লসিত হয়েছে। এমন কি অদ্যাবধি গ্রামবাংলার মাঠে-ঘাটে এ জাতীয় কাহিনীর জমজমাট আসর বসতে দেখা যায়।

দোভাষী পুথিতে যুদ্ধবিষয়ক যেসব পুথি রয়েছে সেগুলো হলো আমির-হামজা, সোনাভান, জৈগুনের পুথি, জঙ্গনামা বা শহীদে কারবালা, মক্তুল হুসেন, হানিফার লড়াই, কাসাসুল-আম্বিয়া ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসব পুথিও কবিকল্পনার আড়ম্বর ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত নয়। সাম্প্রদায়িক মনোভাব সঞ্জাত এসব পুথিতে হজরত আলী ও তৎপুত্র হানিফা কিংবা আমির হামজার বীরত্বকে পুঁজি করে এই বীরবৃন্দকে নায়করূপে ও তাদের বরাবরে অমুসলিম কিছু নারীকে নায়িকারূপে দাঁড় করিয়ে ইসলামধর্ম প্রচারের যে ঘটা, অন্যদিকে কাফের-দলনের যে আড়ম্বর দেখানো হয়েছে, তাতে শায়েরদের জেহাদী মনোভাবের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে পুথিরসিক অনেক বাঙালি মুসলমানই যে শায়ের কবিদের মতো 'এক হাতে পবিত্র কোরান ও অন্য হাতে তরবারী' ধারণ করে কাফেরদের ইসলামে দীক্ষিত করার কাজে লাফিয়ে পড়বে, এমন মনে করা যায়। শায়ের কবিদের এই

বিশেষ প্রবণতার সঙ্গে একটা দুঃখজনক বিষয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় ডক্টর আহমদ শরীফ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—'এসব কাব্যে স্বধর্মের ও স্বজাতির অতীত গৌরব স্মরণে উল্লাসবোধের আভাস আছে অবশ্য, কিন্তু সে উল্লাস হয়েছে আত্মপ্রত্যয়হীন নিঃস্ব দুর্বলের আত্মীয় গৌরবে আত্মপ্রসাদ লাভের বাঞ্ছাজাত এবং এতে রয়েছে বর্তমান আর্তনাদকে অতীত আস্ফালনে ঢাকা দেয়ার প্রয়াস—দুর্দিনে আত্মপ্রবোধ ও স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা।'[২৮১]

একথা ঠিক যে শায়েরগণ তাঁদের অতিপল্লবিত কল্পনায় ইসলামকে যথেষ্ট অবাস্তবভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন; ইসলামের মাহাত্ম্যও তাতে প্রকাশ পায় নি। তবে শায়েরদের উদ্ভবকাল এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন দেশে বিধর্মীদের আবির্ভাব শুরু হয়েছে। সঙ্গতকারণেই ইসলাম বিপন্ন হতে পারে মনে করে মুসলিম শায়েরগণ তাঁদের রচনায় ইসলামের বিপুলত্ব প্রমাণের জন্য ইসলাম যা নয় তাকে সেভাবেই তাঁদের কল্পনার প্রসারতা দিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

এরূপ ধারণা করার কারণ আছে যে শায়ের কবিরা খুব উন্নত সাহিত্যবোধে পরিপক্ব ছিলেন না। সেজন্য স্বজাতির মহিমা প্রচার করতে গিয়ে ইসলামের সত্যিকার আদর্শ বিস্মৃত হয়ে হজরত আলী, হানিফা, আমির হামজা,—এঁদের শৌর্যদীপ্ত জীবনের ইতিবৃত্তকে রোমান্সের জগতে নিক্ষিপ্ত করেছেন। ফলে তাঁদের কাহিনীগুলো নিছক গালগল্পে পর্যবসিত হয়েছে; এই ধারার পরিচর্যাহীন গল্পগুলোতে পরিলক্ষিত ইসলামের মহিমা প্রচারের বিষয়টিও শায়েরদের কল্পিত কাহিনীর পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যেই যে নিবেদিত, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেজন্য স্থূল চিন্তাচেতনা দিয়ে দোভাষী পুঁথির রচয়িতাগণ যে-ধারার সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন তাকে গণমানুষের সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও কোনোক্রমেই তা শুদ্ধ সাহিত্যের অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হওয়ার মর্যাদা পায় না। ফলে দোভাষী পুঁথির অবস্থান স্বজাতি ও স্বসমাজের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

দোভাষী পুঁথিতে অন্য আর এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাতে গোরাচাঁদ, ইসমাইল গাজী, খাঞ্জা খাঁ গাজী ইত্যাদি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের হিন্দুর লৌকিক দেবতার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে ইসলাম-প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো হয়েছে। কিছু কিছু পুঁথিতে পীর আউলিয়াদের কথা আছে। যেমন সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী—এঁরা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূজ্য হিসেবে মান্যতা পেয়েছে।

ইসলাম ধর্মের বিধিব্যবস্থার উপর রচিত কয়েকটি পুথি যেমন, হেদায়েতুল ইসলাম, কেয়ামতনামা, বিসমিল্লার বয়ান, সেরাতুল মোমেনিন ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতকের দোভাষী পুঁথির রচয়িতা হিসেবে ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে মালে মোহাম্মদ, মুহম্মদ দানেশ, মুহম্মদ খাতের—এঁদের নাম করা যায়।

---

২৮১ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮৩

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী লাভ, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ,—এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দোভাষী পুথির উদ্ভব। এই অবস্থায় সাধারণত কোনো মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি হওয়ার অবকাশ পায় না। তবু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রায় শতাব্দীকালের সাহিত্য-স্বল্পতার সময় প্রধানত ক্ষুদ্র প্রতিভার শায়ের কবিরাই তাঁদের অপাঙক্তেয় ও অপরিশোধিত রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ধারাটিকে জিইয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সুতরাং এ মন্তব্য খুবই অর্থবহ যে 'এই সাহিত্য এত বিরাট যে, ইহার উল্লেখ-ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।'[২৮২]

ফকির গরীবুল্লাহ।। অষ্টাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য শায়েরকবি ফকির গরীবুল্লাহ 'শাহ গরীবুল্লাহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর উত্তরসূরি সৈয়দ হামজা গরীবুল্লাহ সম্পর্কে একটি প্রস্তাপন দিয়েছেন। তিনি গরীবুল্লাহকে 'শাহা গরীবুল্লাহ' হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, —

আল্লাহর মকবুল শাহা গরীবুল্লাহ নাম।
বলিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।।
আছিল রওশন দেল শাএরি জবান।
যাহাকে মদদ গাজী শাহা বড়ে খান।।

সৈয়দ হামজার এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে গরীবুল্লাহ হাফেজপুর নামক একটি অঞ্চলের লোক ছিলেন। জানা যায় হাফেজপুর পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার একটি গ্রামের নাম।[২৮৩] গরীবুল্লাহ নিজেকে ফকির গরীবুল্লাহ বলেই উল্লেখ করেছেন, 'অধীন ফকির কহে আল্লা ধেয়াইয়া।।' গরীবুল্লাহর পিতার নাম শাহ দুন্দি, তিনি বড় খাঁ গাজীর ভক্ত ছিলেন,—

বাপ নাম সাহা দুন্দি আল্লার ফকির।
ভাটির সুলতান গাজী বড় খান পীর।।

ফকির গরীবুল্লাহকে দোভাষী পুথির আদিকবি হিসেবে ধরা হয়। সৈয়দ হামজার প্রশংসাবাণী থেকেই তার পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন,

পীর সাহা গরীবুল্লাহ কবিতার গুরু।
আলমে উজালা যার কবিতার শুরু।।

তবে একথা ঠিক যে দোভাষী রীতির সাহিত্যধারার সূচনা হয় সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু কবিদের রচিত 'সত্যপীর পাঁচালী'তে।

ফকির গরীবুল্লাহ পাঁচটি পুথি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। এগুলো হচ্ছে জঙ্গনামার প্রথম অংশ 'হোসেন মঙ্গল', 'আমীর হামজা' (প্রথমাংশ), 'ইউসুফ জোলেখা', সত্যপীরের

---

২৮২ এ. কিউ. এম. আদমউদ্দীন, [পুথি-সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ], 'মাসিক মোহাম্মদী', ১৭শ বর্ষ ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, পৃ. ৪৫৫

২৮৩ পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪; পূর্বোক্ত, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১২৪ ; পূর্বোক্ত, 'ফকির গরীবুল্লাহ', 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ৫ম বর্ষ, পৃ. ১৮

মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পুথি 'মদন কামদেব' ও 'সোনাভান'। 'সোনাভান' সম্পর্কে বিতর্ক আছে।[২৮৪] তবে এই কাব্যটিই কবির কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে সমাধান দেয়। সোনাভান যে গরীবুল্লাহর রচনা, এ সম্পর্কে প্রমাণ এই যে 'আমীর হামজা' ও 'সোনাভান' দুটি কাব্যেই কবির ভণিতা 'গরীব'। যেমন, 'আমীর হামজা'য় 'ফকির গরীব কহে কেতাব দেখিয়া', 'সোনাভানে' 'গরীব রচিল পুঁথি ফাতেমার পায়।' 'সোনাভান' রচনার তারিখ প্রসঙ্গে ফকির গরীবুল্লাহর উক্তি,—

> ১১২৭ সালের বাংলা মাঘ মাসে।
> সোমবারের বাদ আছর ফকিরেতে ভাষে॥
> খতম হইল পুথি আর কিছু নাই।
> আকবত খয়ের কর দোয়া কর ভাই॥

সুতরাং কাব্যরচনার কাল ১১২৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ।

হজরত আলীর পুত্র মহাবীর হানিফার সঙ্গে টুঙ্গি শহরের বীরাঙ্গনা নারী সোনাভানের যুদ্ধের বিষয়কে উপজীব্য করে 'সোনাভান' কাব্য রচনা করা হয়। যুদ্ধশেষে সোনাভানের সঙ্গে হানিফার প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হানিফার তিন পত্নী মল্লিকা, সমর্তবান ও জৈগুনের সঙ্গেও সোনাভানের যুদ্ধ হয়। হানিফার অসাধারণ শৌর্যবীর্যের কাছে হিন্দুর ধ্বংসদেবতা শিবও ভয়ে কম্পমান। এ নিয়ে কবির কৌতুকবোধও কম নয়। সোনাভানের উদ্দেশ্যে ভীত-বিহবল দেবাদিদেব মহাদেবের উক্তি,

> শিব বলে সোনাভান শুন শীঘ্র গতি।
> হজরত আলীর বেটা রছুলের নাতি॥
> ইহাকে খাইতে দেহ যাহা খেতে চায়।
> ইহাকে মারিতে পারে কে আছে দুনিয়ায়॥

ওদিকে হানিফার তুলনায় সোনাও কম কিসে?-

> দুধে জলে ত্রিশমণ করিল জলপান।
> আশিমণ খানা ফের খায় সোনাভান॥
> হাজার মণের গোর্জ্জ তুলে নিল হাতে।
> আছিল লোহার জের পরিল গায়েতে॥

তবে হানিফা ও সোনাভান বিবির এই অতিলৌকিক আচরণে যতই অস্বাভাবিকতা থাকুক, পুথির তাতে রসহানি হয়েছে এমন মনে হয় না। কেননা পাঠকের রসবোধে তা সাদরে গৃহীত হয়েছে। বরঞ্চ কবির এই কৌতুকবোধ না থাকলেই বোধ হয় রসহানির কারণ ঘটতে পারতো।

ফকির গরীবুল্লাহর 'আমীর হামজা'র বিষয় উর্দু কাব্য 'দস্তান-ই-আমীর হামজা' থেকে নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। অবশ্য গরীবুল্লাহ তাঁর এই কাব্য সম্পূর্ণ করতে পারেন নি; অসম্পূর্ণ অংশ সৈযদ হামজা কর্তৃক সমাপ্ত হয়। 'আমীর হামজা'য় হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার বীরত্বের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবির স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা-বশে এই

---

২৮৪ পূর্বোক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পৃ. ২১৪

কাব্যে অতিমানবিক বিষয়ের বর্ণনা একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। এখানে আছে দেও-রাক্ষসের শক্তিমত্তার বীভৎস বর্ণনা, বীর আমীর হামজা তার কেন্দ্রবিন্দু। যেমন,—

খোফন মোকামে যেয়ে পাহাড়েতে পড়ে।
হাঁকের চোটেতে দেও বেহুসেতে পড়ে॥
ষোল ক্রোশ আড়ে দিগে শুনে কাঁপে হাক।
দেও বলে না জানি কি হইল বিপাক॥
গাছপাথর লিয়া সব ধাইল রাক্ষস।
আকাশ পাতাল মুখ কার ছেব দশ॥
দশ বিশ হাত কার আঁখি যেন তারা।
কেহ কাল কেহ লাল কেহ ধল পারা॥
মুলুই সমান দাঁত করে কড়মড়।
ধাইল আসিব পানে যেন মেঘ ঝড়॥

ফকির গরীবুল্লাহ্ তাঁর কল্পনাকে কোনো স্বভাবসুন্দর প্রকাশের পথে এগিয়ে নিতে না পারলেও এগুলো পাঠকচিত্ত উদ্দীপিত করে, তবে নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় এই জাতীয় বর্ণনা স্থূল রসচেতনার অধিগমনের বাইরে সাহিত্যের কোনো অতিরিক্ত মূল্য বহন করেন না। অবশ্য গরীবুল্লাহ যে সবসময় শোভন কল্পনার বাইরে অবস্থান করেন এমনও মনে করা সমীচীন নয়। তার প্রমাণ মেলে আমীর হামজার প্রণয়পাত্রী মেহের নিগারের দৈহিক সৌন্দর্যের মনোরম বর্ণনায়, যা তাঁর কলমের ডগা বেয়ে অনায়াসে বেরিয়ে আসে,--

মাথায় চাচর কেশ, হুরপরী জিনিয়া বেশ, মুখে শোভা চান্দের সমান।
চাহনি মদন বাণ, দেখিলে হরায় প্রাণ, ভুরু দুটি যেমন কামান॥
গলায় সোনার হার, কাঁকনের শোভা তার, আগু পিছু শোভা করে ঝাপা।
হেম নথ নাক মাঝে, গজমতি তাতে সাজে, ছেরে শোভে কনকের চাপা॥
কপালে মানিক পটি, গাথিয়া বান্ধেন চুটি, যেন শোভা আকাশের তারা।
তিলক কপাল পরে, চন্দ্র যেন শোভা করে, বাজুবন্ধে সোনারূপার তোড়া॥

গরীবুল্লাহর কবিত্বের সঙ্গে তাঁর ভাষার আধুনিকায়নের রূপটিও কবির প্রায় অজান্তেই এখানে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

বাইবেল এবং কোরান শরীফে 'প্যারাবোল' বা নৈতিক উপাখ্যান হিসেবে ইউসুফ জোলেখার উল্লেখ আছে। এর আদিকবি বলখ রাজ্যের আবুল মুয়াইদ ও আহওয়াজে বখতিয়ার। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে ইরানের সুবিখ্যাত কবি ফেরদৌসী তুসীও এই রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে ফারসিতে ইউসুফ জোলেখা রচনা করেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে রচিত আবদুর রহমান জামীর ফারসি কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা'র নামটিও এখানে উল্লেখ করা যায়। বাংলায় এই কাব্যের আদি রচয়িতা শাহ মুহম্মদ সগীর। পরে আবদুল হাকিম 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করেন।

গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা'য় বদর পীর এই রোমান্টিক কাহিনীটি বড় খাঁ গাজীকে শোনান।

বদর বলেন শুন বড় খাঁ মেরা ভাই।
আমার সালাম মর্দ তোমাকে জানাই॥

পরে ইউসুফ নবী প্রসঙ্গে,—

বদর বলেন শাজী তোমাকে সমঝাই।
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই॥

'ইউসুফ জোলেখা'র প্রণয় কাহিনীটি শুধু প্রণয়কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, এতে একদিকে অধ্যাত্মজীবনের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, অন্যদিকে কবির অসম্ভব কল্পনা অলৌকিকতার স্পর্শমণ্ডিত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। বিগতযৌবনা জোলেখার ভরাযৌবন লাভ কিংবা ইয়াকুব নবীর সঙ্গে বাঘের সংলাপ,—এসব মাত্রা-বহির্ভূত বর্ণনায় কবির উল্লাস বড়ো বেশি বলেই মনে হয়। কাব্যে নীতিপ্রচারের যে বিষয়, তাতে দেখা যায় অপরাধীকে তার কৃতকর্মের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হয়। কোনো ক্ষমা নেই, মানবিক সহানুভূতিও সেখানে বিবেচনায় আসে না। যেন মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের ক্রূরতা, ভক্তের সামান্য বিচ্যুতিতেই যাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শক্তিহীনদের অশেষ দুর্গতির কারণ হন। তবে ইউসুফ জোলেখার প্রণয়োপাখ্যানে মানবীয় রূপের প্রকাশ বেশ উজ্জ্বল ও বাস্তবানুগ। বিশেষ করে জোলেখার মধ্যে প্রেমের যে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রকাশ, তার আধুনিক রূপায়ণ পাঠককে মুগ্ধ করে। এ যুগের বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে অনায়াসে তা তুলনীয় হতে পারে।

ফকির গরীবুল্লাহ দোভাষী সাহিত্যরীতির কবি বটে, কিন্তু তাঁর শিল্পচৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করেছে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কাব্যকলার ধারা। হয়তো আলাওল প্রমুখ কবি এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ পূর্বসুরি। সেজন্য গরীবুল্লাহর রচনারীতিতে জমকালো কাব্যকলার ছাপটি গভীর। যেমন,--

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মুখের ছুরাত।
ত্রিভুবন জিনে দেখি রূপের ছুরাত॥
ময়ূরের পর জিনে কেশ মাথা পরে।
রাহু যেন গ্রাসিল আসিয়া চাঁদেরে॥
ত্রিভঙ্গ নয়ন যেন খঞ্জনের আঁখি।
ভুবন ভুলাতে পারে সেই রূপ দেখি॥
দুইখান ঠোঁট যেন কমলের ফুল।
তাহার বদন যেন চাঁদ সমতুল॥

অন্যত্র,--

বুকের কাঁচলি যেন করে ঝিকিমিকি।
চন্দ্র সূর্য্য মেঘে যেন হয়ে যায় লুকি॥
অতি ক্ষীণ মাজা তার কে করে বাখানি।
চলন খঞ্জন তার দেখে ভুলে মুনি॥

ঢাকা নিবাসী মুন্সী গরীবুল্লাহর নামেও 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কারবালার বিষাদময় ঘটনা অবলম্বনে ফকির গরীবুল্লাহর 'মক্তুল হুসেন' বা 'জঙ্গনামা' কাব্য রচিত হয়। অবশ্য কাব্যটি গরীবুল্লাহর কিনা, এ সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। তবে ভণিতা বিচারে এটি যে গরীবুল্লাহরই রচনা এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকের অন্যতম কবি হেয়াত মাহমুদও এ বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। গরীবুল্লাহকে বাস্তববিমুখ কবি বলা যায় না ; তবে তাঁর কাব্যে অলৌকিকতা প্রকাশের যে আগ্রহ, তার পেছনে কাজ করেছে উৎকট ও বীভৎস বিষয়ের উপস্থাপনা করে পাঠকচিত্ত অভিভূত করার তাঁর এক ধরনের প্রবণতা। ফলে বিষয়টিকে রসাত্মক করার চেষ্টা থাকলেও অনেকক্ষেত্রে তা হাস্যরসাত্মক না হয়ে হাস্যকর হয়েছে। ফকির গরীবুল্লাহর এই প্রবণতার দুই একটি নিদর্শন, যেমন,--বীর ওহাব যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছেন, তারপরেও তাঁর 'ছের কাটা গেছে তবু বলে মার মার।' কোনো কোনো লড়াইবাজের চল্লিশ পঞ্চাশ গজী দেহের পরিধির বর্ণনা দিতেও কবির কোনো দ্বিধা নেই। পাঁচ বছরের ফাতেমা গরীবুল্লাহর লাগামছাড়া বর্ণনার কারণে একজন মনোলোভা যুবতী নারীতে পর্যবসিত হয়েছে,--

পাঁচ বৎসরের সেই ফাতেমা তার নাম।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রূপে অনুপাম॥
বদন বিকস রূপে যেন চন্দ্রমাসা।
অধর বিম্বক ফল কোকিলের বাসা॥
কিবা রূপ শোভা করে তার দুই উরু।
যেন উলটিয়া পড়ে কদলীর তরু॥
ক্ষণে ক্ষণে দুই পায় চম্পক আঙ্গুলী।
জেওরাতে শোভা যেন করিয়াছে মিলি॥

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম মাত্রাজ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও ফকির গরীবুল্লাহ উপমা ও রূপকের ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টির যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা সমকালীন কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রশংসনীয়। যেমন,--

লহুভরা দুই হাত এমাম উঠা করে।
এমামের লহু গেল আছমান উপরে॥
আছমান উপরে লহু ছিটকিয়া লাগিল।
সিন্দুরিয়া মেঘ হয়ে আছমানে রহিল॥
আজিতক সেই মেঘ উঠে যে আছমানে।
হোসেনের সহিদের লহু জান সর্বজনে॥

বাস্তবজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ফকির গরীবুল্লাহ মানব চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। সেজন্যই পরম দয়াময় হজরত যখন ফাতেমার সপত্নী পুত্রকে আদর করেন, ঈর্ষাপীড়িত ফাতেমা তখন পিতাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন,

বিবিজাদার মুখ নাহি কর নিরীক্ষণ।
ঘন ঘন বান্দিজাদায় করহ চুম্বন॥
তোমার চরিত্র আর কত বা বুঝিব।
ভাল নহে এয়ছা কাম কি আর বলিব॥

ওয়াজেদ আলীর নামে সত্যপীরের পুথির বাজার-সংস্করণ চালু থাকায় গরীবুল্লাহ সত্যপীরের রচয়িতা কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের উদয় হয়। তবে পুথির শেষে 'হীন ওয়াজেদ আলী' ভণিতা থাকলেও পুথির নানা জায়গায় 'অধীন গরিব', 'অধীন ফকির' এরকম ভণিতা

দেখা যায়। সেই সূত্রে বলা যায় ওয়াজেদ আলীর ভণিতাটি হয়তো প্রক্ষিপ্ত হতে পারে, তাহলে গরীবুল্লাহই এ কাব্যের রচয়িতা। সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মসমন্বয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সেজন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক সত্যপীরের শিরনি দিয়ে তাঁর কাছে নিজেদের মনোষ্কামনার চরিতার্থতা কামনা করে ; যেমনটা ঘটে ভারতের আজমীরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর মাজার শরীফে।

গরীবুল্লাহর পুথির নাম 'সত্যপীরের পুথি---মদন-কামদেবের পালা'। সত্যপীরের অলৌকিক কেরামতির বিষয়টিই এই পুথির প্রধান আকর্ষণ। যেমন তিনবার মরেও সত্যপীর তাঁর কেরামতিতে পুনর্জীবন লাভ করেন। এসব কারণে এই পুথিতে মানবরসের স্ফুরণ কম।

আসলে ফকির গরীবুল্লাহ তাঁর দোভাষী রীতির পুথিতে মানবমনে রস পরিবেশনের যে ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও প্রতিভা অনুযায়ী তিনি সার্থক কাব্য রচনা করতে পারেন নি।

সৈয়দ হামজা॥ সৈয়দ হামজা প্রকৃতপক্ষে ফকির গরীবুল্লাহরই একজন অনুসারী পুথিকার। দোভাষী রীতিতে পুথি-রচনায় তাঁর যেমন কৃতিত্ব, সংস্কৃতানুগ ভাষা ব্যবহারেও তদনুরূপ কৃতির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায় তাঁর প্রথম কাব্য 'মধুমালতী' উপাখ্যানে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আহমদ শরীফের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায় বিশুদ্ধ বাংলায় কাব্যরচনা করে জনতোষণ লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে কবি সম্ভবত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত দোভাষী রীতিতে পুথি রচনায় মনোনিবেশ করেন।

সৈয়দ হামজা ফকির গরীবুল্লাহর সমসাময়িক কবি। পূর্বসুরি কবি হিসেবে গরীবুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেছেন, 'পীর শাহা গরীবুল্লাহ কবিতায় গুরু। আলমে উজালা যার কবিতার শুরু॥' 'হাতেম তাই' পুথিতে নিজের আবির্ভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন,-

একশত একুশ লিখে তার পিঠে সন্নি রাখে, সনের ঠিকানা পাবে তায়।
বাঙ্গালা আখেরি সালে গরমীর বাহার কালে পুথির তারিখ লেখা যায়॥
জেলহজ্জ চাঁদের শেষে আখেরি ফাল্গুন মাসে, কেচ্ছার তারিখ কবি বন্ধ।

এই বিবরণী থেকে মনে করা যায় কবি ১২১০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'হাতেম তাই' কাব্য রচনা শেষ করেন। তখন তাঁর বৃদ্ধাবস্থা,--'সত্তর সন বয়েস যাহার।'

হামজা ভুরসুট পরগণার অধিবাসী ছিলেন। জৈগুনের পুথিতে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

ভুরসুট পরগণা বিচে, উদুনাবাগের নীচে, বসবাস কাদিমি মোকাম।
আবদুল কাদের দাদা, তার বড়া দেল সাদা, বাপ মেরা হেতায়াতুল্লাহ নাম॥
কলিমদ্দি বড় বেটা, কুতুবদ্দি তার ছোটা, এই দুই মাছুম আমার।

হামজার জন্মস্থান এই ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো নামক গ্রামে কবি ভারতচন্দ্রও জন্মগ্রহণ করেন। ভুরসুট যে একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিলো এবং সেখানে যে বহু জ্ঞানীগুণীর বাস ছিলো, ভারতচন্দ্র সে সম্পর্কে বলেছেন,—

ভুরশিটে মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়, মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গলে সার, কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বা ১১৬৭ বঙ্গাব্দে এবং সৈয়দ হামজার জন্ম ১১৪০ বঙ্গাব্দে। তদনুযায়ী ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সময় হামজার বয়স ২৭ ছিলো। এই দুই বঙ্গকবি বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁকে দেখেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র ১১৬৭ সালের দুর্ভিক্ষ দেখেন নি, তার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে; সৈয়দ হামজা বাংলার এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখেছেন।[২৮৫]

সৈয়দ হামজার মুখে আমরা তাঁর পরিবারের খবরাখবর পেয়েছি। পরিবারটি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে একদা সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, সে সম্পর্কে কবি খেদ করে বলেছেন,—

সন নিরানব্বই সালে, আমার কপাল ফলে, বাড়িতে পড়িল তিন হানা।
চাষবাস যত ছিল, বাড়িঘর সব গেল, ভরাডুবি হৈল মাঝে মাঠে॥

তখন কবি তাঁর বাস্তুভিটা ছেড়ে কিছুকাল বাযেড়া বানাঘাটে বসবাস করেন।[২৮৬] তারপরেও হামজার পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি ১২০৯ সালের দু'দুটি বন্যায় বিপর্যস্ত হয়।

কর্মসূত্রে সৈয়দ হামজা, বলেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, উদুনার ১৮ মাইল দূরবর্তী বসন্তপুরে মেহদি মোল্লার বাড়িতে চাকরি, বোধ হয় শিক্ষকতা করিতেন। সেখানে থাকিয়া তিনি তাঁহার কাব্যগুলি রচনা করেন।[২৮৭] ১২১৪ সালে সৈয়দ হামজা বার্ধক্যজনিত আধি ব্যাধির শিকার হন। ঐ বছরই তাঁর কর্মস্থল বসন্তপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৮৮]

সৈয়দ হামজা তাঁর কাব্যজীবনের শুরুতে কবিগানের আদলে গীত রচনা করতেন। এছাড়া তিনি গজল গানও রচনা করতেন। সেসময় কবির লড়াই, পাঁচালী, ঝুমুর ও নাচগানের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। গজল গীত রচনার প্রেরণায় সৈয়দ হামজা গীতিধর্মী কাহিনীকাব্য 'মধুমালতী' রচনা করেন। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে কবি মধুমালতী কাব্য রচনা শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। পরে শিক্ষকতা সূত্রে বসন্তপুরে মেহেদী মোল্লার বাড়িতে থাকাকালীন ১১৯৪ সালে কাব্যটি পুনরায় রচনা শুরু করেন এবং ১১৯৫ সালে সম্পূর্ণ করেন।[২৮৯]

হিন্দি কবি মনঝন 'মধুমালতী' উপাখ্যান লেখেন। বাংলায় প্রথমে মুহম্মদ কবীর এই কাব্য রচনা করেন, পরে সৈয়দ হামজা এবং তারপরে রংপুরের কবি শাকির মাহমুদ ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে 'মনোহর মধুমালতী' লেখেন। পরবর্তীকালে মধুমালতী কাব্যের এতদূর জনপ্রিয়তা

---

২৮৫ আবদুর রহমান, ['বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ'], 'আল্ এসলাম', মাঘ ১৩২৩, ২য় ভাগ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৫০৭

২৮৬ পূর্বোক্ত, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪

২৮৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৪, এবং দ্রষ্টব্য এ.কিউ.এম আদমউদ্দীন, [পুঁথিসাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ,] 'মাসিক মোহাম্মদী', ১৭শ বর্ষ ১০ম, ১১শ সংখ্যা শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১, পৃ. ৪৬০ ৪৬১

২৮৮ পূর্বোক্ত, 'বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ', 'আল-এসলাম', পৌষ, ১০২৩, ২য় ভাগ ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৫২০

২৮৯ পূর্বোক্ত, 'আল-এসলাম', ৯ম সংখ্যা, পৃ. ৫২৪

লক্ষ্য করা যায় যে উনিশ শতকে মুহম্মদ চুহর, গোপীনাথ দাস, নূর মুহম্মদ ও জোবেদ আলী এই জনপ্রিয় উপাখ্যানটি একে একে রচনা করেন। 'মধুমালতী'র কাহিনীটি রোমান্টিক। মনুহর ও মধুমালতীর প্রণযকাহিনী এর উপজীব্য। কিঙ্কর দেশের রাজকুমার মনুহর ও মহারস দেশের রাজকুমারী মধুমালতীর প্রেম, প্রেমের পরে বিরহ ও অতঃপর মিলনে পরীদের কারসাজি বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রোমান্স সৃষ্টিতে কবির যে পরিমাণ প্রবণতা, তার চেয়ে বেশি দেখা যায় অলৌকিক ঘটনার উপস্থাপনে তাঁর উল্লাস। দশ হাত দশ চোখ ও পাঁচ মুণ্ডুধারী রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে মনুহর বিশ্রামনগরের রাজা চিত্রসেনের কন্যা প্রেমার উদ্ধারপর্বে যে শক্তি আর বিক্রমের পরিচয় দেয় তাতে অস্বাভাবিকতার প্রবল জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে গ্রামবাংলার পুথিপ্রিয় মানুষ এই অস্বাভাবিকতার জোয়ারে ভেসে গিয়েও তার মধ্য থেকেই আনন্দের উপকরণ আহরণ করতো। তাছাড়া মধুমালতী কাব্যে সৈয়দ হামজার রোমান্টিক কল্পনাকে ঐশ্বর্যময় করেছে সংস্কৃত কাব্যকলার প্রভাব ; হামজার সৌন্দর্যবোধ ও তৎসম শব্দের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বিশুদ্ধ বাংলার চমৎকার প্রয়োগ-কৌশল প্রকৃতপক্ষে সেই প্রভাবেরই ফল। যেমন নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায় কাব্যকলার অসাধারণ বিকাশ, -

নারীগণ হরষিতে, সোনার চিরুণী হাতে, বেড়িয়া বসিল মালতীরে।
সাপিনী জিনিয়া কেশ, নানা ছন্দে করে বেশ, চূড়া বান্ধে মুকুতার ডোরে॥
তাহাতে সুবর্ণ ঝাঁপা, কর্ণেতে কনক চাপা, সিঁতা শোভে মানিকের পাটি।

এই সুললিত কাব্যঝংকার আলাওল, ভারতচন্দ্রের শিল্পসুষমায় আমরা লক্ষ্য করি। অনুরূপ আর একটি উদাহরণ,

মুখ তার পূর্ণশশী, তাতে প্রকাশিল আসি, বহুমূল্য মুকুতার ঝারা।
কেশঝারা কর্ণমূলে, তাহাতে মুকুতা দোলে, চাঁদকে বেড়িয়া যেন তারা॥
কি কব কেশের ঘটা, নয়নে কাজলের ফোটা, ভঙ্গিমা চাহনি মহাবাণ।
অপরূপ ভুরু জোড়া, ধনুকেতে দিয়া চড়া, রসিক বধিতে অনুমান॥

সমকালীন পুথির জগতে এই ধারার কাব্যকলার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে বলে মনে করি। যুবতীদের আনন্দ কলরবের আয়োজনকে ঘিরে মনোতোষ বর্ণনা পেশ করেছেন কবি। যেমন, -

শুনিয়া দাসীর মুখে, মঞ্জরী পরম সুখে, নবীন যুবতীগণে লিয়া।
মালতী কন্যার তরে, সুবর্ণ পিঁড়ির পরে, স্নান করাইল বসিয়া॥
নানা হাস্য পরিহাসে, মালতীরে আশেপাশে, রূপসী গাএন গান গায়।
যুবগণ কুতূহলী, কেহ দেয় করতালি, কেহ কেহ খঞ্জনী বাজায়॥
লইয়া সুবর্ণ ঝারি, আনন্দে কৌতুক করি, কেহ কেহ দেয় জলধার।

অবিমিশ্র সাহিত্যকলার জগৎ থেকে সৈয়দ হামজা পরবর্তী পর্যায়ে দোভাষী পুথির জগতে নিজেকে নিবেদিত করেন। পূর্বসূরি কবি ফকির গরীবুল্লাহর অসমাপ্ত পুথি 'আমীর হামজা' ২য় খণ্ড রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মিশ্র ভাষারীতির পুথি রচনা শুরু করেন। আমীর হামজার রচনাকাল প্রসঙ্গে কবি বলেন, -

বার শত এক সাল বাঙ্গালার শেষে।
কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে॥
কবিনু শায়েরি পুথি আখেরি কেচ্ছার।
লেখা গেল সাহাদত আমীর হামজার॥

এতে পুথি রচনার সমাপ্তিকাল হয় ১২০১ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ। পুথিটির রচনা কবি শুরু করেন 'এগার শও নিরানব্বই সাল মাহা মাঘে।'

'আমীর হামজা'য় কবি হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার শৌর্যবীর্যের কাহিনী উপজীব্য করেন। যুদ্ধবাজদের রণোন্মাদনার সঙ্গে নৃত্যগীত পেয়ালাবাজদের উল্লাস মিশে মধ্যযুগীয় শিভালরির এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এই কাব্যে। জার অধ্যুষিত রাশিয়ার রাজপুটিনের মোহময় চরিত্রের যাদুকরী প্রভাবের মতো পৌরুষের সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল মহাবীর হামজার প্রতি বহু নারীর আকর্ষণের চিত্রায়ণে কবির রোমান্টিক শিল্পীমানস স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এইসব স্বেচ্ছা নিবেদিত নারীর মধ্যে আমীর হামজার মাতৃতুল্য নওশেরওয়া মহিষী আওরঙ্গিরের প্রেমনিবেদনের বিষয়টি পাঠকের মনে বেশ কৌতূহল জাগায়। আমীর হামজার নিজেরও ছিলো প্রবল নারীসঙ্গ-লিপ্সা। তবে সব কিছুতেই অলৌকিকতার বাড়াবাড়ি রয়েছে।

নওশেরওয়া স্ত্রানী বুজরচেহ্ মেহেরের চোখ নষ্ট করে দিলে শিশু হজরতের পদরেণুর স্পর্শে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। এছাড়াও দেখানো হয়েছে হজরতের চেষ্টায় মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভের চিত্র। তবে পিতৃব্য আমীর হামজার প্রতি হজরত বেশি আস্থা প্রকাশ করলে আল্লাহতায়ালা ক্ষুব্ধ হন, পরিণামে আমীর হামজা হেন্দিয়া কর্তৃক মৃত্যুবরণ করেন। অনুতপ্ত হেন্দিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করে।

উর্দু ভাষায় 'জঙ্গে যৈতন' নামে কাব্য রচনা করেন কবি নূরুদ্দীন। সেই কাহিনীর বঙ্গরূপায়ণ সৈয়দ হামজার 'জৈগুনের পুথি'। কবির ভাষায় এ পুথির রচনাকাল 'তেইশে আশ্বিনে, বার শও চারি সালে জুম্মার নামাজ কালে।'

মুহম্মদ হানিফা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও 'জৈগুনের পুথি'তে তিনি হজরত আলীর পুত্ররূপে মুসলমানি পুথির জগতে প্রচণ্ড শক্তিমত্তার অধিকারী হয়ে চরম আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রোমান্টিক কাহিনীর নায়করূপে বীর হানিফা বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং ইসলাম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বীর হানিফা এরেম শাহের দুর্ধর্ষ কন্যা জৈগুনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রথমে পরাজিত হন, পরে হানিফার মাতা হনুফার কাছে জৈগুন পরাজিত হয়ে হানিফার বাগদত্তা হন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করে হানিফার সঙ্গে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও ইসলামের প্রচার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পিতা এরেম শাহকেও জৈগুন পরাভূত করেন। এছাড়া কুয়াপরীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জৈগুন অপহৃত হানিফাকে উদ্ধার করেন।

হানিফা ও জৈগুনের বিপুল পরাক্রমে আতঙ্কিত হয়ে বহু অমুসলমান ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। বিধর্মী সৈন্যদের বিধ্বস্ত করতে হানিফা পালোয়ানের আবির্ভাব কী ভয়ঙ্কর !-

ছাগলের পালে যেন বাঘ সান্ধাইল॥
এয়ছা জোরে তেগ মারে হানিফা পাহালওয়ান।
এক চোটে দশ বিশ করে খান খান॥
সামনেতে মারে যার ছের তাকাইয়া।
আধাআধি ভাগ করে তলাওয়ারে কাটিয়া॥

করালমূর্তি হানিফা যখন,–

হাকিয়া হায়দরী হাঁক ফেরে ময়দানেতে।
দেও পরী উড়ে ভাগে না পারে টিকিতে॥

সাধারণ মানুষের যুদ্ধপ্রীতির ব্যাপারটা হয়তো সৈয়দ হামজাকে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। এজন্যই কাফের-দলনে আলী-তনয় হানিফার দুর্ধর্ষ যুদ্ধের চিত্রায়ণে এতসব জমকালো ও হৃদ চমকানো বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

সৈয়দ হামজার সর্বশেষ কাব্য 'হাতেমতাই'-এর রচনাকাল সম্পর্কে কবি বলেন,—'এক শও একুশ লিখি তার পাশে শূন্য' অর্থাৎ ১২১০ বঙ্গাব্দ বা ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ। শাহ এর্জতুল্লা নামক জনৈক ব্যক্তি হয়তো কবির এ কাব্য-রচনার প্রেরণাদায়ক। যেমন,—'মিঞা শাহা এর্জতুল্লা কহিলেন আমায়। হাতেমতাইর কেচ্ছা লেখ বাঙ্গালায়॥' তবে এ সময় সৈয়দ হামজার বার্ধক্যজনিত আধিব্যাধি তাঁকে প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। সুতরাং মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি প্রথমে কাব্যটি অসমাপ্ত রাখেন, পরে বসন্তপুর গ্রামের জনৈক কলিমোল্লার অনুপ্রেরণায় পুথির অসমাপ্ত অংশ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কবি বলেন,—

কলিমোল্লা কহিলেন কবিতে তর্জমা॥
ভুরসুট বসন্তপুরে বসতি মোকাম।
চান্দের ফরজন্দ সেখ কলিমোল্লা নাম॥
সেই লাড়কা বুঝাইয়া কহিল আমায়।
আধা কাম করা কভু শোভা নাহি পায়॥
লেখ তুমি এলাহি মোরাদ যাকে দিবে।
সে লোক কবিতা হায় কিনিয়া পরিবে॥

এই উপদেশ শুনে কবি তখন,–

কালুর কথায় ফের ধরিনু কলম।
আল্লা যদি করে পুথি করিব খতম॥

হাতেমতাইয়ের জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী নিয়ে ফারসিতে 'কিস্‌সা-ই-হাতিম-তাই', তুর্কি ভাষায় 'দাস্তান-ই-হাতিমতাই' এবং উর্দুতে 'আরায়েশ মাহফিল' কাব্য রচিত হয়। বাংলায় এ কাব্যের বঙ্গানুবাদ করেন সৈয়দ হামজা। প্রেম একাব্যের উপজীব্য। সওদাগরজাদী হুসনা বানুর প্রেমে উন্মাদ মনীর শামীর প্রেমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সপ্ত প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে হাতেমতাইয়ের দুর্ধর্ষ অভিযান কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। অনেক কৌতূহলোদ্দীপক উপকাহিনীও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাতেমের বাকচাতুর্য ও উপস্থিতবুদ্ধি উপকাহিনী-গুলোকে অলঙ্কৃত করেছে। বহু বিপদসঙ্কুল পথে হাতেমের অভিযান,—

কোথাও উৎকট রোগযন্ত্রণায় কাতর প্রেমিককে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলন ঘটানোর দায়িত্ব পালন করেন পরোপকারী হাতেম। হাতেমের অভিযানে অতিপ্রাকৃতিক বিভীষিকা ও বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথের বাধা-বিপত্তির জমকালো বর্ণনায় কবির রোমান্টিক চেতনারই স্ফুরণ ঘটেছে। হাতেম তাঁর যাত্রাপথে যেসব সুরূপা নারীর সাক্ষাৎ পান, তারা প্রায় সবাই এই বীরের জীবনসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এদের কেউ পরী, কেউ বা ভালুক-কন্যা। দুর্ধর্ষ হাতেম অবলীলায় দৈত্যদানো বশ করে; তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য পরীকুল নৃত্যগীত করে, কুমীর হাতেমকে কাবু করতে পারে না, সাপের পেট গলিয়ে তিনি অনায়াসে বেরিয়ে আসেন। যারা মৃত, তাদের সঙ্গে তিনি অবলীলায় কথাবার্তা বলেন। মৃত্যুদূত তাঁর পাঁচ হাজার বছর আয়ু ঘোষণা করেন।

সাধারণ মানুষের রসবোধে এই সব অলৌকিক বিষয়ের প্রভাব থাকায় সৈয়দ হামজা বিপুল বিক্রমে তার বর্ণনা পেশ করেছেন। আসলে কবিকল্পনার এই জগৎ ও জীবন কবির চতুর্পার্শ্বস্থ বাস্তব জগৎ ও জীবনের সঙ্গে বিরোধ ঘটালেও কবি তাঁর পাঠকদের নিয়ে তাঁর এই লোকজীবন-বহির্ভূত কল্পনার জগতেই বিহার করতে বেশি ভালোবাসেন। এবং পাঠকদের কাছেও তা এক ধরনের আনন্দসামগ্রীরূপেই বিবেচিত হয়।

অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য মুসলিম পুথি-রচয়িতা।। দোভাষী রীতির পুথিসাহিত্যই প্রধানত অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবিদের কাব্যের ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই ধারার কাব্য রচনায় ফকির গরীবুল্লাহ ও সৈয়দ হামজা এই দুজন কবিই তাঁদের প্রতিভা অনুযায়ী কাব্যসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের কাব্যধারা অনুসরণ করে সমসাময়িককালে ও পরে আরো কয়েকজন দোভাষী পুথিকারের আবির্ভাব হয় বটে, তবে তাঁদের পুথিগুলো কোনোক্রমেই গরীবুল্লাহ কিংবা সৈয়দ হামজার পুথির কাব্যবৈশিষ্ট্য ও কাব্যসিদ্ধি লাভ করতে পারে নি। আসলে দোভাষী রীতির কাব্যধারার শিল্পমূল্য খুব কম। যদিও রাজনৈতিক যুগসঙ্কটকালে রচিত হওয়ায় এসব পুথির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কিন্তু স্থূলরসের কাব্য হিসেবে চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা এগুলোর মধ্যে নেই। ফলে মিশ্রভাষার কাব্যরচনায় অনেকেই আর উৎসাহিত হন নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অবিমিশ্র বিশুদ্ধ ধারাটিই যেন পুনরায় ফিরে আসে. তবে অষ্টাদশ শতকের এই ধারার কাব্যে কবিগণ নতুন করে কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তাছাড়া আধুনিকযুগের উন্মেষকালে মধ্যযুগীয় পন্থায় কাব্য রচনা করে কোনো কবি সার্থক হবেন, এমন আশাও করা যায় না। নতুনযুগে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান যাঁরা লিখেছেন, সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মুহম্মদ রাজা বা মুহম্মদ আলী রাজা।। মুহম্মদ রাজা 'তমিম গোলাল' ও 'মিছিরি জামাল' কাব্যের রচয়িতা। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে তিনি ফটিকছড়ি থানার বখ্‌তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির বংশলতিকা থেকে অনুমান করা হয় ১০৫৩ মঘীসন বা ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১২৯ মঘীসন বা ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

'তমিম গোলাল ও চতুর্নসিলাল' কাব্যের কাহিনীটি এরকম,—শিমাল-বাজ ইউসুফ জালালের পুত্র তমিম গোলাল ও শিরাজ-রাজকুমারী চতুর্নসিলাল স্বপ্নে পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং গন্ধর্বমতে বিয়ে করে। কিন্তু অতঃপর পরস্পরের বিচ্ছেদ। বিরহক্লিষ্টা হয়ে,—

দিবসে বসিয়া কন্যা গাঁথে পুষ্পহার।
রাত্রিতে গোলালচন্দ্র গলেতে দিবার॥
যার লাগি এত দুঃক্ষ দেখা নাহি তার।
কার লাগি প্রতিদিন গাঁথে পুষ্পহার॥

চিন্তিত শিরাজ সম্রাট কন্যার বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভা ডাকেন। রাজকন্যার পাঁচটি পণ, অশ্বারোহণে দুর্গম পার্বত্যচূড়ায় পৌঁছা, অজগর নিধন, মানুষখেকো রাক্ষসী হত্যা, শিরাজের শত্রু বলমিত্র দৈত্যের বিনাশ ও রিপুরাজের পরাজয়। শর্তগুলো পালন করে তমিম গোলাল চতুর্নসিলালকে লাভ করে।

'মিছিরি জামালে'র প্রণয়কাহিনীটি হলো বিমলনগরের রাজা শরীফ সুলতান শাহের পুত্র তোবান হামীমের সঙ্গে কুর্মাবাধিপতি আবদুল করিম শাহের কন্যা মিছিরি জামালের প্রেম।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে মুহম্মদ রাজার জনপ্রিয়তার একটি কারণ তাঁর রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো বটতলার ছাপাখানার কল্যাণে সাধারণ মানুষের হাতে সহজ-সুলভ হয়।

আলী রজা ওরফে কানু ফকির॥ আলী রজা ফকিরি মতে দীক্ষিত ছিলেন বলে তাকে 'কানু ফকির' বলা হতো। পীরালি তাঁর পেশা ছিলো। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন ওশখাইন গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। প্রতিবেশীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। আলী রজার বংশধারার পরিচয় নিম্নরূপ, প্রপিতামহ মুহম্মদ আকবর, পিতামহ মনোহর ও পিতা মুহম্মদ শাহি। কবির পুত্র এরশাদুল্লা ও শরফতউল্লাহ পদ রচনা করতেন। আলী রজা ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ তাঁর মৃত্যু হয়। এই অভিমত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের।[২৯০] ডক্টর আহমদ শরীফের মতে আলী রজার জন্ম ১১২১ মঘীসন বা ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ এবং মৃত্যু ১১৯৯ মঘী বা ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে।[২৯১] কেয়ামুদ্দীন নামে তাঁর একজন পীর ছিলেন। আলী রজা সিরাজকুলুব, জ্ঞানসাগর, আগম, ধ্যানমালা, যোগকালন্দর ও ষটচক্রভেদ নামক কাব্য রচনা করেন। 'জ্ঞানসাগর' ও 'আগম' আসলে একটিমাত্র বই,—প্রথম অংশ জ্ঞানসাগর ও দ্বিতীয় অংশ আগম। এছাড়া আলী রজা অনেক মারফতী গান ও পদাবলী লিখেছেন।

আলী রজার 'জ্ঞানসাগরে' সুফীদর্শন, বৈষ্ণবতত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়। ফারসি কিতাব অবলম্বনে রচিত 'সিরাজকুলুবে'র উৎপত্তি সংপর্কে কবির উক্তি,—

ছিরাজ কুলুব নামে যাছিল কেতাব।
উত্তম মছল্লা তাতে সুন্দর পরস্তাব॥

---

২৯০ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৭৮
২৯১ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬৯

গুরু মুখে এসব যে হাদিছ পাইলুঁ।
সভানে বুঝিতে ভাল বাঙ্গালা কবিলুঁ॥

কাব্যে শরাশরীয়ত বিষয় স্থান পেয়েছে। কবির 'ষটচক্রভেদ' কাব্যে হিন্দুব যোগতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। 'ধ্যানমালা' সঙ্গীতের বই হলেও তত্ত্বোপদেশ এর আন্তর সৌন্দর্য। ডক্টব সুকুমার সেনেব মতে আলী রজার কাব্য আসলে 'বাউল দরবেশি যোগসাধন বিষয়ক নিবন্ধ।'[২৯২] মিস্টিক ভাবেব চমৎকার স্ফুরণ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। যেমন,—

হৃদয় প্রদীপ মোর তুমি গুরু সার।
কৃপা কর গাঁথিবারে আগম বিচার॥
প্রভুর গোপন তত্ত্ব মারফত যে হয়।
সেই মারফত নাম আগম বলয়॥

কাজী শেখ মনসুর॥ চট্টগ্রামের রামু অঞ্চলেব অধিবাসী কাজী শেখ মনসুর তাঁর 'সির্নামা' বা 'শ্রীনামা' কাব্যে একটি আত্মপবিচয় দিযেছেন। তা থেকে জানা যায তাঁব পিতার নাম কাজী ইছা—'কহএ মনচোব কাজি ইছাব তনয়।' ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে রামু বোসাঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[২৯৩] কবি বলেছেন, 'রুসাঙ্গে আছিল আমি বাস্তু কৈল বাস।' 'সির্নামা' কাব্যেব বচনাকাল সম্পর্কে কবিব উক্তি,—

জথ হৈল মগি সন লয় পরিমাণি।
এক পরে সন্য ছও পাচ দিয়া গোনি।

অর্থাৎ ১০৬৫ মঘীসন বা ১০৬৫ + ৬৩৮ = ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ।[২৯৪] সুতরাং অনুমান করা যায় কবি সপ্তদশ শতকেব শেষপাদ থেকে অষ্টাদশ শতকেব প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। মনসুর তাঁর কাব্য সম্পর্কে বলেছেন,—

আছিল আরবী ভাসে কিতাব প্রধান।
আলিম চতুরে কৈল ফারসি বাখান॥
আনিয়া ফারসি ভাস বাঙ্গালা করিলুং।
তার মধ্যে দোষ গোনা এক ন চাহিলুং॥

পুথিব বিষয় কবি 'ফসল' বা অধ্যাযে ভাগ কবে ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত তত্ত্বকথা বয়ান কবেছেন। প্রথম ফসলে 'দববেশী কথন', দ্বিতীয় ফসলে 'এবাদত তত্ত্ব', তৃতীয় ফসলে 'তনের বিচার', চতুর্থ ফসলে 'বাবিব বযান', পঞ্চম ফসলে 'দিলের বিচার' ইত্যাদি। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে কাজী শেখ মনসুবের 'সির্নামা' পুস্তকাখানি 'প্রকৃতপক্ষে একটি দরবেশী গ্রন্থেব মহাকোষ।'[২৯৫]

---

২৯২ পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৫৪৪
২৯৩ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি-পরিচিতি' (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সং. ১৯৫৮), পৃ. ৫১৯
২৯৪ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২২১; পূর্বোক্ত, 'পুথি-পরিচিতি', পৃ. ৫২০
২৯৫ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২২৩

শেখ সাদী॥ ত্রিপুরাবাসী বাঙালি কবি শেখ সাদী তাঁর কাব্যে ত্রিপুরাধিপতির উদ্দেশ্যে একটি রাজপ্রশস্তি দিয়েছেন, -

ত্রিপুরা নামেতে এক আছএ দেশ।
এবে আমি কহি কিছু তাহার উদ্দেশ॥
ধর্মবন্ত নরপতি মহিমা সাগর।
অবিশ্রান্ত দানধর্ম করে নিরন্তর॥
রত্নসেন নামে তথা বৈসে মহারাজা।
কুকি মেখল সবে করে যার পূজা॥
চম্পা রাএ নাম তাত ধর্ম যুবরাজ।
রাজ্যের পালন করে মন্ত্রীর সমাজ॥

উল্লিখিত রত্নসেন তথা রত্নমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১০৯২-১১২১ ত্রিপুরাব্দ। রত্নমাণিক্যের পিতা রামমাণিক্যের ভাইপো চম্পক রায় রত্নমাণিক্যের দেওয়ান ছিলেন।[২৯৬]

সাদির 'গদা মল্লিকার পুথি'টি ১১২২ ত্রিপুরাব্দ বা ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়[২৯৭]. 'পড়িয়া বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ। একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ॥' সুতরাং সাদী অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের কবি। চম্পক রায়ের বিপদকালে সাদী তাঁকে সহায়তা করায় চম্পক রায় বিপদমুক্ত হয়ে সাদীকে রাজদরবারে চাকরি দেন। সেজন্য শেখ সাদীর জন্মস্থান চট্টগ্রাম হলেও তিনি তাঁর কাব্যে ত্রিপুরাধিপতির প্রশস্তি রচনা করেন।

সপ্তদশ শতকের শেষপাদের কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরীর 'মল্লিকার হাজার সওয়াল' কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে শেখ সাদীর 'গদা মল্লিকার পুথি'র কাহিনীগত সাদৃশ্য আছে। দুটি কাব্যেরই মূলভাব রোমান্টিক। রুম রাজকুমারী মল্লিকার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবদুল্লাহ নামের এক গদা বা ফকির রাজকুমারীকে লাভ করে রুমের সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কাহিনীর অভ্যন্তরে রোমান্স সৃষ্টির পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ব প্রকাশের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মল্লিকার প্রশ্ন ও গদার প্রশ্নোত্তরে ধর্মতত্ত্বের বাড়াবাড়ি থাকায় কাব্যরস তাতে জমাট বাঁধে নি। সাদির ছন্দ প্রকরণ শিথিল ও উপমাপ্রয়োগ গতানুগতিক। রাজকুমারী মল্লিকার প্রশ্নবাণে নীরস তত্ত্বকথা যেভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে,

তবে মালিকা এ পুছে ফকিরের আলয়।
এক বৃক্ষে বার ডাল আছিল নিশ্চয়॥
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত।
বেশি কম নাহি তাতে সম সরতাজ॥
সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সেহা রঙ্গ শুন কহি সার॥
এক এক পত্রে ধরে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।
আল্লাহর কুদরতের ফুল দিতে নাহি তুল॥

---

২৯৬ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬২
২৯৭ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২২৫

তবে সাদী একজন প্রকৃত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাল সম্পর্কে তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। ধূমপান যে কলিযুগে প্রসারিত হবে সে সম্পর্কে তাঁর বাণী,—

গদা কহে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ।
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ॥
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুব হতে।
হাঁটিতে চলিতে লোকে পিব পথে পথে॥
অন্ন হতে তামাকু জানিব বড় ধন।
তামাকুতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন॥
পিতায় তামাকু পিতে পুত্রে করে আশ।
তামাকু তু করিবেক ভুবন বিনাশ॥

কলির নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের এক লজ্জাজনক ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি,—

পুরুষ নারীর কথা ধরিয়া চলিব।
পুরুষেব কথা কভু নারী না ধরিব॥

অন্যদিকে 'সোয়ামীর সহিতে নাবীর না বৈব পীরিত।' এবং 'লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার।'

নওয়াজিস খান॥ নওয়াজিস খানের পূর্বপুরুষ সিলিম খান আভিজাত্য ও প্রতাপের জোবে চট্টগ্রামে নিজেব নামে সিলিমপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রাম মধ্যযুগের অন্যতম কবি আবদুন নবীরও জন্মস্থান। ডক্টব মুহম্মদ এনামুল হকেব মতে 'গুলে বকাউলি' কাব্যের কবি নওয়াজিস খান ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে একজন যুবক ছিলেন।[২৯৮] ডক্টর আহমদ শরীফ জানিয়েছেন কবি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯৯] এই দুই পণ্ডিতের বিবরণ অনুযায়ী বলা যায নওয়াজিস খান খুব দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন।

নওয়াজিস খানের 'গুলে বকাউলি' কাব্য, ডক্টর আহমদ শরীফের মতে, ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে রচিত হযে থাকবে। কাব্যেব কাহিনী রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। শর্কস্তানের রাজকুমাব তাজুলমুলকের সঙ্গে ইবরাজ্যেব রাজকুমাবী গুলে বকাউলিকে লাভ করতে তাজুলকে অনেক দৈত্যদানোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। বহুবিবাহে বাধা না থাকায তাজুল আরো অনেক কন্যার পাণিপীড়নে সমর্থ হয়। অন্ধ পিতা জয়নুলমুলকেব দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসে। নওয়াজিস খানের বর্ণনায় কাব্যের ছটা আছে। রচনায় সংস্কৃতবহুল তৎসম শব্দপ্রয়োগের ঘটাও অনেক। যেমন, ঘুমন্ত রাজকুমারীর বর্ণনা,—

সুবর্ণ মৃণাল ভুজ যুগল সুন্দর।
বলয় সংযোগে দোলএ নিরন্তর॥

---

২৯৮ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২১০
২৯৯ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৯

বারিজ বিকাশ পানি চম্পক অঙ্গুল।
মেহেন্দি সংযোগে নখে সুরিন্দ বহুল॥
সুবর্ণের স্তনে জিনি বালার্ক ঢাক।
কনক কটোরা তাহে যুগল সুমেরু॥
শিপরে ধরিছে কিবা প্রথম শ্যামল।
নতুন ছত্রধারী রাজা বসিছে যুগল॥
স্বীবধর গিরিকুচ হব নামে ধরে।
কবপূজা দিবারে কুমারে ইচ্ছা করে॥

নওযাজিস খানের 'বয়ানাত' ধর্মীয় বিষয়ের উপর লেখা একখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

পোরাওল বা পরাগল॥ পনেরো শতকের শেষপাদে গৌড়ে সম্রাট আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সেনানায়ক ছিলেন জনৈক পোরাওল বা পরাগল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁরই আদেশে 'পরাগলী মহাভারত' রচনা করেন। আমাদের আলোচ্য পরাগল-কবি একজন ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি 'শাহপরীর কেচ্ছা' শীর্ষক পুথির রচয়িতা। পুথিটি ফারসি কিতাব অবলম্বনে রচিত। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি,

শাহপরীর কেচ্ছা এবে সমাপ্ত হৈল।
ফারসী কিতাবেতে নেজামী রচিত।
বএত ভাঙ্গি পোরয়াওলে পএআর করিল॥

ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'পুথি পরিচিতি'তে উল্লিখিত হয়েছে—'শাহপরীর এ কিচ্ছা নিযামী গঞ্জাবীর (১১৪০ ১২০৭) সপ্ত পয়করের (১১৯৬) একটি গল্প অবলম্বনে রচিত।'[৩০০]

'শাহপরীর কেচ্ছা' একটি রোমান্টিক বিষয়ের উপর পরিকল্পিত। রোকাম শহরের শাহপরীর সঙ্গে রাজকুমার রূপবানের সাক্ষাৎ ও সেই সাক্ষাৎ থেকে উভয়ের মধ্যে প্রেম। কিন্তু শাহপরী অত সহজে ধরা দেবার পাত্রী নয়। প্রেমিককে বনে পাঠিয়ে দাইকে সে বলে,—

বিনে দুঃখে মোরে পাই, তিলেক আদর নাই।
কহিঅ কুমার বরাবরে।

এই কথা বলে শাহপরী উড়াল দিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে যায়। কুমার সদুঃখে ক্ষেদ করে বলে,—

রোকাম শহরে আমি করিমু গমন।
শাহপরী উদ্দেশিয়া তেজিমু জীবন।

পরে অনেক গিরি-মরু পার হয়ে কুমার তার প্রেয়সীর সাক্ষাৎ পায়,—

শাহপরীর মুখ যদি কুমারে দেখিল।
আকাশের চন্দ্র যেন হাতে হাতে পাইল।

---

৩০০ পূর্বোক্ত, 'পুথি-পরিচিতি', পৃ. ৫১৩

পোরাওল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের একজন মুসলিম কবি। কেননা তাঁর পরবর্তী অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম কবি মুহম্মদ মুকীম তাঁর কাব্যে 'পোরওল' বা পরাগলের নাম উল্লেখ করেছেন।

শুকর মাহমুদ॥ শুকুর মাহমুদ ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে শুকর মাহমুদের নিবাস ছিলো ত্রিপুরা জেলায়।

শুকুর মাহমুদের একমাত্র কাব্য 'ময়নামতীর গান'। ত্রিপুরাশ্বর গোপীচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীকে নিয়ে নাথসাহিত্যে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, শুকুর মাহমুদের কাব্যের বিষয়ও উক্ত কাহিনী। অনুমান করা হয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে শুকুর মাহমুদের কাব্যখানা রচিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে ময়নামতীর প্রখরা রূপটি আমাদের মুগ্ধ করে।

সৈয়দ নূরুদ্দীন॥ সৈয়দ নূরুদ্দীন তাঁর 'দাকায়েকুল হাকায়েক' পুস্তকের রচনাকাল সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন 'এগার স সাতানব্বই সন হইল যবে', তাতে কাব্যের রচনাকাল ১১৯৭ সাল বা ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ হয়। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে জীবিত ছিলেন। নূরুদ্দীন চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম আজিজ। বলা হয়েছে নূরুদ্দীনের একজন পীর 'ঢাকার আজিমপুর দায়রাশরীফের (পীর বাড়ির) সূফী মুহম্মদ দাইমের শিষ্য শাহ মুহম্মদ জাহিদ।'[৩০১]

সৈয়দ নূরুদ্দীনের নামে মোট চারখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হলো,— দাকায়েকুল হাকায়েক, মুসার সওয়াল, রাহাতুল কুলুব বা কিয়ামতনামা এবং হিতোপদেশ বা বুরহানুল আরিফীন। 'দাকায়েকুল হাকায়েক' ইমাম হাফিজুদ্দীন নফসীর আরবি ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'কনজুদ্ দ-দকায়িক' নামক গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এতে ইসলাম ধর্মীয় আচার আলোচিত হয়েছে। মাত্র বারো পাতায় সমাপ্ত 'মুসার সওয়াল' কাব্যখানি কোনো আরবি কিংবা ফারসি গ্রন্থের সার- সঙ্কলন মাত্র। এতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হজরত মুসা এবং আল্লাহতায়ালার মধ্যে কথোপকথন হয়েছে। উনত্রিশ অধ্যায়ে সমাপ্ত 'রাহাতুল কুলুব' কাব্যগ্রন্থে হাদিস তফসির থেকে বিভিন্ন উপদেশ যেমন,- কিয়ামতের কথা, পিতামাতার হক, দোজখের কথা, বেহেশতের কথা, রোজা নামাজের কথা, সুরাপানের কুফল ইত্যাদি আহরণ করে সম্যক আলোচিত হয়েছে। সৈয়দ নূরুদ্দীনের 'হিতোপদেশ' গ্রন্থের মূল বিষয় সুফীতত্ত্ব। কবির সর্বশেষ এ কাব্য সম্ভবত ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়ে থাকবে।

ধর্মীয় বিষয়ের উপর সৈয়দ নূরুদ্দীনের যথেষ্ট দক্ষতা ছিলো। তাঁর কাব্যের জ্ঞানগর্ভ বাণী সেই নিদর্শন। বাংলা এবং আরবি উভয় হরফেই তাঁর কাব্য প্রচারিত হয়েছে। হিতোপদেশ থেকে উদ্ধৃত তাঁর ভাষার কিছু নমুনা,--

> বারশ তিন সনে পুস্তক লিখা যায়।
> পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিবে সবায়॥

৩০১ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৬

বোরহানুল আরেফিন কিতাব দেখিয়া।
কহি হিত উপদেশ বাংলা রচিয়া॥

দাকায়িক থেকে,—

সৈয়দ নূরুদ্দীন কয় আজিজ-নন্দন।
বিরচি কহি যে আমি শুন গুণিগণ॥
এগারশ সাতানব্বই সন হৈল যবে।
পুস্তক বাংলা কৈলু শুন নর সবে॥

শমসের আলী॥ ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাকির আগার 'গুলজারে ইশ্ক' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাহিনী অবলম্বনে শমসের আলী তাঁর 'রিজওয়ান শাহ' কাব্যখানা লেখেন। বাকির আগার কাব্যের সূত্র ধরে শমসের আলীকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের লোক মনে করতে পারি। কাব্যখানা অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। 'রিজওয়ান শাহ' বিষয় ভাবনায় একখানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। উপাখ্যানের পটভূমি খোরাসান ও পারস্য। কিন্তু চরিত্রসমূহ বাঙালি হিন্দুর নামাঙ্কিত। যেমন হীরালাল, চিত্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী ইত্যাদি। শমসের আলীর ভাষা সংস্কৃতানুগ, ললিতমধুর ও ছন্দঝঙ্কৃত।

শাকির মাহমুদ॥ শাকির মাহমুদের 'মধুমালতী' কাব্যের রচনাকাল ১১৮৯ সাল বা ১৭৮১/৮২ খ্রিস্টাব্দ। অতএব তিনি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। শাকির মাহমুদ রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিপুর পরগণার বিকাইতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিকাইতপুর গ্রামখানি বর্ধনকুঠির রাজা গৌরনাথের জমিদারীভুক্ত ছিলো।

শাকির মাহমুদের 'মনোহর মধুমালতী' কাব্য একখানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। কাব্য রচনাকালে কবির বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কবির একটি উক্তি। যেমন,

মধুমালা মনোহর কিতাব নিকটে।
পাইয়া পাঁচালী দীর্ঘ রচি কহো ঝাঁটে॥
আনন্দ উৎসব মন ঈদের দিবসে।
সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয় আকাশে॥
একাদশ শত সাল উন অষ্ট আশী।
ফারসী বাঙ্গালা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি॥
বয়ঃক্রম শুন মোর কুড়িপর দুই।
বাইশ বছর বয়স মাত্র না বুঝি প্রমাই॥

মুহম্মদ আলী॥ মুহম্মদ আলীর জন্ম ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে।[৩০২] তাঁর নিবাস ছিলো চট্টগ্রাম জেলার আজিমনগরের অন্তর্গত ইদিলপুর গ্রাম। মুহম্মদ আলীর দুখানি প্রণয়োপাখ্যানমূলক

---

৩০২ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২৮৪

কাব্য 'শাহাপরী মল্লিকজাদা' ও 'হাসন বানু'। শেষোক্ত কাব্যখানা ইয়ার আলী নামক জনৈক ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। লেলাঙ্গের জমিদার ইউসুফ হাফেজের নির্দেশে কবি ফারসি কিতাব থেকে 'ছায়রাতুল ফিকাহ' নামক একখানি ধর্মীয় পুস্তক লেখেন। এ গ্রন্থ থেকে কবির ভাষার নিদর্শন হিসাবে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত হলো,—

আর এক জাহিল কথা শুন মন করি।
বন্দিতে রাখিছে এক মুসলমান ধরি॥
অন্নজল ভক্ষ্য দ্রব্য না দেয় খাইবারে।
দুই তিন দিন কিবা রাখে অনাহারে॥
রান্ধিয়া শূকর মাংসে সম্মুখ আনিয়া।
খাইতে করয় আজ্ঞা তাড়িয়া তাড়িয়া॥
পদুত্তর কহ কি ভক্ষিব না ভক্ষিব।
অনাহারে বন্দীতে কিরূপে রহিব॥
খাবার খাইয়া প্রাণ রাখিব তাহার।
না খাইয়া যুক্ত নহে মৃত্যু হইবার॥

মুহম্মদ জান॥ মুহম্মদ জান অষ্টাদশ শতকের কবি।[৩০৩] কবির ব্যক্তি-পরিচয় অজ্ঞাত। মুহম্মদ জানের একটিমাত্র কাব্য 'নামাজমাহাত্ম্য' অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৩০৪] কাব্যের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানা আরবি হরফে লেখা। ধর্মকথা আরবি হরফ ব্যতীত বাংলা হরফে লেখা চলে না, কবির মনোভাব ছিলো এই রকম। কাজেই তিনি বাংলা ভাষার কাব্য আরবি হরফে রূপ দেন। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি,—

আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
আরবী আঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন॥
বুঝি সুজি কার্য্য কৈলে পাপ ঘোরতর।
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর॥

মুহম্মদ মুকীম॥ মুকীম তাঁর 'ফায়দুল মুক্তদী' কাব্যের রচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,—

ঋতু বেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়।
ইতি সার জ্ঞান মঘী সনের নির্ণয়॥
শ্রাবণের শেষ পক্ষ দিন জুমাবার।
বেলা অবসানে হৈল পয়ার সুনার॥

কাব্যখানি বিশ্লেষণ করে ১১৩৫ মঘীসন বা ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। মুহম্মদ মুকীমের পূর্বপুরুষ নোয়াখালি জেলার ফেনীর অধিবাসী ছিলেন। রাজনৈতিক গোলযোগে তাঁরা প্রথমে চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ, পরে ফটিকছড়ির অধীন আজিমপুর এবং শেষ পর্যন্ত রাউজান থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। মুহম্মদ মুকীম নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মুকীমের পিতা সৈয়দ মুহম্মদ দৌলত এবং পিতামহ আফজল। শৈশবে পিতৃহীন হলে

৩০৩ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২২০
৩০৪ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ২২০

জীবন হোসেন নামে মুকীমের জনৈক প্রতিবেশী তাঁকে লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। জীবিকার উপায় হিসেবে পরিণত বয়সে মুকীম জমিদার আলী আকবর চৌধুরীর সেরেস্তায় কার্যগ্রহণ করেন।

মুহম্মদ মুকীমের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো,--'গুল-ই-বকওলী', 'কালাকাম', 'মৃগাবতী', 'আইয়ুব কথা' ও 'ফায়দুল মুকতদী'। কবির প্রৌঢ় বয়সের প্রথম কাব্য 'গুল-ই-বকওলী' ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রচনা এবং এতে তিনি প্রয়োজনবোধে স্বকপোলকল্পিত কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত করেছেন। মুহম্মদ মুকীম এ কাব্যে ছন্দ-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সঙ্গীত এবং হিন্দু ও মুসলমানি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে জ্ঞানের বিষয়কে তিনি কুশলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, সেই সূত্রে তাঁকে কবি আলাওলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কবির অন্যান্য কাব্যগুলো ধর্মীয় বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এক 'ফায়দুল মুকতদী' ছাড়া অন্যান্য তিনখানা পাণ্ডুলিপি অনাবিষ্কৃত থাকায় এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। ধর্মীয় বিষয় মুকীমের 'ফায়দুল মুকতদী'র দেহগঠনে সহায়ক হয়েছে। তাঁর ভাষার নিদর্শন হিসেবে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত হলো,

প্রেমরস কাব্য কথা সুগন্ধি শীতল।
কালাকাম ভাঙ্গি কৈলু পয়ার নির্মল॥
মৃগাবতী নামে তার পরীর নন্দিনী।
মিত্র স্থানে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী॥
মোরে আজ্ঞা দিলা পীর রচিতে পয়ার।
দেশী ভাষে বঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার॥
আয়ুব নবীর কথা আছিল কিতাবে।
পয়ার না কৈলু তাতে মন্দ কহে সবে॥

মুহম্মদ রফিউদ্দীন॥ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি জীবিত ছিলেন। কবির পিতার নাম আশরাফ। সপ্তদশ শতকের কবি সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের 'জেবলমুলক শামারোখ' নামক কাব্যের অনুসরণে মুহম্মদ রফিউদ্দীন একই নামে তাঁর কাব্যটি প্রণয়ন করেন। অবশ্য রফিউদ্দীন তাঁর কাব্যে নতুন কিছু সংযোজন করতে পারেন নি। দৈত্য দানব, ঝড় ঝঞ্ঝা ও যুদ্ধবিগ্রহ শেষে জেবলমুলক গন্ধর্বকুমারী শামারোখকে লাভ করে, অন্যদিকে জেবলমুলকের বন্ধু ফোরখপাল লাভ করে রাজকন্যা পিয়ারেখাকে। অবশ্য জেবলমুলকের তিন পত্নী ছিলো,--

শিরিলর, শামারোখ অর সনুবর।
একপতি কোলে মিলি রঙ্গে পরস্পর॥
বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ।
সুখের নগর ধন্য চামরী সুরাজ॥

মুহম্মদ জীবন॥ উনিশ শতকের বিশিষ্ট কবি মুহম্মদ চুহর তাঁর পূর্বসুরি কবি হিসেবে মুহম্মদ জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তা থেকে জানা যায় কবি মুহম্মদ জীবন ছিলেন

কবি চুহরের আশ্রয়দাতা জাফর আলীর শিক্ষক। জীবনের কাব্য-রচনায় যিনি তাঁর প্রেরণাদায়ক হিসেবে কাজ করেন, তাঁর নাম আবদুল মজিদ। এই মজিদ সাহেব ১৮০৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত টাকশালের একজন চাকুরে ছিলেন। সেই হিসেবে জীবনকে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকের কবি মনে করা যায়। জীবনের দুটি কাব্যের মধ্যে 'কামরূপ কালাকামে'র কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় কাব্য 'বানুহোসেন বাহরামগোর' খণ্ডিত আকারে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। 'বানুহোসেন' সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'বানুহোসেনের কাব্য অমৃত সদৃশ ভব্য।' কাব্যের বিষয় প্রেম। পারস্যের বাদশাহ বাহরামের সঙ্গে পরীজাদী বানুহোসেনের প্রণয়কাহিনী একাব্যের উপজীব্য।

সৈয়দ মুহম্মদ নাসির/সৈয়দ নাসির ॥ দুই নাসিরের নামে দুটি কাব্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে সৈয়দ মুহম্মদ নাসিরের 'বেনজীর বদর-ই মুনীর' খণ্ডিত আকারে প্রাপ্ত একখানি পুথি। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে উর্দুতে মীর হাসান দেহলভী 'সিহরুল বয়ান' বা 'বেনজীর বদর-ই মুনীর' নামক যে প্রণয়োপাখ্যানটি রচনা করেন, তাকে অবলম্বন করে সৈয়দ মুহম্মদ নাসির বাংলায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। কাব্যের কাহিনীটি হচ্ছে রাজকুমার বেনজীর ও রাজকুমারী বদরে মুনীরের প্রেম।

অপর কবি **সৈয়দ নাসিরের** কাব্যের নাম 'সিরাজ সবিল'। কবির দেওয়া দীর্ঘ আত্মবিবৃতি থেকে জানা যায় তাঁর পূর্বপুরুষ শাহ সুজার অনুচর ছিলেন। তিনি সাতকানিয়ার আমীরাবাদ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ নাসির আঠারো শতকের শেষ দুই দশকে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। পুথিতে কবির ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ আছে। তাতে তাঁর দারিদ্র্যের কথা নির্দ্বিধায় বলা হয়েছে। কবির রচনায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টার প্রতি আত্মনিবেদনের সুর মারফতী কায়দায় ধ্বনিত হয়েছে ; যেমন, 'তুই যন্ত্রী মুই যন্ত্র, আর নিরঞ্জন' ইত্যাদি।

মুহম্মদ কাসিম ॥ অনুমান করা হয় মুহম্মদ কাসিমের জন্ম ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।[৩০৫] কবির জন্মস্থান নোয়াখালি জেলার বুগীদিয়া নামক গ্রাম। তাঁর পিতার নাম শাহ আজিজ। মুহম্মদ কাসিমের তিনখানা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হলো, হিতোপদেশ, সুলতান জমজমা ও সিরাজুল কুলুব। সুফীতত্ত্বের বিষয়কে কেন্দ্র করে আরবি গ্রন্থ 'বুরহানুল আরিফীন'-এর অনুবাদের মাধ্যমে কবি 'হিতোপদেশ' কাব্যখানা রচনা করেছেন। হজরত ঈসার (আঃ) অনুগ্রহে সুলতান জমজমার পুনর্জীবনের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে 'সুলতান জমজমায়'। 'সিরাজুল কুলুব' গ্রন্থে বিসমিল্লার বয়ান, সুরা ফাতেহার বাখান, নামাজতত্ত্ব, রোজাতত্ত্ব, হাদিস তত্ত্ব, জিকিরের মাহাত্ম্য, রসুলের কথা, হাসর বেহেস্তের বিবরণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। মুহম্মদ কাসিম জনকল্যাণের দিকে নজর রেখে শাস্ত্রীয় বিষয়ের নীতিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই তাঁর কাব্যরচনার প্রয়াস উদ্দেশ্যমূলক ও নীতিবাহক হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই শিল্পের লালিত্য তাতে অনুপস্থিত।

---

৩০৫ পূর্বোক্ত, 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', পৃ. ১৮৬

মুহম্মদ নকী॥ মুহম্মদ নকী অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। তিনি চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া নকী কবি নওয়াজিশ খানের শিষ্য ছিলেন। চট্টগ্রামের ত্রাহিরাম নামক এক হিন্দু জমিদারের আদেশে মুহম্মদ নকী তাঁর 'তুতীনামা' কাব্যখানি ফারসি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেন।

মুহম্মদ বাকির আগা॥ বাকির আগা অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের লোক। তাঁর নিবাস চট্টগ্রাম জেলা। মুহম্মদ বাকির আগার 'গুলজারে ইশ্‌ক' কাব্যখানি ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। কাব্যের কাহিনীটি রোমান্টিক। হরিণীবেশী রুহ আফজার সঙ্গে চীনের রাজকুমার লিজ্জওয়ান শাহের প্রণয়জীবনের রোমান্টিক কাহিনীকে এ কাব্যে রূপায়িত করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আকিল॥ মোহাম্মদ আকিল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি অষ্টাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। তাঁর কাব্যের নাম 'মুছানামা'। আকিলের শব্দপ্রয়োগে প্রাচীনত্বের চিহ্ন বিদ্যমান।

বালক ফকির॥ বালক ফকির ছিলেন মারফতী ধারার কবি। তাঁর পূর্ববর্তী কবি 'জ্ঞানসাগর' পুঁথির রচয়িতা আলী রজা ওরফে কানু ফকির ছিলেন বালক ফকিরের গুরু। আলী রজা নিজেও মারফতী বিষয়ে খ্যাতিমান ছিলেন। সম্ভবত গুরুর প্রভাবে শিষ্য ধর্মীয় বিষয়ে কাব্য রচনায় উৎসাহিত হন। 'ফাএদুল মুকতদি' তাঁর সেই উৎসাহের ফসল। এই কাব্যে বালক ফকির গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন,

ফাএদুল মোক্তাদি এই কিতাবের নাম।
বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লেখিলুঁ উপাম॥
শাহা আলী রজা গুরু পদে নমস্কারি।
বালক ফকিরে ভণে কিতাব বিচারি।

হয়তো সমসাময়িককালে বালক ফকির আরো কিছু জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকবেন। সেই সূত্রেই সম্ভবত ইংরেজ আমলের প্রথম দিকের একজন বিশিষ্ট চট্টগ্রামবাসী কাজী শাহাবুদ্দিনের নাম উল্লেখ করে কবি বলেছেন,--

শাহাবদ্দি নামে এক আলিম প্রধান।
ছৈয়দ বংশত জন্ম অতি গুণবান॥
চাটিগ্রাম দেসে ছিল তাহান বসতি।
সাহসিক ধনবন্ত সুকুলীন অতি॥

ডক্টর আহমদ শরীফ মনে করেন কাজী শাহাবদ্দী ও আলি রজা আঠারো শতকের শেষার্ধ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক। সেই সূত্রে বালক ফকিরকেও সেই সময়ে ফেলা যায়।[৩০১] এবং তিনি যে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন সে ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বালক ফকিরের 'ফাএদুল মুকতদি'ও ইসলাম ধর্মের পালনীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে

৩০১ পূর্বোক্ত, 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,' ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৮

রচিত। একজন সদাচার মুসলিমের কর্তব্য তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মানুমোদিত কাজের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করা। 'ফাএদুল মুকতদি'ও ইসলাম ধর্মের পালনীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। পুথিতে সে সম্পর্কে উপদেশ আছে। 'ফাএদুল মুকতদি' ছাড়াও বালক ফকির 'সত্যপীর পুথি' রচনা করেছেন। তাছাড়া তাঁর নামে 'বালক ফকিরের গান'ও রয়েছে।

আরিফ।। ডক্টর আহমদ শরীফের মতে আরিফ অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের কবি। তিনি 'লালমনের কেচ্ছা' শীর্ষক প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা। ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন আরিফ দেসড়া অঞ্চলের নিকটবর্তী দক্ষিণ রাঢ়ের তাজপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৩০৭] কেননা কবি বলেন,—'দেশড়া দক্ষিণে ঘর তাজপুর মোকাম।' আরিফ তাঁর কাব্যে জনৈক নেওয়াজ গাজীর নাম উল্লেখ করেছেন, -

সত্যের কউসে যে আরিফ কবি গায়।
লাএকে নেয়াজ গাজী ধরি তোমা পায়।

নেওয়াজ গাজী সম্ভবত কবির পীর ছিলেন। সত্যপীরের পাঁচালীর ধারায় রচিত আরিফের 'লালমনের কেচ্ছা'র কাহিনীটি চমৎকারভাবে পরিকল্পিত। এ কাব্যের নায়ক নায়িকার ভাগ্যনির্ধারণে সত্যপীরের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কাহিনীটি হচ্ছে লালমন ও হোসেন শাহ বাদশার ভুলের জন্য সত্যপীরের রোষ ও তার পরিণামে উভয়ের অশেষ দুর্গতি, শেষ পর্যন্ত লালমন ও হোসেন শাহ অনুতপ্ত হয়ে সত্যপীরের মসজিদ তৈরি করে দেয় ; তখন উভয়ের মিলন সম্ভব হয়। কাব্যটি রোমান্টিক। নানা কারণে এ কাব্যে অলৌকিকতার প্রভাব দেখানো হয়েছে। বাদশা তরবারীর আঘাতে নিহত হয়েও সত্যপীরের কেরামতিতে প্রাণ ফিরে পায়। এইসব অলৌকিকতার প্রকাশ সত্ত্বেও কাব্যটি জনপ্রিয় হয়। সম্ভবত সাধারণ মানুষ পুথির জগতে অলৌকিকতার প্রকাশে আনন্দ পায় বেশি ; সেই কারণে তা দেখানো হয়। তবে আরিফ অপরূপ যৌবনশালিনী লালমনকে তার দেহরূপের বর্ণনা-ছলে প্রায় নগ্ন করে ছেড়েছেন। যেমন,-

এক রোজ লালমন হইআ খোসালিত।
গোছল করিতে বিবি চলিল ত্বরিত।।
গোছল করিয়া বিবি আইল মোহলে।
বাল শুখাইতে গেল বালাখানা পরে।।
পাছু পানে ঝারে কেশ ছাতি হেলাইয়া।
হৃদয় কাচলি তার পরিল খসিয়া।।
উলঙ্গ হইল বিবি কোম্বর হইতে।
হোসেন সা বাদসা তাহা পাইল দেখিতে।।
দেখিয়া বাদসার বেটা বোলে হাএ হাএ।
খানাপিনা নাই খায় সেই দিন ত্বাএ।।

---

৩০৭ পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৫৬ ৪৫৭

আবদুস সামাদ।। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে আবদুস সামাদ অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের কিংবা উনিশ শতকের প্রথম পাদের কবি। কবির নিবাস চট্টগ্রাম জেলার শুলকবহর নামক স্থান। তিনি শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ থেকে প্রেমমূলক আখ্যানগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন।

দানিশ।। দানিশ নামধারী বেশ কিছু কবির নাম পাওয়া যায়। মুহম্মদ মুকীম তাঁর 'গুলে বকাউলি' কাব্যে এক দানিশের নাম উল্লেখ করেছেন, যিনি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অন্য এক দানিশ সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের ফারসি অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করে তাঁর কাব্যের নাম রাখেন 'স্তানবসন্তবাণী'। আর একজন শায়েরকবি দানিশ নামে পরিচিত। তিনি অনেকগুলো জনপ্রিয় পুথি লিখেছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে তাঁর পুথিগুলো বটতলার পুথি হিসেবে পাঠকের প্রশংসা অর্জন করে এবং জনসমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এসব পুথির মধ্যে রয়েছে 'চাহার দরবেশ', 'হাতেমতাই', 'গোলে নূর সানুয়ার' বা 'গুল ও সানুবর' এবং 'নূর উল ইমাম'। পুথিগুলোর রচয়িতা নিজের পরিচয় ছলে বলেছেন, 'শিবপুর ঘর মেরা শুন হোসমন্দ। রফি মোল্লার আমি প্রথম ফরজন্দ।।' উল্লিখিত শিবপুর হাওড়া অঞ্চলের হতে পারে। কবি অষ্টাদশ শতকের শেষ বা উনিশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। কেননা তাঁর ভাষা পুথির ভাষা হলেও তাতে আধুনিকতার স্পর্শ আছে।

অষ্টাদশ শতকে কয়েকজন **হিন্দুকবি** প্রণয়োপাখ্যান রচনায় উৎসাহিত হন। এই সব কবি ও তাঁদের কাব্য হিসেবে রামজীবন দাস বা রামজয়ের 'শশিচন্দ্রের কাহিনী', সুশীল মিশ্রের 'রূপবান রূপবতী উপাখ্যান', দ্বিজ পশুপতির 'চন্দ্রাবলী উপাখ্যান', গোপীনাথ দাস রচিত 'মনোহর মধুমালতী', ও রাণীরাম দাস রচিত 'শীতবসন্ত উপাখ্যানে'র নাম করা যায়। মুসলমানি প্রণয়োপাখ্যানের ধারাটি যে হিন্দুদেরও আকৃষ্ট করে, এই তালিকা থেকে তা বোঝা যায়। এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্কার অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো বলে মনে হয় না। আসলে সাহিত্যের বিষয় যে ধর্মনিরপেক্ষতার সীমা লঙ্ঘন করে না, কথাটি খুব সত্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের লক্ষণব্যঞ্জক কতিপয় সাহিত্যের ধারা

(খ্রিস্টীয় ১৮-১৯ শতক)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বাঁকবদল

মধ্যযুগের শেষপর্বের বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা যেমন শাক্ত পদাবলী, ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গগীতিকা ইত্যাদি সাহিত্যকর্ম মধ্যযুগের আদর্শ পুরোপুরি রক্ষা করেও ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জিত করেছে। অন্ত্যপর্বের বাংলা সাহিত্যের এসব ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দুই।। শাক্ত-পদাবলী

মঙ্গলকাব্যে শক্তিপূজার আদর্শ দেখা যায়। অর্থাৎ দেবদেবীদের মধ্যে শক্তি এবং সামর্থ্যের যে পরিচয় কবিরা লক্ষ্য করেছেন, তাতে ঐসব দেবদেবী অনায়াসে কবিদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। সাধারণ মানুষও ক্রুর দেবদেবীদের শক্তি সামর্থ্যের কাছে তখন নির্বিবাদে আত্মসমর্পণ করে। শাক্ত পদাবলীতে সেই শক্তির দেবীকেই ভক্ত তার ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে ধন্য হয়।

আসলে শাক্ত পদাবলীতে প্রেমের বদলে শক্তির নিষ্ঠুর দিকটিকেই সাধনা করা হয়েছে। সেজন্য প্রেমধর্মকে আচ্ছন্ন করে এবং বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ও নিবেদনের সব দুর্বলতা পরিহার করে জিঘাংসার হিংস্র প্রবৃত্তি শাক্ত সাধনার মূলে দুর্বার হয়ে কাজ করেছে। বৈষ্ণব-সাধনায় সংসারের প্রতি উদাসীনতার যে প্রকাশ, শক্তি সাধনায় তার ঠিক উল্টো দিকটাই চোখে পড়ে। সেজন্য দেখা যায় শাক্তরা সংসার এবং বৈষয়িক ব্যাপার থেকে নিজেদের কখনো আলাদাভাবে চিন্তা করেন না। বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বে পরকীয়া প্রেমের যে সাধনা, সমাজ তাকে খুব একটা সুনজরে দেখে না। চৈতন্যদেবের সভক্তি সমর্থন পাওয়ায় এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়সঞ্জাত ধর্মের প্রভাব এই পরকীয়া প্রেমের ধারায় বিদ্যমান থাকায় হিন্দুসমাজের একটা মৌন স্বীকৃতি তাতে আছে বটে, কিন্তু এই অবৈধ প্রেমের আদর্শকে সমাজ যেন আর মেনে নিতে পারছে না, -ক্রমশ একরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার বদলে শক্তি-সাধনায় মাতার প্রভাবই সমাজে বেশি কার্যকর হয়। পরে এই প্রভাব অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। মা এবং সন্তানের মধ্যে প্রবহমান স্নেহ ও মমতার ধারাটি শক্তি-সাধনার মূলে বেশি প্রভাব সঞ্চার করে। তাই মাতার প্রতি আত্মনিবেদনের আরতিকে প্রথম শর্ত হিসেবে পালন করেন শাক্ত-পদাবলীর কবিগণ।

তথাপি শাক্ত পদাবলীতে আমরা যে শক্তির বন্দনা লক্ষ্য করি, হিন্দুদের দেবী কালীই যে তার অভিলক্ষ তা বোঝা যায়। তবে মা হয়ে কেমন করে তিনি যে সন্তানের রক্তপানের বীভৎস আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, এই বিরুদ্ধ অনুষঙ্গ কোনোক্রমেই যেন কোনো সুস্থ চিন্তার বাহন হতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও কালীর এই ভয়ঙ্কর আচরণের মধ্যেই যে তন্ত্রসাধনার আসল চরিত্র ধরা পড়ে, যতই তা বিরুদ্ধ কিংবা বীভৎস হোক, শক্তিসাধক তাকেই যে

আদর্শ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এমন ব্যাপার শক্তি-সাধনার মূল অভিলক্ষ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। এতে কালীভক্তদের মনে কোনো সংস্কার কাজ করেছে কিনা সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও যদি শাক্ত-পদাবলীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করি, তাহলে লক্ষ্য করবো,---যে শ্মশানচারিণী, নরকঙ্কালধারিণী রক্তপিপাসু দেবী তন্ত্রসাধনার মূলে শক্তি যোগিয়েছেন, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি দেবীর এত সব নিষ্ঠুর আচরণের পরিচয় পেয়েও তাঁকেই বাৎসল্যের উৎসরূপে বিবেচনা করে নিজেকে সেই নির্মম মাতৃদেবীর কোলের সন্তান মনে করেছেন এবং তাঁরই কাছে এমন সব আবদার, আবেদন এমন কি মান অভিমান করে মাতৃস্নেহ আদায় করার প্রয়াস পেয়েছেন, যার অনুষঙ্গ বাঙালির মাতৃকল্পনাকেই পূর্ণতা দেয়। কালীর সংহারমূর্তিকে ঘিরে ভক্তচিত্তের স্নেহব্যাকুলতার যে প্রকাশ, প্রকৃতপক্ষে তারই মধ্যে সূচিত হয়েছে মাতৃবন্দনার সকরুণ দিক।

শাক্ত পদাবলীর যুগ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্যাপৃত। কবিদের অধিকাংশই গৃহী, কিন্তু দেবীর প্রতি পরম ভক্ত ও নিবেদিত। কেউ কেউ যথার্থই সংসার নির্লিপ্ত, ত্যাগী, কেউ কেউ রাজ রাজড়াদের বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন। তবে অন্তরে তাঁরা সবাই শ্যামার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। মায়ের কোলে শিশু হয়ে থাকার অভিলাষ তাদের শ্যামাসংগীতের মূল প্রেরণা। সাধক কবিদের পদগুলো বিশ্লেষণ করলে মনে হবে তাঁরা আসলে এক ধরনের বয়স্ক শিশু। শিশুর বেশে তাঁরা শ্যামা মাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে যে আবদার আবেদন এবং মান অভিমান করেছেন তাতে মনে হবে মায়ের অঞ্চলাশ্রয় ছাড়া তাঁদের যেন আর কোনো গতি নেই।

ইংরেজ আমলের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শাসন ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য ক্লেশের কথা অবলীলায় ব্যক্ত হয়েছে শাক্ত পদাবলীতে। এ কারণে সেই বিশেষ কালের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট শাক্তকবিদের এই চিত্রধর্মী রূপায়ণের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।

তিন।। শাক্ত-পদাবলীর কবি

রামপ্রসাদ সেন, কবিরঞ্জন।। রামপ্রসাদ সেনের জন্ম অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে।[৩০৮] অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষকাল অবধি তিনি জীবিত ছিলেন। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি চব্বিশ পরগণার হালিসহরের নিকটস্থ ভাগীরথী তীরবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে কুলীন বৈদ্যবংশে ধন্বন্তরী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কবির পিতা রামরাম সেন, পিতামহ রামেশ্বর। রামেশ্বর স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ায় তিনি কলকাতার নিকটস্থ কোনো এক ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীর মুহুরীর কাজ গ্রহণ করেন। কবির বিরাট পরিবার ছিলো। ছোট ভাই বিশ্বনাথ, দুইবোনের মধ্যে অম্বিকা জ্যেষ্ঠা ও ভবানী

---

৩০৮ পূর্বোক্ত, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃ. ৪৯৩

কনিষ্ঠা। কবির দুই পুত্র রামদুলাল ও রামমোহন এবং দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদেশ্বরী। বৃহৎ পরিবারের এই বিরাট দায়িত্বে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন, কালক্রমে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। হিসেবের খাতায় 'আমায় দাও মা তহবিলদারী। আমি নিমকহারাম নই মা শঙ্করী', এই জাতীয় কালীকীর্তন লিখে তাঁর ভাবতন্ময়তার পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে এই ভাবোন্মাদ রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন।

রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। শ্যামাসংগীত, আগমনীগান ও বিজয়াগান রচনায় তিনি যে ভাবতন্ময়তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সমাজে একজন সিদ্ধ পুরুষরূপে তাঁর খ্যাতি অর্জন হয়। তাঁর শাক্ত-পদাবলীতে বাঙালির সমাজীবনের হাসিকান্না বেদনার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল জাতীয় কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' ঘরোয়া ভাবের অপূর্ব প্রকাশে শুদ্ধস্নিগ্ধ। কীর্তনগান ভেঙে রচিত তাঁর 'কালীকীর্তন' পাঁচালী জাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। রামপ্রসাদ একজন ভালো গায়কও ছিলেন। তাঁর রচিত গান জনসমাজে 'রামপ্রসাদী গান' নামে খ্যাত। বর্তমান বাংলাদেশে দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে একজন শাক্ত কবি আলোচ্য রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তবে হালিশহরের রামপ্রসাদই যে 'রামপ্রসাদী গানের' রচয়িতা এমন মনে করার কারণ আছে।

আজু গোঁসাই নামে জনৈক বৈষ্ণবভক্ত কবির সঙ্গে রামপ্রসাদের কবির লড়াই হতো। এই লড়াইয়ের মধ্যে এক ধরনের কৌতুকের মিশ্রণ ছিলো বলে লড়াইটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠতো। দুজনের তর্কবিতর্কে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বর্ষণ হতো অবিরলভাবে। রামপ্রসাদের 'কালীকীর্তন' গ্রন্থে উমাকে কৃষ্ণের মতো বাঁশী বাজিয়ে গোরুকে আহবান করার যে একটি অদ্ভুত অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে, সেটি আজু গোসাইয়ের বিদ্রূপের উপকরণ যোগায়। আজু বলেন, 'জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।' সেজন্যই ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,--'কালীকীর্তনে রামপ্রসাদের প্রতিভা বিকাশের পথ পায়নি।'[৩০৭]

রামপ্রসাদী গান॥ সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন 'কালীকীর্তন', 'কৃষ্ণকীর্তন' ও 'বিদ্যাসুন্দর' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যক্তিরসের যে ধারাটি অনায়াসে পদাবলীর মধ্য দিয়ে বয়ে আসছিলো, সেই আদর্শেরই চমৎকার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় রামপ্রসাদের গানে। তবে রামপ্রসাদ যে ভক্তিরসের প্রবর্তন করেন, তার অন্তর্নিহিত সুর মাতা ও সন্তানের স্নেহনিবিড় সম্পর্ককে ঘিরেই উৎসারিত।

রামপ্রসাদ তিন শতাধিক শাক্তপদের রচয়িতা। তার মধ্যে গভীর তত্ত্বঘটিত পদগুলো বাদ দিলে তাঁর শ্যামা, বিজয়া ও আগমনী সম্পর্কিত গানগুলো বাংলা সাহিত্যের অমর সম্পদ। জননী ও সন্তানের মধ্যে যে মমতার সম্পর্ক, তাকে ঘিরে মায়ের প্রতি সন্তানের আবদার, মান-অভিমান এবং না-পাওয়ার দুঃখে কটূক্তি,--সাহিত্যে এরকম সম্পর্কের উপস্থাপনা কোনো জটিল অধ্যাত্মতত্ত্বের বাহন নয়, বরং এসব পদের মধ্যে অবলীলায় ফুটে

ওঠে বাঙালির চিরকালের ধূলিধূসরিত বাস্তব সংসারের চাওয়া-পাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পর্শকাতর প্রতিচ্ছবি। সংসারের অসহনীয় যাতনায় কাতর কবি হয়তো অভিমানবশে মায়ের প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ করে বলেন,-

মা মা বলে আর ডাকব না।
মা দিয়েছ, দিতেছ, কতই যাতনা॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী, বানালি সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী॥
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব।
মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না॥
রামপ্রসাদ ছিল গো মায়েরই পুত্র।
মা হয়ে হলি গো ছেলেরই শত্রু॥
মা বর্তমানে এ দুঃখ সন্তানের।
মা থেকে তার কি ফল বল না॥

কিন্তু দুঃখকে ধারণ করে সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা মোকাবেলা করার মধ্যে যে এক ধরনের অহঙ্কার থাকে, অভিমানী ক্ষুব্ধ কবি শ্যামা মাকে সে কথাটি জানিয়ে মনে তৃপ্তি আনেন,-

আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জনম গেল, আর কত দুখ দেও দেখি তাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেও যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই॥

রামপ্রসাদের সংসারে দুঃখ দারিদ্র্য ছিলো, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। হয়তো আশার ছলনে ভুলে তিনি মোহের পেছনেও ছুটেছেন। কিন্তু সামাজিক অপ ব্যবস্থা তাঁর আশাপূরণে ব্যর্থতা আনে। তখন শ্যামা মায়ের চরণ ধরে তাঁকে তাঁর সেই দুঃখের বাণী শোনান,-

আমায় দেও মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধুলার অধিকারী॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য॥ অনুমান করা হয় কমলাকান্ত ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের চান্না গ্রামস্থ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমান-রাজ তেজচন্দ্র তাঁকে বর্ধমান শহরের কোটালহাটে একটি বাসগৃহ তৈরি করে দেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জন' নামক একখানি তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তাঁর ভক্তিরসের সঙ্গে কবিত্বের চমৎকার মিলন ঘটেছে। তিনি প্রচণ্ডভাবে কালীভক্ত ছিলেন, তবে তাঁর আগমনী ও বিজয়াপর্বের গানগুলোতে পুরাণের ছত্রছায়ে বাঙালির গার্হস্থ্য-জীবনের ছবি অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। হিমালয় কন্যা উমা পিতৃগৃহে আগমন করলে মেনকার মাতৃহৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়। কিন্তু জামাতা মহাদেব উমাকে যেদিন নিতে আসেন সেদিন মায়ের মনের ব্যাকুলতা ও বেদনাকে কবি এভাবে ব্যক্ত করেন, –

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি, অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা, তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।

দাশরথি রায়।। দাশরথি রায় উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট পাঁচালীকার-রূপে খ্যাতিমান; তবে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আধ্যাত্মিক গান ও শ্যামাসংগীত রচনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বেশি। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের বাঁধমুড়ায় তাঁর জন্ম। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৫৭ সালে। তাঁর সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো না। নীলকুঠিতে সামান্য বেতনের চাকুরে ছিলেন তিনি। জানা যায় আকাবাই বা অক্ষয় পাটুনী নামক একটি নিচজাতীয় নারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দাশরথি রায়ের সম্পর্ক ছিলো। আকাবাইয়ের কবির দলে দাশরথি রায় গান বাঁধতেন। তাঁর শ্যামাবিষয়ক একটি গানের নমুনা,

দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।।
ষড় রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ।
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।।
কাটিলাম সে কূপ কালরূপ জল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি ত্রিগুণ ধারিণি। বিগুণ করেছি স্বগুণে।।
কিসে এ বারি নিবারি ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে।
বারি ছিল চক্ষে ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে
তরে তরি, চরণ তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি করি ক্ষমা।।

দাশরথি রায়ের পাঁচালীর কথা আর সুর প্রবাদ প্রবচনের দ্যুতি ছড়ায়। তারই কিছু নমুনা,-

খলের স্বভাব অন্তরে বিষ, মুখে বলে মিষ্টি।
লোভীর স্বভাব চিরকাল পরদ্রব্যে দৃষ্টি।।
মানীর স্বভাব নিজ দুঃখের কথা পরে কন না।
অভিমানী লোকের স্বভাব তুচ্ছ কথায় কান্না।।
নারীর স্বভাব গুপ্ত কথা পেটে রাখা দায়।
ডাইনের স্বভাব ছেলে দেখলে ঘন দৃষ্টে চায়।।
দাতার স্বভাব 'নাই' বাক্য নাহি মুখে।
হিংসুকের স্বভাব পরসুখে মরে মনোদুঃখে।।
কৃপণের স্বভাব ক্ষুদ্র দৃষ্টি খুদটি ধরে টানে।
বালকের স্বভাব খাদ্যদ্রব্যে দেবতারে না মানে।।
বাতুলের স্বভাব মিছে কথায় চারিদণ্ড বকে।
বৈদ্যের স্বভাব কিছু কিছু অহঙ্কার রাখে।।
জলের স্বভাব নীচ বিনে ঊর্ধ্বগামী হয় না।
পাষাণের স্বভাব শরীরে কভু দয়ামায়া রয় না।।

ষোড়শ অধ্যায়

অনুবাদমূলক বাংলা সাহিত্য

দ্বিতীয় পর্ব চতুর্থ অংশ (খ্রিস্টীয় ১৯ শতক)

মধ্যযুগের বাংলো সাহিত্যে মুসলিম অবদান

উনিশ শতকের পুথিসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত॥ উনিশ শতক নানা কারণে বাঙালি জীবনের রেনেসাঁ বলে বিবেচিত। এ সময়ে, হয়তো পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিনব অভিসারেই, বাঙালির চিত্ত জুড়ে জীবনের নানা ক্ষেত্রে নতুন মূল্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেজন্যই যুগের এই বাঁক বদলানো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন একটা পরিবর্তনের ঢেউ আসে, তেমনি এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনায় গতানুগতিকতাকে পরিহার করার শুভ সূচনা হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণেই বাংলা গদ্যের জন্ম সম্ভব হয়, কবিতা নতুন পথের অভিসারী তখন। নাটকে উপন্যাসে নতুনরূপে সমাজ এবং মানুষের জীবনের মূল্যায়ন শুরু হয়। সুতরাং বলা যায় এ সময় বাঙালি জাতি তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্ণয়ে যেমন প্রস্তুতি নেয়, তেমনি বাংলার কবি সাহিত্যিকগণও নতুন সাহিত্যাদর্শ আবিষ্কারে উন্মুখ হন। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সব কিছুর মূলেই তখন পাশ্চাত্য জীবনের ভাবপ্লাবন গভীরভাবে প্রভাব সঞ্চার করে। এই অবস্থায় সমাজের শিক্ষিত স্তরের লোকগণ উপলব্ধি করেন শিক্ষা, সংস্কৃতি কিংবা সাহিত্যের পুরোনো আদর্শে আটকে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অশিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন সেই নতুন ধারার জীবনাদর্শকে স্বাগত জানানোর উৎসাহ দেখা দেয় নি। ফলে আরবি পড়ুয়া মুসলিম কবিদের পক্ষেও নতুন ধারার সাহিত্যের ভাবোন্মাদনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। এর পেছনে যে কারণগুলো বিদ্যমান ছিলো, সেগুলো অবশ্যই বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। প্রথমত, শরীয়তি শিক্ষার প্রভাবে মুসলিম কবিরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে গিয়ে মধ্যযুগীয় পুথির জগতেই আত্মমগ্ন থাকেন। সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার সাধ ও সাধ্য কোনোটাই তাঁদের ছিলো না। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে অনীহার কারণে অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানগণ অগ্রসরমান শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি কৌতূহল, উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা কোনোটাই পান নি। ফলে নতুন সাহিত্যাদর্শে দীক্ষিত হওয়া থেকে তাঁরা থাকেন একেবারেই নির্লিপ্ত। এই অবস্থায় পুথির জগতে আবর্তিত হওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। অথচ পূর্বসূরিদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য রক্ষারও এঁরা যে সফলকাম হয়েছেন এমনও বলা যায় না। এ সময়ের কয়েকজন মুসলিম পুথিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

দুই॥ উনিশ শতকের কতিপয় মুসলিম পুথিকার

তমিজী॥ তমিজীর কাব্যের নাম 'লালমতি তাজলমুলুক'। পুথিখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত। তাই তমিজীর জীবন কিংবা পুথির রচনাকাল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায় না। তবে হয়তো ভাষারীতির বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করে তমিজীর কাব্যের রচনাকাল ১৮৫৫

থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব।[৩১০] 'পুথি-পরিচিতি'তে বলা হয়েছে, তামিজী আঠারো শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন।[৩১১] তমিজী বলেছেন, 'নিধনী আলিম অলি পণ্ডিতের গণ।' এই অলি পণ্ডিত কবির পৃষ্ঠপোষক ও আদেষ্টা ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা তাঁদের আদেষ্টা কিংবা পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে অনেক প্রশংসাজ্ঞাপক উক্তি করেন। অলি পণ্ডিতও যে সেই ভাগ্যবানদের একজন, তাঁর সম্পর্কে তমিজীর মন্তব্য থেকে তা প্রমাণিত হয়। অলি পণ্ডিতের রূপ, গুণ ও যশ বিষয়ে কবি বলেন, --

সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ এলম সাগর।
গুণী জ্ঞানী পিক মানি রসের নাগর॥
সোন্দর শরীর জেন মুরতি মদন।
ফুটিআছে চাম্পা জেন রস বৃন্দাবন॥

তমিজীর সমসাময়িক আর একজন সম্পর্কে গুণকীর্তন করা হয়েছে। সম্ভবত আলী হোসেন নামের এই ব্যক্তিও ছিলেন তমিজীর কাব্যরচনার অন্যতম অনুপ্রেরণা। তাঁর সম্পর্কে কবি বলেছেন,

ঠাকুর আলী হোছন ধীর আরতি করিয়া স্থির বামু গ্রামে বৈসে মহাসএ।
তাহান আরতি শুনি আপনার মনে গুণি হীনমতি তমিজী ভণএ॥

আর এক জায়গায়,

রস দর্প গুণধাম আলী হোছন নাম সুআরতি শুনিআ তাহান।
তাহান পীরিতি রসে আর তান উপদেশে হীনমতি তমিজীএ ভাণ॥

'পুথি পরিচিতি'তে উল্লিখিত হয়েছে যে এই আলী হোসেন চট্টগ্রামের বামুর জমিদার ছিলেন। কবি তাকে 'রাজা' বলে সম্বোধন করেছেন। অনেক জমিদারই তখন 'রাজা' সম্বোধনে মান্যতা পেতেন। তবে আলী হোসেনের প্রতাপের সঙ্গে তাঁর গুণও যে ছিলো, তাঁর প্রতি তমিজীর প্রশংসাকীর্তন থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তমিজী নিজেও বামুর অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তমিজীর পুথিটি খণ্ডিত হওয়ায় এর উপাখ্যান সম্পর্কে সবটা জানা যায় না। সোলেমান নবী এই উপাখ্যানের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কবির কল্পনার গুণে তিনি দৈত্য দানো পরী ও পশু পাখির সম্রাট। একদিন জিবরাইল সোলেমান নবীকে জানালেন পূর্বদেশের নৃপতি জেবলমুলকের পুত্র তাজলমুলকের সঙ্গে পশ্চিম দেশের রাজকন্যা লালমতির মিলন হোক। মহান আল্লাহর এই ইচ্ছা বিফলে যেতে পারে না। সুতরাং সোলেমান নবী শপথ বাক্য উচ্চারণ করে বলেন, -'প্রভুর হুকুম কভু না হৈব খণ্ডন। অবশ্য হৈব দোহ শুভ দরশন।' পরের অংশ খণ্ডিত বলে কাহিনীর পরিণতি জানা যায় না।

মুহম্মদ চুহর॥ চুহরের কাব্যে বিবৃত আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় তিনি চল্লিশ বছর বয়সে 'আজরশাহ ছমনরোখ' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তবে তাঁর বালক বয়সের

---

৩১০ পূর্বোক্ত, 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৪
৩১১ পূর্বোক্ত, 'পুথি পরিচিতি', পৃ ৫০৬

রচনা পীর মতিউল্লাহর আদেশে রচিত 'মধুমালতী' কাব্য ও পরে 'দিলারাম'। জনৈক জাফর আলীর আদেশে চুহর 'সুজান চিত্রাবতী' নামক আর একটি কাব্য রচনা করেন। এতগুলো কাব্যের মধ্যে 'আজরশাহ ছমনরোখ' ছাড়া অপর কাব্যগুলো পাওয়া যায় নি। মুহম্মদ চুহর তাঁর কাব্য-আদেষ্টা জাফর আলীর নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করে বলেছেন,—

চাটিগ্রাম ঢাকা আদি ভ্রমি নানা স্থান।
কলিকাত্তা টাকসালে লেখাইল নাম॥
ভাগ্যবলে কোম্পানীর উকিল হইয়া।
পুনরপি চাটিগ্রামে আইল পালাটিয়া॥

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত টাকশালে জাফর আলী কাজ করতেন বলে কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং মুহম্মদ চুহরকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের লোক মনে করাই সমীচীন।[৩১২] চুহরের কাব্যের আত্মবিবরণী অংশটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। জানা যায় কবির পূর্বপুরুষ আজমত গৌড় থেকে চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে নিবাস স্থাপন করেন। কবির পিতা ওয়াযিজুদ্দীনের পীর মোল্লা আবদুল হাকিম। হাকিমের দুই পুত্র কাজী আবদুল হামিদ ও কাজী আবদুল মজিদের মধ্যে আবদুল মজিদ ছিলেন দোহাজারীর কাজী কমিশনার এবং কবির প্রতিপোষক। প্রতিপোষক হিসেবে তিনি চুহরের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এই আবদুল মজিদের আদেশক্রমেই চুহর 'বানু হোসেন বাহরাম খান', 'কামরূপ কালাকাম' ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন। 'আজরশাহ ছমনরোখ' খণ্ডিত আকারে প্রাপ্ত পুথি। কাব্যে জাফর আলীর গুণগান করে কবি বলেছেন,

নৃপ জাফর আলী সাধু স্থানমন্ত দাতা।
কুশলে রাখৌক কর্ত্তা শিরে স্বর্ণ ছাতা॥
তান আজ্ঞা পাই হীন দুঃখিত চুহর।
ভাঙ্গিয়া ফারছি ভাষা রচিল পয়ার॥

কাব্যের কাহিনীটি হচ্ছে– আজর শাহ ও সুনালা আবিজ দেশের রাজা ও রাণী। কিন্তু তাঁরা নিঃসন্তান। দৈবজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী আজর শাহ মসরিক রাজকন্যা সমনরোখকে বিয়ে করেন। ঈর্ষার জ্বালায় অধীর হয়ে সুনালা যাদু টোনা করে রাজাকে নির্বীর্য করার চেষ্টা করেন। তথাপি সমনরোখ গর্ভবতী হন। তুকতাক করে তাকেও মারাত্মক অসুস্থ করা হয়। জানা গেলো বাগদাদের জনৈক পীর সফাহানই কেবল সমনরোখের জীবনরক্ষা করতে পারেন। বুড়ো মন্ত্রী বিপদসঙ্কুল অভিযান চালিয়ে ও পরীদের রাজ্য পার হয়ে বাগদাদ পৌঁছে পীরের দর্শন পান। তারপরে পুথিটি খণ্ডিত। তবে এটুকু অনুমান করতে বাধা নেই যে আজর শাহ ও সমনরোখের মিলনেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। চুহরের কাব্যে যাদু টোনা ও তুকতাকের প্রসঙ্গ থেকে লোকবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

মালে মোহাম্মদ॥ মালে মোহাম্মদ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। ডক্টর আহমদ শরীফ অনুমান করেন কবির জীবনকাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়পাদ থেকে

৩১২ পূর্বোক্ত, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি', পৃ. ১৬৭

শোলপাদ। উনিশ শতকে বেশ কিছু মুসলমানি পুথি বটতলার ছাপাখানার বদৌলতে সুলভ হয়েছিলো। মালে মোহাম্মদের 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল,' 'তম্বিয়তন্নেছা', 'আহকামুল জুমা', 'সেরাজুল মুমেনীন' এভাবেই সুলভ হয়। পুথিগুলোর মধ্যে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' বিষয়গত কারণে বেশ জনপ্রিয় হয়। এই জনপ্রিয় রোমান্টিক উপাখ্যানটি পরীর সঙ্গে মানুষের প্রেম ও পরিণয়ের সাহিত্যিক রূপায়ণ। মিসরের যুবরাজ সয়ফুলমুলক বন্ধু সায়াদকে নিয়ে এক বিপদসঙ্কুল অভিযান চালিয়ে পরীরাজ শাহবালকন্যা বদিউজ্জামালকে লাভ করে। ধর্মীয় পুস্তক 'তম্বিয়তন্নেছায় মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র শোধনের জন্য নানা উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর প্রতিদিন ঝগড়া দেখে কবি ক্ষুব্ধ,

আমি অতি মূর্খ মতি কি জানি সায়রি।
কিতাব ভাঙ্গিয়া রঙ্গে করিতে তৈয়ারি॥
দেখিলুং বাঙ্গালা দেশে বড়হি ফছাদ।
আওরত মরদে নিতি করএ বিবাদ॥

কোরান হাদিস আর ফেকা হৈতে আনান।
তম্বিয়তন্নেছা করি কিতাবের নাম॥

এই গ্রন্থে নারীর শরীয়তসম্মত জীবনযাত্রার প্রতি যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করা যায়।

বাকের আলী চৌধুরী॥ বাকের আলী তাঁর 'মনুচেহর মাসুমা পরী' পুথিতে একটি আত্মবিবরণী দিয়েছেন,

কহে হীন বাকের আলী নাছির নন্দন।
পড়িয়া শোনায়ে মন জানে সর্বজন॥
দাদা মোর আজিজুল্লা সর্বগুণ ধাম।
আবদুল মজিদ মোর পরদাদার নাম॥
জমিদারী ছিল মোর গোলাম আজিজ।
লবু হস্তে বেচা গেল নিলামেত নিজ॥

রাউজান থানার গহীরা গ্রামে কবির বসতি। বাকের আলী চৌধুরীরা ছিলেন খান্দানি জমিদার বংশোদ্ভূত। কিন্তু এক সময় তাঁদের জমিদারী নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। পুথি-রচনায় বাকের আলী ফারসি কিতাবকে আদর্শ করেন।

মনুচেহর কেচ্ছাবাণী ফারসি জবান।
কেতাবেতে লিখা আছে তাহার বয়ান॥
বাঙ্গালার ভাষে তাকে করিনু পদবন্ধ।
সকলে জানিতে হেতু পয়ার সুছন্দ॥

পুথির রচনাকাল ১২১১ মঘীসনের ৫ মাঘ বা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ। এই হিসেবে বাকের আলী চৌধুরী উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক। কবি জনৈক সফর আলীর অনুরোধক্রমে পুথি রচনা করেন, 'সফরালি আরতি শুনি, মনুচেহর কেচ্ছাবাণী কহিলেন্ত হীন বাকর

আলী।' পুথির রোমান্টিক গল্পটি হচ্ছে মাসুমা পরীর প্রতি মনুচেহরের অনুরাগ, পরে রোমান্টিক পুথিসাহিত্যের রেওয়াজ অনুযায়ী নানা বিপদ-উত্তরণ শেষে নায়ক নায়িকার মিলন।

মোহাম্মদ খাতের॥ মোহাম্মদ খাতেরের জন্মস্থান হাওড়া জেলার বালিয়া পরগণার গোবিন্দপুর নামক গ্রাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১২৪৬ বঙ্গাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করে ১৩..৬ বঙ্গাব্দে।[৩১৩] মোহাম্মদ খাতের ছিলেন উনিশ শতকের একজন নিষ্ঠাবান পুথিকার। তিনি বারোটি পুথির রচয়িতা। বিষয়ভেদে তাঁর পুথিগুলো হচ্ছে, উপাখ্যানমূলক পুথি, 'লায়লী মজনু', 'মৃগাবতী যামিনীভান', 'গুল ও হরমুজ' এবং 'শাহনামা'। পীরপাচালী, 'কাসাসুল আম্বিয়া' ও 'বনবিবি জহুরনামা'। শরাশরীয়ত বিষয়ক, 'একশত ত্রিশ ফরজ'। এছাড়া বিবিধ বিষয় অবলম্বনে লেখা 'তুতিনামা', 'আখবারুল জুমা', 'সওয়াল ও জবাব', 'মেরাজনামা' এবং 'জঙ্গে সোহরাব'। 'কাসাসুল আম্বিয়া'র মূল লেখক ইসহাক আলী নিসাপুরী। তবে খাতের তাঁর পুথিখানি গোলাম নবীর একটি উর্দু তর্জমা থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন।

৩১৩ পূর্বোক্ত, 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য', ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯৮

সপ্তদশ অধ্যায়

লোকসাহিত্য (আবহমান)

আবহমান কালের বাংলা সাহিত্য

লোকসাহিত্যের যে সাধারণ সংজ্ঞা,- বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা সৃষ্ট লোকমুখে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত কোনো গাথা বা উপাখ্যান, অনেককাল পর্যন্ত যার কোনো লিখিত রূপ থাকে না,-- তাকে শিষ্ট সাহিত্যের ধারা থেকে আলাদাভাবে বিচার করা হয়। কারণ সাহিত্যের পরিমার্জিত রূপের সন্ধান প্রায়শ তাতে পাওয়া যায় না। তবে এই ধারার সাহিত্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় ভাবের যে স্ফুরণ ঘটে তা মনে করার কারণ আছে, ফলে মৌলিকতাগুণ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। লোকসাহিত্য প্রধানত সমষ্টির সৃষ্টি। তবে তার উৎসমুখে ব্যষ্টির অবদান থাকতে পারে। হয়তো এক সময় কোনো বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা বিশেষ কোনো বিষয়ের উপর কোনো আখ্যান বা পালাগান মুখে মুখে রচিত হয়ে থাকবে। পরে জনপ্রিয়তা অনুযায়ী কালের বিবর্তন পথে যাত্রাকালে তার উপর বিভিন্ন জনের শৈল্পিক অভিরুচির ছাপ পড়ে লোকসাহিত্যের ধারাটি নতুন সংস্করণ লাভ করে। একারণে লোকসাহিত্য কখনো কখনো সমাজের সৃষ্টি বলেও বিবেচিত হয়। এবং একথাটিও সত্য যে সমাজের অভ্যন্তর থেকেই লোকসাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। এসব কারণে লোকসাহিত্যে লোকসমাজ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে।

যদিও লোকসাহিত্যের ধারাটি এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে, এক সমাজ থেকে পরবর্তী সমাজে এবং এক যুগ থেকে আর এক যুগে বাহিত হয়ে আসে, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতিতে লোকসাহিত্যের পরম্পরা মৌখিক ঐতিহ্য থেকে ক্রমশ লিখিত ঐতিহ্যে প্রবেশ করার অধিকার পায়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য যথা পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, শুক সপ্ততি বা জাতক এবং রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, প্রবাদ, হেঁয়ালি, ছড়া, ধাঁ ধাঁ ইত্যাদির লিখিত ঐতিহ্য এখন আমরা পাই।

ছড়া, ব্রতকথা, মেয়েলি গান, জারিগান, সারিগান, কৃষিবিষয়ক গান, ঘাটুগান, বারোমাসী গান, বেদের গান, পটুয়ার গান, ধাঁ ধাঁ, পালাগান বা গীতিকা ইত্যাদি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পালাগান লোকসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। 'মৈমনসিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত পালাগানগুলো বিশেষকালের সৃষ্টি হিসেবে যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য লাভ করেছে। জনসাধারণের ঐতিহ্যের ধারাকে সঞ্জীবিত রেখেছে এসব পালাগান।

একথা ঠিক যে লোকসাহিত্যের লৌকিক ও মৌখিক ঐতিহ্যের কাছে লিখিত বা শিষ্ট সাহিত্যও যথেষ্ট ঋণী। তবে লিখিত সাহিত্যের কাছেও লোকসাহিত্যের কিছু ঋণ থাকে। সংস্কৃতে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগের লৌকিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য ও চৈতন্য জীবনী সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য এমন কি অনুবাদ ও পুঁথিসাহিত্যের ধারাটিও লোকসাহিত্যের মেজাজ ও স্বভাবের বিশিষ্টতাকে তাদের অন্তর্নিহিত সত্তায় প্রয়োজনবোধে ধারণ করেছে। আমরা লালন শাহ, পাগলা কানাই, মনসুর বয়াতি, মদন বাউল, হাসন রাজা, পাঞ্জু শাহ, এদের গান লিখিত সাহিত্যের রূপেই পেয়েছি, কিন্তু লোকের মুখে তার প্রচার যেন আরো অনেক বেশি মানানসই।

আসলে লোকসাহিত্যের সৃষ্টিই হয়েছে লোকের মুখে মুখে, তার প্রচার এবং প্রচলনও লোকের মুখে। নিরক্ষর সমাজের এই মূল্যবান সৃষ্টি লোকসংস্কৃতির মধ্যে ধারণকৃত হয়ে বহমান সংস্কৃতির ধারায় একযুগ থেকে অন্যযুগে এসে পৌঁছায়। বর্তমান সমাজে লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় লোকসাহিত্যের ধারাটি এখন লিখিত আকারে পাওয়া যায়।

দুই॥ মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা

এই দুটি গীতিকার পালাগুলো চন্দ্রকুমার দে (১৮৮৯-১৯৪৬) কর্তৃক ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এসব পালা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ সালে 'মৈমনসিংহগীতিকা' ও ১৯২৬ সালে 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মৈমনসিংহগীতিকার অন্তর্ভুক্ত দ্বিজ কানাই রচিত 'মহুয়া', চন্দ্রাবতী রচিত 'মলুয়া', 'দস্যু কেনারামের পালা', নয়ানচাঁদ ঘোষ রচিত 'চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র', দ্বিজ ঈশান রচিত 'কমলা', রঘুসুত রচিত 'কঙ্ক ও লীলা', মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ান মদিনা' এবং 'দেওয়ান ভাবনা', 'কাজলরেখা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পালা। এসব পালায় প্রেমকাহিনীর যে উদ্ভব, তার উৎস ময়মনসিংহের অন্তঃপাতি পল্লী। সেই সূত্রে বলা হয়েছে, --'উত্তরে সুসঙ্গ দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্বর্তী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র।'[৩১৪] পূর্ববঙ্গগীতিকায় অনেক পালা আছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি যেমন, 'ধোপার পাট', 'কাঞ্চনমালা', 'ভেলুয়া', 'মানিকতারা বা ডাকাইতের পালা', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'নেজাম ডাকাইতের পালা', 'কাফন চোরা বা মনসুর ডাকাইত', 'আয়না বিবি', 'নুরুন্নেছা ও কবরের কথা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গীতিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য॥ এসব গীতিকায় যে প্রেমের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে সমাজ ও জীবনের ছবি স্পষ্ট, সেসমাজ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে সমষ্টিগত জনগণের দ্বারা গঠিত। সেখানে ভালো মানুষের যেমন সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি আছে মন্দ মানুষ। সেখানে হিংস্র প্রবৃত্তি ও দৈবের নিষ্করুণ নিষ্পেষণের পাশাপাশি বিরাজ করে জীবনের প্রতি অনিবার্য মমতা ও প্রেমের দুর্দম পিপাসা।

গীতিকায় বর্ণিত প্রেমের যে প্রকাশ, তা কোনো দৈব বা সমাজের নির্ধারিত গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। প্রেম এখানে সমাজের অনুশাসন তুচ্ছ করে। এই অপ্রতিরোধ্য প্রেমের পরিপূরক হিসেবে এখানে কোমল ছায়া ফেলে বাংলাদেশের প্রকৃতি। মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির এক অনবদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এই চিরায়ত প্রেমের ছত্রছায়ে। কখনো প্রকৃতির বিমোহন রাজ্য থেকে কবিগণ উপমা সংগ্রহ করে এক একটি অনবদ্য চিত্র পাঠককে উপহার দেন। যেমন,--

ভাদ্র মাসের চাম্মি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥
[কঙ্ক ও লীলা]

---

৩১৪ দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত, 'মৈমনসিংহগীতিকা' [পূর্ববঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা] (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সং. ১৯৫৮), ভূমিকা দ্রষ্টব্য

মহুয়ায়,—

সাপে যেমন পাইল মনি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্ম ফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল॥'

ভেলুয়া সুন্দরীতে,—

সেই ঘাটে আসিয়ে ভোলা দৃষ্টি করি চায়।
আকাশের চন্দ্র যেন রে ঘাটে দেখা যায়॥
এক চন্দ্র উঠে জানি রে পূর্বপশ্চিম ধারে।
আজু কেন দেখি রে চন্দ্র দরিয়ার কিনারে॥

উৎকট প্রাদেশিকতার ছাপ এবং অপটু ছন্দপ্রয়োগ সত্ত্বেও কবিরা মাতৃভাষায় উপমার মালা গেঁথে ভাবটিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা প্রশংসনীয় ভাবনার পরিচয় দেয়। প্রকৃতি তার ভাণ্ডারটি উজাড় করে দিয়েছে এই গ্রাম্য কবিদের। মানবকন্যার রূপবর্ণনায় কবিরা তাই এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম। তার মধ্যে মানবহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বার্তাটিও তাঁরা আমাদের শুনিয়েছেন।

গ্রাম্যতার অনেক নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও কবিদের উপস্থাপনায় কাব্যভাবনার যে প্রকাশ তাতে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের অভাব নেই। যেমন,—

জোছনা ভরা রাইত রে, দোলা যায় চলি।
মুঠ মুঠ যেন ছুঁড়ে বেলফুলের কলি॥
দোলা যায়, যায় রে দোলা অষ্ট বেহারার কাঁধে।
মা-বাপেরে মনেতে পড়ি বৌ গুরি গুরি কাঁদে॥
ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনি কাঁপি ওঠে বুক।
মা-বাপেরে মনেতে পড়ে, ছোট ভাইয়ের মুখ॥
আগে পাছে বৈরাতি যায়, যায় রে ধীরে ধীরে।
দখিন হাওয়া পাইয়া দোলার কাপড় ঘন ঘন উড়ে॥
ধবধবা জোছনা পহর দিনের মত রাইত।
ঝোপের কাছে খাপদি রইছে মনসুর ডাকাইত॥

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন পালাগুলো ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রচিত হয়েছে। তবে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিলো বলে এগুলোর ভাষা অবিকৃত থাকে নি। যুগে যুগে ভাষা যেমন বদলায়, পালাগুলোর ভাষা তেমনি বিভিন্ন কালের লোকমুখে প্রবহমান হওয়ায় এগুলোর ভাষায়ও পরিবর্তন আসে।

তিন॥ বাউল গান

বাউল সাধকেরা তাঁদের নিজস্ব যে-ধর্মের তাড়নায় সাধনার পথে অগ্রসর হন, তার মূলে আছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, সুফী দর্শনতত্ত্ব, সহজিয়া সাধনতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমতের প্রভাব। এমন কি বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রভাবও বাউলদের মধ্যে পড়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, বাউল গানের উৎপত্তি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

তবে এসব গানে প্রাচীনত্বের কোনো নিদর্শন নেই। লোকমুখে প্রচলিত ছিলো বলে বিভিন্ন যুগের ছাপ এগুলোর মধ্যে পড়েছে।

বাউলদের মূল অভিপ্রায় হলো পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার লীলাসন্দর্শন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের মিল আছে। মুসলিম সহজিয়াপন্থীরা যে বৈষ্ণব সহজিয়াপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা মনে করারও কারণ আছে।

বাউল সম্প্রদায়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১. মুসলমান বাউল সম্প্রদায়, ২. নবদ্বীপের বাউল সম্প্রদায় এবং ৩. নবদ্বীপের বাউলগোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে সুফীবাদের প্রভাব বেশি দেখা যায়। সুফীসাধনার তত্ত্বটি হলো মানবজীবনেই স্রষ্টার রূপের প্রকাশ ঘটে। ধর্মগুরু নবীদের নির্দেশিত পথে মানুষ পরিচালিত হলে তার জীবনে সার্থকতা আসে। সেজন্য বাউল গানের বিষয় গুরুবাদ ও দেহতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহতত্ত্ব বাউল গানে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাউলগণ মনে করেন দেহের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার অধিষ্ঠান। অর্থাৎ পরমাত্মা মানবজীবনের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাই জীবাত্মা অর্থাৎ মানবজীবন পরমাত্মারই একটা অংশ। ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সুফীর একাত্মতা বা 'ফানা' প্রাপ্তি ঘটে। সুফী ধর্মতত্ত্বের উপদেশ হলো সংসারের সুখসুবিধা, আরাম আয়াস ত্যাগ করে ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়া এবং যে উপায়ে তা অর্জন করা সম্ভব তাকে মিস্টিসিজমের পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়।

বাউল গানগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে স্রষ্টার প্রতি ব্যক্তিহৃদয়ের আর্তি ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা। গুরুপ্রশস্তি ও দেহতত্ত্বের বিশ্লেষণ এসব গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যদিও এসব তত্ত্বের উপস্থাপনায় কিংবা বিশ্লেষণে অভিনবত্বের কোনো পরিচয় নেই, কিন্তু কবির আত্মনিবেদনে আন্তরিকতার যে স্পর্শ থাকে, তা গভীর ভাবের ব্যঞ্জনা বহন করে।

লালন শাহ।। আত্মপরিচয় জ্ঞাপনে মধ্যযুগের কবিদের অনেকেরই বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ; কিন্তু বাউলগুরু লালন শাহ তাঁর গানে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ধারণ করেও আত্মপরিচয় দানে ছিলেন একেবারেই নির্লিপ্ত। ফলে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী মিস্টিক কবির জীবনতথ্য সংগ্রহে গবেষকগণ খুব একটা সফল হতে পারেন নি। গবেষক কিংবা পণ্ডিতদের কথা বাদই দিলাম ; লালনের বিপুল পরিমাণ শিষ্যও তাঁর জীবন সম্পর্কে এমন কোনো প্রামাণিক তথ্য দিতে পারেন নি। ফলে শ্রুতিতে অনুমানে গবেষকগণ লালন শাহের জীবনী নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ।

লালন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর/১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক শুক্রবার। তাঁর জন্মস্থান কেউ কেউ মনে করেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি অঞ্চলের গড়াই নদীর তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রাম ; কেউ কেউ ঝিনাইদহের হরিশপুর বলেও মত প্রকাশ করেছেন। ধর্মে লালন ছিলেন কারো মতে মুসলমান, কারো মতে হিন্দু। তাঁর সম্পর্কে যে জনশ্রুতিটি

কৌতূহলোদ্দীপক তা হলো খেতুরী যাত্রাকালে লালন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীরা তখন তাঁকে কালীগঙ্গার তীরে ফেলে রেখে চলে যান। তখন ছেঁউড়িয়ার মলম বিশ্বাস তাঁকে উদ্ধার করে নিজগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে লালন মরমীয়া জীবন শুরু করেন এবং একদা সাধক সিরাজ সাঁইয়ের সংস্পর্শে আসেন।

লালন লোকসমাজে যে তত্ত্বের বাণী প্রচার করেন তার মূলে আছে তাঁর অখণ্ড মানবপ্রীতি। এই প্রীতির বশবর্তী হয়ে তিনি মানবজীবনকে দেখেছেন জাতি ধর্ম বর্ণের অনেক উপরে। সেজন্য তাঁর সাধনতত্ত্বে মানুষ কোনো বিভাগ উপবিভাগের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তিনি যে তত্ত্বের সন্ধান পান, তাঁর মতে সে ই হচ্ছে 'মানুষ-তত্ত্ব'। লালন জীবনভর এই মানুষ তত্ত্বের সাধনা করেছেন।

মানুষ তত্ত্বে অভিজ্ঞান লাভ করলেই মনের মানুষের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। সেজন্য লালন বলেন,

মনের মানুষ এই মানুষে আছে, লও চিনে, তারে দেখলে মন, জ্ঞান নাগনে।
রসিক যারা, জানবে তারা, অরসিকে জানবে কেনে॥

তত্ত্বময় বাণী চিরন্তনকে লালন তাঁর সহজাত শিল্পার্থীভাব স্পর্শে রসময় করে তুলেছেন, ফলে শিল্পপ্রিয় মানুষের কাছে তা বিপুলভাবে আদরণীয় হয়েছে। লালনের গানে উপমা, রূপক, প্রতীক, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সাহিত্যতত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার আছে। উচ্চাঙ্গের ভাবকে সাহিত্যের নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কলাকৌশল হিসেবে লালন তাঁর গানে সাহিত্যতত্ত্বের বিষয়গুলো সমন্বিতভাবে ব্যবহার করেছেন। সেজন্য বলা যায় লালনসঙ্গীতে মহৎ কাব্যের সব রকম লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

মিস্টিক সঙ্গীতের ধারায় অন্য যেসব কবি তাদের অবদান রেখেছেন তারা হলেন হাসন রাজা, ফকির পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, হাউলে গোসাঁই, পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, এরফান শাহ, গোসাঁই গোপাল, অনন্ত গোসাঁই, নিতাই ক্ষ্যাপা প্রমুখ। বাউল গানের ধারাটিকে নতুন প্রজন্মে সঞ্জীবিত রাখার একটা উদ্যম তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্মে মরমীয়া চিন্তাবিদ **মহিন শাহ** মিস্টিক সাহিত্যের ধারাটিকে অনেক দূর এগিয়ে দেন।

চার॥ ব্রতকথা

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলার ব্রতকথাগুলোর একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। অনুমান করা হয় এগুলোর উৎপত্তি খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে নবম শতকের মধ্যে। সেজন্য ব্রতকথায় আদিযুগের বাংলা ও বাঙালির সমাজ জীবনের কিছু পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে প্রাচীন বাঙালি হিন্দুনারীর ধর্মজীবনের সংস্কার ও পালনীয় বিধি সম্পর্কে ব্রতকথায় নির্দেশাদি আছে। এছাড়া হিন্দুর বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনার মূলেও ব্রতকথাগুলো অনেক মূল্যবান অবদান রেখেছে।

ব্রতকথাগুলো প্রাচীনকালের সৃষ্টি বলে একসময় এগুলোর ভাষায় যে দুর্বোধ্যতা ছিলো, কালের বিবর্তনে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসে এখন ব্রতকথার ভাষার দুর্বোধ্যতা

অপসারিত হয়েছে। এদের অপ্রচলিত প্রয়োগও এখন সহজবোধ্য হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও এদের ভাষায় এখনো কিছু প্রাচীনত্বের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের প্রতি প্রশংসাসূচক যেসব ভক্তিগান কবিরা রচনা করেছেন, ব্রতকথা থেকেই তাঁর প্রেরণা আসা সম্ভব। মঙ্গলচণ্ডীর আবির্ভাব কল্পনা তার একটি প্রমাণ বলে মনে করা যায়। কেননা মঙ্গলকাব্যের মতো দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করার বিষয় ব্রতকথায় দেখা যায়।

বাংলার হিন্দুনারীরা পারিবারিক মঙ্গল-কামনায় বিভিন্ন ব্রতপালন করে থাকেন। পারিবারিক মঙ্গলের নানাদিক ছাড়াও গার্হস্থ্যজীবনের নানা প্রসঙ্গ ব্রতকথায় দেখা যায়। দেবদেবীদের মূর্তি তৈরি করে পূজা অর্চনার মাধ্যমে বাংলার নারীগণ ব্রতপালন করেন। ঘরের শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এসব ব্রতপালন করা হয়। ব্রতকথার দেবদেবীদের নাম হচ্ছে থুয়া, লাউল, ভাদুলি, সেঁজুতি ইত্যাদি। এসব দেবদেবীর সঙ্গে সূর্যঠাকুর ও শিবঠাকুরের একটা সম্পর্ক পাতানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এঁদের পরিচয় নিম্নরূপ,--

থুয়া॥ সংসারে স্বচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে থুয়ার বন্দনা করা হয়। কখনো কখনো সন্তান কামনার উদ্দেশ্যেও থুয়া দেবতার পূজা করা হয়। এঁর বন্দনার ভাষায় কিছু প্রাচীনত্বের নিদর্শন আছে। যেমন, 'থু থুয়াস্তি। আঘন মাসের জয়াস্তি॥'

লাউল॥ যেহেতু লাউল দেবতার পূজার দ্বারা কৃষিবিষয়ক ফলনের প্রাচুর্যের প্রার্থনা করা হয়, সেজন্য লাউল সম্ভবত লাঙ্গলকে বোঝানো হয়েছে।

ভাদুলী॥ নৌযাত্রা যাতে বিঘ্নসঙ্কুল না হয়, সেই দিকের প্রার্থনা করে ভাদুলি পূজার আয়োজন করা হয়। ভাদুলী ভাদ্রদেবীর বিকল্প রূপ। প্রাচীনকালে বঙ্গনারীরা ভাদ্র মৌসুমে স্বামীপুত্রকে জলপথে বিদায় দিয়ে তাঁদের মঙ্গলের জন্য ভাদুলী দেবীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতো। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গটি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্ষাকালে জলপথে যাত্রা বিঘ্নসঙ্কুল ছিলো বলে ভাদ্রমাসে ভাদুলীকে পূজা করে এই যাত্রা শুরু হতো।

সেঁজুতি॥ প্রাচীন বাংলায় কুমারী হিন্দুকন্যা বিয়ের আগে ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনে শান্তি কামনা করে অথবা সপত্নীরূপ বিপদ আপদ অপসারণ ও জীবনভর পতিপ্রেম-লাভের আকাঙ্ক্ষা করে সেঁজুতি ব্রত পালন করতো।

পাঁচ॥ ডাকার্ণব ও ডাকের বচন

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের অন্যতম নিদর্শন বৌদ্ধ ডাকার্ণব গ্রন্থ। তারই আদর্শে লেখা হয় ডাকের বচন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'ডাকার্ণব' গ্রন্থখানি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি নেপালের কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এ গ্রন্থ পান। তাঁর মতে ডাকার্ণব রচিত

হয়েছে খ্রিস্টীয় দশম শতকে। ডাকার্ণবের সাদৃশ্যযুক্ত বাংলাদেশে-পরিচিত ডাকতন্ত্রই হচ্ছে ডাকের বচন।

ডাক সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত হচ্ছে তন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীকে ডাক বা ডাকিনী মনে করা যায়। ডক্টব দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত ডাক অর্থে প্রচলিত বাক্য বোঝায়।

ডাকার্ণব তান্ত্রিক মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনত্যম শাখা বজ্রযানী সম্প্রদায়ের রচিত একখানি পুস্তক। 'ডাক' কিংবা 'খনা' যথার্থই কোনো ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে সাধাবণ মানুষেব কাছে এরূপ ধারণা প্রচলিত যে ডাক ও খনা বৌদ্ধ বা হিন্দু- সম্প্রদায়ের কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলা হয়। কেউ কেউ ডাকের বচনের স্রষ্টা একজন গোপ ছিলেন বলে মনে কবেন। তাঁব বাড়ি ছিলো কামরূপ জেলাব বড়পেটা মহকুমার লেহিভেগবা গ্রাম। মুসলমান আক্রমণের সময় বাংলাব বৌদ্ধমঠ ও মন্দিরগুলো লুণ্ঠিত হলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ যে তাঁদেব পুথিপত্র নিযে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে পালিযে যান, সেই সূত্রে নেপাল থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেব একটি প্রাচীন পুথির সঙ্গে 'ডাকার্ণব' গ্রন্থখানিও পাওযা যায। তবে 'ডাকার্ণবে'ব আদর্শে পবিকল্পিত ডাকের বচনেব ভাষায প্রাচীনত্বেব কোনো নিদর্শন নেই। এব ভাষা পুবোপুবি আধুনিক। ডাকের বচনে বাংলাদেশেব পাবিবাবিক জীবনেব চমৎকাব ছাযাপাত ঘটেছে। কোনো কোনো বচনে বাংলার গৃহ ও গৃহিণী সম্পর্কে যে সাবধান--বাণী উচ্চারণ কবা হয়েছে তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন, -

> ঘবে স্বামী বাইবে বইসে।
> চাবি পাশে চাহে মুচকি হাসে॥
> হেন স্ত্রীযে যাহাব বাস।
> তাহার কেন জীবনেব আশ॥

ঘবসংসাব সম্পর্কিত আবো একটি বচন,---

> ভাল দ্রব্য যখন পাব।
> কালিকার জন্য তুলিয়া না থোব॥
> দধি দুগ্ধ কবিয়া ভোগ।
> ঔষধ দিয়া খণ্ডাব বোগ॥
> বলে ডাক এই সংসাব।
> আপনে নইলে কিসের সংসাব॥

ছয়॥ খনার বচন

খনা সম্পর্কে যে তথ্য জানা যায় তা হলো তিনি একজন বিদুষী নারী ছিলেন। অনুমান করা হয খনাব আবির্ভাবকাল ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে। খনা বলেছেন 'আমি অনাচার্যের বেটি।' জনশ্রুতি অনু..ব।. ..শিক্ষণ পবগণাব বাবাসাত মহকুমাব দেউলি গ্রামে খনার

নিবাস ছিলো।[৩১৫] জানা যায় চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রম চন্দ্রপুরে খনা দীর্ঘদিন বাস করেন। বাংলার জনমনে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে এই বিদুষী মহিলা রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য [illegible] খ্রিস্টীয় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতক। বিক্রমাদিত্যই খনার বচনের নায়ক ছিলেন। [illegible] কিংবদন্তী অনুযায়ী খনা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম কবি বরাহমিহিরের স্ত্রী ছিলেন।

আসলে খনা সম্পর্কিত কিংবদন্তিগুলো কতদূর সত্য তা সঠিকভাবে বলা যায় না। খনার কাল সম্পর্কেও বিভ্রান্তি আছে। খনার বচনে প্রাচীনত্বের কোনো নিদর্শন নেই। লোকের মুখে মুখে বচনগুলোর প্রচলন ছিলো। তাই যুগে যুগে এসব বচনের ভাষায় আসে পরিবর্তন এবং ভাব আধুনিকতার স্পর্শমণ্ডিত হয়। আজকের দিনে খনার বচনের আধুনিক রূপের কাছে তার প্রাচীনত্বের বিষয়টা প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেছে। বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে খনার বচনের বিষয়গুলোর একটা গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় খনা যে বাঙালি ঘরের মেয়ে ছিলেন এ সম্পর্কে একটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়।

খনার বিষয়-বৈশিষ্ট্য।। কৃষিতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গকে ঘিরে খনার বচনের অবস্থান। জমি ও ফসলের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য খনা বাংলার কৃষকদের অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। বিষয়ভেদে খনার এই ধারার বচনকে চারভাগে ভাগ করা যায়। ক. কৃষিবিষয়ে [illegible] এবং সংস্কার বিষয়ক; খ. আবহাওয়া জ্ঞান সম্পর্কিত; গ. কৃষিবিষয়ে ফলিত জ্যোতিষ জ্ঞান বিষয়ক এবং ঘ. [illegible] সম্পর্কে উপদেশ। খনার এসব বচন সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ,

কৃষিবিষয়ে অমঙ্গল আশঙ্কা করে খনার বচনে কিছু সংস্কারের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন,

পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল।
তার দুঃখ চিরকাল।।
তার বলদের হয় বাত।
ঘরে তার না থাকে ভাত।।
খনা বলে আমার বাণী।
যে চষে তার হবে হানি।।

খনার কোনো কোনো বচনে প্রাচীন প্রথা সম্পর্কে নির্দেশ আছে। যেমন,

আষাঢ়ের পঞ্চদিনে রোপয়ে যে ধান।
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান।।

খনার যেসব বচনে আবহাওয়া ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে,

ক. চৈত্রে কুয়া ভাদ্রে বান।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।।

---

৩১৫ প্রিয়নাথ জানা, 'বঙ্গীয় জীবনীকোষ', ১ম খণ্ড (কলিকাতা : মাতৃভাষা পরিষদ, ১ম সং. [illegible]), পৃ. ১১৪

খ. যদি বর্ষে আঘনে। রাজায় বার হয় মাগনে।
যদি বর্ষে পৌষ। মেঘে না পায় তূষ॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

গ. আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখা। কি কব শ্বশুর লেখাজোখা॥
যদি বর্ষে মুষলধারে। মধ্য সমুদ্রে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ছিটেফোঁটা। পর্বতে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি। শস্যের ভার না সয় মেদিনী॥
হেসে চাকি বসে পাটে। শস্য সেবার না হয় খোটে॥

খ. দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কার্তিকের উন জলে। খনা বলে ফুল ফলে॥

গ. দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ। কমে না, বাড়ে বারমাস॥

কোনো কোনো বচনে বাংলাদেশের চাষী সম্প্রদায়কে শস্যের যত্ন নিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন,

ক. শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা॥
দিলে চিটা গোড়ে। দুই কুড়া ভুঁই বাড়বে ঝাড়ে॥

খ. লাউগাছে দেও মাছের জল।

খনার বচনগুলো যাঁরই লেখা হোক না কেন, এসব বচন যে বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গভীর তত্ত্ব ও সত্যকথাকে সহজভাবে ব্যক্ত করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব সঞ্চার করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিপুল বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের এখানেই শেষ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্রমশ আধুনিকতার দিকে মোড় পরিবর্তন করে। উনিশ শতকের শুরু থেকেই নতুন যুগের সূচনা। এই যুগ বাঙালির নবজাগরণের যুগ। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন উপলব্ধি এই যুগের বাহন। গদ্যচর্চা আধুনিক যুগের সেই নতুন উপলব্ধিতে গতিসঞ্চার করে। প্রবন্ধ সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে গদ্যে; এবং কাব্যগীতির ধারায় গীতিকবিতার মননধর্মী ও রোমান্টিক রূপায়ণ এই যুগেরই সাহিত্য বৈশিষ্ট্য। রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে, বঙ্কিম উপন্যাসে, মধুসূদন মহাকাব্যে এবং বিহারীলাল বাংলা গীতিকবিতায় এই নতুন যুগের উন্মেষ ঘটান। রবীন্দ্রনাথ থেকে এই যুগের ব্যাপক প্রসার শুরু হয়। তবে এই যুগকে তার সৃষ্টির বিশালতায় পরিপূর্ণ করবার ভূমিকা পালন করেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ। এই পরিপ্রেক্ষিতেই একথা আমরা বিবেচনা করবো যে নতুনের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর সৃষ্টির প্রেরণা আসে প্রকৃতপক্ষে অতীতকে তার স্বমহিমায় গৌরবান্বিত করবার প্রবণতা থেকে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

শব্দসূচি